নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৫

সম্পাদনা :
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

মুদ্রক :
কাশীনাথ পাল
১৮বি, ভুবনধর লেন
কলকাতা-১২
ও
দুলাল চন্দ্র ভূঁঞ্যা
সুদীপ প্রিন্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ :
রূপায়ণ
কলকাতা-৫

সূচীপত্র

উপন্যাস :

গল্পগ্রন্থ :

উপন্যাস

সহৃদয়া

শ্রীনরেন্দ্রনাথ গুহ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

'সোয়ালো লেনের পুরনো ফ্ল্যাট বাড়িটার দোতলায় উত্তর-পশ্চিম কোণের ছোট্ট একখানা ঘর। সবচেয়ে নিরেস ঘর বাড়িটার, যেমনি নোংরা, তেমনি অন্ধকার। গরমের দিনে কি কষ্টই যে হোত। টিকতে না পেরে শেষে এক বন্ধুর কাছ থেকে পাখা একখানা ভাড়া ক'রে আনলুম। কিন্তু চালান যায় না। বাতাস যতটুকু মাথায় লাগে তার চেয়ে মাথার উপর ঝুর ঝুর ক'রে চুণ বালি ঝরে বেশি। দুটি কাউণ্টার, একটি সেভিংস আর একটি কারেণ্ট। ক্যাশে কখনো আমি বসি, কখনো হেমন্ত। আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সে সেক্রেটারী। আবার আমি লেজার কীপার, সে চিফ এ্যাকাউণ্টাণ্ট। হিসেবটা হেমন্তই ভালো বুঝত। আমরাই কর্মচারী, আমরাই কর্মকর্তা। আর শীতল বেয়ারা। সে ডিরেক্টর নয়, ডিক্টেটর। নাওয়া-খাওয়া ব্যাপারে তার হুকুম আমাদের দুজনকে মেনে চলতে হোত। সাইন বোর্ডটা কিন্তু আমাদেরই সবচেয়ে ভালো ছিল। বিল্ডিংটায় যতগুলি অফিস তার মধ্যে দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মত অমন জমকালো অর্ণামেণ্টাল হরফ আর কারো ছিল না। কিন্তু হলে হবে কি পার্টি যা দু' একটি আসে সাইন বোর্ড দেখেই খুশি আর চরিতার্থ হয়ে ফিরে যায়, ভিতরে ঢোকেনা।'

মৃদু হাসলেন সুরপতি। সেদিনের সেই পার্টি হারাবার দুঃখের রেশ আজও যেন তাঁর স্বরে ভাসল, ঠোঁটের কৌতুকের হাসির সঙ্গে মিশে রইল।

সাদার্ণ এভেনিয়ুর তেতলা বাড়ির দোতলার ড্রয়িংরুমে শোফায় অসুস্থ শরীর এলিয়ে দিয়ে দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের আঠার বছর আগেকার ইতিহাস বলছিলেন চেয়ারম্যান সুরপতি চক্রবর্তী। শ্রোতা মেয়ে সুজাতা আর জেনারেল ম্যানেজার অবনী চাটুয্যে। এ ইতিহাস সুজাতা বাবার কাছে আরো বহুবার শুনেছে। শুনে তার ক্লান্তি আসে না, যত শোনে তত যেন নতুন বলে মনে হয়। বাবার কৈশোর আর যৌবনারম্ভের কৃচ্ছ্র-সাধনের কাহিনী শুনতে সত্যিই ভারী চমৎকার লাগে সুজাতার। সে যেন আর এক সুরপতি। এখনকার দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যেন তাঁর খুব কমই মিল আছে। সেই সোয়ালো লেনের পর আরো দু' একটি অলিগলি ঘুরে দেশলক্ষ্মী উঠে এসেছে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে, ছ'তলা নিজস্ব বাড়ি হয়েছে, আরো গোটা দশেক বাড়ি দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেনারস, বোম্বাইয়ে। আর তিন চারটে বাড়ির কনস্ট্রাকসন্ চলছে আগ্রা এলাহাবাদ, পাটনা, নাগপুরে। এছাড়া ভারতবর্ষের আরো যে গোটা কুড়ি শহরে দেশলক্ষ্মীর শাখা আছে সে বাড়িগুলি ব্যাঙ্কের নিজস্ব নয়, ভাড়া করা। তাদের কিছু কিছু সুজাতা দেখেছে, কিছু দেখেনি। তবে সুজাতা কল্পনা করতে পারে তার কোনটাই এখন আর সোয়ালো লেন নয়।

সুরপতির মুখে পুরনো কাহিনী শুনতে সুজাতার ভালোই লাগে। কিন্তু আজ সুজাতাও একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। প্রথমত সুরপতি অত্যন্ত লো ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন, কথা বলা তাঁর পক্ষে একেবারেই বারণ। এ সম্বন্ধে ভারি কড়া নির্দেশ দিয়ে গেছেন ডাক্তার সেন। দ্বিতীয়ত অবনীবাবুর সামনে এসব গল্প বলা সুজাতার মোটেই মনঃপুত হচ্ছিল না। হোলই বা গল্প, নিজেদের দৈন্যের কাহিনী তো বটে। অবনী চাটুয্যে হলেনই বা পদস্থ জেনারেল ম্যানেজার, সুরপতির দক্ষিণ হাত, তবু তো বাইরের লোক। কিন্তু কথা বলবার সময় বাধা পাওয়া সুরপতি পছন্দ করেন না। একটু বাদে তিনি নিজেই থামলেন। থেমে টি-পট্ থেকে চা কাপে ঢেলে নিতে যাচ্ছিলেন, সুজাতা বাধা দিয়ে বলল, 'ওকি হচ্ছে বাবা। এবার নিয়ে ক-কাপ হোল।'

সুরপতি জেনারেল ম্যানেজার অবনীর দিকে তাকিয়ে নালিশের ভঙ্গিতে বললেন. 'খাওয়ার মধ্যে ক'কাপ চা-ই তো খাই, তাও বুলু আমাকে খেতে দেবে না।'

অবনী সংক্ষেপে বলল, 'চা বোধ হয় আপনার পক্ষে কম খাওয়াই ভালো, মিঃ চক্রবর্তী।'

সুজাতা বলল, 'চা অত বেশি খাও বলেই আর কিছু খেতে পার না।'

সুরপতি ততক্ষণ কাপে চা ঢেলে নিয়েছেন, পুরো নয়, মেয়ের মন রাখবার জন্য আধা-আধি ভরেছেন কাপের। একটু চুমুক দিয়ে নিয়ে সুরপতি বললেন,—চায়ের অভ্যাস সেই সোয়ালো লেন থেকেই শুরু। না, তারও অনেক আগে থেকে। যখন বেকার নিঃসম্বল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতুম তখনো এক কাপ চা ছাড়া চলত না। দু'পয়সা করে কাপ ছিল তখন। কতদিন কেবল চা খেয়েই কেটেছে। ব্যয় সঙ্কোচের জন্য এক কাপ থেকে আধ কাপে নামতে হয়েছে মাঝে মাঝে, আর ছিল বিড়ি।'

সুজাতা আবার ধমক দিল, 'বাবা, তোমার না কথা বলা বারণ?'

সুরপতি হাসলেন, 'কেবল চা নয়, চা-র কথাটা পর্যন্ত বারণ?'

তারপর টি-পয়ের ওপরকার সুন্দর শ্বেত পাথরের কৌটোর ভিতর থেকে একটা হাভানা চুরুট তুলে নিলেন, অবনীর দিকে একটু ঠেলে দিলেন গোল্ড ফ্লেকের টিনটা। একটু কৌতুকের হাসি ঠোঁটে।

অবনী আরক্ত হয়ে উঠে মাথা নাড়ল।

সুরপতি বললেন, 'তাতে কি। হ্যাঁ, কিন্তু জানো অবনী, কি অমোঘ শক্তি ছিল সেই এক কাপ চা আর একটা বিড়ির? পায়ে হেঁটে তারই জোরে সারা কলকাতা চষে বেড়িয়েছি। কড়া নেড়ে নেড়ে জোগাড় করেছি—পার্টি। সেই পদরথের কাছে কোথায় লাগে তোমার স্টুডিবেকার? ভালো কথা, সাধুখাঁদের কি করলে?'

নতুন মডেলের স্টুডিবেকারটা কাজকর্মের সুবিধার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে জেনারেল ম্যানেজারকে দেওয়া হয়েছে। লাখ পাঁচেক টাকার একটা এ্যাকাউন্ট খোলবার কথা ছিল গোবিন্দ অয়েল মিলের স্বধন্য সাধুখাঁর—যোগাযোগের ভার ছিল স্বয়ং জেনারেল

ম্যানেজার অবনী চাটুয্যের উপর। অবনী মৃদু কৈফিয়তের সুরে বলল, 'এখনো কিছু করে উঠতে পারিনি। আগামী সপ্তাহে—'

ছায়া পড়ল সুরপতির মুখে, গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হুঁ, আগামী সপ্তাহে সাধুখাঁ তোমার কাছে নাও আসতে পারে।' এক মুহূর্তে কঠিন দৃষ্টিতে জেনারেল ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে রইলেন চেয়ারম্যান, তারপর ফের একটু হাসলেন, 'হ্যাঁ, তখনকার দিনে পাঁচ টাকার একটা পার্টিও যদি হাত থেকে ফসকে যেত, মনে হোত পাঁজরের একখানা হাড় ছুটে গেছে।'

অবনী মনে মনে ভাবল, কেবল তখন কেন এখনও তাই যায়। ব্যাঙ্কিং আর অর্থনীতি সম্বন্ধে বিলেতী ডিপ্লোমা আছে অবনী চাটুয্যের। দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক থেকে মাসে মাসে সাড়ে বারশ টাকা করে মাইনে পায়। এক হাজার বেতন, আড়াইশ ভাতা; অভিজাত ঘরের চারু দর্শন পুরুষ, গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর, তীক্ষ্ণ নাক, আয়ত চোখ, বলিষ্ঠ গড়ন, শালপ্রাংশু মহাভুজ। সংস্কৃত কাব্যের নায়কোচিত চেহারা। চমৎকার মানিয়েছে ইউরোপীয় পোশাকে। তিরিশের এক বছর ওপরেই হবে বয়স। মুখের দিকে তাকালে ব্যক্তিত্বটাই যেন বেশি চোখে পড়ে।

চেয়ারম্যানের এই রূঢ় অসহিষ্ণুতায় অবনী বিস্মিত হোল না, কিংবা যে ন্যায়সঙ্গত জবাবটা মনে এসেছিল তাও উচ্চারণ করল না বরং একটু হেসে আশ্বাসের সুরে বলল, 'আপনি ভাববেন না মিঃ চক্রবর্তী।'

ধৈর্য আছে অবনীর। ব্যবহারিক শিষ্টাচারে আর সৌজন্যে আছে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ছাপ, যখন অন্য কোন কেরানী কি কর্মচারী সামনে থাকে না তখন চেয়ারম্যান অবনীর কাজকর্মের সামান্য শৈথিল্যে এর চেয়েও অসংস্কৃত ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রথম প্রথম অবনীর মনও উৎক্ষিপ্ত হোত, বিক্ষুব্ধ হোত, এখন আর হয় না। চেয়ারম্যানের কথার জবাবে নিজের আচার আচরণের শান্ত যুক্তিগত ব্যাখ্যা জানায়, মনের বিক্ষোভ অশোভন কোন ভাষায় প্রকাশ করে না। চাকরী রক্ষার ভয়ে নয়, চাকরীর ভাবনা তার নেই; শিষ্টাচার আর শৃঙ্খলা রক্ষার দায়ে। যতক্ষণ দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে অবনী আছে ততক্ষণ সুরপতি চক্রবর্তীর আসনের সম্মান সে রাখতে বাধ্য। কিন্তু এই কর্তব্যবোধ ছাড়া আরও এক কোমল প্রচ্ছন্ন মধুর অনুভূতি এই কর্কশ মানুষটি সম্বন্ধে মনে মনে পোষণ করে অবনী। সুরপতি চক্রবর্তী কেবল দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান নয়, লক্ষ্মীপ্রতিম সহৃদয়া সুজাতার বাবা।

সুরপতি আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন। সুজাতা উঠবার ভঙ্গী করে বলল, 'আমি যাই বাবা, তুমি যখন আমার কোন কথাই শুনবে না, কেবল কথাই বলবে—'

সুরপতি মৃদু হাসলেন, বুঝতে বাকি রইল না কোন কথায় মেয়ের আপত্তি। বললেন, 'আচ্ছা আর রাগ করব না তুই বোস।'

যার ওপর সুরপতি রাগ করবেন না তার নামটা অনুচ্চারিত থাকলেও সুজাতার

সুগৌর সুন্দর মুখখানা অকস্মাৎ রক্তাভ হয়ে উঠল কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'তোমার যা ইচ্ছা তাই কর বাবা, চা খাও, কথা বল, মেজাজ খারাপ কর, কিন্তু অসুখ বাড়লে আমি কিছু জানিনে, তখন যে হৈ চৈ করে—'

ক্রীং… ….

সুজাতা কথাটা শেষ করতে পারল না, নিচের তলায় কোন্ আগন্তুক যেন এই অসময়ে এসে কলিং বেল টিপছে।

ভ্রূ আর কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল সুরপতির, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, রামভজন, অমূল্য, কার্তিক কেউ নিচে নেই নাকি? আর বুলু, কলিং বেলটা এবার বদলাবার ব্যবস্থা কর। কানে আর সহ্য হয় না।'

সুজাতা বলল, 'তাই দেব বাবা, দেখে আসি কে এল।'

সুরপতি বললেন, 'যেই আসুক না কেন বারণ করে দিয়ে এসো, বলো যে দেখা হবে না।'

সুজাতা মৃদু হাসল, 'না আমি তো বারণ করব না বাবা। রাস্তার যত লোক ডেকে নিয়ে আসব, দেখি কত কথা বলতে পার তুমি।'

ফিকে সবুজ রঙের পর্দাটা একটু তুলে সুজাতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পর্দার সেই মৃদু আন্দোলনের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অবনী, তারপর সোনা বাঁধানো হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'আমি এবার উঠি—।'

সুরপতি বাধা দিয়ে বললেন, 'বোসো, তাড়া কিসের, আজ তো ছুটি। তা'হলে সাধুখাঁ—'

আবার একবার কলিং বেল বাজল, কারো সাড়া না পেয়ে একতলার আগন্তুক বোধহয় অধীর হয়ে উঠছে।

সুরপতি স্নায়ুতে স্নায়ুতে আবার সেই অস্বস্তি বোধ করলেন, বললেন, 'আমি আজ সব হারামজাদাকে তাড়াব, নিচে কি কেউ নেই? লোকটা বোধ হয় এই নতুন কলিং বেল টিপতে শিখেছে, মজা পাচ্ছে বাজিয়ে বাজিয়ে, ইতর, অভদ্র!'

অবনী কোন জবাব দিল না। কলিং বেলের একাধিকবার শব্দে সেও অস্বস্তি বোধ করছে।

কিন্তু সুরপতির এতখানি অসহিষ্ণুতা তার কাছে অশোভন লাগল। কোন অপরিচিত আগন্তুক সম্বন্ধে কোন ভদ্রলোক যে এমন অশিষ্ট মন্তব্য করতে পারেন তা সুরপতির সঙ্গে পরিচয় না হলে অবনী ধারণা করতে পারত না। বিচক্ষণ ব্যাঙ্কার হিসাবে, স্বপ্রতিষ্ঠ স্বগঠিত মানুষ হিসাবে সুরপতির ওপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে অবনীর, কিন্তু তাঁর আচার-আচরণ শাসন-ভাষণের ভঙ্গি পদে পদে যেন অবনীর রুচি আর শালীনতাবোধকে পীড়িত করে। বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় সুরপতি অত্যন্ত নিচের তলা থেকে উপরে উঠেছেন।

যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে সুরপতির। লিফ্‌টে কেউ তাঁকে তুলে নেয়নি, উপরে উঠবার জন্য কেউ তার জন্য সিঁড়ি পেতে রাখেনি, অমসৃন বন্ধুর পাহাড়ী পথ বেয়ে নিজের শক্তিকে তাঁকে উঠে আসতে হয়েছে। সে কাহিনীর কিছু কিছু অবনী শুনেছে। বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত কিংবদন্তীও কানে গেছে কিছু কিছু। না গেলেই যেন ভালো হোত, কারণ সুরপতি সুজাতার বাবা। সুরপতির মধ্যে অসংস্কৃত মনের ছাপ না দেখলেই যেন ভালো হোত। অবশ্য আকৃতি প্রকৃতিতে সুজাতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুরপতির মেয়ে বলে তাকে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। শিক্ষায় দীক্ষায় পরিমার্জিত স্বতন্ত্র। তবু যেন মাঝে মাঝে কেমন এক ধরণের আশঙ্কা হয় অবনীর। যদি কোনদিন সুরপতির অভ্যাস, শালীনতা, সংস্কৃতির দৈন্য সুজাতার মধ্যেও আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে, বড় ঘনিষ্ঠতা বাপ মেয়ের মধ্যে। এতখানি অন্তরঙ্গতা যেন ভালো লাগে না অবনীর। কেবল শ্রদ্ধা আর বাৎসল্যই নয়, পরস্পরের মধ্যে সৌখেরও সম্পর্ক আছে। অবনীর নিজের যদি এমন বাপ থাকত সে তাকে মনে করত এ্যাকসিডেণ্ট। কিন্তু এত সাদৃশ্যের অভাব, এত বৈপরীত্য সত্ত্বেও সুরপতি সুজাতার পক্ষে আকস্মিক নয়, অপরিহার্য্য।

সুরপতি অবনীর ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন না, কিংবা লক্ষ্য করলেও গ্রাহ্য করলেন না। অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সুজাতার জন্য। অবাঞ্ছিত আগন্তুক বিদায় হয়েছে না জানতে পারলে যেন সুরপতির স্বস্তি নেই। কথা শুরু করতে ভরসা পাচ্ছেন না সুরপতি, আবার কখন বেল বেজে বসবে তার ঠিক কি। কলিং বেলটা আজই সরিয়ে ফেলতে হবে।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই লঘু পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। ফের নড়ে উঠল পর্দা। সুজাতা ঘরে ঢুকল।

সুরপতি বললেন, 'কে এসেছিল। বিদায় করতে পারলি ?'

সুজাতা একটু ইতঃস্তত করে বলল 'ভদ্রলোককে নিচের ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

সুরপতি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কেন ? কি দরকার ?'

'তোমার নামে একখানা চিঠি নিয়ে এসেছেন। জবাব নিয়ে যেতে চান। আমি অনেক করে বললুম তুমি অসুস্থ। জবাব তাঁকে না হয় পরেই দেওয়া যাবে। কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, অনেক দিন ধরে ঘুরছেন, ব্যাঙ্কেও গেছেন কয়েকবার, না পেয়ে—'।

সুরপতি পাদপূরণ করে বললেন, 'এখানে হানা দিয়েছেন। আচ্ছা, দাও চিঠি।'

চিঠিটা সুজাতা তার বাবার হাতে এগিয়ে দিল। সাদা খামের ওপর পাকা হাতের ইংরাজিতে সুপরিচিত নাম ঠিকানা।

সুরপতি চিঠিটা একবার দেখেই অদ্ভুত একটু হেসে অবনীর দিকে এগিয়ে দিলেন, 'নাও পড়।'

অবনী তেমন লক্ষ্য না করেই বলল, 'কিন্তু এতো আপনার পার্সনাল চিঠি।'

সুরপতি বললেন, 'না, তোমাদের বিলাতী কার্টসির জ্বালায় আর পারিনে। দেখছ না নামের পর চেয়ারম্যান দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড লেখা আছে। আচ্ছা বুলু, তুই-ই খোল দেখি চিঠিটা।'

সুজাতা চিঠিটা খুলে ফেলল। দেখা গেল চিঠির ওপরটা যেমন ভিতরটা তেমন নয়। নীলাভ প্যাডে ভাঁজ খুলে দু'চার লাইন পড়ে চিঠিখানা বাবার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সুজাতা বলল, 'তুমি পড় বাবা।'

সুরপতি বললেন 'কেন, কি আছে চিঠিতে? তোরা সবাই সাহেব মেম হয়ে গেলি?'

চিঠিখানা একটু রাগ করেই মেয়ের হাতে থেকে ছিনিয়ে নিলেন সুরপতি। মেয়েলী গোটা গোটা অক্ষরের বাংলা লেখা দেখে প্রথমে একটু যেন চমকে উঠলেন সুরপতি, কিন্তু পাঠ দেখে আশ্বস্ত হলেন, তারপর মনে মনে পডতে লাগলেন :

কল্যাণীয়েষু,

চিঠি লিখবার আগে অনেকবার ইতঃস্তত করেছি চিঠি দিলে তুমি সত্যিই চিনতে পারবে কিনা। সেদিন তো আর নেই। তুমি আজকাল কত বড় লোক হয়েছে। তোমার সেই রঙপুরের গরিব বউদির কথা এখন কি আর চেষ্টা করলেও মনে করতে পারবে? তা ছাড়া দু' দশ বছরের কথাও তো নয়। তোমার ছাত্রী বীণার বয়স ছিল তখন নয়, এখন উনত্রিশ। পাঁচটি সন্তানের মা হয়েছে। হিসেব করে দেখ কতকাল হোল। আর তোমার সেই ছাত্রটির কথা মনে আছে? যাকে অ, আ, ক, খ পড়াতে? অসিত লিখতে যে বার বার তালব্য শয়ে দীর্ঘ ঈ-কার দিত আর বার বার শোধরাতে হোত তোমাকে। আর তোমার ছাত্রের বাবা রাগ করতেন মাস্টারের ওপর। নিতান্ত আমার দয়ায় তোমার তখন চাকরি যায়নি। কিন্তু সেই রাগ করা মানুষটি আর নেই সুরপতি ঠাকুরপো। তিনি আজ দশ বছর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। রাখবার মধ্যে রেখে গেছেন অসিতের ঘাড়ে একরাশ দেনা আর তিনটি বয়স্থা বোন। স্বর্গে গেছেন তিনি, তাঁর কথা আর বলিনে। বীণার পর আরো দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম মেজোটি বছর খানেকের মধ্যেই সিঁদুর মুছে ফিরে এসেছে। সবই অদৃষ্ট। কিন্তু মেয়েদের জন্য তো কারো কাছে হাত পাতিনি পাততে হোল ছেলের জন্য। তোমার সেই ছাত্র আজকাল নাম শুদ্ধ করে লিখতে পারে বটে, কিন্তু না পারে চাকরি যোগাড় করতে, না পারে রাখতে। সেই চার বৎসরের ছেলেমানুষী আর খেয়ালীপনা ছাব্বিশ বছরেও ওর গেল না। তাই ভাবলুম অসিতের সেই ছেলেবেলার মাস্টারের কাছেই তাকে পাঠিয়ে দি, যেমন করে পারে ছাত্রকে বেত মেরে সোজা

করুক। কেবল নিজের কথাই বললুম। তুমি কেমন আছ? ছেলে মেয়ে কটি? কে কি করে? তাদের মা যে ছেলেবেলায়ই ফাঁকি দিয়েছে সে খবর জানি। আহা বেচারা! কেবল দুঃখ দুর্দাশার সঙ্গেই যুদ্ধ করে গেল। সুখের মুখ আর দেখল না। তুমি কি দেখেছ? বড মানুষের সুখ দুঃখের আমরা কি বুঝি। স্নেহ আর মঙ্গল জেনো। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষিনী—
শ্রীঅরুন্ধতী চন্দ

পড়া শেষ ক'রে চিঠিটা সুজাতার হাতে ফিরিয়ে দিলেন সুরপতি, তারপর মৃদু হাসলেন।

সুজাতা বলল, 'হাসছ যে বাবা।'

সুরপতি বললেন, 'ভাবছি সংসারে প্রয়োজনের তাগিদে কত কাজই না হয়! বাইশ তেইশ বছর আগেকার ভুলে-যাওয়া ছিঁড়ে-যাওয়া সম্পর্ক ফের জোড়া লাগে। নখচেনা সামান্য পরিচয় অসামান্য হয়ে ওঠে। কিন্তু কুটুম্বিতার ব্যাপারে মেয়েদের জুড়ি নেই। এ বিষয়ে পুরুষ তাদের অনেক পেছনে। হরবিলাসবাবু এমন করে লিখতে পারতেন না। একটা ইনট্রডাকটরী চিঠিই বড় জোর দিতেন, অবশ্য হরবিলাসবাবুর স্ত্রীর চিরকালই একটু লেখালেখি আর সাহিত্যের বাতিক ছিল।'

চিঠি পড়বার কৌতূহল অতিকষ্টে আপাততঃ চেপে রাখল সুজাতা, বলল 'ভদ্রলোক যে বসে রয়েছে বাবা।'

সুরপতি বললেন, 'বলে দাও অফিসে দেখা হবে। পরশু থেকে আফিসে যাব।' তারপর অবনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চাকরির ক্যানডিডেট। আমার মনে আগেই স্ট্রাইক করেছিল। কোথাও কিছু খালি আছে নাকি অবনী?

একটু কি চিন্তা করে অবনী জবাব দিল, 'বিল ডিপার্টমেণ্টের গণেশবাবু আরও একজন এসিস্ট্যাণ্ট চাইছেন মাস দুই ধরে। লেজারেও দু'তিন জন সর্ট আছে।'

সুরপতি বললেন, 'একেকটা লেজারকে দু'ভাগ করলে দু'তিন জন কেন দশ পনের জনও সর্ট পড়তে পারে। সেভিংসে অন্তত চারটি লোক বেশি আছে, সেখান থেকে কিছু কারেণ্টে পাঠালে—'

জেনারেল ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে চেয়ারম্যান একটু হাসলেন, তারপর বললেন, 'অবশ্য তুমি যদি প্রয়োজন মনে কর তাহলে নিশ্চয় লোক নেবে। তোমার অফিসের কথা আমি কি জানি?'

কথাটা ঠিক নয়, কেবল ইনভেস্টমেণ্ট আর বড় বড ব্যাপারই চেয়ারম্যানের মাথায় ঘোরে না, অফিসের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টের নাড়ী নক্ষত্র তাঁর নখাগ্রে। কেবল হেড-আফিসের নয়, সাতাশটি ব্রাঞ্চ অফিসেরও সব রকম খোঁজ খবর রাখেন সুরপতি। প্রত্যেকটি ম্যানেজার আর এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের সঙ্গে সুরপতির ব্যক্তিগত পত্রালাপ আছে।

একেক সময় বড় বাড়াবাড়ি মনে হয় অবনীর। সে যখন রয়েছে এতখানি খোঁজ খবর না রাখলেও চেয়ারম্যান পারেন। মনে হয় সোয়ালো লেনের ছোট্ট ব্যাঙ্কের একাধারে কর্মচারী আর কর্মকর্তা সুরপতি চক্রবর্তী যেন বাংলা দেশের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কারের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই সুরপতির অনন্যসাধারণতার কথা ভেবে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না অবনী চাটুয্যের। সত্যিই কি আসাধারণ ক্ষমতা চেয়ারম্যানের। সাধারণকে অতিক্রম করে তিনি অসাধারণ নন, সাধারণত্ব সঙ্গে নিয়ে অঙ্গে জড়িয়েই তিনি অসাধারণ। কিন্তু খোঁজ খবর রেখেই চেয়ারম্যান সন্তুষ্ট, পারতপক্ষে অবনীর কোন কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। বরং চেয়ারম্যানের অনেক কাজই অবনীর হাতে ছেড়ে দেন।

সুরপতি চশমার ভিতর দিয়ে অবনীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে একবার হাসলেন, একটু যেন লজ্জিত হলেন। তাঁর কোন কথায় কোন আচরণে যে এই বিলাত-ফেরত জেনারেল ম্যানেজারটির মর্যাদা হানি হবে তা সব সময় তিনি খেয়াল রাখতে পারেন না। অবনীর সবই ভালো, কিন্তু বড় স্পর্শকাতর মন। দেহের মত ওর মনটাও যদি অমন রোবাস্ট্ হোত তাহ'লে আর কথা ছিল না।

মেয়ের দিকে ফিরে তাকালেন সুরপতি, 'আচ্ছা, ছেলেটিকে একবার ডেকে পাঠাও দেখি তোমার নিচে যাওয়ার দরকার নেই, চাকর বেয়ারা কাউকে ডেকে বল, তা হলেই হবে।'

সুজাতা আবার বেরিয়ে গেল। মনে হল যেন একটু খুশিই হয়েছে।

সুরজিত ফের অবনীর দিকে তাকালেন, 'রঙপুর হাইস্কুলে মাস্টারী করেছিলাম কিছুদিন। হরবিলাস চন্দ নামে একজন উকিল ছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েদের পড়াতুম, বার টাকা ছিল মাইনে। তবে তাঁর স্ত্রী খুব যত্ন করতেন। নানারকম জলখাবার ক'রে খাওয়াতেন। ভাতও খেয়েছি। যজমানী বামুনের বংশে জন্মালে হবে কি, ছেলেবেলা থেকেই সব রকম কুসংস্কার আমি ছেড়েছি, তোমার মত বিলেত ঘুরে এলে আরো যে কি ছাড়তাম বলতে পারিনে।' একটু হাসলেন সুরপতি তারপর বললেন, 'আমার সেই ছাত্র এসেছে চাকরীর খোঁজে।'

অবনী প্রতিধ্বনি করল, 'আপনার ছাত্র?'

সুরপতি বললেন, 'হ্যাঁ, মাস্টারি টিউশনি তো কম করিনি জীবনে, না করেছি কি, এ আজ নতুন নয়, ব্যাঙ্ক বড় হওয়ার পর থেকে এমন কত ছাত্র, কত বন্ধু, সহপাঠী আর তাদের ছেলে, ভাইপো, ভাগ্নে জামাইকে যে চাকরি জোগাতে হয়েছে তার আর ঠিক নেই, মজা এই এমন সব বন্ধু এসে ঘনিষ্ঠতা দাবী করেছে যার মুখও মনে নেই নামও মনে নেই, কিন্তু সে কথা উচ্চারণ করি সাধ্য কি।'

অবনী বলল, 'কেন'?

সুরপতি অদ্ভুত একটু হাসলেন, 'আর কেন আবার, লোকে কি তা বিশ্বাস করবে?

নিশ্চয়ই ভাববে আমার স্মৃতিভ্রংশতার বিশেষ কারণ আছে, বিশেষ অর্থ আছে, অর্থবান হওয়ার বড় বিপদ অবনী।'

নিজের কানেই যেন একটু দম্ভের মত শোনাল কথাটা, সঙ্গে সঙ্গে সুরপতি নিজেকে শুধরে নিয়ে বললেন, 'অবশ্য অর্থ যাকে বলে তার কিছুই আমার হয়নি, নিজের জন্য আমি কিছু করতে চাইনে, লোকে অবশ্য অনেক কিছুই মনে করে।'

অবনী এবার একটু হাসল, সুযোগ পেয়ে খোঁচাও যেন দিল একটু, বলল, 'আপনাকে যতটুকু জানি, তাতে লোকভয় আপনার কাছে প্রশ্রয় পায় বলে মনে হয় না।'

উত্তেজিত হয়ে সোজা হয়ে বসলেন সুরপতি, 'তা তো পায়ই না, লোকের নিন্দা বন্দনাকে সত্যিই যদি আমি তেমন পরোয়া করতুম তাহ'লে আর কিছু করতে পারতুম না, লোকের স্তুতি প্রশংসাও আমি গ্রাহ্য করিনে, অযথা নিন্দা কুৎসায়ও কান পাতিনে। মানি কেবল নিজের বিবেক বুদ্ধিকে।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবনীর দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলেন সুরপতি, তারপর বললেন, 'যে যাই বলুক, তুমি যার কাছে যত কিছু শুনে থাক, কেউ এমন কথা বলতে পারবে না যে সুরপতি চক্রবর্তী কারো কাছে বিন্দুমাত্র অকৃতজ্ঞ হয়েছে। যার কাছে যতটুকু পেয়েছি, কড়ায় গণ্ডায় তা শোধ করেছি। বেশি ছাড়া কম দিইনি। বাবা বলতেন, কৃতজ্ঞতা শিখবি নারকেল গাছে। গৃহস্থ এক ঘটি জল গাছের গোড়ায় ঢালে আর গাছ সারা জীবন ভরে ঘটি ঘটি জল নিজের মাথায় ক'রে ধ'রে রাখে গৃহস্থের জন্য।'

সুরপতি একটু থামলেন, একটু কোমল হোল গলা, স্বাভাবিক হোল দৃষ্টি, 'যতটা পেরেছি তাঁর উপদেশ আমি পালন করেছি। কিন্তু সব মানুষই তো স্বীকৃতি পাবার যোগ্য নয় অবনী। সব মানুষ মানুষ নয়। তাদের যাচাই করে নিতে হয়, বাজিয়ে নিতে হয়। ইন্‌স্টিটিউশনের যেখানে ক্ষতি দেখেছি সেখানে কুটুম্ব, বন্ধু, ছাত্র, কোনো কিছুর দোহাই আমাকে আটকাতে পারেনি। ছেঁটে ফেলেছি। দুষ্ট ক্ষত বিষাক্ত ব্রণকে পোষণ করবার মত মারাত্মক মমতা আমার নেই।'

পর্দা ঠেলে ফের ঘরে ঢুকল সুজাতা, এবার আর একা নয়। সঙ্গে শ্যাম-বর্ণ, ছিপছিপে চেহারার পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক, একটু লম্বাটে ধরণের মুখ, ঠোঁটটি ভারি মিষ্টি, নাকটি তেমন চোখা নয়, চোখ দুটি গভীর আর প্রশস্ত। একটু যেন স্বপ্নাচ্ছন্নতা আছে। বেশবাসে যত্নের অভাব, খাড়াখাড়া-চুলের সবগুলি চিরুণীর শাসন মানেনি। খদ্দরের পাঞ্জাবীটা আরো একটু ফরসা হলেই যেন শোভন হোত, পায়ের পুরনো স্যাণ্ডেলজোড়াও বদলে আসলে ভালো করত। সব মিলিয়ে হাবে ভাবে কেমন একটা মফঃস্বলের নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের গন্ধ জড়ানো।

চশমার ভিতর দিয়ে প্রাক্তন ছাত্রের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সুরপতি, তারপর সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো।'

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হোলো না অসি·ের, যেন শুনতেই পেলনা। সুরপতির

দিকে আরও একমুহূর্ত যেন পলকহীন হয়ে তাকিয়ে রইল। সে দৃষ্টিতো মুগ্ধতা নেই, কিন্তু বিস্ময় আর কৌতূহল আছে।

অসিতের মনে হোল এমন কুদর্শন মানুষ সে শিগ্‌গির দেখেনি। বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে সুরপতির। কিছু কম হতে পারে, কিন্তু যেন বেশি বলেই মনে হয়। কুটিল রেখা কুঞ্চিত, লম্বাটে ধরণের মুখ, চোয়াল জাগানো, গাল ভাঙা। ঠোঁট দুটিতে বিশেষ করে কে যেন গভীর কালো রঙের তুলি বুলিয়ে দিয়েছে। দেখলে জোঁকের কথা মনে হয়, গা শির শির করে, দাড়ি গোঁফ সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে কামানো, তাতে রেখাগুলি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অনেক কৃচ্ছ্রতা অনেক সংগ্রামের সঙ্কেত যেন দুর্বোধ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে আঁচড়ে আঁচড়ে। চাপা চ্যাপটা চিবুক আর ঠোঁট দু'টি সবচেয়ে নিষ্ঠুর আর হিংস্র লাগল অসিতের। মনে হোল এমুখ সুরপতি দাড়ি গোঁফে আচ্ছন্ন করে রাখলেই যেন ভালো করতেন।

'বোসো।' সুরপতির কণ্ঠে এবার বিরক্ত আর অসহিষ্ণুতার ঝাঁঝ ফুটল।

হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় অসিত যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মাথা নিচু করে প্রণাম করল পা ছুঁয়ে, তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'মার কাছে শুনেছি আপনি ছেলেবেলায় আমার মাস্টারমশাই ছিলেন, চেহারাটা ঠিক মনে করতে পারছিলাম না।'

সুরপতি বললেন, 'তাই চেয়ে চেয়ে দেখছিলে বুঝি, কি করব বল, দেখবার মত চেহারা ভগবান আমাকে দিয়ে পাঠাননি, ভাগ্যটা চেহারার মতই অবিকল দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি নিজের হাতে তাকে মেজে ঘষে নিয়েছি, কেবল চেহারাটায় কিছু করে উঠতে পারিনি। সেইজন্য বোধ হয়, কেবল তোমার কেন অনেকেরই অবাক লাগে। বোধহয় এখানকার বাড়ি-ঘর আসবাবপত্রের সঙ্গে বেমানান মনে হয়, বোসো।'

অসিত এবার বাধ্য ছাত্রের মত বসে বড়ল।

সুরপতি বললেন, 'তোমার মার চিঠিতে সবই জেনেছি। ব্যাঙ্কে চাকরি করবে ?'

'হাঁ।'

সুরপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'কতটা অবধি পড়াশুনা করেছে ?'

'এম, এ, পাশ করেছি।'

'বেশ, কি সাবজেক্ট ছিল ?'

অসিত বলল, 'ফিলসফি।'

সুরপতি একটু হাসলেন, 'ফিলসফি!' ব্যাঙ্কের চাকরির পক্ষে বিষয়টা খুব উপযুক্ত নয় এ কথাটা কেবল হাসিতেই ব্যক্ত করলেন।

কিন্তু বাপের ডান পাশ থেকে সুজাতা হঠাৎ বলে উঠল, 'কোন ইয়ারে বেরিয়েছেন আপনি ?'

বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে মেয়ের দিকে তাকালেন স্থরপতি, তারপর ফের চাইলেন অসিতের দিকে, 'আমার মেয়ে সুজাতা, গত বছর এম, এ, তে ফিলসফিতে ফার্স্টক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে। তোমার রেজাল্ট কেমন ছিল ?'

অসিত একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'ভালো ছিলো না। লো-সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছিলাম। তারপর সুজাতার দিকে তাকিয়ে তার কথার জবাবে বলল, 'আমি ফরটি এইটে পাশ করেছি।'

স্থরপতি মেয়ের দিকে তাকালেন, 'বুলু বুঝি এর মধ্যেই আলাপ ক'রে নিয়েছ।' তারপর ফের অসিতকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'বেশ, কিন্তু প্রথমে আমরা খুব বেশি দিতে পারব না। মাস তিনেক এ্যাপ্রেণ্টিস থাকতে হবে পঞ্চাশ টাকায়।'

অসিত একটু যেন হতাশ হোল, বলল, 'এ্যাপ্রেণ্টিস ? পঞ্চাশ টাকায় ?'

স্থরপতি বললেন, 'হ্যাঁ। আর কোন ব্যাঙ্কে এর আগে কাজ করেছ ?

'না।'

স্থরপতি বললেন, 'তবে ? হ্যাঁ আর এক কথা। ট্রানসফারেবল সার্ভিস, দু'একদিনের নোটিশে ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় তোমাকে পাঠানো হতে পারে। অবশ্য চাকরী কনফার্মড্ হলে তবেই।'

অসিত উৎসাহের স্থরে বলল, 'তাতে আপত্তি নেই। এই উপলক্ষে সমস্ত দেশটা ঘুরে দেখা যাবে।'

স্থরপতি বললেন, 'হ্যাঁ। তা যাবে। তবে চাকরিটাকে উপলক্ষ বলে ভুল কোরোনা, চাকরিটাই লক্ষ্য। ভেবে দেখ। যদি তোমার স্যুট করে সোমবার অফিসে যেয়ো। মিঃ চ্যাটার্জী এপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দেবেন।' বলে অবনীকে ইসারায় দেখিয়ে দিয়ে স্থরপতি বললেন, 'ইনি আমাদের ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার।'

'ও,' অসিত হাত তুলে অবনীকে নমস্কার করল।

অবনী প্রতি-নমস্কারে একটু মাথা নুইয়ে বলল, 'সোমবার অফিসে যাবেন।'

স্থরপতি বললেন, 'আচ্ছা,' তারপর হাঁক দিলেন, 'অমূল্য—'

চাকর এসে দোরের কাছে হাজির হোল।

স্থরপতি বললেন, 'বাবুকে নিচে নিয়ে যাও।'

অসিত বুঝল, স্থরপতি আর দেরি করা পছন্দ করছেন না!

কাউকে বিদায়-নমস্কার না জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে অমূল্যের পিছনে পিছনে নিচে নেমে গেল। কিন্তু সদর পেরিয়ে রাস্তায় পড়ে আর একবার স্থরপতির বাড়িখানার দিকে তাকাল, ভারি সুন্দর ধবধবে তেতালা বাড়ি। মারবেল ফলকে লেখা 'কমলা কুটীর।'

কমলা বোধহয় মাস্টারমশাইর স্ত্রীর নাম;

কিন্তু কুটীর কেন? মনে মনে একবার হাসল অসিত; তারপর ছটা ঘাসের লন পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল।

হাতায় ক'রে মুলো বেগুনের খানিকটা নিরামিষ তরকারী ছেলের পাতে তুলে দিতে দিতে অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর কি বললেন তোর মাস্টার মশাই? চিনতে পারলেন প্রথমে?

অসিত ভাত মাখতে মাখতে মায়ের মুখের দিকে একবার তাকাল, 'তোমার সুপারিশ চিঠি না থাকলে প্রথমে কেন শেষেও তিনি চিনতে পারতেন না মা।'

অরুন্ধতীর মুখখানা একটু আরক্ত হয়ে উঠল কিনা ঠিক যেন বোঝা গেল না। যৌবনের ফর্সা রঙ এখন ম্লান হয়ে গেছে চেহারায়; তাছাড়া বয়সও হয়েছে। এ বয়সে মুখের রঙ ঘন ঘন বদলায় না, বদলাতে দেওয়াই কি যায়?

ছেলের কথার জবাবে অরুন্ধতী বললেন, আহাহা ভারি পড়া শিখেছ, এখন নিজের পরিচয় যদি লোকের কাছে মুখ ফুটে বলতে না পারো সে দোষ কার?'

অসিত খেতে একটু হাসল, 'বলতে চাইলেই কি লোক কান পাতে মা? চেনাতে চাইলেই কি সব সময় লোক চেনে? না চিনতে চায়?'

অসিতের ছোট বোন নীলা সামনেই ছোট্ট জলচৌকিখানার ওপর বসে হাঁটুতে থুৎনি রেখে অন্যমনস্কভাবে মেঝের উপর আঙুল দিয়ে কি যেন লিখে চলছিল। পরনে পুরনো একখানা খয়েরি রঙের শাড়ি। শুকোবার জন্য ভিজে চুল পিঠময় ছড়িয়ে দিয়েছে মাথা নিচু করে থাকার এক গোছা চুল কাঁধের ধার দিয়ে বাহু সংলগ্ন হয়ে মেজের উপর এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে নীলা, নিজের মধ্যে নিজে ডুবে থাকে, অরুন্ধতী কি অসিত কেউ তখন তাকে সংসারী কথায় ডাকে না। কিন্তু অসিতের শেষ কথাটায় নীলা নিজেই যেন সমস্ত আচ্ছন্নতা থেকে হঠাৎ জেগে উঠল। অসিতের দিকে তাকিয়ে উত্যক্ত স্বরে বলল, 'তোমার এসব মান অভিমানের কোন মানে হয় না দাদা, চেনাবার গরজটা পুরোপুরি আমাদের। এখনও যদি নিজেকে এ্যাসার্ট না করতে পার—'

অসিত স্থির কঠিন দৃষ্টিতে বোনের দিকে একবার তাকাল, কিন্তু পরক্ষণেই স্নিগ্ধ কৌতুকে তার মুখ ভারি মোলায়েম দেখাল। মার দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম নালিশের ভঙ্গিতে অসিত বলল, 'শোন মা, নীলার কথা শোন, ছোট বোন হয়ে বড় দিদির মত কি রকম আমাকে উপদেশ দিতে শুরু করেছে দেখ। কি কুক্ষণেই যে ওর মাস্টারীতে মত দিয়েছিলাম, এখন ধমক খেতে খেতে প্রাণ যায়। নীলার ধারণা কি জান, সমস্ত পৃথিবীটাই জ্যোতির্ময়ী গার্লস স্কুল।'

ছেলের কথার ভঙ্গিতে অরুন্ধতীও হাসলেন, 'তা বাপু কথা তো ঠিকই, তোরই তো দোষ, বোনের বিয়ে দিলি না, মাস্টারী জুটিয়ে দিলি।'

নীলা প্রতিবাদ করে উঠল, 'দোষের নামে দাদার অযথা গৌরব বাড়িয়ো না মা। নিজের চাকরি জোটাতে পারে না তার আবার আমার চাকরি জুটিয়ে দেবে। মল্লিকাদিকে ধ'রে মাস্টারীটা আমি নিজে ঠিক করে নিয়েছি মনে নেই ?'

অসিত গম্ভীর ভাবে বলল, 'মাত্র ছ' মাস তো চাকরি করছে এরই মধ্যে কি রকম কর্তৃত্ব করতে শুরু করেছে দেখ মা।' তারপর বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু তুই বড় অকৃতজ্ঞ নীলা, চারির না হয় তোর কোন মল্লিকাদি না কে তিনিই জুটিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু করবার অনুমতিটা দিয়েছিল কে ? মাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে রাজি করেছিল কে ? সে তো আমিই। কৃতজ্ঞতা বলে কোন জিনিস যদি থাকে তোর মধ্যে !'

খেতে খেতে অসিত ফের তাকাল নীলার দিকে, 'কেবল কি তাই ? এত বড় আইবুড়ো বোনকে ঘরে রেখে বাইরে চাকরিতে পাঠিয়ে সমাজে হুঁকো বন্ধ হবার কত বড় একটা ভয় দিন রাত বুকের মধ্যে পুষে রাখছি তা জানিস ?'

নীলা এবার হেসে উঠল, 'সস্তা বিড়ি সিগারেটে বাজার ভরে গেছে তাই, নইলে সত্যি সত্যি সমাজের সেই হুঁকো ছাড়া যদি ধূমপানের আর উপায় না থাকত তাহলে কি আর সহজে তুমি আমাকে ছেড়ে দিতে ?'

যেন ছেড়ে দেওয়ায় নীলা সম্পূর্ণ খুশি হয় নি। যেন হুঁকো বন্ধের ভয়ে আগেকার দিনের মত ছোট বোনকে বারোতে পার করে দিলেই অসিত ভাল করত।

ছেলের পাতে ভাত নেই। অরুন্ধতী ফের ভাত আনতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন, বললেন, 'তাই নাকি ? ওসব গুণও হয়েছে নাকি অসিতের ? আজকাল সিগারেট খায় নাকি ও ?'

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে নীলা বলল, 'হ্যাঁ মা খুব। তোমার ছেলের গুণের আর অবধি নেই। প্যাকেটে কুলোয় না, কৌটা ভরে ভরে সিগারেট আসে আজকাল—'

অরুন্ধতী বললেন, 'সত্যি ?'

অসিত বলল, 'আচ্ছা পাগল তুমি মা, নীলা তোমাকে ক্ষ্যাপাচ্ছে বুঝতে পারছ না ?'

অরুন্ধতী হাসলেন, 'ও তাই বল, ভারি ফাজিল হয়েছিস তো নীলা, এমনি স্বভাব নিয়ে স্কুলে তুই কি করে মাস্টারী করিস শুনি ? মেয়েরা মানে তোকে ?'

নীলা বলল, 'খুব মানে, মানবে না কেন বল ? মেয়েদেরও ধরে ধরে এই সব শিখিয়ে দি। বলি গুরুজনদের সঙ্গে খুব করে ইয়ার্কি দিয়ো তোমরা, তাঁরা যদি রাগ করে ধমক দিতে আসেন বলে দিয়ো "বড় যদি হ'তে চাও ছোট হও তবে।" কিন্তু আমার খিধে পেয়েছে মা। আমিও বসে যাই। তোমার মেজো মেয়ের সন্ধ্যা পূজো কখন শেষ হবে তার তো কিছু ঠিক নেই।'

অরুন্ধতী একটু হাসলেন, 'আমি তো তখনই বলেছিলাম, তুই বস, আর কারো জন্যে তোকে ভদ্রতা করতে হবে না।'

নীলা বলল, 'না বিশেষ ক'রে দাদার জন্যে ভদ্রতা ক'রে মোটেই লাভ নেই আজকাল,

যা দাও লোভী স্বার্থপরের মত চেটে পুটে খেয়ে নেয়। বাটিতেও না রেখে যায় এক টুকরো মাছ না একটু তরকারি। দাদার জন্য অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই মা, যাই মেজদিকে ডেকে নিয়ে আসি।'

নীলা উঠে পাশের ঘরে চলে গেল। একুশ বাইশ বছরের মেয়ে, কিন্তু গড়নটা তেমন বাড়ন্ত নয়, ছোট খাট চেহারা, মুখের ভাবখানাও বেশ মিষ্টি, কচি কচি। অনায়াসে বছর তিনেক বয়স গোপন করা চলে। অরুন্ধতী তা করেনও। কারো কাছে দু'বছর কমান, কারো কাছে তিন। কিন্তু অনর্থক লোকের কাছে মিথ্যা কথা বলা, যে জন্য কমানো তা কোনদিন হবে না, এ মেয়ে যে আর বিয়ে করবে না তা অরুন্ধতী জানেন।

খেতে খেতে অসিত বলল, 'নীলার স্বভাবটা ফের বদলেছে, তাই না মা? মাস্টারী নেওয়ার পর থেকে অল্পবয়সী ছাত্রীদের সঙ্গে মিশে ওর সেই ছেলেমানুষী ভাবটা ফিরে এসেছে, কি বল?'

অরুন্ধতী ছেলের দিকে একটু তাকালেন, তাকিয়ে থেকে ক্লিষ্ট বিষণ্ণ ভঙ্গিতে হাসলেন, 'তুই একটা পাগল খোকন, ছেলেবেলা বুঝি কারো কোনদিন ফিরে আসে? মেয়েদের কোন দিনই আসে না। তবে কেউ কেউ বহুকাল পর্যন্ত ছেলে মানুষ থাকে। যেমন তুই।'

খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অসিত শূন্য থালায় আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে জিভ দিয়ে চুষতে লাগল। অরুন্ধতী ছেলের এই আবাল্যের অভ্যাসটির দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলেন; তারপর বললেন, 'নে এবার ওঠ।'

অসিত বলল, 'উঠি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও নীলা সে সব ব্যাপার ভুলে যায় নি, কি কোন দিন ভুলে যাবে না?'

অরুন্ধতী তর্ক করলেন না, ছেলের কথা স্বীকার করে বললেন, 'আমি কি বলেছি যাবে না? থাক ওসব কথায় আর দরকার নেই, এবার তুই ওঠ দেখি, উমারা এসে বসুক, কি হোল চাকরির, কি বললেন তোর মাস্টারমশাই তা তো কই বললিনে।'

অসিত বলল, 'বলব, তোমাদের খাওয়া দাওয়া হোক, তারপর ধীরে সুস্থে সব শুনো। এমন কিছু শুনবার খবর নয়।'

অরুন্ধতী বললেন, 'কেন, চাকরি পাওয়ার কি আশা নেই? কোন ভরসাই দিল না সুরো ঠাকুরপো? এত করে লিখলাম!'

অসিত একটু রুক্ষস্বরে বলল, 'ভরসা একেবারে দেবেন না কেন, দিয়েছেন, কিন্তু বললাম তো সবই বলব। আগে খেয়ে দেয়ে এসো।'

অরুন্ধতী ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'আচ্ছা, ইচ্ছা হয় বলিস না হয় না বলিস। দিনের পর দিন কেমন যে তিরিক্ষি মেজাজের সব হয়ে যাচ্ছিস তোরা।'

অসিত লজ্জিত হয়ে বলল, 'রাগ করলে নাকি মা?'

ততক্ষণে নীলা আর উমা সরু বারান্দাটুকু পার হয়ে এ ঘরের চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

অরুন্ধতী কোন কথা বললেন না, তাঁর হয়ে নীলাই জবাব দিল, 'না, মনের সাধে বকবে ধমকাবে তবু মা রাগ করবে কেন, এ বাড়িতে রাগ করবার অধিকার কেবল দাদারই —কি বল মেজদি ?'

অসিত একটু হাসল, 'উমা নীলা কি রকম শত্রুতা করছে দেখ আমার সঙ্গে !'

উমা এ অভিযোগের কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল, তারপর বলল, 'উদ্বোধনের উপনিষদ গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডখানা এনেছ নাকি দাদা ?'

অসিত একটু থমকে গিয়ে চুপ ক'রে রইল, তারপর অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, 'ওই যাঃ, আজও তো ভুলে গেছি। বিকেলে ফের যখন বেরুব তখন নিয়ে আসব। কিন্তু কেন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস উমা ? কি হবে ও সব পড়ে ?'

উমা দুটি প্রশ্নের কোনটিরই জবাব না দিয়ে মৃদু একটু হাসল, তারপর শান্তভাবে বলল, 'মনে ক'রে এনো কিন্তু।'

নীলার চেয়ে দু' বছরের বড় উমা, অসিতের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট, কিন্তু তার ভাব দেখলে মনে হয় বয়সের তার আর কোন গাছ-পাথর নেই। এ যুগের মেয়ে নয় যেন উমা, এ শতকের মেয়ে নয়। অকালে অল্প বয়সে কোন মেয়ে কি আর বিধবা হয় না ? কিন্তু উমার মত এমন স্বভাব কার হয় ? শুচিতায়, আচার-নিষ্ঠায়, শাস্ত্রপাঠে উমা তার মাকে অনেকখানি পিছনে ফেলেছে। বছর চারেক হোল বিধবা হয়েছে উমা। পাঁচ বছরের একটি ছেলেও আছে তার। ঠাকুরমার কাছ ছাড়া সে থাকতে পারে না, তাই তাকে রেখে আসতে হয়েছে। তার জন্য তেমন যেন দুঃখ নেই উমার, তার লক্ষ্য ঊর্ধ্বলোকে। দুর্বোধ্য রহস্যঘন আধ্যাত্মিকতায় তার চারদিক ঘেরা।

উমার ঘরে ঢুকলে অসিতের মনে হয় যেন উনবিংশ শতাব্দীতে ঢুকেছে।

দেয়ালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি ; তাক ভরা রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন সংস্করণ। কেরোসিনের মাঝারি ধরনের একটা প্যাকিং বাক্সে তৈরি মন্দির, তার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, শ্বেত চন্দন মাখা তুলসীতে পায়ের দিকটা আর দেখা যায় না। মাঝে মাঝে আসন পেতে সেই মূর্তির সামনে উমাকে বসে থাকতে দেখা যায়। কখনো বা বালিসের ওপর ভাগবতখানা রেখে গালে হাত দিয়ে তন্ময় হয়ে থাকে তার দেড় হাত চওড়া চার হাত লম্বা বাজে কাঠের পুরনো তক্তপোষে। তক্তপোষখানা পুরনো হলে হবে কি, তার ওপর বিছানাটুকু ভারি যত্ন ক'রে পাতা। সাদা ধবধবে চাদর, দেখলেই মনে হয় এই মাত্র বাক্স থেকে বের করেছে। সাদা ঢাকনিতে ঢাকা দুটো বালিস, সন্ধ্যায় যেমন দেখা যায় সকালেও তাই, ঠিক তেমনি ফুলানো ফাঁপানো নিটোল শুভ্রতা। মনে হয় না উমা এসব ব্যবহার করেছে, রাত্রে শুয়ে ঘুমিয়েছে। বিছানা তো নয় যেন রাশি রাশি ফুলের স্তবক। আর

সে স্কুল সাদা ফুল। বৈধব্যের এই শুভ্র বেশ ভারি মানিয়েছে উমাকে। সাদা ব্লাউস, সাদা থান ছাড়া আর কোন বেশ যেন এখন উমার আর কল্পনা করা যায় না। তবু মাঝে মাঝে মন যেন ভারি অস্থির হয়ে ওঠে অসিতের। ইচ্ছা করে সব ভেঙেচুরে ছত্রছান ক'রে ফেলে, দুই কাঁধ ধ'রে আচ্ছা ক'রে উমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, কেন এসব মিথ্যা ভড়ং? সুধীরের স্মৃতি কি তোর কাছে এত প্রিয়? সেই পরম কাপুরুষ রাস্কেলটাকে তুই কি সত্যিই ভালোবাসিস?

কিন্তু এসব প্রশ্ন দাদা হয়ে বোনকে করতে নেই, করবার কোন সুযোগই তাকে দেয় না মা। তাছাড়া এ ধরনের কোন প্রসঙ্গ উঠলে উমা হয় অন্য কথা পাড়ে, না হয় নিজেই উঠে যায়, কিংবা হেসে চুপ করে থাকে; তার সেই হাসির কোন মানে বুঝতে পারে না অসিত।

কিন্তু কেবল উমাকে নয়, এ প্রশ্নটা নীলাকেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে অসিতের। কুমারী নীলার অবশ্য বৈধব্যের কোন ভড়ং নেই। সে রঙিন শাড়ি সেমিজ পরে, হাসে, গল্প করে, স্কুলে পড়ায়, বাইরে থেকে ভারি স্বাভাবিক দেখা যায় নীলাকে। একই ঘরের মাঝেখানে কালো পর্দা টাঙিয়ে দক্ষিণের দিকটায় নীলা ভারি অগোছালো, এলোমেলো খোপটুকুর মধ্যে দিন কাটায়। এ যেন বৈধব্যের আর এক প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় রূপ। তার ঘরের দেয়ালে কোন মহাপুরুষের ছবি নেই। কেবল দু' একখানা ক্যালেণ্ডার, কেবল এ বছরের নয়, পুরনো বছরেরও। বইপত্র এলোমেলোভাবে বিছানায় ছড়ানো। বিছানার রঙিন চাদরে কালির দাগ। এই ঔদাসীন্যের হেতু কি? নীলাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে অসিতের, ইচ্ছা করে তাকে একবার জিজ্ঞেস করে, তুই কি ভুলতে পারিস নি সেই রাস্কেলটাকে? গোপনে গোপনে তুইও কি সুধীরের জন্য এখনো শোক করিস? শোক করতে লজ্জা করে না তোর?

কিন্তু এ সব কথা ছোট বোনকে জিজ্ঞেস করতে অসিতের নিজের লজ্জা করে। কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়, তা ছাড়া অসিতের এই আচরণে অরুন্ধতী কষ্ট পান। তিনি আড়ালে ডেকে বার বার নিষেধ করেন ছেলেকে, 'ছিঃ, এসব কি প্রবৃত্তি তোর? বোনেদের এসব ব্যাপারের মধ্যে কেন আসবি তুই? তা ছাড়া পুরনো ঘাকে খুঁচিয়ে তুলে কি লাভ আছে কিছু? তুই চুপ করে থাক, আপনিই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু ঠিক হলো কই? পটেসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে সুধীর মরেছে আজ চার বছর হলো। কিন্তু তার সেই অস্বাভাবিক, অবৈধ মৃত্যুর ছায়াটা তাদের সংসার থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। কিছুতেই যেন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসছে না উমা আর নীলা।

ছোট বোনের কালির দাগ মাখা বিছানার চাদরটা তুলে ফেলে গুটিয়ে রাখা বিছানার ওপর মাথা রেখে ক্লান্তিতে হাত পা ছড়িয়ে দিল অসিত। নিজের ঘরে যাওয়ার উপায় নেই। সেখানে বোনেদের নিয়ে মা খেতে বসেছেন। যৌথভাবে মায়ের সঙ্গে ঘরখানাকে নিতে হয়েছে অসিতের; দু' খানার মধ্যে সেই ঘরখানাই একটু বড় বলে

তাতেই গৃহস্থালী পেতেছেন অরুন্ধতী। খোলা বারান্দার খানিকটা অংশ ঘিরে নিয়ে রান্নার ব্যবস্থা; কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পাট সারতে হয় অসিতের শোয়ার ঘরেই।

নীলার তক্তপোষের হাত দেড়েক উত্তরেই পর্দা টাঙানো। পর্দার দিকে অসিত তাকিয়ে একটু হাসল। ফাঁক দিয়ে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে উমার গৃহসজ্জা। এই পর্দার ব্যবধানে উমা আর নীলা কতটুকু আড়াল রাখতে পারে পরস্পরকে? ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা জিঘাংসা কতটুকু ঢাকা থাকে এই পাতলা পর্দায়?

কিন্তু না, মনে যাই থাকুক সুধীরের মৃত্যুর পর উমা আর নীলা এখন আর ঝগড়া করে না আগের মত, মুখ দেখাদেখিও আর বন্ধ নেই তাদের মধ্যে। ঘরের মধ্যে কেবল কালো পর্দাই টাঙায় নি ওরা, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য না থাক সভ্যতার পর্দাও টাঙিয়েছে। নীলা আর উমা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে, হাসে, গল্প করে। পাশাপাশি বসে খায়, যদিও একজন আমিষ, একজন নিরামিষ। যদিও দুজনের আচার-আচরণ, চাল-চলন পৃথক, যদিও এই দুই মেরু-বাসিনীর মধ্যে কোন মনের মিল নেই; যদিও পরস্পর পরস্পরের জীবনের ব্যর্থতার কারণ হয়ে রয়েছে; আশ্চর্য, তবু প্রতিমুহূর্তে ঠোকাঠুকি বাধে না। অদ্ভুত ক্ষমতা সভ্যতার পাতলা পর্দাটার।

'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি দাদা?' নীলা এসে ঘরে ঢুকল, 'এই নাও তোমার সুপুরি।'

একটু তন্দ্রার মত এসেছিল অসিতের। নড়ে চড়ে উঠে বসল।

নীলা বলল, 'অনেকক্ষণ suspense রেখেছ। এবার চাকরির খবরটা খুলে বল।'

মা আর বোনদের কাছে সব কথা খুলেই বলল অসিত। চাকরি দিতে রাজি হয়েছেন সুরপতিবাবু। কিন্তু তিন মাস পঞ্চাশ টাকায় এ্যাপ্রেন্টিস থাকতে হবে। তারপর চাকরি পাকা হ'লে দশ পনের টাকা বাড়তে পারে।

শুনে অরুন্ধতী খানিকক্ষণ গম্ভীরমুখে চুপ করে রইলেন। তাঁর এম. এ. পাশ করা ছেলের দাম শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ টাকা ধার্য করবেন সুরপতি চক্রবর্তী, এটা তিনি আশা করেন নি। তাঁর আই. এ. পাশ মেয়েও তো মাস্টারী করে পঞ্চাশ টাকার বেশি রোজগার করে। ভারি লজ্জা করতে লাগল অরুন্ধতীর। এই জন্যই কি অত অনুনয় বিনয় করে, অত পূর্ব পরিচয়ের দোহাই পেড়ে তিনি সুরপতিকে চিঠি লিখেছিলেন। ইচ্ছা করতে লাগল, চিঠিখানা তিনি ফেরৎ আনেন। কিন্তু তাতো আর সম্ভব নয়। স্বামী বলতেন হস্তচ্যুত পাশা; পাশার দান একবার পড়ে গেলে আর ফেরানো যায় না। সেই অনুযায়ীই ঘুঁটি চালাতে হয়। বন্ধুদের সঙ্গে স্বামীকে পাশা খেলতে দেখেছেন অরুন্ধতী। কিন্তু সুরপতির সঙ্গে এখানেই সব খেলা তিনি শেষ করে দেবেন। ঘুঁটি আর তিনি চালবেন না, ও পথ আর মাড়াতে দেবেন না অসিতকে। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। দুটো টিউশনি করলেও ওর চেয়ে বেশি আয় করতে পারবে অসিত, এখন একটা টিউশনি তো আছে। নীলাও যা হোক কিছু করছে। একেবারে না খেয়ে তো আর কেউ নেই,

চলুক যেভাবে চলছে। তারপর সরকারী হোক বেসরকারী হোক কিছু না কিছু অসিত একটা খুঁজে নিতে পারবেই।

মার মনের কথারই যেন প্রতিধ্বনি করল নীলা, 'মাত্র পঞ্চাশ টাকা? বলতে লজ্জা করল না সুরপতিবাবুর? তোমার মতো মুখচোরা মানুষকে দিয়ে কোন কাজ হবে না দাদা। পঞ্চাশ কেন পঁচিশ টাকা বললেও তোমার মুখ দিয়ে হয়তো রা বেরুত না! সুরপতিবাবুকে স্পষ্ট শুনিয়ে দিয়ে এলেই পারতে পঞ্চাশ টাকায় এম. এ. পাশ ছেলে মেলে না?'

অসিত একটু হাসল, 'কি করে শোনাব নীলা। তিনি যখন তাঁর পে-বুক খুলে আমাকে দেখিয়ে দিতেন গণ্ডায় গণ্ডায় এম. এ. পাশ ছেলে পঞ্চাশ টাকায় চাকরি করছে তাঁর ব্যাঙ্কে তখন কি করতাম? সুরপতিবাবু ব্যবসায়ী মানুষ, তিনি বাজার দর জানেন বলেই তো অমন অসঙ্কোচে আমার খাঁটি দাম বলতে পারলেন।'

নীলা রাগ করে বলল, 'তুমি তো ওই করেই গেলে। নিজের দাম বাজারে গিয়ে জোর গলায় হাঁকতে পারলে না। জানো কেবল ঘরে বসে অভিমানে ঠোঁট ফুলোতে। থাকগে, মাস্টারমশাইকে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে আজই বিকেলে একটা চিঠি লিখে দাও, তার বদান্যতার জন্য কোটি কোটি ধন্যবাদ।'

পর্দার ওপাশে শ্রীমদ্ভাগবতের পাতা খুলে বসেছিল উমা। পারতপক্ষে এদের সাংসারিক আলোচনায় সে আসতে চায় না, নিজের পড়াশুনো, পূজা আর্চা ধ্যান ধারণা নিয়েই থাকতে ভালোবাসে, থাকেও। কিন্তু আজ পর্দার অন্যপাশে যে সাংসারিক আলোচনা শুরু হয়েছিল, তাতে শ্রীমদ্ভাগবতে নিজের অভিনিবেশ সে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলো না। বৈষয়িক আলাপের জন্য নয়, ওদের অবৈষয়িক বুদ্ধিই উমাকে উত্যক্ত ক'রে তুলল।

পাতলা পর্দার দিকে তাকিয়ে উমা নীলার কথার জবাবে হঠাৎ বলে উঠল, 'তুই একটু থাম দেখি নীলি। সমস্ত পৃথিবীটা তোর তেজের জোরে, তোর ঠাট্টা তামাসার ভয়ে রাতারাতি বদলে যাবে না। দিনকালের অবস্থা বুঝে সবাই চলে, আমাদেরও চলতে হবে। আমি তো বলি চল্লিশ হোক পঞ্চাশ হোক চাকরি তুমি নিয়েই নাও দাদা। গোড়াতে অমন ছোট হয়ে ঢুকতে হয়, তাতে দোষ হয় না। তারপর তোমার ভিতরে যদি জিনিস থাকে, তোমাকে পঞ্চাশ টাকায় বেঁধে রাখবেন সুরপতিবাবুর সাধ্য কি, কাজ-কর্ম শিখে তুমি তখন অন্য কোন বড় ব্যাঙ্কেও চলে যেতে পারবে। পঞ্চাশ টাকা তো ভালো বেকার বসে থাকার চাইতে বিনে মাইনের বেগার খাটলেও লাভ আছে। ভবিষ্যতে কিছু একটা করবার আশা থাকে।'

উমা ফের তার বইয়ের পাতায় চোখ দিল।

অসিত আর নীলা দুজনেই এক সঙ্গে মার দিকে তাকাল। একটু বাদে অসিত বলল, 'তুই হাসছিস কেন নীলা, উমা তো ঠিকই বলেছে। তোদের চাইতে ওর বিষয়-বুদ্ধি অনেক বেশি।'

নীলা হঠাৎ বলে উঠল, 'তা জানি। দিদি অর্থও চেনে পরমার্থও চেনে।'

'নীলা !'

পর্দার ওপাশ থেকে উমার তীক্ষ্ণ চাপা গলা শোনা গেল।

মুহূর্তকাল সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর অসিত বলল, 'ছিঃ, ও কথা বলা তোর ঠিক হয়নি নীলা।'

নীলা অদ্ভুত একটু হাসল, 'আমি কিছু ভেবে বলিনি দাদা।'

অরুন্ধতীও তিরস্কার করলেন ছোট মেয়েকে, 'কেন তুই ও কথা বলবি। ওর আছে কি, অপঘাতে মরেছে বলে সুধীরের লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের টাকাগুলি তো পেলই না, একমাত্র তার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা কটা, আর তার পকেট থেকে দু' এক টাকা করে নিয়ে নিয়ে যা জমিয়ে ছিল তাই তো সম্বল। সব শুদ্ধ পুরো হাজার চারেকও হবে না বোধ হয়।'

নীলা বলল, 'সে হিসাব তোমার কাছে কে চাইছে মা।'

অরুন্ধতী বললেন, 'না, তাই বলছি। আমি ওকে বলে দিয়েছি ও টাকা থেকে এক পয়সাও তুই ভাঙিসনে। সারা জীবন পড়ে রয়েছে সামনে, অসুখ আছে, বিসুখ আছে, কত আপদ বিপদ আছে মানুষের। একেবারে নিঃসম্বল হয়ে কি কারো থাকা উচিত ! তারপর একটা বাচ্চাও রেখে গেছে সুধীর। তার ভবিষ্যতের ভাবনাও তো ওকেই ভাবতে হবে। কাকা আর ঠাকুরমার আদরে তো চিরদিন কাটবে না।'

নীলা বলল, 'ও সব পুরনো কথা কেন তুলছ, কে শুনতে চাইছে ? ও সব কথার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ?'

বলতে বলতে নীলা হঠাৎ থেমে গেল। তারপর একটুকাল চুপ ক'রে থেকে অসিতের দিকে তাকাল নীলা, 'এর চেয়ে আমি কোন হোস্টেলে-টোস্টেলেই উঠে যাব দাদা। সেই ভালো, এভাবে একসঙ্গে থাকাটা কিছুতেই সম্ভব হবে না। থাকা উচিতও নয়।'

অসিত বলল, 'কেন ?'

নীলা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কেন তা তুমি নিজে বোঝ না ? মিছিমিছি অশান্তি ডেকে এনে লাভ কি !'

অসিত বলল, 'কি পাগলামি শুরু করলি। অশান্তির আবার কি হোল ?'

নীলা বিরক্তির ভঙ্গিতে বলল, 'কি না হয়েছে। তুমি যদি বুঝেও না বোঝ, দেখেও না দেখ তা হলে আর কি করতে পারি বল। এক জায়গায় থাকতে হলেই দু এক সময় কথা কাটাকাটি হয়, হাসি ঠাট্টা হয়, কিন্তু সব কিছুতেই যদি শুধু মহাভারত নয়, গীতা শ্রীমদ্ভাগবত শুদ্ধ অশুদ্ধ হয়ে যায়, তা হলে আর মানুষ থাকে কি করে !'

অরুন্ধতী বললেন, 'আঃ থাম না বাপু। একটা কথা না হয় হয়েছে তাই বলে সারাদিন ধরে গজগজ করবি। কই উমা তো তারপর আর একটা কথাও বলেনি। চুপচাপ নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছে। তোকে একটুও দোষারোপ করেনি। অথচ দোষ তো তোরই।'

নীলা তীব্র দৃষ্টিতে মার দিকে তাকাল, 'আমার দোষ ?'

অরুন্ধতীও কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ তোর দোষ ছাড়া কি ?'

নীলা বলল 'শুধু আমার দোষ ? এতদিন বাদে তুমি ফের সেই কথা বলতে শুরু করেছ ? দিদির নিজের কোন দোষ ছিল না, তার স্বামীর কোন দোষ ছিল না, সমস্ত দোষের বোঝা মা হয়ে তুমি আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ ?'

অরুন্ধতী বললেন 'হ্যাঁ চাপাচ্ছি। আর কেউ হলে লজ্জায় মুখ তুলে কথা বলতে পারত না, তুই বলে পারিস। বোন হয়ে বোনের যে সর্বনাশ তুই করেছিস আর কেউ হলে সেই লজ্জায় সেই অনুতাপে দিদির পায়ে ধুলো হয়ে থাকত। কিন্তু তুই নির্লজ্জ বেহায়া বলে ফের ওই হতভাগীকে খোঁটা দিস, রাত দিন খিটিমিটি বাধাস, টিটকিরি মারিস। ছি ছি ছি, তুই না লেখাপড়া শিখেছিস, দু' দুটো পাশ দিয়েছিস—।'

নীলা হঠাৎ চুপ করে গেল। আগে আগে এসব ধিক্কারে ওর দু'চোখ জলে ভরে উঠত, এখন শুধু জ্বলে।

অমিত বোনের বালিশের ওপর কনুই রেখে আধশোয়া হয়েছিল, এবার উঠে বসে রুক্ষস্বরে বলল, 'তোমরা মনের সাধ মিটিয়ে ঝগড়া কর মা, আমি চলে যাই বাসা ছেড়ে। আশ্চর্য, এত অভাব অনটন, কি দিয়ে সংসার চলবে সেই ভাবনা ভেবে মানুষ অস্থির আর তোমাদের বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই, তোমরা আছ কেবল দিনের পর দিন অতীতের নোংরা নর্দমা ঘাঁটতে। আমি চলে যাব, নিশ্চয়ই চলে যাব।'

রাগ ক'রে অরুন্ধতী বললেন, 'তুই যাবি কেন, আমাকেই কোথাও দিয়ে আয়। খুঁজলে আত্মীয় স্বজন আমার এখনো অনেক আছে। কাজ কর্ম করলে একবেলা একমুঠো ভাত আর বছরে একজোড়া থান আমাকে তারাও দিতে পারবে।'

নীলা বলল, 'তার দরকার কি, আমাকে নিয়েই তো যত গণ্ডগোল, আমিই চলে যাই। এত হোস্টেল আছে, বোর্ডিং আছে, কোথাও জায়গা একটু জুটবেই। না জোটে তো সেই রেশিডেনসিয়াল টিউশনিটাই নেব। তবু তোমরা শান্তিতে থাক।'

সেদিন একজন বিপত্নীক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছোট ছোট দুটি ছেলে-মেয়েকে পড়াবার প্রস্তাব করেছিলেন। বলেছিলেন ইচ্ছা করলে নীলা তাঁর বাড়িতেও একটা ঘর নিয়ে থাকতে পারে। কোন অসুবিধা নেই, বিনোদবাবুর একজন বিধবা পিসিমা থাকেন তাঁর সঙ্গে। ছেলেমেয়ে দুটি দুরন্ত, তাদের যদি নীলা একটু আগলায় থাকা খাওয়া ছাড়াও পঞ্চাশ টাকা করে তিনি ওকে দেবেন।

নীলা হাসতে হাসতে গল্প করেছিল, 'এ বাজারে অফারটা খুব লোভনীয়। কিন্তু একটু ভয়ও আছে। হয়তো দুদিন যেতে না যেতেই পিসিমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হওয়ার প্রস্তাব ক'রে বসবেন। তখন শুধু থাকা খাওয়া। ভদ্রলোকের রকমসকম দেখে তাই মনে হল।'

আজ আবার সেই কথা উল্লেখ করায় অরুন্ধতী চটে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ তুই ওই

রকমই যাবি। তোর যা মন-মতি তাতে ওই রকমই গতি হবে তোর। না হলে এতদিন বিয়ে-টিয়ে ক'রে ঘর গৃহস্থালী করতিস। কোন কেলেঙ্কারী থাকত না।'

এতক্ষণে পর্দা সরিয়ে উমা এল এ পাশে। পরণে ধবধবে সাদা থান গায়ে সাদা ব্লাউস, গলায় এক চিলতে সরু হার চিক্ চিক্ করছে। পিঠের ওপর ছড়ানো কালো মসৃণ এক রাশ ভিজে চুলের পশ্চাৎ-পটে ওর সুগৌর তনু দেহ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের ছাপ ওর ছোট কপালে, আয়ত গভীর চোখে, চাপা ঠোঁটে যেন নিবিড় হয়ে রয়েছে।

অরুন্ধতী দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। পেটের ছেলেমেয়েদের মধ্যে উমাই সব চেয়ে সুন্দরী অথচ ওর কপালই এমন ক'রে পুড়ল।

মার দিকে তাকিয়ে মৃদু তিরস্কারের সুরে উমা বলল, 'তোমরা কি শুরু করেছ মা? তোমরা কি আমাকে টিকতে দেবে না একটু? যার জন্যে ছেলে ছেড়ে এলাম, শ্বশুর শাশুড়ী দেওরের সংসার ছেড়ে এলাম, এখানেও তাই? তোমরা কি কিছু ভুলতে পারবে না, ভুলতে দেবে না আমাকে?'

অরুন্ধতী গভীর দুঃখে আর অভিমানে বলে উঠলেন 'তুই আমার চোখের আড়ালে কোথাও চলে যা উমা। সেই ভালো। আমি আর এ সব দেখতে পারিনে সইতে পারিনে।'

উমা বলল, 'বেশ তাই যাব। আমি তো আর চিরদিনের জন্য থাকতে আসিনি। তোমরা না বললেও আমি যেতাম।'

অরুন্ধতী আর কোন কথা বললেন না। আজকালকার দিনে কি হয়েছে সব ছেলে-মেয়েরা, তারা কেবল মার মুখের কথার অর্থ ধরে; কথার আড়ালে মন যে জলে পুড়ে খাক হয়ে যায়, তার দিকে তাদের একবারও চোখ পড়ে না।

এবার আর কনুয়ের উপর মাথা না রেখে নীলার ময়লা বালিসে দোয়াতের কালি ঢেলে পড়া বিছানাটার ওপর একেবারে টান হয়ে শুয়ে পড়ে অসিত বলল, 'যাক বাঁচা গেল। এতক্ষণে বাসা একেবারে পরিষ্কার। মা যাবে আত্মীয় স্বজনের কাছে, নীলা যাবে হোস্টেলে, আর উমা কোন আশ্রমে-টাশ্রমে গিয়ে উঠবে। আর আমি সেই ফাঁকে বিয়ে থা করে দিব্যি সংসার পাতিয়ে বসব। এইটা হবে বসবার ঘর আর পাশেরটা শোয়ার। চমৎকার হবে। মা, উমা, নীলা তোমরা আজই এক ঘণ্টার নোটিশে সব খালি করে দাও, গাঁটরি বোঁচকা বেঁধে ফেল। আমি বউ আনব।'

অরুন্ধতী এতক্ষণে একটু হাসলেন, 'আর জ্বালাসনে বাপু। তুই বউ আনবি আর তা আবার দু'চোখে আমি দেখব!'

অসিত বলল, 'তা তো দেখবেই না। তুমি যে দু'চোখে তাকে দেখতে পারবে না তা আমি এখন থেকেই টের পাচ্ছি। তাই তো আগে আগেই তোমাকে বিদায় করতে চাই। যাও, ও ঘরে গিয়ে বাক্স-টাক্স সব গুছিয়ে ফেল, আর দেরি কোরো না, যাও।'

অরুন্ধতী হাসি মুখে উঠে যেতে যেতে বললেন, 'তা যেন গেলাম, তুইও আয়। একটু ঘুমিয়ে নে। সারাটা দুপুর তো টো টো করে এলি। বেলাও আর বেশি নেই।'

অসিত বলল, 'তুমি যাও মা, বউ এলে এ ঘরটা বাইরের ঘর হলে ভালো হবে না, এটাকেই ভিতরের ঘর করব, নীলা আর উমার সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'রে আমি এলাম বলে।'

অরুন্ধতী বললেন, 'জ্বালা!'

কিন্তু ভিতরে এই মুহূর্তে তাঁর আর কোন জ্বালার চিহ্ন নেই। তিনটি ছেলেমেয়ের দিকে একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন অরুন্ধতী।

উমাও চলে যাচ্ছিল। অসিত তাকে হাত ধরে মাথার কাছে টেনে বসাল, 'যাচ্ছিস কোথায়, বোস। বললাম না পরামর্শ আছে। নীলা আমার পা'টা একটু টিপে দে না। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি। ভারি টন টন করছে।'

নীলা তবু চলে যাচ্ছে দেখে অসিত বলল, 'এই ভালো হবে না কিন্তু। উমাকে হাত ধরে টেনে এনেছি বলে তোকে কিন্তু অত খাতির করব না, উঠে গিয়ে চুলের মুঠি ধরব।'

নীলা হাসল না, কিন্তু দাদার পায়ের কাছে বসে বলল, 'ব্যাপার কি, হঠাৎ এত স্ফূর্তি কি দেখে হল তোমার? চাকরি পেয়ে নাকি?'

অসিত একবার ছোট বোনের মুখের দিকে তাকাল। নীলার মুখ উমার মত সুন্দর নয়।

ওর গায়ের রঙ শ্যাম, কপালটা চওড়া। নাক চোখা নয়, ঠোঁট দুটি একটু পুরুই বলা যায়; উমার মত স্নিগ্ধ বিষণ্ণ-সৌন্দর্যের ছাপ নেই মুখে। অন্তরের জ্বালা এখনো ওর মুখের দিকে তাকালে টের পাওয়া যায়। বুঝতে পারা যায় নীলা এখনো ভোলে নি, ও কাউকে ক্ষমা করেনি। সুধীরকে নয়, দিদিকে নয়, নিজেকেও নয়। দুঃসহ অবিস্মরণীয় এক জ্বালায় ও নিজেকে ভাস্বর করে রেখেছে। সেই ওর রূপ। হঠাৎ যেন মনে হয় উমার রূপ ওর কাছে তুচ্ছ। নীলার এই অদ্ভুত রূপই কি সুধীরকে টেনেছিল?

নীলা চোখ নামিয়ে দাদার পায়ের আঙুল টেনে দিতে লাগল।

অসিত তার সেই আনত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু নিঃশ্বাস ফেলল। সত্যি এই দুটি বোনের কাছে তার লঘুচাপল্য, মনের স্বাভাবিক প্রসন্নতা প্রকাশের অধিকার নেই, এ ঘরে আনন্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু আজ মনে হোল অসিত ভুল করেছে। ওদের অতীত দুঃখের, কিন্তু শ্রদ্ধার নয়, স্মরণীয় নয়। কেন ওদের এই অস্বাভাবিক দুঃখ-বিলাসকে এমন ক'রে প্রশ্রয় দেয় অসিত? কেন অতীতকে আঁকড়ে থাকতে ও সাহায্য করে? অসিতের উচিত ওদের ফের বিয়ে দেওয়া। শুধু নীলাকে নয়, উমাকেও। একটি ছেলে আছে উমার তাতে কি হয়েছে? এক ছেলে নিয়ে ও সারা জীবন কেন ভুলে থাকবে? আলাদা আলাদা ভাবে দুজনে ফের ঘর বাঁধুক, সংসার করুক, সুন্দর

স্বাভাবিক পরিবেশে একটি বিকৃত অসুস্থ অধ্যায়কে চিরদিনের মত ভুলে যাক, কিন্তু এখনো সরাসরি ওদের কাছে একথা পাড়বার সময় হয়নি, অন্ততঃ সাহস হয়নি অসিতের।

নীলার কথার জবাবে অসিত বলল, 'শুধু যে পঞ্চাশ টাকার চাকরির লোভেই আমার এত ফূর্তি হয়েছে তা ভাবিস কেন? দেখেছিস উমা, ও কি রকম কাঙাল মনে করে আমাকে?'

উমা নিঃশব্দে দাদার ঘন বড় বড় চুলের মধ্যে আঙুল বুলাতে লাগল। চাকরি সম্বন্ধে আর কোন কথা সে বলবে না। একটু আগেও এই নিয়ে অনর্থ বেধেছিল।

পায়ের কাছ থেকে নীলা বলল, 'কাঙাল তোমাকে কে বলে। কিন্তু কি দেখে এলে তাই শুনি।'

অসিত চপল ভঙ্গিতে বলল, 'যা দেখলাম তার তুলনা হয় না। শুনলে তুই তো তুই, উমা পর্যন্ত হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরবে।'

উমা একটু হেসে বলল, 'তাই নাকি?'

অসিত বলল, 'তা ছাড়া কি, যেমন রূপ তেমনি গুণ। উমার চেয়ে বেশ লম্বা। আমার মাথা প্রায় ছুঁই ছুঁই করে। উমার রঙ ফর্সা, আর তার রঙ সোনালি হলদে। নাক চোখ উমার চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর।'

মাথা তুলে অসিত উমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল একটু হাসি ফুটেছে বোনের বিষণ্ণ মুখে।

নীলা বলল, 'কিন্তু চুল। দিদির মত অত চুল আছে তার মাথায়?'

অসিত বলল, 'নেই আবার? তবে আর বলছি কি? চুল গোড়ালি পর্যন্তই পড়ত। কিন্তু তাতে মহা বিপদ, জড়িয়ে গিয়ে পদে পদে আছাড় খায়। তাই খাটো ক'রে কেটে শুধু কাঁধ পর্যন্ত নামতে দিয়েছে। চমৎকার মানিয়েছে যাই বলিস।'

নীলা মুখ টিপে হেসে বলল, 'হুঁ, তা তো মানাবেই, এই তো গেল রূপ। তারপর তোমার রাজকন্যার গুণের বর্ণনাটা এবার শুনি।'

অসিত বলল, 'শুনবি আবার কি, রাজকন্যা হয়ে জন্মেছে এই তো সব চেয়ে বড় গুণ, এ গুণের তুলনা আছে নাকি?'

নীলা বলল, 'তবু বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়টা এবার শুনি।'

অসিত বলল, 'তা বিদ্যা আছে বই কি; তোর মত আই. এ. অবধি পড়ে টাকার অভাবে পড়াতে শুরু করে নি। এম. এ.-তে ফিলজফির ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি নিয়ে তবে থেমেছে। কেবল সুদর্শনাই নয়, সুদার্শনিকও।'

নীলা বলল, 'না, তাহলে আর কোন আশা নেই, রাজকন্যার ক্লাসটা তোমার চেয়েও দেখছি এক ধাপ উঁচু।'

অসিত বলল, 'এক ধাপ বলিস কিরে, অনেক ধাপ। সে রাজকন্যা আর আমি কোটালপুত্র।'

দুজনেই একটু চুপ করে রইল। উমা আগের মতই অসিতের চুলের মধ্যে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'তোমার মাথায় বড় ময়লা জমেছে দাদা, সাবান দিয়ো।'

নীলা বলল, 'বড়ই আফশোষের কথা। কিন্তু রাজকন্যার নাম-ধামটা এবার বল দাদা, আমরা দেখি চেষ্টাচরিত্র করে। অনেক সময় কোটালপুত্রও তো—'

অসিত বলল, 'না, চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না নীলা। রাজামশাই তেমন চরিত্রের লোকই নন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে তিনি একটু সদয় হয়ে বললেন, কোটালপুত্র, অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যাই তোমাকে দিতে পারতাম, কিন্তু জেনারেল ম্যানেজারকে তা দিয়ে রেখেছি। আপাততঃ পঞ্চাশ টাকার কেরানীগিরি ছাড়া আর কিছু খালি নেই। খুশি মনে ওই তুমি নাও, তারপর তোমার হাতযশ আর আমার মর্জি।'

নীলা ঠোঁট চেপে হাসল, 'ও, সুরপতিবাবুর মেয়ের কথা বলছিলে বুঝি, তাই বল। আমি এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি।'

নীলার মুখ দেখে অবশ্যি বোঝা গেল সে অনেকক্ষণ আগেই বুঝতে পেরেছে।

এবার ভারি লজ্জিত হোল অসিত। বোনেদের আনন্দ দিতে গিয়ে নিজের এ-ধরনের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তা সে ভাবতে পারেনি। অবশ্য ব্যাপারটা কৌতুক ছাড়া কিছু নয়, তবু নীলা আর উমা যদি অন্য কিছু ভাবে। কেমন যেন একটু অস্বস্তিবোধ করল অসিত।

একটু বাদে ছোট বোনকে ধমক দিয়ে বলল, 'বুঝবার আবার কি আছে। ভারি বুদ্ধির ধাড়ী হয়েছিস কিনা; নে, আঙুল তো একটাও মটকাতে পারলিনে, এবার পায়ে ভালো করে একটু হাত বুলিয়ে দে দেখি।'

তারপর কথার মোড় ফেরাবার জন্য উমাকে বলল, 'বাবার কথা মনে আছে উমি? ছেলেবেলায় বাবাও এমনি তক্তপোষে শুয়ে থাকতেন। আমি মাথার পাকা চুল তুলতাম, তুই পায়ে হাত বুলাতিস, দুজনে দুটো করে পয়সা পেতাম। নীলা ঘুম থেকে উঠে তাই দেখে হিংসায় জ্বলত, কেঁদে কেটে ভাগ না নিয়ে ছাড়ত না, মনে আছে তোর?'

উমা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আছে দাদা।'

অসিত আস্তে আস্তে চোখ বুজল।

কিন্তু উমার চোখের সামনে আর একটি দৃশ্য ভেসে উঠল, বাবা নয়, উমার স্বামী সুধীর শুয়ে আছে বিছানায়। উমা বসে আছে মাথার কাছে, নীলা ঠিক এমনি করে তারও পায়ে হাত বুলাচ্ছে।

হঠাৎ পা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে নীলা বলেছিল, 'ঈস্ ভারি দায় পড়েছে আমার, পা টিপব। পদসেবার অধিকার যার আছে তারই থাক, পরের শ্রীচরণে আমার লোভ নেই।'

সুধীর হেসে বলেছিল, 'আহা রাগ করছ কেন। কাল আবার জায়গাটি বদলে নিয়ো। তা হলেই হবে। তোমরা দুটি হলে সোনার কাঠি আর রূপার কাঠি।

সেখানে সেখানে বার বার অদল বদল করতে হয়। একটির ছোঁয়ায় ঘুম আসে, আর একটির ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙে।'

উমা বলেছিল, 'কার ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙে ?'

সুধীর জবাব দিয়েছিল, 'কার আবার ? দেখনা পায়ের তলায় কি রকম সুড়সুড়ি দিচ্ছে ! এই, ভালো হবে না কিন্তু নীলু।'

ভালো হয়ওনি।

মুহূর্তের জন্য উমার বুকের ভিতরটা ফের আবার জ্বালা ক'রে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত ক'রে ছোট বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলল, 'দাদা ঘুমিয়ে পড়েছে। তুইও যা, মার কাছে একটু শুয়ে থাক গিয়ে, আমি উঠি, দ্বাদশ স্কন্ধটা আজ বুঝি আর শেষ হোল না।'

নীলা দিদির দিকে একবার তাকাল, তারপর উমার প্রায় পায়ে পায়েই পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল

পরদিন বেলা এগারটার সময় দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের সামনে গিয়ে উপস্থিত হোল অসিত। ক্লাইভ রো'য়ের ওপর ব্যাঙ্কের নিজস্ব ছ'তলা বাড়ি। ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকে বড় বড় পিতলের ফলক। বাঁ দিকে বাংলায় ডান দিকে ইংরেজী অলঙ্কৃত অক্ষরে দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের নাম মুদ্রিত। একপাশে গোঁফওয়ালা একটি হিন্দুস্থানী দারোয়ান বন্দুক হাতে ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা রক্ষা করছে। বহুলোক ভিতরে যাচ্ছে, অনেক লোক বেরিয়ে আসছে। সকলের মুখে ব্যস্ততার ভাব। অসিত এক মুহূর্ত একটু ইতঃস্তত করল। তারপর আরো কয়েকজনের পিছনে পিছনে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

ডানদিকের একটি মাঝারি টেবিলে একখানা ফলক দাঁড় করানো আছে, Enquiry। সামনে খান তিনেক চেয়ার জুড়ে আগন্তুকরা বসে রয়েছেন। তাঁদের পিছনে বেঁটে-ফর্সা একজন ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে কি যেন তাঁদের বুঝাবার চেষ্টা করছেন।

অসিত তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন— ।'

ভদ্রলোক একটু কর্কশ স্বরে বললেন, 'আমার দেখবার সময় নেই। দেখছেন না কথায় আছি। বসুন একটু।'

বসবার যে আর স্থান নেই সে কথা উল্লেখ না ক'রে অসিত দাঁড়িয়েই রইল। ভদ্রলোক জন দুই আগন্তুককে saving account খোলার নিয়মাবলী বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। মিনিট পাঁচেক পরে তিনি ফের তাকালেন অসিতের দিকে, 'হ্যাঁ, বলুন এবার ? কি এ্যাকাউন্ট খুলবেন ? সেভিংস, না কারেণ্ট ?'

অসিত বলল, 'আজ্ঞে কোন এ্যাকাউণ্টই খুলতে চাই না। আমি চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'দেখা করতে এলেই কি দেখা হয় মশাই ? তিনি আজ কদিন

পরে অফিসে এলেন। ভয়ানক ব্যস্ত। বড় বড় পার্টি পর্যন্ত আজ তাঁর ঘরে ঢুকতে পারছে না আর আপনি তো—।'

অসিতের বেশবাসের দিকে তাকিয়ে বাকি অপ্রিয় কথাটা বলতে ভদ্রলোকের কষ্ট হোল। অনুকম্পার ভঙ্গিতে তিনি একটু হাসলেন, 'আপনার কি দরকার বলুন না।'

অসিত বলল, 'দরকারটা চেয়ারম্যান জানেন। তিনি আমাকে আসতে বলেছেন।'

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ও তিনিই আসতে বলেছেন? তাঁর সঙ্গে আপনার আগের পরিচয় আছে বুঝি?'

অসিত গম্ভীরভাবে বলল, 'হ্যাঁ একটু বিশেষ পরিচয়ই আছে।'

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সে কথা আগে বলতে হয়। দেখুন দেখি, আমি ভেবেছি—।' তারপর বেয়ারাকে ডেকে ধমকের স্বরে বললেন, 'এই শীতল, একটা চেয়ার দে এখানে। তোদের আক্কেল কি বল দেখি। ভদ্রলোক কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন একটা চেয়ার দিতে পারিস নে?'

কতকগুলি পাশ-বুক বয়ে এনে শীতল টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আমাকে কেন ধমকাচ্ছেন বিষ্ণুবাবু। বাড়তি চেয়ার আর কই। কোত্থেকে আনব চেয়ার।'

বিষ্ণুবাবু আবার গর্জে উঠলেন, 'ফের মুখে মুখে কথা। বড় বাড় তোদের। কোত্থেকে আনব! বাড়ি থেকে গড়িয়ে আনবি, বাজার থেকে কিনে আনবি। হতভাগা কোথাকার। এত বড় ব্যাঙ্কে একখানা চেয়ার নেই?'

ইতিমধ্যে সামনের একখানা চেয়ার খালি ক'রে দিয়ে এক ভদ্রলোক উঠে গেলেন।

বিষ্ণুবাবু সাদরে অসিতকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, 'বসুন বসুন। মাথার ঠিক থাকে না মশাই। আগে ছিল শুধু এনকোয়ারি এখন এ্যাকাউন্টস খোলার কাজও দেখতে হয়। ঝামেলা কি কম! আর যত সব ছ্যাঁচড়া পার্টি আসবে। ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। বোঝাতে বোঝাতে গলা বুজে আসে মশাই। ও শীতল, এক কাপ চা এনে দে তো বাবা, চা চলবে?' অসিতের দিকে তাকিয়ে বিষ্ণুবাবু মৃদু হাসলেন।

অসিত মাথা নেড়ে বলল, 'না না, চায়ের দরকার নেই। তার চেয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে যদি একটু তাড়াতাড়ি দেখা করবার ব্যবস্থা করে দেন—।'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'অবশ্য অবশ্য। ব্যবস্থা তো আপনিই ক'রে এসেছেন। আমাদের আর করবার কি আছে। একটা স্লিপ এনে দে তো শীতল, শিগ্‌গির।'

ভিজিটিং স্লিপে নিজের পুরো নাম লিখে দিল অসিত। শীতল সেই স্লিপখানা পৌঁছে দিয়ে এল চেয়ারম্যানের খাস বেয়ারা অদ্বৈতের হাতে। আর আশ্চর্য দু' তিন মিনিটের মধ্যেই ডাক পড়ল অসিতের।

বিষ্ণুবাবু সম্ভ্রম ভরে অসিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আসুন। কিছু মনে করবেন না স্যার। আমি চিনতে পারিনি।'

অসিত কোন জবাব দিল না। বেয়ারার সঙ্গে যেতে যেতে মনে মনে ভাবল, দু' দিন বাদে বিষ্ণুবাবু সত্যি যখন চিনতে পারবে পঞ্চাশ টাকার কেরানী ছাড়া সে আর কিছু নয়, তখন তার সম্বন্ধে ভদ্রলোকের কি ধারণাই না হবে। নিশ্চয়ই ভাববেন এতখানি আপ্যায়ন অভ্যর্থনা নেহাতই বাজে খরচ করেছেন।

স্প্রিংয়ের দরজা ঠেলে অসিত চেয়ারম্যানের ঘরে ঢুকল। সামনে কয়েকখানা গদি আঁটা চেয়ার। চেয়ারগুলি সম্প্রতি খালি। উত্তরদিকের দেয়ালে গান্ধীজির একখানা পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। সুরপতিবাবুর বেশবাস দেখলে তাঁরই একান্ত অনুরক্ত শিষ্য ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। পরনে খদ্দরের ধুতি। গায়ে খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবি। ভারি সরল অনাড়ম্বর মানুষ। এত বড় জাঁকাল জমকাল ব্যাঙ্কের যে এমন একজন সাদাসিধে আটপৌরে চেয়ারম্যান থাকতে পারে তা যেন মনেই হয় না।

সুরপতি তাঁর সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো।'

অসিত বিনীতভাবে চেয়ারখানায় বসলে তিনি কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কালো ফ্রেমে আঁটা পুরু চশমার ভেতর থেকে এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ যেন অসিতের অন্তঃস্থলে গিয়ে পৌঁছুতে চাচ্ছে।

সুরপতিবাবু বললেন, 'তারপর, মন স্থির ক'রে ফেলেছ? তুমি ইচ্ছা করলে আরো দু'চার দিন সময় নিতে পার। আমার আপত্তি নেই। চাকরি তোমার জন্যে খালি থাকবে।'

অসিত বলল, 'নাঃ, আর সময় নেওয়ার দরকার হবে না। আমি চাকরি করব ঠিক করেছি।'

সুরপতিবাবু বললেন, 'বেশ, শর্তগুলি ভালো করে ভেবে দেখেছ তো? এখন পঞ্চাশ টাকার বেশি দিতে পারব না। তারপর কাজকর্ম শিখে নিয়ে—তোমার যোগ্যতার ওপর সব নির্ভর করবে।'

অসিত বলল, 'সে তো আগেই বলেছেন।'

সুরপতিবাবু বললেন, 'তুমি যাতে ভালো ক'রে ভেবে দেখতে পার তাই আরো একবার বলছি। শেষে অনুতাপ অনুশোচনা না হয়। অনিচ্ছুক অসন্তুষ্ট কর্মচারী নিজের আর ইনষ্টিটিউশনের দুইয়েরই ক্ষতি করে।'

অসিত বলল, 'আশা করছি আমার দ্বারা তেমন কোন ক্ষতি হবে না।'

সুরপতিবাবু বললেন, 'খুব খুশি হলাম। যে-সব ছেলের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় আছে তাদের এক আধটু ঔদ্ধত্যও আমি সহ্য করি। কিন্তু "কোন ক্ষতি হবে না" এই প্রতিশ্রুতিই সব চেয়ে বড় নয়। আমি নেতি-বাদী নই, পরম অস্তিবাদী। তুমি এমনভাবে কাজ করবে যাতে তোমারও লাভ, যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে তারও লাভ। আর কাজ যদি

করতে চাও, যথেষ্ট স্কোপ এখানে পাবে। সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সব ছেলে, এ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কারো আছে কারো বা নেই। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমি যোগ্য লোককে সুযোগ দিতে কার্পণ্য করিনি।'

দেয়ালে ডান দিকে ভারতবর্ষের একটা বড় ম্যাপ টাঙানো। সুরপতি সেই দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে তাকালেন, 'দেশের সব জায়গায় সবগুলি বড় বড় শহরে দেশলক্ষ্মীর ব্রাঞ্চ ছড়ানো। কোন কোন ব্রাঞ্চে এমন ম্যানেজারও আছে বিদ্যায় যারা শুধু ম্যাট্রিকুলেট, কিন্তু বুদ্ধিতে কর্মক্ষমতায় তা নয়। এক পয়সা সিকিউরিটি না নিয়ে আমি তাদের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছি। ভাবতে পার? অন্য কোন ব্যাঙ্ক এ কথা কল্পনাও করতে পারে না। আমার অন্য সব ব্যাঙ্কার বন্ধুরা, এমন কি এই ব্যাঙ্কেরই অন্য সব ডিরেকটররা সাহস দেখে অবাক হয়ে গেছেন। আমি তাদের বলেছি পাঁচ হাজার দশ হাজার সিকিউরিটি নিয়ে কি হবে যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে কারবার। আসলে মানুষ চিনতে পারা চাই; মানুষই আসল, টাকাটা আসল নয়।'

সিগারেট কেস খুলে এবার একটা সিগারেট ধরালেন সুরপতি। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'এত কথা তোমাকে বললাম তুমি আমার প্রথম যৌবনের ছাত্র বলে। তোমার মা আমার প্রথম যৌবনের—' একটু ঢোক গিলে সুরপতি বললেন, 'বন্ধুপত্নী বলে। ভাল কথা, তাঁর শরীর কেমন আছে আজকাল?'

অসিত গম্ভীর মুখে বলল, 'তিনি ভালোই আছেন।'

সুরপতি হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে বললেন, 'আচ্ছা, বিকেলেই জেনারেল ম্যানেজার তোমাকে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দিয়ে দেবেন। আজ অবশ্য ঘণ্টা খানেক দেরিতে তুমি এসেছ। এত দেরি হ'লে চলবে না।'

অসিত বলল, 'তা জানি। দশটায় ব্যাঙ্ক বসে।'

সুরপতিবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে এসে বসতে হবে আরো দশ পনের মিনিট আগে। যাক এখানকার নিয়মকানুন তুমি ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে, আশা করছি মানতেও পারবে।'

সুরপতিবাবু একটু হেসে বেল টিপলেন।

খাস বেয়ারা অদ্বৈত এসে সেলাম করে দাঁড়াল। বছর তিরিশেক বয়স হবে লোকটির। কালো ছিপছিপে চেহারা। মুখখানা গোবেচারা গোছের। কিন্তু চোখ দুটি দেখলে মনে হয় অতখানি গোবেচারা নয়। ভিতরে ভিতরে বেশ বুদ্ধি রাখে।

সুরপতিবাবু বললেন, 'অদ্বৈত, জেনারেল ম্যানেজার সাহেবকে সেলাম দাও। আর আমাকে চা দাও এক কাপ।'

অদ্বৈত বলল, 'সে কি বড়বাবু। একটু আগেও দিদিমণি আমাকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন আপনাকে যেন ঘন ঘন চা না দিই।'

সুরপতিবাবু বললেন, 'না, মেয়েটার জ্বালায় আর পারা গেল না। সে বাড়িতে

বসেও আমার খবরদারী করবে, কড়া পাহারা দেবে। এ ব্যাপারে বুলু তার মাকেও ছাড়িয়ে গেছে।'

হঠাৎ একটু থেমে গেলেন সুরপতিবাবু। মৃত স্ত্রীর কথা স্মরণ ক'রে তাঁর এই ভাবান্তর ঘটল, না কি বাইরের একটি লোকের সামনে পারিবারিক প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় তিনি অপ্রস্তুত হলেন বোঝা গেল না।

একটু বাদে জেনারেল ম্যানেজার অবনীমোহন এসে দাঁড়াল। একটা বড় ব্যাঙ্কের পদস্থ কর্তাব্যক্তির মতই চেহারা। অসিত এঁকে চেয়ারম্যানের বাড়িতে সেদিন দেখেছিল। কিন্তু সেখানকার চেয়েও এই ব্যাঙ্কে যেন অবনীমোহনকে আরো বেশি মানিয়েছে।

সুরপতিবাবু অসিতকে দেখিয়ে বললেন, 'সেই ছেলেটি আবার এসেছে অবনী. দেখ একটা ব্যবস্থা-ট্যবস্থা যদি কিছু এঁর করে দিতে পার।'

অবনীমোহন গম্ভীরভাবে বলল, 'এঁকে নেওয়া ঠিক হয়ে গেছে।'

সুরপতিবাবু একটু কৌতুকের ভঙ্গিতে বললেন, 'তাই নাকি। তবে তো ঠিক হয়েই আছে। তবে আর কি।'

অবনীমোহন অসিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে। আমি এবার যাই মিঃ চক্রবর্তী। ঘরে অন্য লোক আছে। একটু ব্যস্ত ছিলাম কথায়।'

সুরপতি বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সাহেবসুবো মানুষ। তোমাদের সর্বদাই তো ব্যস্ত থাকতে হয়। কখনো কথায়, কখনো কাজে।'

অবনীমোহন এ কথার কোন জবাব না দিয়ে গম্ভীরভাবে বেরিয়ে এল। চেয়ারম্যানের এই রসিকতায় সে খুশি হয় নি। অসিতের মত একজন অধঃস্তন কর্মচারীর সামনে এ ধরনের রসিকতা সুরপতি যেন না করলেই ভালো করতেন।

এর পর অবনীমোহন অসিতকে নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এ্যাকাউণ্টাণ্টকে বললেন, 'বিনয়বাবু, এ ভদ্রলোক আজ থেকে আমাদের এখানে কাজ করবেন। ক্লিয়ারিংএ লোক সর্ট আছে, আপনি সেদিন বলেছিলেন। ইচ্ছা করলে এঁকে সেখানেও দিতে পারেন। দু'তিন মাসের মধ্যে এঁকে সব ডিপার্টমেণ্ট ঘুরিয়ে আনতে হবে। আশা করি অল্প দিনের মধ্যেই ইনি সব বুঝে শুনে নিতে পারবেন।'

বিনয় বিনীত ভাবে বলল, 'আজ্ঞে তা আর পারবেন না কেন।'

জেনারেল ম্যানেজার চলে গেলে বিনয় একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

তারপর একটি বেয়ারাকে ডেকে বলল, 'ফটিক, ক্লিয়ারিং এর মাধববাবুকে একটু ডেকে দে তো।'

বেঁটে মোটা ফর্সামত আর একটি কেরানী এসে দাঁড়াল। বছর ত্রিশ বত্রিশ হবে বয়স। পানের রসে ঠোঁট লাল। কানেও একটি লাল পেনসিল। 'ব্যাপার কি, বিনয়বাবু।'

'ব্যাপার একটু আছে। আপনার ওখানে কি সত্যিই হাণ্ড সর্ট।'

'সে তো আপনাকে দিন পনর ধরেই বলছি।'

'তাহলে এই ভদ্রলোককে নিন। ইনি অবশ্য নতুন। দু'তিন দিন একটু দেখিয়ে শুনিয়ে নিতে হবে।'

মাধব অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলল, 'তাহলে আর দরকার নেই বিনয়বাবু, আপনার দান ফিরিয়ে নিন। যত আনাড়ি সব বুঝি আমার কপালে।'

বিনয় বলল, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। পেট থেকে পড়েই কি আপনি সব কাজকর্ম শিখে নিয়েছিলেন? জেনারেল ম্যানেজার বিশেষ করে ওকে আপনার ডিপার্টমেন্টেই দিতে বলে গেলেন; এখন আপনার ইচ্ছা।'

মাধব বলল, 'তাতো ঠিকই। আমার ইচ্ছাও যা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাও তাই। আসুন মশাই আসুন। কি নাম আপনার?'

অসিত নিজের নাম বলল।

মাধব নিজেদের টেবিলের কাছে যেতে যেতে বলল, 'আনাড়ি বলায় সত্যি সত্যিই তো রাগ করেন নি আপনি?'

অসিত একটু হেসে বলল, 'রাগ কেন করব। আনাড়িকে আনাড়ি বলেছেন।'

মাধব বলল, 'ঈস্, আপনি দেখছি বিনয়ের একেবারে অবতার। এখানে আনাড়ি মশাই সবাই। নাড়ী আর কার আছে বলুন? কিন্তু এত জায়গা থাকতে এই গোয়ালে ঢুকতে এলেন কেন?'

অসিত বলল, 'এক গোয়ালে না এক গোয়ালে ঢুকতে তো হবেই।'

মাধব বলল, 'তা বটে। গোটা দুনিয়াটাই তো গোয়াল। আপনার সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে। আসুন।'

উত্তর-পশ্চিম কোণে ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট। দু'খানা টেবিল লম্বালম্বি ভাবে জোড়া। দু'পাশে সারি সারি চেয়ারে জন পাঁচ ছয় যুবক ঘাড়-গুঁজে কাজ করছে। অসিত তাদের সারিতে আসন নিল।

মাধব সকলের সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'ইনি আমাদের আনকোরা নতুন কলীগ। আমাদের পরিচয় আমাদের কাজেই মালুম। বসুন দাদা, বসে বসে দুনিয়ার হাল চাল দেখুন। হাতের কাজ সেরে নিই, তারপর আপনার সঙ্গে প্রাণ ভরে আলাপ করব।'

অসিত বলল, 'আমাকে কিছু কাজ দেবেন না?'

মাধব বলল, 'বসুন দাদা, কাজের ভাবনা কি। কাজ তো জীবন ভরেই করবেন। আজ তো সবে হাতে খড়ি, আজকের দিনটা একটু প্রাণ ভরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন।'

অসিত আর কোন কথা না বলে সহকর্মীদের কাজের ধারা লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ ছাব্বিশ সাতাশ বছরের আর একটি যুবক তার দিকে এগিয়ে এল, 'আরে অসিত, তুমি যে এখানে? দার্শনিকের কি এই স্থান?'

অসিত বলল, 'আমিও সেই কথা বলি শ্যামল। কবিরও তো এটা যোগ্য স্থান নয়। তারপর তোমার কাব্যচর্চা কেমন চলছে?'

দু'জনে একসঙ্গে পড়ত। কলেজ ম্যাগাজিনের পাতায় লেখা বেরুত দুই বন্ধুর।

শ্যামল মৃদু হেসে বলল, 'সে পাট অনেকদিন চুকে গেছে। এখন লেজারের খাতায় যোগ বিয়োগ করি।'

অসিত বলল, 'কতদিন ধরে আছো এখানে?'

শ্যামল বলল, 'তা মাস ছয়েক হোল। কিন্তু এত জায়গা থাকতে তুমি এখানে কেন?

অসিত হেসে বলল, 'এখানে না এলে কি তোমার সঙ্গে এমন ক'রে দেখা হোত?' তারপর ইন্‌চার্জের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাধববাবু, আমি একটু এর সঙ্গে কথা বলে আসি।'

মাধব বলল, 'বিলক্ষণ, হারানো বন্ধুকে ফিরে পেলেন, কথা বলবেন বই কি। প্রাণভরে কথা বলুন, দিন ভরে কথা বলুন। কিন্তু দোহাই আপনাদের, চেয়ারম্যানের ঘরে গিয়ে যেন প্রেমালাপ শুরু করবেন না।' মাধবের কথার ভঙ্গিতে তার সহকারীরা হেসে উঠল।

দুপুরটা শুয়ে-বসে কোন রকমে কেটেছে, কিন্তু বিকেলটা যেন কিছুতেই আর কাটতে চাইছিল না সুজাতার। মাঝে মাঝে এমন হয়। সময় যেন একতাল ভারি সিসার মত অনড় অচল ভাবে স্থির হয়ে থাকে। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। অস্বস্তির যেন আর সীমা থাকে না। অথচ কোন দুঃখই তো নেই। সুজাতাদের মত সচ্ছল অবস্থা সংসারে ক'জনের। এই তেতলার বাড়িটির ভবিষ্যৎ মালিক সুজাতা নিজে। বাবার বহু টাকার বিষয় সম্পত্তির সুজাতা একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। এই টাকার পরিমাণ নিয়ে স্বজন বন্ধু থেকে শুরু ক'রে চাকর-বাকর দারোয়ান-বেয়ারার অনেক মন্তব্য কানে এসেছে সুজাতার। কেউ বলেছে পঞ্চাশ লক্ষ, কেউ বলেছে কোটি। সুরপতি শুনে হেসেছেন, 'ও সব কিছু বিশ্বাস করিসনে বুলু। বিশ্বাস করলেই ঠকবি। আমার মরবার পরে হয়ত দেখবি একটি ফুটো পয়সাও রেখে যাইনি।'

সুজাতা ধমক দিয়ে বলেছে, 'বাবা, ফের যদি তুমি ওসব বলবে, আমি তোমার সঙ্গে আর কোন কথাই বলব না।'

সুরপতি তবু হেসেছেন, 'কোন সব? কিছু না রেখে যাওয়ার কথা?'

সুজাতা বলেছে, 'না, ওই মরবার কথা। তুমি বুড়ো মানুষের মত এখনই মরবার কথা বলবে কেন? কি এমন বয়স হয়েছে যে তুমি ওসব বলবে?'

সুরপতি জবাব দিয়েছেন, 'আচ্ছা, আর বলব না। মরবার কথা পাড়লেও সত্যি সত্যিই কি আমার মরবার জো আছে? তাহলে দেশলক্ষ্মীর কি হবে?'

সুজাতা ছদ্ম অভিমানের ভঙ্গিতে বলেছে, 'কেবল দেশলক্ষ্মী আর দেশলক্ষ্মী। আমি বুঝি তোমার কেউ নই?'

সুরপতি ছোট মেয়ের মত সুজাতাকে কোলের কাছে টেনে নিয়েছিলেন, 'তুই আমার পূর্ণলক্ষ্মী, তুই আমার প্রাণলক্ষ্মী ! আমার দেশলক্ষ্মী তো তোর জন্যেই ।'

আর কোন কথা বলেনি সুজাতা। বাবার গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে চুপ ক'রে বসে রয়েছে। বাবা যখন আছেন তখন সব আছে, তার আর কিছুর অভাব নেই, আর কিছুর দরকার নেই।

কিন্তু এই মনোভাব তো সব সময় থাকে না। বেশিক্ষণ সুরপতি মেয়ের কাছে থাকতে পারেন না। তাঁর অনেক কাজ, অনেক বিষয়-চিন্তা। সুরপতি যখন ব্যস্ত থাকেন তখন তাঁর আর এক মূর্তি। ভারি কাঠখোট্টা রূঢ়ভাষী বদমেজাজী মানুষ। চাকর-বাকরকে গালাগালি করেন, বাড়ির আশ্রিতা বিধবা কাকীমাকে অকারণে বকেন, সুজাতাকেও বাদ দেন না। পারতপক্ষে এ সময় বাবার কাছে ঘেঁষে না সুজাতা। দূরে দূরে আড়ালে আড়ালে থাকে। কিন্তু তাও থাকবার জো নেই। সুরপতি তাকে কোন না কোন অজুহাতে কাছে ডাকবেন আর সামান্য ত্রুটি, এমন কি কল্পিত বিচ্যুতির জন্যে বকবেন। দেখে দেখে সুজাতার এমন সহ্য হয়ে গেছে এর জন্য তার আর মন খারাপ হয় না। বাবার এই রূঢ় স্বভাব সে মেনে নিয়েছে। এই রুক্ষতার আড়ালে যে স্নেহের ফল্গুধারা আছে বাবার মনে, তার কথা তো সুজাতার অজানা নেই। তবু মাঝে মাঝে কেন যেন মন বড় খারাপ হয়ে ওঠে সুজাতার। এত বিত্ত বিভব, এত নিশ্চিন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে থেকেও মন ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। সুজাতা যেন বন্দিনী হয়ে আছে। বাবার স্নেহ আর শাসনের কারাগারে বন্দিনী। কি করতে হবে, কি পড়তে হবে, কাদের সঙ্গে মিশতে হবে, সব সুরপতি তাকে ঠিক ক'রে দিয়েছেন। এর কোন রকম ব্যতিক্রম ঘটলে তিনি রাগ করেন, দুঃখ পান। আর বাবাকে দুঃখ দিয়ে শান্তি পায় না সুজাতা। সুরপতি বলেন, 'বুলু, আর সকলের অবাধ্যতা আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু তোর নরম হাতের আঘাত আমি কিছুতে সইতে পারিনে।'

সুজাতা জানে নরম কি কঠিন, আপন কি পর, কারো আঘাতই নিঃশব্দে সহ্য করবার মত মানুষ সুরপতি নন। তিনি প্রত্যাঘাত দেবেনই। কারো কোন রকম অবাধ্যতাই তিনি সইতে পারেন না, সইতে চান না। কেন করবেন? তিনি যা ভালো বুঝবেন তা সকলের পক্ষেই ভালো। তিনি যা করবেন তাতে সকলেরই কল্যাণ। অন্তত সুজাতার তো নিশ্চয়ই। মেয়েকে তিনি এম. এ. পর্যন্ত পড়িয়েছেন। প্রত্যেক ক্লাসের পাঠ্য তিনি নিজে নির্বাচন করে দিয়েছেন। এমন কি তার ভাবীপতিও সুরপতি নিজে বেছে রেখেছেন। তাঁর বাছাই খারাপ হয়েছে একথা কেউ বলতে পারবে না। অবনী চাটুয্যে দেখতে সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সাধারণের চেয়ে অনেক উঁচুতে তার মাথা। ব্যাঙ্কের পরিচালনায় তার যোগ্যতা এবং কর্মদক্ষতারও পরিচয় পাওয়া গেছে। তার উপর মেয়ের আর ব্যাঙ্কের ভার দিয়ে সুরপতি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আর সেই উদ্দেশ্যেই অবনীকে তিনি নিজের মনের মত করে গড়ে তুলেছেন। গড়ে তোলা ছাড়া

ক্ষি। বিদেশী ডিগ্রী অবশ্য অবনীর আছে। কিন্তু ডিগ্রী থাকাই তো সব নয়। ডিগ্রীর পুঁথিগত বিদ্যাকে কি ক'রে কাজে লাগাতে হয় তা কাজের মানুষ সুরপতির কাছে থেকেই অবনীকে শিখে নিতে হবে।

নিজের মনোনীত পাত্রের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুরপতি বলেছেন, 'আমি জোর করছিনে, হুকুম করছিনে। তুমি তো আর এখন ছোট মেয়ে নও। তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি বিবেচনা হয়েছে। স্বামীকে তুমি নিজে বেছে নেবে।'

কিন্তু সুজাতা জানে বেছে নেওয়ার আর কিছু নেই। একাধিক কেউ থাকলে তো তাদের মধ্যে বাছাই চলবে। অবনী সুজাতার জীবনে একক। পিতার মনোনীত একমাত্র পুরুষ। একে তার পছন্দ করতেই হবে। এর আগে আরও কয়েকটি সম্বন্ধ সুজাতার এসেছে। সুরপতির সমব্যবসায়ী দু' একজন ব্যাঙ্কের বন্ধু কি কোন বীমা কোম্পানীর ডিরেক্টর তাদের পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্যে সুরপতিকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু বন্ধুদের কথায় সুরপতি কান পাতেন নি, তাঁদের অনুরোধ উপরোধ কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। কারণ সে সব ছেলের রূপ আছে তো গুণ নেই, গুণ আছে তো স্বাস্থ্য নেই। তারা কেউ সর্বাঙ্গসুন্দর নয়। কিন্তু অবনীর সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। কুলে-শীলে, পদে-সম্পদে কোথাও কোন খুঁত নেই অবনীর। আশ্চর্য, তবু খুঁৎখুতি আছে সুজাতার মনে। কেন যে এই খুঁৎখুতি তা সুজাতা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। সে নিজেই কি বোঝে ?

সুরপতির উদ্দেশ্যের কথা শুনে সুজাতা প্রথম দিনই বলেছিল, 'আমি কিন্তু বাবা বিয়ে করব না।'

সুরপতি হেসেছিলেন, 'তাই নাকি ? তবে কী করবি ?'

সুজাতা বলেছিল, 'কেন, করবার জিনিসের অভাব আছে নাকি সংসারে ? চাকরি বাকরি করব, যেটুকু লেখাপড়া শিখেছি তাকে কাজে লাগাব।'

সুরপতি বলেছিলেন, 'ওই হোলো তোদের ভুল। চাকরি করে লেখাপড়া কাজে লাগানো যায় না। চাকরি করতে করতে লোকে লেখাপড়া ভুলেই যায়। আমার ব্যাঙ্কের বি. এ., এম. এ. পাশ ছেলেদের তো রোজই দেখছি। টাকা পয়সা খরচ ক'রে লেখাপড়া যে কোনদিন তারা শিখেছিল তা দেখলে মনেই হয় না।'

সুজাতা বলেছিল, 'তাঁদের আর দোষ কী বাবা। ব্যাঙ্কের ঐ যোগ-বিয়োগের কাজে পড়াশুনোর কি কোন দরকার হয় যে তা তাঁরা মনে রাখতে পারবেন ?'

সুরপতি জবাব দিয়েছিলেন, 'আমিও সেই কথা বলি। মাস্টারী প্রফেসারী ছাড়া সংসারে এমন কাজ খুব কম আছে যাতে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের চর্চা হয়ে যায়। জ্ঞান আর কর্ম দুই আলাদা আলাদা কাণ্ড, আলাদা আলাদা যোগ। নিষ্কাম কর্ম যদি সম্ভব নাও হয়, নিষ্কাম এমন কি নিষ্কর্মা না হলে জ্ঞানের চর্চা করা চলে না।'

বেশির ভাগ সময়ই অবশ্য সুরপতির ব্যাঙ্কের চিন্তায়, ব্যাঙ্কের উন্নতির চেষ্টায় ব্যয়িত

হয়। বাকি যে সময়টুকু থাকে সুরপতি চুপ করে বসে থাকেন না। পড়াশুনো করেন। কখনো সাহিত্য, কখনো দর্শন, কখনো বা রাজনীতি অর্থনীতি। এই বয়সে এত কাজ কর্মের মধ্যে ব্যস্ত থেকেও বাবার পড়াশুনোর আগ্রহ আর অভ্যাস সুজাতার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। যত কুদর্শন আর রূঢ়ভাষীই হন তার বাবা, তাঁর মত এমন একই সঙ্গে জ্ঞানী আর কর্মী কেউ নেই। অবনীর সঙ্গে তুলনাটা সহজেই মনে আসে। তার ভদ্রতা আর বিজ্ঞতা যেন কেবল পোশাকে আর পারিপাট্যে, খানিকটা চালে, খানিকটা চলনে, তার চেয়ে বেশি গভীরে যেন নামতে জানে না অবনী। জীবন সম্বন্ধে, সাহিত্য দর্শন সম্বন্ধে, কোন গভীর উপলব্ধির কথা কোনদিন অবনীর মুখে শুনতে পায়নি সুজাতা। না, অবনী ঠিক তাদের মত নয়, ঠিক যেন সুজাতাদের জাতের নয়।

এরপর সুজাতা আবার নিজের কথায় ফিরে গিয়েছিল, 'আমিও তাই ভেবেছি বাবা। বিয়ে-টিয়ে কিছু করব না। তুমি যেমন বললে সেই নিষ্কাম কর্মহীন জ্ঞানের চর্চায় জীবন কাটাব। আমরা একসঙ্গে থাকব বাবা। আমি কোনদিন তোমার কাছ ছাড়া হব না।'

সুরপতি মুহূর্তকাল মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিলেন, 'দূর পাগলি। তাই কি কখনো হয়? ও-ভাবে কি কাছে থাকা যায়? ও-ভাবে কি কেউ কোনদিন নিজের মেয়েকে কাছে রাখতে পারে? তুই যখন পর হয়ে যাবি, স্বামী পুত্র নিয়ে আপন ঘর সংসারের মধ্যে সার্থক হবি তখনই আপন হবি তুই।'

সুজাতা তর্ক করেছিল, 'কিন্তু বাবা, ও ছাড়া সার্থকতার কি আর কোন পথ নেই? আমার জানা আরো দু'তিনটি মেয়ে বিয়ে করবে না বলে পণ করেছে। কেউ সাহিত্যের দিকে গেছে, কেউ বিজ্ঞানে, কেউ রাজনীতিতে। আজকাল মেয়েদের জীবনেও সার্থকতার আরো অনেক পথ আছে বাবা। তোমাদের ওই সেকেলে বাঁধা পথই একমাত্র পথ নয়।'

সুরপতি বলেছিলেন, 'কিন্তু রাজপথ ওই বাঁধা পথই। আজকাল মেয়েদের মধ্যে বিয়ে না করার রেওয়াজ হয়েছে, তা আমিও জানি। বাপ-মায়ের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্যে অনেকেরই বিয়ে হয় না। এদের সংখ্যাই শতকরা নিরানব্বই। আর যারা নিজেরা ইচ্ছা ক'রে বিয়ে করতে চায় না তাদের কারো হয়ত বড় বেশি উঁচু নজর, কেউ হয়ত পছন্দমত স্বামী পেল না, কেউ হয়ত যাকে পছন্দ করেছিল তাকে পেল না, চির-কৌমার্যের পণ নিয়ে রইল। কিন্তু সে পণ সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত ক'জনে রাখতে পারে?'

বাবার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে সুজাতার মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছিল। একটু বাদে সঙ্কোচ কাটিয়ে নিয়ে সে দৃঢ় স্পষ্ট গলায় বলেছিল, 'কিন্তু বাবা, তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হচ্ছে না। সবাই যে ওই একই কারণে চিরকুমারী থাকে তা নয়। পুরুষের মত

আজকাল মেয়েদের মনও জটিল। তাদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র। এমন মেয়ে থাকতে পারে যার মন মোটেই ঘরকন্নায় সায় দেয় না। ঘরকন্নার বাইরে সে হয়ত একক জীবনকেই ভালোবাসে—।'

সুরপতি বাধা দিয়ে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ। তেমন স্বার্থপর মেয়ে যে দু' চারটি না আছে তা নয়।'

সুজাতা প্রতিবাদ করেছিল, 'স্বার্থপর?'

সুরপতি উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, 'তা ছাড়া কি? উঁচু আদর্শের দোহাই দিয়ে যত গালভরা নামই দাও, একে স্বার্থপরতাই বলব। কেবল নিজে খাব, নিজে পরব, নিজের খেয়াল নিজের বাতিক নিয়ে পড়ে থাকব, সংসারে ঢুকব না, আর কোন ঝামেলা ঝক্কি পোহাব না—কেবল আত্মবিলাস, একে স্বার্থপরতা ছাড়া আর কী বলব! দেখ বুলু, মেয়েরা সাধারণভাবে অমনিতেই স্বার্থপর। বিয়ের পরেও তারা স্বামী পুত্র ছাড়া কাউকে চেনে না, চিনতে চায় না। এরপর যদি তারা আবার অবিবাহিত থাকে তাহ'লে নিজের দেহ, শুধু নিজের হাত পা, নাক, কান, মুখ চোখ ছাড়া দুনিয়ায় তাদের আর কী বাকি থাকে বল তো?'

সমস্ত তর্ক আর আলোচনা বন্ধ ক'রে সুরপতি সকালের কাগজে শেয়ার মার্কেটের ওঠা-নামার দিকে চোখ দিয়েছিলেন। সুজাতা আর আলোচনা বাড়ায়নি। ভেবেছিল শত মিল থাকা সত্ত্বেও এইখানেই বড় রকমের অমিল। এখানেই তার আর বাবার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। বাবা শুধু তার হাত, পা, নাক, কান, চোখ, মুখ ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না। বুঝতে চান না ও-সব ছাড়াও সুজাতার মন বলে আরো কিছু বস্তু থাকতে পারে। সে মনের আলাদা রূপ আছে, রুচি আছে, স্বতন্ত্র দর্শন আর আদর্শ আছে। সে মন যদি কেউ না বোঝে, কাউকে বোঝাবার জো নেই। সেই গোপন মনের দ্বার সকলের কাছে খুলে ধরা যায় না। কারো কাছেই কি পারা যায়? সুজাতা তো আজ পর্যন্ত পারেনি। মন যখন খোলে, তখন আপনিই খোলে, তাকে জোর ক'রে খোলানো যায় না।

কদিন ধরে আবার সেই বিয়ের প্রস্তাব উঠেছে। অবনীর বাবা মা আর অপেক্ষা করতে রাজি নন। শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ততই ভালো। তাঁরা সামনের বৈশাখেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চান। এ সম্বন্ধে সুরপতিকে তাঁরা অনুরোধও জানিয়েছেন। বিয়ে হয়ে যাক। তারপর শরীর অসুস্থ বলে মেয়েকে যদি সুরপতি নিজের কাছে রাখতে চান তাঁরা আপত্তি করবেন না। তা ছাড়া সাদার্ন এভিনিয়ু ক' মিনিটেরই বা পথ। বাড়ির গাড়িতে যতবার ইচ্ছা সুজাতা যাতায়াত করতে পারবে। কেউ কোন বাধা দেবেনা। কিন্তু এভাবে শুভ কাজটাকে শুধু অনিশ্চিত সম্ভাবনার মধ্যে রেখে দেওয়াটা আর ভালো দেখায় না। অবনীর বাবার শরীরও তো ভালো নয়। কার যে কখন ডাক পড়বে তার কি কিছু ঠিক আছে?

কথাগুলি সুরপতিও চিন্তা ক'রে দেখেছেন। অবনীর বাবা অভয়চরণকে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে সত্যিই তাঁর আর দেরি করবার ইচ্ছা নেই। একগুঁয়ে মেয়েটার জন্যেই হয়েছে যত মুশকিল। আর ছেলেবেলায় মা মারা যাওয়ায় স্বভাবটা বড় অভিমানী ধরনের হয়েছে। পিঠে হাত বুলানো ছাড়া ওর কাছ থেকে কোন কাজ আদায় করবার জো নেই। ধমক দিলেই বিগড়ে যায়। কিন্তু সুরপতি এবার নতুন পঞ্জিকা কিনে পাঠিয়েছেন জ্যোতিষার্ণবের কাছে। দিনক্ষণ এবার ঠিক ক'রে ফেলবেন। সুজাতাকে বলেছেন, 'তুমিও মন স্থির ক'রে ফেল বুলু। আর কিন্তু তোমার কোন অজুহাত শুনছিনে।'

অবনীও সেদিন কথায় কথায় বলেছে, 'বন্ধুরা সবাই ঠাট্টা করছে সুজাতা। বলছে তোমাদের এই মন জানাজানির পালা কি এই দু'বছরেও শেষ হ'লো না?'

সুজাতা জবাব দিয়েছে, 'তুমি তাঁদের বললেই পারতে যে ও-পালার আরম্ভ আছে কিন্তু শেষ নেই। পালা যত বড়, তার তুলনায় দু'দশ বছর কিছুই নয়, বললেই পারতে তুমি।'

অবনী বলেছে, 'না সুজাতা আমি তা বলতে পারতাম না। আমি তো তোমার মত কবি নই। ব্যাঙ্কের লেনদেনের হিসেবের মধ্যে আমার দিন কাটছে। আমার হিসেবের খাতায় দু' বছরের সঙ্গে দশ বছরের অনেক তফাৎ।'

সুজাতা বলেছে, 'তা জানি।'

সব জানে সুজাতা, সবই বোঝে। কিন্তু মন থেকে যে সাড়া পায় না। কেমন যেন ভয় ভয় করে, কেমন যেন আশঙ্কা হয়। যদি না মেলাতে পারে তা হলে কি আর তখন ভুল শোধরাবার জো থাকবে?

অধীর অবনী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিল, 'আচ্ছা আমি আজ যাই। দরকার আছে আমার।'

তারপর দিন তিনেকের মধ্যে অবনী আর আসে নি।

সুরপতি এরই মধ্যে উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছেন। 'কী হয়েছে বুলু?'

সুজাতা বলেছে 'কী আবার হবে বাবা।'

'অবনী কদিন ধ'রে আসছে না কেন?'

'কি জানি, হয়ত আর কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'

সুরপতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়েছেন, 'উঁহু এ শুধু ব্যস্ততার জন্য নয়। এই রবিবার ওকে চায়ে বলিস।'

সুজাতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে এসেছে।

কিন্তু এমন ক'রে তো এড়াতে পারবে না সুজাতা। বাবার ইচ্ছা, তাঁর আদেশ তাকে মানতেই হবে। তাই যদি হয় তাহলে প্রসন্ন মনে মেনে নেওয়াই ভালো।

দুধের কাপ হাতে অনুপমা এসে দাঁড়ালেন। সুজাতার বিধবা কাকীমা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। চেহারা দেখে অবশ্য অতটা মনে হয় না, ঠিক স্থূলাঙ্গী বলা যায় না, তবে পুষ্টাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী। পরণে সাদা থান, কোথাও কোন আভরণ নেই। সুজাতা তাঁর এই বেশে অনেকদিন আপত্তি করে বলেছে, 'কাকীমা, আজকাল তো কালোপেড়ে শাড়ি সবাই পরে, আপনিও তাই পরুন না। বড় বিশ্রী দেখায়।'

অনুপমা হেসে বলেছেন, 'বিশ্রী দেখাবারই যে কপাল বুলু। শুধু শাড়িতে পাড় বসালেই তো আর পোড়া কপাল ঢাকবে না।'

অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন অনুপমা। সন্তান একটি হয়েছিল, তাও গেছে। এত দিন ছোট ভাইয়ের কাছে ছিলেন। কিন্তু অভাব অনটনের সংসারে ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে কিছুতেই বনিবনাও হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে জ্ঞাতি সম্পর্কে ভাসুর সুরপতির কাছে। কাকীমার জন্যে ভারি মায়া হয় সুজাতার। যদি সময় থাকতে, বয়স থাকতে আর একবার বিয়ে করতেন, তাহলে ওঁকে আর এভাবে ভেসে ভেসে বেড়াতে হোত না। স্বামী পুত্র নিয়ে নতুন সংসারে সার্থক হতে পারতেন। কিন্তু এ সব কথা বলবার জো নেই। কাকীমা তাহলে তাঁর মুখ দর্শন করবেন না। ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। সামান্য লেখাপড়া জানেন। নিজের বিশ্বাস সংস্কারকে প্রাণপণে আঁকড়ে রয়েছেন। এই সংস্কারকে অনর্থক আঘাত দিয়ে লাভ কি। সে সুযোগ যখন কিছুতেই ওঁর জীবনে আর আসবে না তখন সে সব কথা তুলে অনর্থক ওঁর মনে অশান্তি আনবে কেন সুজাতা। তবু মাঝে মাঝে অদ্ভুত ইচ্ছা হয় তার। কাকীমার সঙ্গে সে এক সখ্যের সম্পর্কে এসে পৌঁছেছে। তাই কাকীমাকে একালের চিন্তাধারা, কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত করাবার লোভ হয় সুজাতার। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারে না। অনুপমা তার সঙ্গে বেশি দূর এগোতে চান না।

দূর থেকে সুজাতার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাছে এলেন অনুপমা, বললেন, 'দুধটুকু খেয়ে ফেল বুলু।'

সুজাতা বলল, 'আবার দুধ। আমাকে ডাকলেই তো আমি যেতে পারতাম কাকীমা। আপনি কেন নিয়ে এলেন।'

অনুপমা বললেন, 'ডাকিনি! ডেকে ডেকে হয়রাণ হয়ে গেলাম। তোমার কি কোন খেয়াল আছে কোন দিকে। এত কী ভাবছ বলতো? এত ভাববার কী আছে তোমার?'

সুজাতা একটু হাসল, 'ভাববার কিছু নেই বলেই বোধ হয় এই ভাবনা। কিন্তু কাকীমা দুধটা নিয়ে যান আপনি, দুধ আর এখন খাব না। আর আমি কি ছোট মেয়ে আছি যে সেধে সেধে আমাকে খাওয়াতে হবে। আমার যখন ক্ষিদে পাবে আমি নিজেই রান্না ঘরে যাব। আপনাকে মোটেই ব্যস্ত হ'তে হবে না।'

অনুপমা বললেন, 'না, ব্যস্ত হতে হবে কিসের। এই ক'দিনে যা একখানা ছিরি করেছ চেহারার। এই নিয়ে কালও ভাসঠাকুর কত দুঃখ করলেন।'

সুজাতা হেসে বলল, 'তাই নাকি? বাবার দুঃখ করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। সেজন্য আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না।'

অনুপমা কী যেন জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, বাড়ির চাকর গোবিন্দ বিকেলের ডাক নিয়ে এসে দাঁড়াল। 'দিদিমণি, চিঠি।'

সুজাতা সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে চিঠিপত্রগুলি নিল। সুরপতির নামে ব্যাঙ্ক ইনসিওরেন্স সংক্রান্ত কয়েকখানি পত্রিকা। পত্র মাত্র একখানি। সেখানা সুজাতার নামে।

অনুপমা একটু মুচকি হেসে বললেন, 'অবনীর চিঠি বুঝি?'

অনুপমা লক্ষ্য করেছেন, যখন ওদের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ থাকে, মুখে মুখে কথাবার্তা বন্ধ হয়, তখন আলাপ চলে চিঠিতে চিঠিতে।

সুজাতা আরক্তমুখে বলল, 'না, এ অন্য কারো চিঠি।'

খামের ওপর বাংলা গোটা গোটা অক্ষরে ঠিকানা লেখা, 'শ্রীমতী সুজাতা চক্রবর্তী কল্যাণীয়াসু।'

এমন হাতের লেখা অবনীর নয়। এমন পাঠও সে লেখে না।

খামের মুখ ছিঁড়ে সুজাতা চিঠিখানা পড়তে শুরু করল:

'পরম কল্যাণীয়াসু,

এ চিঠি দেখে তুমি অবাক হয়ে যাবে। তুমি আমাকে কোনদিন দেখনি। আমার সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় নেই। তবু তোমাকে চিঠি লিখছি। তুমি আমাকে না চিনলেও আমি তো তোমাকে চিনি। সুরপতি ঠাকুরপোর মুখে তোমার ছেলেবেলার কথা শুনেছি আর বড় হওয়ার পর কেমন হয়েছ তা শুনেছি অসিতের মুখে। চাকরির উমেদার হয়ে সে যেদিন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল মনে আছে বোধ হয়। শুনলুম তোমার সঙ্গেও তার দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হয়েছে। তারপর থেকে তার বোনেদের কাছে তোমার কথা সে প্রায়ই বলে। আর আমি আড়ালে বসে শুনি। শুনতে শুনতে তোমার সুন্দর চেহারা, শান্ত স্বভাব, অগাধ বিদ্যা সম্বন্ধে আমি প্রায় সবই আন্দাজ ক'রে নিয়েছি। তুমি যখন আসবে সেই আন্দাজের সঙ্গে তোমাকে মিলিয়ে দেখব।

আমার ছেলে যেমন মুখচোরা তেমনি ভীরু। ওকে এত করে বললাম সুরপতি ঠাকুরপো আর তার মেয়েকে একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে আয়। কতদিন ধরে দেখি না, একবার দেখি। কিন্তু ওর যত লম্ফঝম্ফ কেবল আমার কাছে। বলে কী জানো? তোমার সাহস তো কম নয়, অতবড় লোককে তোমার ঐই কুঁড়ে ঘরে নিমন্ত্রণ ক'রে যে আনতে চাইছ বসতে দেবে কোথায়, খেতে দেবে কী। আমি বলেছি বসতে দেব পিঁড়ে, খেতে দেব চিঁড়ে। তোর সাহস না থাকে আমার সাহস আছে। সুরপতি

ঠাকুরপো না হয় বড়লোক, সে না হয় চিঠি পেয়ে জবাব দেয় না। কিন্তু তার ঘরে আমার একটি মা লক্ষ্মী আছে। সে কি তার মেয়েকে গরীব বলে ঘৃণা করবে? কখনো নয়, কখনো নয়, আমার মা তেমন মেয়েই নয়।

আমার ছেলের সঙ্গে বাজি রেখে তোমাদের নিমন্ত্রণ করলুম। বাজিতে যদি হারি সে টাকা তোমাকে গুণতে হবে। এই রবিবার সন্ধ্যায় আমার সেই ব্যস্তবাগীশ বড়লোক দেমাকী ঠাকুরপোটিকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে অবশ্যই তোমার আসা চাই। পথ চেনাবার জন্য অসিতকে ঘণ্টা খানেক আগে পাঠিয়ে দেব।

তুমি আমার অন্তরের আশীর্বাদ ও স্নেহচুম্বন নিয়ো। ইতি—

শুভার্থিনী

শ্রীঅরুন্ধতী চন্দ।'

সন্ধ্যার পর সুরপতি বাড়ি ফিরে এলেন। সুজাতা নিজেই তাঁর হাত মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা করল। চা আর খাবার এনে দিল সামনে।

খেতে খেতে সুরপতি মেয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। 'কী খবর তোমার বুলু? আজকের মেজাজটা কী রকম!'

সুজাতা বলল, 'আমার মেজাজ কোনদিন খারাপ থাকে না কি বাবা!'

সুরপতি একটু হাসলেন, 'মানে তোমার বাবার মেজাজ সবদিনই খারাপ থাকে, ঘুরিয়ে এই কথাটাই তো বলতে চাও?'

সুজাতা বলল, 'তা কেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমি কেন বলতে যাব; আমি যা বলি সোজাসুজি বলি।'

সুরপতি বললেন, 'তা ঠিক। সুরপতি চক্রবর্তীকে শাসন করবার ক্ষমতা দুনিয়ায় একমাত্র তোমারই আছে।'

সুজাতা বলল, 'আছেই তো। ভালো কথা, একটা জিনিস কিন্তু তোমাকে দেখাব বলে রেখে দিয়েছি। বল রাগ করবে না, আমার কথায় যদি রাজী হও তাহলে দেখাতে পারি।'

সুরপতি হেসে বললেন, 'মাত্র দুটি সর্ত? আমি ভেবেছিলাম অন্ততঃ শ' দুই সর্ত তুমি আমার ওপর চাপিয়ে ছাড়বে।'

সুজাতা মৃদু হাসল। তারপর আর কোন কথা না বলে অরুন্ধতীর লেখা চিঠিখানা সুরপতির হাতে দিল।

চিঠি পড়তে পড়তে সুরপতির মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'এর মানে কী বুলু?'

সুজাতা বলল, 'কিসের মানে বাবা?'

সুরপতি চটে উঠলেন, 'অসিতের মার এমন গায়ে-পড়া আত্মীয়তার মানে কী? চায় কী সে?'

সুজাতা বলল, 'ছিঃ বাবা, তুমি নিজের মুখেই বলেছ ওঁদের কাছ থেকে তুমি এক সময় উপকার পেয়েছ।'

সুরপতি বললেন, 'তাকে উপকার বলে না, বলে বিনিময়। ছেলে পড়াবার বদলে মাসে বার টাকা করে মজুরী।'

সুজাতা বলল, 'কিন্তু বাবা, তোমার কাছেই কতবার শুনেছি ব্যাঙ্কে চাকরি দিয়ে তুমি বহু গরীব ছেলের উপকার করেছ।'

সুরপতি রাগ করে বললেন, 'করেছিই তো, হাজার বার করেছি। এ নিয়ে তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাইনে।'

সুজাতা কোন জবাব দিল না।

সুরপতি বলতে লাগলেন, 'উপকারই যদি বলিস তার প্রত্যুপকার তো আমি সাধ্যমত করেইছি। চাকরি দিয়েছি তার ছেলেকে। আবার চায় কী সে?'

সুজাতা বলল, 'কী আবার চাইবেন?'

সুরপতি বললেন, 'কী যে চায় তা আমি জানি। বাড়িতে ডেকে নিয়ে আদর যত্ন করে শেষে বলবে ছেলের মাইনে বাড়িয়ে দাও, উন্নতি করে দাও চাকরির। এই তো? তার জন্যেই এত অন্তরঙ্গতা, এত ঘনিষ্ঠতা।'

সুজাতা বলল, 'ছিঃ বাবা, মানুষকে অত ছোট ভাবতে নেই। তাতে আমরা নিজেরাই ছোট হয়ে যাব। তিনি আমাকে যেতে লিখেছেন। তোমার ইচ্ছা হয় যেতে দেবে, না হয় দেবে না। কিন্তু অনর্থক মানুষকে অপমান করতে যেয়ো না বাবা। পরিহাসচ্ছলেও না।'

বলে সুজাতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুরপতি সকৌতুকে পিছন থেকে ডাকলেন, 'আরে শোন শোন, ও বিবেকবতী, রাগ করলে নাকি? আরে শোনই না।'

কিন্তু সুজাতা সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আর তার সেই গতিভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বহুদিন আগের কথা সুরপতির মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল কমলার কথা, সুজাতার মার কথা। সেও ঠিক দেখতে অনেকটা ওইরকমই ছিল। ঝগড়ায় না পেরে সেও ঠিক অমনি করে রাগ করে অন্য ঘরে চলে যেত। অবশ্য তখন এত ঘর ছিল না, নিজের বাড়ি ছিল না। বউবাজারে ফকিরচাঁদ দে লেনে একটি ভাড়াটে বাড়ির দুখানি ঘর নিয়ে সুরপতি থাকতেন। কিন্তু তখন থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তোলবার, শহরে নিজের বাড়ি গাড়ি করবার কথা ভাবতেন সুরপতি। আর সেই ভাবনার কথা স্ত্রীকে মাঝে মাঝে জানাতেন। স্বামী যে প্রচলিত নীতি ধর্ম মেনে চলছেন না সে কথা টের পেয়ে কমলা সুজাতার মতই বাধা দিতেন। তিনি বলতেন, 'দেখ, গরীব হয়ে থাক সেও ভালো, কিন্তু অন্যের ওপর অন্যায় অবিচার যেন কোনদিন করতে যেয়ো না।'

সুরপতি জবাব দিতেন, 'দেখ, তোমার ব্রতকথা পাঁচালী কথার সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার মিল নেই। তার রীতিনীতি আলাদা। তোমার লক্ষ্মী আর মঙ্গলচণ্ডীর জগৎ নিয়ে তুমি থাক, আমাকে আমার জগৎ গড়ে তুলতে দাও।'

স্ত্রীর সঙ্গে মতভেদ মতান্তর সুরপতির যথেষ্ট হোত, ঝগড়াঝাটি নেহাত কম হোত না। কিন্তু মাঝে মাঝে ভালো লাগত। দুর্বল ক্ষীণ হাতের সেই বাধা, স্ত্রীর মুখের সেই নীতি উপদেশ মাঝে মাঝে ভারি উপভোগ করতেন সুরপতি। মনে মনে ভাবতেন মেয়েদের এই রকমই শোভা পায়। ওরা রক্ষয়িত্রী, ওদের স্বভাবের মধ্যেই রক্ষণশীলতা। পুরুষদের তা নয়। নীতি শাস্ত্র তারা একহাতে গড়ে, একহাতে ভাঙে। নিজেদের চলবার পথ তারা নিজেরা কেটে কেটে চলে। জীবনের বড় সড়কে পড়তে হোলে অনেক বাঁকা-চোরা গলি ঘুঁজির পথ অতিক্রম ক'রে যেতে হয়। তারপর জীবনে একবার সার্থক হোলে, সেই সব গলি ঘুঁজি আপনিই মিলিয়ে যায়। সে কথা নিজেরও আর মনে থাকে না। সেই গোপন পথের দু'চার জন খোঁড়া সহযাত্রী যে সে কথা নিয়ে কানাঘুষা মাঝে মাঝে না করে তা নয়। কিন্তু সে সব ফিস্‌ফিস্‌ানিতে কান দিতে নেই। মনের কথা যারা জোর গলায় উচ্চারণ করতে পারে না তাদের সুরপতি ভয় করেন না। তারা সংসারের কোন ক্ষতিও করে না, উপকারও করে না।

কিন্তু এম এ.-ই পাশ করুক আর যাই করুক, সুজাতা সেই যজমানী ভট্টচার্যের মেয়ের ধর্মভয় পেয়েছে, পেয়েছে মায়ের সেই রক্ষণশীলতা, ভালোমন্দ বিচারের সেই বাঁধাধরা পদ্ধতি। সুরপতি এককেবারে ভাবেন ওর এই ভয়কে ভেঙে দেবেন, বাইরের জটিল জগতের সঙ্গে পরিচয় করাবেন সুজাতার। কিন্তু পারেন নি। কেমন যেন মায়া হয়েছে। থাক, দরকার কী। আগে থেকেই ওর স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে লাভ কী। সে স্বপ্ন স্বাভাবিক নিয়মে আপনি ভাঙবে। তখন সেই ভাঙবার ব্যাথাটা ওর আর মনে লাগবে না।

সুরপতি মাঝে মাঝে ভেবেছেন ব্যাঙ্কের কাজে সুজাতাকে আরও পাকা ক'রে তুলবেন, নিজের সহকারিণী করবেন ওকে। কিন্তু সুজাতার বিমুখতা তাঁকে নিরুৎসাহ করেছে। ওপর থেকে যতটা দেখা যায় বোঝা যায়, পৈতৃক ব্যবসায়ের ও ততটুকু জেনেই খুসি। বেশী গভীরে নামতে চায় না। সুরপতি তেমন গরজও দেখান নি। দরকার কি ওকে আগে থেকেই অকালপক্ক করে তুলে। সময়ে সবই হবে। সংসার নিজেই ওকে গভীর থেকে গভীরতর গহ্বরে টেনে নেবে। যে কটা দিন গান গেয়ে, ফুল তুলে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় থাকতে পারে থাকুক।

তাছাড়া সুরপতির নিজের মধ্যেও একটি রক্ষণশীল মানুষ আছে। তাঁর মতে স্ত্রী পুরুষের কাজের ক্ষেত্র আলাদা, ভাবের ক্ষেত্র আলাদা। মেয়েদের পক্ষে ওই নরম সহজ সুনীতির জগৎই ভালো, ভালো ওদের মঙ্গলচণ্ডী, দীপের আলো আর ধূপের ধোঁয়া। পুরুষের কাজের মরুভূমিতে ওরা স্নিগ্ধ শ্যামল ওয়েসিস। সেইটেই নিয়ম। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম যে না দেখা যায় তা নয়। কিন্তু সেটা নিয়মেরই ব্যতিক্রম।

হঠাৎ মেয়ের জন্তে ভারি মমতা বোধ করলেন সুরপতি। তাকে অকারণে বকেছেন বলে অনুতাপ বোধ করলেন মনে। ধীরে ধীরে এসে জানালার ধারে দাঁড়ালেন। আকাশ ভরা তারা। কিন্তু তারার দিকে তাকাবার সময় সুরপতির হয় না, তাকাবার কথা যেন মনেই থাকে না। ফুলের জগৎ, তারার জগৎ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, যেন ক্রমেই পিছনে পড়ে যাচ্ছে। কে বলবে এই ফুল আর তারা নিয়ে কলেজ ম্যাগাজিনে তিনিও এক সময় কবিতা লিখেছেন। ভেবে সুরপতির নিজেরই হাসি পেল। শুধু মাসিক পত্রই নয়, প্রথম জীবনের দাম্পত্য পত্রগুলিও তাঁর কবিতার ছত্রে ভরে উঠত। আজকাল মাথা কুটে মরলেও বোধ হয় এক লাইন কবিতা মেলাতে পারবেন না। অক্ষরের বদলে গণিতের সংখ্যাগুলি খাতার পাতায় নেমে আসবে। কিন্তু তাতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের। জীবনের সবগুলি অধ্যায় সমাজ চায় না। কোন সময় মানুষ শব্দ দিয়ে কবিতা লেখে, কখনো বা সংখ্যা দিয়ে। পণ্ডিতমশাই বলতেন, 'তুমি একদিন কবি হবে সুরপতি, তুমি শিল্পী হবে।'

শিল্পী না হন, শিল্পপতি তো হয়েছেন। ব্যাঙ্কই তাঁর রচিত কবিতা। ছোট সংক্ষিপ্ত গীতকবিতা নয়; সর্গে সর্গে সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য।

পরম স্নেহে মেয়েকে কাছে ডাকলেন সুরপতি, 'বুলু, এদিকে এসো'। সুজাতার সাড়া দেওয়ার অপেক্ষা না ক'রে দ্বিতীয়বার ডাকলেন, 'বুলু।'

একটু বাদে সুজাতা এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল, বলল, 'কি বাবা।'

সুরপতি সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'তুই আমার ওপর রাগ করেছিস?'

সুজাতা বলল, 'না বাবা, রাগ কেন করব। বরং তুমি বোধ হয় রাগ করেছ।'

সুরপতি বললেন, 'হাঁ রাগ করেছিলাম, কিন্তু এখন আর তা নেই। আমার রাগ দপ ক'রে ওঠে, খপ ক'রে পড়ে যায়। আমি কি তোর মত?'

সুজাতা হেসে বলল, 'আমার রাগটা কিসের মত বাবা?'

সুরপতি এবার জবাব এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'যাক, আর তুলনা দিয়ে কাজ নেই। ভেবে দেখলাম অসিতের মা যখন অত করে লিখেছেন, একবার গিয়ে ঘুরে আসাই ভালো। অবনীকে রবিবার চা খেতে বলব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তাকে বোধ হয় একবার এলাহাবাদ যেতে হবে।'

'কেন?'

সুরপতি বললেন, 'ব্রাঞ্চটায় একটু গোলমাল হচ্ছে। একটু ঘরে আসা দরকার। আর যদি যায়ই ওদিকে, ইউ. পি.র অন্য ব্রাঞ্চগুলিও একবার দেখে আসবে।'

সুজাতা হঠাৎ বলল, 'বাবা, চল না আমরাও একবার যাই। এক জায়গায় আর ভালো লাগে না।'

সুরপতি মেয়ের দিকে তাকালেন, 'তুইও তো এই সঙ্গে যেতে পারতিস। কিন্তু তুই নিজেই তো ইচ্ছা ক'রে তা হতে দিচ্ছিস না। বারবার পিছিয়ে দিচ্ছিস।'

সুজাতা লজ্জিত হ'য়ে চোখ নামিয়ে বলল, 'বাবা আমি তো সেভাবে যাওয়ার কথা বলিনি। তোমার আর আমার একসঙ্গে যাওয়ার কথাই বলছিলাম।'

সুরপতি বললেন, 'আচ্ছা পরের বার তাই যাওয়া যাবে। রবিবার বরং চ'ল অসিতের বাড়ি থেকেই বেড়িয়ে আসি।'

সুজাতা বলল, 'বাবা, তোমার যদি মত না থাকে তাহলে শুধু আমাকে খুশি করবার জন্যই তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই।'

সুরপতি বললেন, 'তোকে খুশি করবার জন্যে আমি সব করতে পারি। তোকে খুশি করতে পারলে আমি নিজেও যে খুশি হই বুলু।'

সুজাতা বলল, 'তাহলে ওঁকে একটা চিঠি লিখে দেব বাবা ?'

সুরপতি হেসে বললেন, 'বাঃ, সঙ্গে সঙ্গে রাজী ? এতক্ষণ ধরে বুঝি তা'হলে শুধু ভদ্রতা হচ্ছিল। তোমার যদি অমত থাকে তোমার যদি আপত্তি থাকে—। এখন যদি আমি সত্যিই আপত্তি করে বসি তাহলে কি হবে ?'

সুজাতাও হাসল, 'কী আবার হবে, আপত্তি কর তো যাওয়া হবে না।' বলে সুজাতা পাশের ঘরে চলে গেল।

সুরপতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন। সত্যিই ভারি খুশি হয়েছে বুলু। আহা বেচারা! আত্মীয়স্বজন বলতে তো তেমন কেউ নেই। ওর মনে মা-মাসীর স্নেহের ক্ষুধা রয়েই গেছে। সুরপতির অভিজাত বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে নানা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ আসে। সুজাতাকেও সঙ্গে ক'রে নেওয়ার জন্যে তাঁদের বাড়ির মেয়েরা অনুরোধ জানান। কিন্তু সে সব পার্টিতে গিয়ে সুরপতিও তেমন আরাম পান নি। আর সুজাতা তো রীতিমত অস্বস্তিই বোধ করে। এদিক থেকে ও বড় অসামাজিক। এ সব নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ সুজাতা যত পারে এড়িয়ে যায়। বলে, 'বাবা, ভালো লাগে না ও সব ফর্মালিটি।'

সুরপতি বলেন, 'সে কি রে। আমি না হয় গেঁয়ো বামুন। খোলা গায়ে থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে পারলে আর কিছু চাইনে। কিন্তু তুই তো আর তা নোস। তুই তো রীতিমত উচ্চশিক্ষিতা আধুনিকা মহিলা। নাঃ, তোর পিছনে টাকা পয়সা ব্যয় করাটা কোনই কাজে লাগেনি দেখছি।'

সুজাতা হেসে জবাব দেয়, 'সত্যি বাবা। একেবারে জলে গেছে।'

এদিক থেকে অসামাজিক অহংকারী বলে সমাজে খানিকটা দুর্নামই আছে বাপ মেয়ের। কিন্তু সুরপতি তা গ্রাহ্য করেন না। সুজাতা যে অমন পোশাকী আদব কায়দার বিরুদ্ধে তা জেনে মনে মনে তিনি বরং খুশিই হন।

সাধারণত নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে সুজাতা সাড়া দেয় না। কিন্তু অসিতের মা ডাকামাত্রই ও এমন উৎসুক হয়ে উঠল কেন ? ওকি তার চিঠিতে সত্যিই নতুন কিছু পেয়েছে ?

সুরপতি অরুন্ধতীর চিঠির ভাষাটা আর একবার মনে আনবার চেষ্টা করলেন। একবার ভাবলেন চিঠিখানা নিয়ে আসবার জন্যে মেয়েকে বলবেন। কিন্তু কেমন যেন একটু সংকোচ বোধ হোলো।

সুজাতা নিজের ঘরে গিয়ে ততক্ষণে অরুন্ধতীর চিঠির জবাব লিখতে বসেছে। খানিকক্ষণ কাটা ছেঁড়ার পর একটা চিঠি প্রায় দাঁড় করিয়ে এনেছিল, রান্নাঘরে খাওয়ার ডাক পড়ল। দেরি করবার জো নেই। এক মিনিট দেরি হলেই বাবা অসহিষ্ণু হয়ে বকাবকি শুরু করবেন। সুজাতা চিঠিটা অসমাপ্ত রেখে খাওয়ার জন্যে নিচে নেমে গেল। তারপর আধ ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে ফের নতুন ক'রে আরম্ভ করল চিঠি। এ চিঠি কোন বন্ধুকে নয়, প্রেমাস্পদকে নয়, নেহাৎই মায়ের বয়সী অপরিচিতা অর্ধশিক্ষিতা একটি মহিলার কাছে সামাজিক পত্র। কিন্তু লিখতে গিয়ে যেন নতুন এক আনন্দের স্বাদ পেল সুজাতা। তার মা যদি থাকতেন তাহলে দূরে বসে তার কাছেও হয়ত এক বিনিদ্র রাতে এমনি চিঠি লিখত সুজাতা। অনেক কাটাকুটির পর অনেক পাঠ বদলের পর সে লিখল :

'মাননীয়াসু,

আজই বিকালে আপনার চিঠি পেলাম। বাবাকে লেখা আপনার আর একখানা চিঠি আমার কাছেই আছে। সে চিঠি দেখে প্রথমে আমার ভারি হিংসা হয়েছিল। ভেবেছিলাম এ চিঠি কেন শুধু তাঁর কাছেই এল, কেন আমার কাছেও এল না। তখন কি ভাবতে পেরেছি আপনি আমাকেও চিঠি লিখবেন। অমন ভালো অত সুন্দর আর চমৎকার একখানা চিঠির জবাব বাবা আজ পর্যন্ত দেননি জেনে তাঁর ওপর আমার প্রথমে খুব রাগ হয়েছিল। এখন এত রাত্রে এই ঘুমন্ত নিস্তব্ধ পুরীতে একা বসে বসে চিঠি লিখতে সে রাগ আর ততটা নেই। এখন ভাবছি তিনি যদি চিঠি লিখতেন, তিনি যদি আমার মত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতেন, আমাকে কি আর আপনার চিঠি লেখার দরকার হোতো? আমি কি তাহলে আপনার কাছ থেকে কোন চিঠি আশা করতে পারতাম? তাই ভাবছি তিনি চিঠি না দিয়ে ভালোই করেছেন। খুব স্বার্থপরের মত কথা বলছি, না? দেখুন তো আপনি আমাকে 'লক্ষ্মী' 'মালক্ষ্মী' কত ভালো নামেই না ডেকেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারলেন তো আমি মোটেই সে সব কিছু নই। আমি একটি আস্ত অলক্ষ্মী স্বার্থপর মেয়ে।

অসিতবাবু আমার সম্বন্ধে তাঁর বোনেদের কাছে কী গল্প করেছেন কী জানি। বোধ হয় খুব নিন্দা মন্দ ক'রে থাকবেন। কোন মেয়ের অসাধারণ রূপ, শান্ত স্বভাব আর বিদ্যাবুদ্ধির গল্প যদি তিনি তাঁদের শুনিয়ে থাকেন—নিশ্চয়ই আর কারো কথা বলেছেন। আপনি আড়াল থেকে শুনেছেন কিনা তাই আমার কথা আন্দাজ করেছেন। যদি সামনাসামনি দাঁড়িয়ে শুনতেন নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন সে অসামান্যার নাম সুজাতা নয়।

আপনি যখন ডেকেছেন না গিয়ে কি পারি? রবিবার অবশ্যই যাব। বাবাকেও রাজী করিয়েছি। অসিতবাবু যদি দয়া করে আসেন তো ভালোই হয়। পথ চেনাবার জন্যে নয়, তাঁর কাছে বেশ গল্প শুনতে শুনতে যাওয়া যাবে। আপনার গল্প। আপনি আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—

সুজাতা।'

পরদিন ভোরে উঠে বাড়ির চাকর অমূল্যকে ডেকে চিঠিটা পোস্ট করতে দিল সুজাতা। কিন্তু ডাকে পাঠিয়ে দেওয়ার পরেই তার মনে হোতে লাগল অত বড় একটা দীর্ঘ চিঠি না পাঠালেই ভালো হতো। বড়ই ভাবপ্রবণ হয়ে গেছে চিঠিটা। একজন অপরিচিতা ভদ্রমহিলার কাছে এতখানি ভাবাবেশ প্রকাশ করে ফেলে তার ভারি লজ্জা করতে লাগল। কিন্তু হস্তচ্যুত পাশা। ডাকে ছেড়ে দেওয়া চিঠি আর ফিরিয়ে নেওয়ার জো নেই। এখন শুধু একটি কাজ করা যায়। একখানা পোস্টকার্ড ছেড়ে আগের চিঠিটাকে বাতিল করা চলে। দু'লাইন লিখে দিলেই হয়, জরুরী কাজ থাকায় সুজাতাদের পক্ষে এই রবিবার যাওয়া সম্ভব হবে না। পরে সুবিধা সুযোগ মত যাওয়ার দিন ঠিক করা যাবে।

কিন্তু লিখি লিখি করে দু'দিনের মধ্যে সে চিঠি লেখা হোলো না। শেষ পর্যন্ত রবিবার এল। সকাল কাটল, দুপুর কাটল। সুজাতা বাবাকে আর কাকীমাকে বারবার বলল দরকারী কাজে ল্যান্সডাউন রোডে সে এক বান্ধবীর বাড়িতে যাবে। অসিতবাবু যদি নিতান্ত এসেই পড়েন তাঁকে যেন বলা হয় আজ আর তাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হোলো না। সে জন্য বড়ই লজ্জিত সুজাতা।

সুরপতি হেসে বললেন, 'আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে বুঝি।'

সুজাতা বলল, 'বাঃ রে, পরীক্ষা আবার কিসের। সত্যিই আজ ডলিদের ওখানে যাওয়া দরকার।'

বেরোবার জন্য তৈরী হবে বলেই যেন সুজাতা নিজের ঘরে ঢুকল। মনে মনে ভাবল সত্যি যদি না যায় কেমন হয়। তার এই খেয়ালীপনায় কী ভাববেন অসিতবাবুর মা। চিঠির মেয়ের সঙ্গে আসল মেয়ের যে অনেক তফাৎ তা দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবেন। বেশ তো, তাঁকে একটু অবাক করে দেওয়ারই ইচ্ছা সুজাতার। আলমারী থেকে খান কয়েক শাড়ি বের করল সুজাতা। একখানা জমকালো রঙের শাড়ি পরে হঠাৎ ডলিদের বাড়িতে সে উপস্থিত হবে। তাকে দেখে ডলি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। যে বার বার ডাকলেও আসে না সে আজ অনাহুত ভাবে কেন এল ভেবে নিশ্চয়ই কুল-কিনারা পাবে না। আর ওদিকে বিস্মিত হবেন অসিতবাবুর মা। ভাববেন বড়লোকের মেয়েরা খেয়াল হলে পাতার পর পাতা ভাবাবেগে ভাসিয়ে দিতে পারে, কিন্তু গরীবের বাড়িতে তারা সত্যি কোন দিন নিমন্ত্রণ রাখতে যায় না। তাদের কথার জগৎ আর কাজের

জগৎ একেবারে আলাদা। তাদের হৃদয় যে পথে যেতে চায় আভিজাত্যবোধ সে পথ মাড়ায় না।

দোরে টোকা পড়ায় সুজাতা চমকে উঠল, 'কে!'

'বুলু, আমি।'

'কাকীমা?'

'হাঁ।'

সুজাতা বলল, 'কী ব্যাপার? ঘরে আসুন। দোর খোলাই আছে।'

অনুপমা ঘরে ঢুকে বললেন, 'কী ব্যাপার আমিও তাইই দেখতে এলাম। ওদিকে অসিতবাবু এসে বসে আছেন। তোমার সাজসজ্জা হোলো?'

সুজাতা বলল, 'তিনি এসে গেছেন?'

অনুপমা মৃদু হেসে বললেন, 'তাঁর বাড়িতে মনিবের মেয়ের পায়ের ধুলো পড়বে তিনি কি না এসে পারেন!'

সুজাতা বলল, 'ছিঃ কাকীমা।'

অনুপমা বললেন, 'আমি ঠাট্টা করছিলাম সুজাতা, তুমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।'

সুজাতা বলল, 'আমার তৈরী হ'তে বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু তার আগে অসিতবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।'

অনুপমা বললেন, 'দেখা ক'রে কী বলবে? তোমার সেই জরুরী কাজের কথা তো? সেটা না হয় গাড়িতে বসেই বলো।'

অনুপমা মুখ মুচকে একটু হাসলেন।

সুজাতা আরক্ত হয়ে বলল, 'আপনার সব কিছুতেই ঠাট্টা। আমার বুঝি সত্যিই কোন দরকারী কাজ থাকতে পারে না?'

অনুপমা বললেন, 'পারে না আমি কি বলেছি?'

'বুলু তাড়াতাড়ি এসো, আমরা অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে।'

ড্রয়িংরুম থেকে সুরপতির চড়া গলার হাঁক শোনা গেল।

শাড়িটাড়ি না বদলেই সুজাতা তাড়াতাড়ি ড্রয়িংরুমে ঢুকল। সুরপতি তৈরী হয়েই আছেন। অনুপমার কাছ থেকে মিহি সাদা খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি চেয়ে নিয়ে পরেছেন। পকেটে পুরে নিয়েছেন গোল্ড ফ্লেকের কৌটো। চোখে কালো মোটা শেলের চশমা। তার ভিতর দিয়ে সুরপতি সোজা মেয়ের দিকে তাকালেন, 'এই যে, তুমি এখনও তৈরী হও নি। অসিত এসে বসে আছে।'

সুজাতা মনে মনে ভাবল, বাবার মনে কোন দ্বিধা নেই। যেখানে যাবেন বলে কথা দেন সেখানে নিশ্চয়ই যান। আর একবার যদি যাব না বলেন তাহলে শত সাধ্য সাধনাতেও তাঁর আর সম্মতি মেলে না।

সুজাতা অসিতের দিকে তাকিয়ে নমস্কার জানিয়ে একটু হেসে বলল, 'আপনাকে কি সত্যিই অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি ?'

অসিতের বেশবাসের কোন পরিবর্তন হয়নি। তবে জামা কাপড় প্রথম দিনের তুলনায় আজ বেশ ফরসা। পায়ে পুরানো স্যাণ্ডেলের বদলে এবার শু উঠেছে। নিতান্ত সাধারণ আটপৌরে বেশ। কিন্তু সুরপতির মনে হোলো বেশটা যত সাধারণ, চেহারাটা তত নয়। মুখ চোখের নিরীহ ভঙ্গির মধ্যে যেন এক চাপা কৌতুক প্রচ্ছন্ন আছে।

অসিত সুজাতার দিকে তাকিয়ে প্রতি নমস্কার ক'রে স্মিত মুখে বলল, 'না, এখনো অনেকক্ষণ হয়নি। কিন্তু সে কথা আপনাকে বলা বোধ হয় নিরাপদ নয়।'

সুজাতা একটু হাসল, 'আপনাদের ভয় যতই থাকুক, যাঁরা সৎ তাঁরা সব সময় সত্যি কথাই বলেন।'

অসিত বলল, 'কিন্তু সেই সৎ আর সত্যবাদীর সংখ্যা দুনিয়ায় ক'জন ?'

সুজাতা বলল, 'বেশি নয়, সেইজন্তেই তো তাঁদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা এত বেশি।'

অসিত এবার একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে তাকাতেই সে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। পৃথিবীর সৎব্যক্তিদের সম্বন্ধে আশা পোষণ করায় এবং তা প্রকাশ করায় সুজাতার লজ্জার কিছু নেই। তবু যেন সুজাতা কেমন একটু লজ্জা বোধ করল। তার কথায় কেউ কোন ব্যক্তিগত অর্থ আরোপ করবে না তো ?

সুরপতি অসহিষ্ণুভাবে তাগিদ দিয়ে বললেন, 'বুলু' সত্যিই কিন্তু বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। অসিতের ওখান থেকে ঘুরে এসে আমার আবার অন্য কাজে বেরোতে হবে।'

হাত ঘড়িতে সময় দেখলেন সুরপতি।

সুজাতা লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাই বাবা।'

তারপর মিনিট দশেক বাদেই শাড়ি বদলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অনুপমা বললেন, 'একি, এ যে একেবারে নিরাভরণা ? এই কি তোমার বাইরে বেরোবার সজ্জা ?'

সুজাতার পরণে চওড়া কালো পেড়ে সাদা খোলের মিহি শান্তিপুরী শাড়ি। হাতে দু'গাছি চুড়ি। গলায় সরু হার, কানে লাল পাথর বসানো ফুল। মুখে পাউডারের ক্ষীণ আভাস ছাড়া চোখে ঠোঁটে কোন প্রসাধনের ছাপ নেই।

সুজাতা বলল, 'এর চেয়ে বেশি গয়না আমি কবে পরি কাকীমা ?'

অনুপমা বললেন, 'তা অবশ্য পরোনা, কিন্তু শাড়িটা আর একটু ভালো দেখে পরে গেলে পারতে। উনি যদি রাগ করেন।'

সুজাতা বলল, 'কে, বাবা ? না, তা করবেন না। এ তো আর ওঁর কোন বড়লোক বন্ধুর পার্টিতে যাচ্ছি না।'

অনুপমা বলতে যাচ্ছিলেন, 'সেইজন্তেই বুঝি এত বিবেচনা ?' কিন্তু সে কথা চেপে

গিয়ে বললেন, 'এতেও অবশ্য তোমাকে খুবই মানিয়েছে। গায়ের রং যার ভালো, সাদাই হোক কালোই হোক তাকে সব শাড়িই মানায়।'

সুজাতা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আহা, নিজের মেয়েকে কে কবে বেমানান দেখে কাকীমা ?'

সুরপতি আর একবার অধীর ভাবে হাঁক দিলেন, 'বুলু, হোলো তোমার ?'

সুজাতা এগুতে এগুতে সাড়া দিয়ে বলল, 'হয়েছে বাবা, যাচ্ছি।'

ড্রাইভার রামলগন অনেক আগেই গাড়ি নিয়ে তৈরী হয়ে আছে। সুরপতি মেয়েকে নিয়ে পিছনের সীটে উঠে বসলেন, অসিত গিয়ে বসল ড্রাইভারের পাশের সীটে।

সুরপতি একটু ইতঃস্তত করে বললেন, 'তুমিও তো এদিকে এলে পারতে।'

অসিত বলল, 'না না, আমি এখানে বসলেই রামলগনের সুবিধে হবে।'

বাড়ির নম্বরটা বেলেঘাটা মেইন রোডের, কিন্তু অবস্থানটা ঠিক সদর রাস্তার ওপরে নয়, একটি কাণা গলির মধ্যে।

সুরপতির গাড়ি সে গলির ভেতর ঢুকল না।

অসিত একটু সংকোচের সঙ্গে বলল, 'এখানে নামতে হবে। গাড়ি আর যাবে না।'

সুরপতি বললেন, 'তাতে কী হয়েছে ? গাড়ি কি আর লোকের ঘরের ভিতরে যায়!'

মেয়েকে নিয়ে সুরপতি নেমে পড়লেন, অসিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চল।'

পাশেই একটা বস্তি। তার কোল ঘেষে কাঁচা নর্দমা, কয়েকটি উলঙ্গ ছেলে তার ধারে বসে নোংরা জলে ঢিল ছুঁড়ছে।

নাকে একটু রুমাল বুলাল সুজাতা। অসিতের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলল, 'বেছে বেছে ভাল জায়গায় এসে বাড়ি করেছেন।'

অসিত হাসল, 'তা ঠিক। কেন নির্বাচনটা বুঝি পছন্দ হচ্ছে না ?'

বাড়ির বাইরেটা যেমন পুরোন, সুরকি ঝরা লোনা ধরা, ভিতরটা তেমন নয়। সদর পেরিয়ে ছোট একটি উঠোন। উঠোনের তিন দিকে আরো দু'ঘর ভাড়াটে। উত্তর দিকের পাশাপাশি দু'খানা ঘর অসিতদের। সাড়া পেয়ে সবাই এগিয়ে এসেছেন। অরুন্ধতী, উমা, নীলা। দুই বোনের চোখে বিস্ময় আর কৌতুহল।

অরুন্ধতীর সঙ্গেই অসিত প্রথমে সুজাতার পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার মা, আর –'

অরুন্ধতী বললেন, 'আর বলতে হবে না। আমি চিনতে পেরেছি। এসো মা, এসো।'

তারপর সুরপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন আছ সুয়ো ঠাকুরপো ? দেখ, শেষ পর্যন্ত না এসে পারলে না তো ?'

সুরপতি বললেন, 'কী করে আর পারি ? যেভাবে পত্রাঘাত শুরু করেছিলেন ?'

সুজাতা অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে বলল, 'আপনি চমৎকার চিঠি লেখেন।'

অসিত বলল, মার আশা ছিল একজন লেখিকাটেখিকা হবেন, কিন্তু হতে হতে পত্র লেখিকা পর্যন্ত হয়ে রইলেন। সাহিত্যের সাধ চিঠিতেই মেটান।'

অরুন্ধতী হেসে বললেন, 'ও আমার নিন্দা না ক'রে জলগ্রহণ করে না। এসো ভিতরে এসো।' তারপর দুই মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উমা আর নীলা। অসিতের দুই ছোট বোন।'

সুজাতা বলল, 'দেখেই বুঝতে পেরেছি।'

অসিত প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল, 'কিছুই বুঝতে পারেন নি। ওরা বয়সে ছোট, কিন্তু প্রতাপে বড়। সবাই আমার অভিভাবিকা। আমাকে সবারই শাসনে থাকতে হয়।'

সুজাতা হেসে বলল, 'শাসন খুব কড়া বলে তো মনে হচ্ছে না।'

নীলা বলল, 'দাদা, সুজাতা দেবীর কাছে আমাদের সবাইকে অপদস্থ করবে বলে পণ ক'রে বসেছ? এর ফল কি ভালো হবে?'

অসিত বলল, 'অপদস্থ ব'লো না, উচ্চপদস্থ বলো।'

নীলার দিকে তাকিয়ে সুজাতা বলল, 'আমার একটু আপত্তি আছে। সুজাতা দেবী বলবেন না, কেমন যেন কানে লাগে। যেন যাত্রা থিয়েটারের মত শোনায়।'

নীলা হেসে বলল, 'বেশ তাহলে সুজাতাদি।'

সুজাতা বলল, 'শুধু নামই তো যথেষ্ট।'

নীলা বলল, 'এখনই নয়। আলাপটা আরো জমে উঠুক, তারপরে।'

সুরপতিকে নিয়ে অসিত পাশের ঘরে গেল। উমা আর নীলার সেই যৌথ ঘর। কালো পর্দায় ভাগ করা। নীলার সেই ছোট তক্তপোষখানার ওপর বসে সুরপতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ঘরে কে থাকে?'

অসিত বলল 'আমার ছোট বোন নীলা।'

'এখনো বিয়ে টিয়ে দাওনি?'

অসিত বলল, 'না, ওর বড় উমার বিয়ে হয়েছিল। বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে। এখন এখানেই থাকে।'

সুরপতি বললেন, 'তোমাদের রংপুরের বাসায় যখন ওদের দেখেছি খুবই ছোট ছিল। চেহারা মনে নেই ভালো করে।'

সুরপতি হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ঈস্, অনেক দেরী হয়ে গেল। তোমার মাকে বলো আমি এক্ষুনি উঠব। আর সুজাতাকে গিয়ে একটু তাড়া দাও। সে বোধ হয় খুব জমিয়ে নিয়েছে।'

অসিত বলল, 'সে কি, এই তো সবে এলেন। এক্ষুনি উঠতে চাইছেন।'

সুরপতি গম্ভীর ভাবে বললেন, 'হাঁ, দরকারী কাজ আছে।'

অসিত আর কিছু না বলে পাশের ঘরের দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অরুন্ধতী মেঝের ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়েছেন। সেখানে সবাই গোল হয়ে বসে; সুজাতা অসিতের মা আর দুবোনের সঙ্গে আলাপ ক'রে চলেছে। কোন তাড়া নেই, ব্যস্ততা নেই। উমা আর নীলার সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেছে সুজাতা, যেন সে ওদেরই একজন। ধনীকন্যার এই সরল অনাড়ম্বর ধরণটুকু অসিতের খুবই ভালো লাগল। ব্যবধান অবশ্যই আছে। বেশেবাশে কথায় বার্তায়—একটু লক্ষ্য করলেই প্রত্যেকটি চোখে পড়ে। তবু উচ্চশিক্ষা আর মার্জিত রুচিতে রূপ আর ধনের অহংকারকে উগ্র হ'তে দেয় নি সুজাতা। সুজাতার এই কোমল বিনম্রভাব, ওর এই নারীত্বকে মধুর আর মনোহর করে তুলেছে। ওকে দেখে অসিতের মন এক অনির্বচনীয় সুখে পূর্ণ হয়ে উঠল।

নীলারই চোখে পড়ল প্রথমে। সে একটু মৃদু হেসে বলল, 'দাদা আর লজ্জা করতে হবে না, এসো। আমাদের এ বৈঠকে অন্তত একজন অনাহুত রবাহুতের স্থান আছে, কী বলুন সুজাতাদি?'

সুজাতা হঠাৎ কোন জবাব খুঁজে পেল না। আরক্ত মুখে চুপ ক'রে রইল।

অসিত এই প্রগলভা বোনটির কথার কোন জবাব দেওয়ার চেষ্টা করল না। অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, উনি এক্ষুনি উঠতে চাইছেন।'

মাস্টারমশাই কথাটা মুখে আটকে গেল অসিতের। অন্য কোন সম্বোধনও হঠাৎ মুখে জোগাল না।

অরুন্ধতী বললেন, 'সেকি রে, এক্ষুনি উঠবেন কি!' তারপর সুজাতার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'বড় লোকেদের বোধ হয় এই নিয়ম। কারো বাড়িতে এলে খুব ব্যস্ততা না দেখালে মানায় না। কী বলো সুজাতা?'

সুজাতা হেসে জবাব দিল, 'আমাকে কেন খোঁটা দিচ্ছেন। আমি তো আর বড়লোক নই, যাওয়ার জন্যে ব্যস্তও হয়ে উঠিনি।'

অরুন্ধতী স্মিতমুখে বললেন, 'এই তো লক্ষ্মী মেয়ের কথা। আচ্ছা আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছি যিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, দেখি তাঁকে গিয়ে সুস্থ করতে পারি কিনা।'

ছেলেমেয়েদের সামনে এতখানি লঘুচাপল্য প্রকাশ করে ফেলে অরুন্ধতী একটু যেন লজ্জিত হয়ে পড়লেন। ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'যাও, ওঁকে বলো গিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, চা-টা খেয়ে তারপর যাবেন।'

অসিত বলল, 'আমি যথেষ্ট বলেছি মা।'

নীলা প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'মিছে কথা ব'লো না দাদা। যথেষ্ট দূরের কথা, তুমি যে একটি কথাও বলোনি তা আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি। মনিবকন্যার সামনেই তোমার একটিবারের জন্য মুখ ফুটল না আর তিনি তো সাক্ষাৎ মনিব।'

অরুন্ধতী ধমকের সুরে বললেন, 'আঃ থাম তো। তোর নিজের মুখ দিয়ে অনবরত খই ফুটছে। আর কাউকে কি তুই কিছু বলবার অবসর দিস্ যে সে বলবে?'

নীলা বলল, 'বাঃ রে, আমি বুঝি কারো মুখ হাত চেপে বন্ধ করে রেখেছি। আর কারো মুখে তুবড়ী ফুটলে তো আমি বাধা দেই নি।'

অরুন্ধতী রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেললেন। বললেন, 'তোর সঙ্গে তর্কে কে পারবে! আমার অত সময় নেই বকবক করবার।'

সুরপতি যে ঘরে বসেছিলেন আস্তে আস্তে সেই ঘরে এসে ঢুকলেন অরুন্ধতী। সুরপতির দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তুমি না কি যাবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছ?'

সুরপতি অরুন্ধতীর দিকে তাকালেন, সংক্ষেপে বললেন, 'হ্যাঁ, একটু তাড়া আছে। দেখা সাক্ষাৎ তো হয়েই গেল, আবার কি।'

না, আর কিছু বাকি নেই, আর কোন ভয় নেই সুরপতির। অরুন্ধতী আজ পঞ্চাশ উৎরে গেছেন। অভাব অনটনের মধ্যেও তাঁর রূপ অবশ্য এখনো আছে। কিন্তু সে রূপ কোন পুরুষের বুকে আর জ্বালা ধরায় না। সুরপতির নিজের বয়সও পঞ্চাশের কাছাকাছি। এসব ব্যাপার নিয়ে জ্বলবার বয়স তাঁরও আর নেই। এসব ব্যাপারে অবশ্য শুধু বয়সটাই বড় কথা নয়। অনেকে এ বয়সেও অনেক কিছু করে। কোন কোন সমবয়সী বন্ধুর কীর্তি কাহিনীর কথা সুরপতির এখনো কানে আসে। প্রবৃত্তি আর প্রবণতাই সব চেয়ে বড় কথা। সেই প্রবৃত্তি আর সুরপতির নেই। অথচ একদিন এই নারীটির জন্য সুরপতি কী চঞ্চলই না হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সে চাঞ্চল্য তেমন করে প্রকাশ করবার সাহস সুরপতির ছিল না। অরুন্ধতী তখন স্বামী-সন্তান-সম্পদে সৌভাগ্যবতী। তাঁর আকাঙ্ক্ষায় কোথাও কোন অপূর্ণতা নেই। আর সুরপতির তখন সবই অপূর্ণ। অরুন্ধতীর বাড়ীতে তিনি তখন সামান্য একজন গৃহশিক্ষক। দরিদ্র বেকার যুবক। চাঁদের সঙ্গে উদ্বাহু বামনের যে দূরত্ব তার চেয়েও বেশি দূরত্ব অরুন্ধতী আর সুরপতির মধ্যে। অরুন্ধতীকে একটু দেখবার জন্যে, কোন না কোন ছলে তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্যে, উন্মুখ হয়ে থাকতেন সুরপতি। একটু পায়ের শব্দ, হাসির শব্দ, চুলের গন্ধের জন্যে অপেক্ষা করতেন। কী কাতরতা, কী দারিদ্র, কী কাঙালপনার মধ্যেই কেটেছে সে দিনগুলি। অরুন্ধতী কি কিছুই টের পেতেন না? নিশ্চয়ই পেতেন। সুরপতির চোখে মুখে সেই গোপন বাসনার বিচ্ছুরণ তো লক্ষ্য না করবার মত বস্তু নয়। অরুন্ধতী সবই বুঝতেন, সবই টের পেতেন, কিন্তু ভয় পেতেন না, ভয় করতেন না। না নিজেকে, না সুরপতিকে। তিনি সুরপতির সঙ্গে প্রচুর হাসি-পরিহাস, ঠাট্টা-তামাসা করতেন। বাজার থেকে নানারকম জিনিসপত্র সুরপতিকে দিয়ে আনিয়ে নিতেন। তার বদলে আদর যত্ন খুবই পেতেন সুরপতি। কিন্তু তার বেশি কিছু পেতেন না। মাঝে মাঝে সুরপতির মনে হোতো যা তিনি চান তা কেড়ে নেবেন। সে বস্তু কোন মেয়ের কাছ থেকে ভিক্ষা করলে পাওয়া যায় না, কিন্তু জোর ক'রে কেড়ে নিলে হয়তো কিছুটা পাওয়া যায়। নেপথ্যে সেই জোর জবরদস্তির যত মহড়াই চলুক, অরুন্ধতীর সামনে কোন-

রকম অশোভন আচরণই করতে পারতেন না সুরপতি। নিজের এই নিষ্ক্রিয় কাপুরুষতার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতেন। মাঝে মাঝে জোর করে দুঃসাহস প্রকাশের চেষ্টা করতেন। অরুন্ধতী সে সব দেখে হেসে বলতেন, 'সুরো ঠাকুরপো, তোমার মাথায় ছিট আছে। বিয়ে না করলে এ ছিট যাবে না।'

একথা শুনে সুরপতির রাগ হোত্তো, অভিমান হতো। তাঁর এই অগাধ প্রেমকে, দুর্নিবার আকর্ষণকে অরুন্ধতী বলছেন ছিট, বলছেন অবিবাহিত যুবকের মানসিক বিকৃতি। সুরপতি একদিন বলতে পেরেছিলেন, 'আমার এই ছিট যাবে না, একটা কেন হাজারটা বিয়ে করলেওনা।'

অরুন্ধতী পিঠে হাত বুলাবার ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'যাবে যাবে। সময়ে সব সারবে।'

অরুন্ধতীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে। বয়স আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বুদ্ধি বেড়েছে, বাস্তববোধ বেড়েছে সুরপতির। হৃদয় অনেক শক্ত হয়ে গেছে। এত শক্ত যে তাতে আর কোন আঁচড় পড়ে না, সে হৃদয়ের আর ভাঙবার মচকাবার আশঙ্কা নেই। তা ছাড়া লক্ষ্য সরে গেছে, মূল্যবোধ বদলে গেছে। সুরপতির সাধনা আরাধনার বস্তু এখন আর কামিনী নয়, কাঞ্চন। তার রহস্য সুরপতির কাছে নারী হৃদয়ের চেয়েও নিগূঢ়, গ্রন্থি জটিল।

দিন বদলায়, সম্পর্ক বদলায়। তাঁর আর অরুন্ধতীর সম্পর্কেরও আজ পরিবর্তন ঘটেছে। আজ সুরপতি দাতা, অরুন্ধতী প্রার্থিনী! তাঁর কাছে অরুন্ধতীকে হাত পাততে হয়েছে। অবশ্য সুরপতি যা চেয়েছিলেন অরুন্ধতী তা চান না। তবু কিছু তো চান। কিন্তু চাইলেই কি মেলে? হাত পাতলেই কি আর দু হাতের আঁজলা পূর্ণ হয়? হিসেব করে করে অনেক কষ্টে কারবারকে দাঁড় করাতে হয়েছে সুরপতির। বে হিসেবী তিনি কিছু আর করতে পারেন না, দিতে পারেন না। চাইলেও পারেন না। হিসেবের বাইরে যাওয়ার শক্তি তাঁর আর নেই। অরুন্ধতী যা দিয়েছিলেন, তাই পাবেন। তার বেশি সুরপতি তাঁকে দেবেন না। কিছুতেই না। জগৎটাই বিনিময়ের। দান করলে তার প্রতিদান মেলে। কিন্তু কী দিয়েছিলেন অরুন্ধতী? কিছু না, একেবারে শূন্য। সেই শূন্যের বিনিময়ে সুরপতি অরুন্ধতীর ছেলেকে তবু পঞ্চাশ টাকার চাকরি দিয়েছেন। যথেষ্ট দিয়েছেন। আর কী চান অরুন্ধতী, আর কী প্রত্যাশা করেন?

সুরপতিকে নিরুত্তর দেখে অরুন্ধতী বললেন, 'ব্যাপার কী, মনে মনে ব্যবসার হিসেব করছ না কী? আমার কথার জবাব দিচ্ছ না যে।'

সুরপতি বললেন, 'জবাব তো দিলাম। দেখাসাক্ষাৎ হয়ে গেল, এবার চলি। কাজকর্ম আছে।'

সুরপতি একটু হাসতে চেষ্টা করলেন।

অরুন্ধতী বললেন, 'জানি তুমি আজকাল দারুণ কর্মবীর হয়ে উঠেছ।'

স্বরপতি বললেন, 'তা যদি বলেন, বীরাঙ্গনা আপনিই বা কম কিসে ?'

অরুন্ধতী মৃদুস্বরে বললেন 'আস্তে। ওরা শুনতে পাবে।'

আর হঠাৎ অরুন্ধতীর এই সতর্কতা, এই নিচু গলায় কথা বলবার ভঙ্গি, এই একান্ত ঘনিষ্ঠ সুর ভারি ভালো লাগল স্বরপতির। মনে হলো তখন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চেষ্টা করেও যা পাননি আজ এই মুহূর্তে তাই পেলেন। এই একটিমাত্র কথায় স্বরপতির চোখে অরুন্ধতীর রূপ যেন বদলে গেল। অরুন্ধতী যেন আর পঞ্চাশ বছরের বিধবা প্রৌঢ়া নয়, পঁচিশ বছরের পূর্ণ বিকশিতা সেই রহস্যময়ী নারী।

অরুন্ধতীর কথার জবাবে স্বরপতি বললেন, 'শুনলই বা। আমি তো আর মিথ্যে বলিনি।

অরুন্ধতী হেসে বললেন, 'সব সত্যি কথাই বুঝি গলা ছেড়ে বলতে হয় ? বেশ, তুমি কাজের মানুষ, তোমার দরকার থাকে তুমি যেতে পার। সেদিন তো আর নেই। আমার এখানে চা খেতে বলব তোমাকে কোন্ সাহসে ? আমাদের বাড়ির সস্তা চা তোমার মুখে রুচবেই বা কেন ? কিন্তু সুজাতাকে আমি যেতে দেব না। আমার যতক্ষণ ইচ্ছা, যতক্ষণ খুসি ওকে ধরে রাখব। তোমার ওপর আমার দাবী না থাকতে পারে, কিন্তু ওর ওপর আছে।'

স্বরপতি অদ্ভুত একটু হাসলেন, 'তাই নাকি ? কিসের দাবি শুনি ?'

স্বরপতির বিদ্রূপের ভঙ্গিতে অরুন্ধতী প্রথমে একটু অপ্রতিভ হলেন, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তভাবে বললেন, 'শুনলেই কি আর তুমি বুঝতে পারবে ? এ তো তোমার ব্যাঙ্কের হিসেবের খাতা নয়, এ একেবারে বে-হিসেবের জিনিস। আমার উমা, নীলার ওপর আমার যে দাবি সুজাতার ওপর তার চেয়ে কম নয়। আমি ও ঘরে যাই, ছেলে মেয়েদের খেতে দিই গিয়ে, তোমার ইচ্ছা হয় তুমি যাও, সাধ্য থাকে আমার দাবি অপ্রমাণ কর।'

অরুন্ধতী মুখ ফিরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

উঠি উঠি ক'রে স্বরপতি উঠতে পারলেন না, ডাকি ডাকি ক'রেও ডাকতে পারলেন না কাউকে।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে অরুন্ধতীর ঘরেই তাঁর ডাক পড়ল।

উমা এসে বলল, 'মার কাণ্ডই আলাদা। আপনাকে একা একা বসিয়ে রেখে চলে গেছেন। চলুন, ও ঘরে চলুন।'

স্বরপতি তার দিকে তাকালেন। দেখতে প্রায় মার মতই হয়েছে উমা। অরুন্ধতীর মতই তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর, কালো বড় বড় চোখ, পরিপূর্ণ সুডৌল মুখ। কিন্তু এই বয়সেই বৈধব্যের এমন শুভ্র শূন্য যোগিনী বেশ ধরতে হয় নি অরুন্ধতীকে। তখনো হরবিলাসবাবু বেঁচে ছিলেন। জজকোর্টে প্র্যাকটিস ক'রে প্রচুর রোজগার করেছিলেন। সিঁদুরে, সোনায় সোহাগে এ বয়সে ভোগের পূর্ণ প্রতিমা ছিলেন অরুন্ধতী।

অকালে সর্বস্বান্ত-হয়ে-যাওয়া এই মেয়েটির ওপর কেমন একটু মমতার ছোঁয়া লাগল স্বরপতির মনে। স্নেহকোমল স্বরে বললেন, চল মা, চল।'

ঘরে জায়গা যে নিতান্ত কম তা নয়। কিন্তু বিছানা বাক্স তোরঙ্গে তার অনেকখানি জুড়ে রয়েছে। পাশাপাশি তিন চার খানা ঠাঁই করা সেখানে কষ্ট। ঘরের সামনে যে সরু এক ফালি বারান্দা আছে সেখানেই ঠাঁই করলেন অরুন্ধতী।

স্বরপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ছেলেমেয়েদের আমি বারান্দা উঠানে চাটাই আর খবরের কাগজ পেতে অসংকোচে খেতে দিতে পারি। কিন্তু তোমাকে—।'

স্বরপতি বললেন, 'জানি আপনার যত সংকোচ শুধু আমার বেলায়।'

অনেক দিনের পুরোনো, অরুন্ধতীর নিজের হাতে বোনা ফুলতোলা বড় একখানা আসন পাতা হয়েছে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে দিয়ে অরুন্ধতী বললেন, 'বোসো ওখানে। ছেলে মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে বসেই খাও, সেই ভালো।'

স্বরপতির মনে পড়ল অরুন্ধতীদের রংপুরের বাড়িতে এইরকম সারি সারি ঠাঁই পড়ত। তখন দলপতি ছিলেন অরুন্ধতীর স্বামী হরবিলাস চন্দ, বাড়ির কর্তা। একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে খাওয়াটা ছিল তাঁর বিলাস।

তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, 'আহা স্বরপতিকে না হয় ঘরের কোন কানাচে বসিয়ে দাও। এমন প্রকাশ্যভাবে বামুনের ছেলের জাত মারা কি ভালো।'

অরুন্ধতী বলতেন, 'ইস, ভারিতো বামুন। কত জনের হাতে কত অখাদ্য যে যে খেয়েছে তার ঠিক আছে নাকি। তুমি ভেব না, যাওয়ার মত জাত স্বরপতি ঠাকুরপোর আর এক ফোঁটাও নেই। যেটুকু আছে, সেটুকুও ও বিলিয়ে দিতে পারলেই বাঁচে।'

কে জানে অরুন্ধতীর সেদিনের কথায় কোন খোঁচা ছিল কিনা, কোন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল কিনা। স্বরপতি লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। বহু চেষ্টা করেও অরুন্ধতীর কথার যোগ্য জবাব দিতে পারেন নি।

আজও নিরুত্তরে তিনি অরুন্ধতীর দেওয়া বড় আসনখানায় গিয়ে বসলেন। তাঁর পাশে বসেছে অসিত। অসিতের পাশে বসেছে সুজাতা আর নীলা। উমাকে কিছুতেই বসানো যায় নি। সে বিধবার আচার মেনে চলে। যখন তখন খায় না। মার সঙ্গে সঙ্গে সেও পরিবেশন সুরু করেছে। লুচি, ডাল, তরকারী, মাছের কালিয়া। সবই অরুন্ধতীর নিজের হাতের রান্না।

স্বরপতি খেতে খেতে বললেন, 'এতসব আয়োজন করেছেন কেন। এর কী দরকার ছিল।'

অরুন্ধতী বললেন, 'আয়োজন আর কই। গরীব মানুষ, তোমাকে আয়োজন করে খাওয়াবার সাধ্য আছে নাকি আমাদের। তোমরা বড় লোক। কত কী খাও।'

স্বরপতি বললেন, 'তা ঠিক। আমরা বড় লোক। বড় বড় জন্তু ছাড়া কিছু

থাইনে। কোন দিন হাতি, কোন দিন ঘোড়া, কী বল বুলু। আর অসিতরা বোধহয় চীনাদের খাদ্য খায়। ছুঁচো চামচিকে তেলাপোকা 'সব ছোট ছোট প্রাণী।'

সুরপতির এই রসিকতায় সকলেই মুখ টিপে হাসতে লাগল।

কিন্তু হাসল না নীলা। সে খেতে খেতে গম্ভীর মুখে বলল, 'হাতি চামচিকের তফাৎটা সব সময় শুধু কি চোখে দেখা যায় ?'

সুরপতি ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বললে ?'

অরুন্ধতী বললেন, 'ওর কথায় কান দিয়ো না, ওর কথার কোন মাথা মুণ্ডু নেই। ও আমার এক ঠোঁট-কাটা ঝগড়াটে মেয়ে, সকলের সঙ্গে ওর শুধু ঝগড়ার সম্পর্ক।'

সুরপতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই-বোনেদের সঙ্গেও তাই না কি ?'

অরুন্ধতী বললেন, 'তাছাড়া কি, দাদার সঙ্গে তেমন পেরে না উঠলেও দিদির সঙ্গে তো ওর খিটিমিটি লেগেই আছে।'

নীলা মার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে ফের খাওয়ায় মন দিল।

সুজাতা অরুন্ধতীর দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'আপনি নীলাদির নিন্দে করবেন না। ওঁর মত চমৎকার মেয়ে আর নেই।'

খাওয়া শেষ হওয়ার পর আরো আধ ঘণ্টা ধরে গল্প গুজব চলল। অরুন্ধতী অতীতের বহু ছোটখাট কাহিনী বললেন। সুরপতি যখন প্রাইভেট টিউটর ছিলেন তখন তাঁর অন্যমনস্কতা, কাজকর্মে অপটুতা, সাধারণ জ্ঞানের অভাব নিয়ে অনেক কৌতুকের গল্প করলেন। সে সব কাহিনীর মধ্যে বেশির ভাগই অতিরঞ্জন। কিন্তু সেদিকে অরুন্ধতীর ভ্রূক্ষেপ নেই। সকলের মনোরঞ্জনই তাঁর উদ্দেশ্য।

সুরপতি মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করতে লাগলেন। বললেন, 'তোমরা ওঁর কথা মোটেই বিশ্বাস কোরো না। উনি সব বানিয়ে বলছেন।'

অরুন্ধতী বললেন, 'এক বিন্দুও বানানো নয়। তোমাদের সত্যি বলছি এক হাতে ক্ষুদে ছাত্রছাত্রীকে শাসন করতে হোত, আর এক হাতে স্বয়ং মাস্টারমশাইকে।'

সুরপতি অরুন্ধতীর দিকে তাকালেন। ওঁর কথার মধ্যে কোন কি অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ আছে। কিন্তু অরুন্ধতীর সঙ্গে চোখা-চোখি হোলো না। তাঁর চোখ তখন অসিত সুজাতাদের দিকে। তাঁর মুখে বাৎসল্যের স্নিগ্ধ হাসি।

হঠাৎ সুরপতি চমকে উঠলেন। অসিত আর সুজাতা পাশাপাশি বসেছে। বসবার ভঙ্গিতে মনে হয় দুজনের মধ্যে যেন অনেকদিনের আলাপ, বহুদিনের ঘনিষ্ঠতা। দীর্ঘকালের অপরিচয়ের ব্যবধান, সামাজিক আর্থিক অবস্থাগত ব্যবধান ওরা যেন অল্প সময়ের মধ্যে বড় অনায়াসে পার হয়ে এসেছে। ওরা যে একজন আর একজনকে খুব পছন্দ করেছে তা ওদের তাকাবার ভঙ্গিতে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

বিষয়টাকে তেমন প্রসন্নভাবে নিতে পারলেন না সুরপতি। তাঁর মুখ গম্ভীর আর কঠিন হয়ে উঠল। না, এ বড় অসঙ্গত, অসমীচীন, অশোভন।

সুরপতি বললেন 'চল সুজাতা, এবার ওঠা যাক। তোমাদের পাল্লায় পড়ে আমার কাজকর্ম সব মাটি হোলো। চল, এবার যাওয়া যাক।'

সকলেই সুরপতির হঠাৎ এই ভাবান্তরে বিস্মিত হোলো। এতক্ষণ তো তিনি বেশ খোশ মেজাজেই ছিলেন। সকলের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসায় যোগ দিয়েছিলেন। হঠাৎ কী হলো তাঁর। হয়ত সেই অসমাপ্ত দরকারী কাজের কথাটা তাঁর এতক্ষণে ফের মনে পড়েছে।

অরুন্ধতী অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'সত্যি, তুমি এসে অবধিই তো জরুরী কাজের কথা বলছ। বাজে গল্পে মিছামিছি তোমাকে আটকে রেখে না জানি কত ক্ষতিই করলাম।'

অরুন্ধতীর কথায় আন্তরিকতা ছিল। সুরপতিকে তা স্পর্শ করল। তিনি বললেন, 'না না, তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। আপনি সেজন্যে ভাববেন না। তা ছাড়া লাভ ক্ষতি দুই নিয়েই আমাদের কারবার। লোকসান হয়, আবার পুষিয়েও নিতে হয়। কারবারীকে কিছুতেই ভয় করলে চলে না।'

ড্রাইভারকে আগেই খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। খাওয়ার পর তার একটু ঝিমুনি এসেছিল। মনিবের ধমকে তন্দ্রা ছুটল। মেয়েকে নিয়ে সুরপতি গাড়িতে উঠলেন।

এগিয়ে দেওয়ার জন্যে অসিত, উমা, নীলা সবাই এসে দাঁড়াল। অরুন্ধতী এলেন পিছনে পিছনে। সুজাতার দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'আর একদিন এসো। বাড়ি তো চেনাই রইল। যখন খুসি চলে আসবে।'

সুজাতা বলল, 'তা আসব। কিন্তু আপনি উমাদি নীলাদিদের নিয়ে একদিন যাবেন। আপনি না গেলে কিন্তু আর একদিনও আসব না।'

অরুন্ধতী বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা যাব। আমার কি আর বেরোবার জো আছে।'

সুজাতা বলল, 'নিশ্চয়ই আছে। আমি দিন ঠিক করে গাড়ি পাঠাব, আপনাদের যেতেই হবে। না গেলে কিন্তু আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

অরুন্ধতী বললেন, 'আচ্ছা মেয়ে। এত সহজেই বুঝি সম্পর্ক তুলে দেওয়া যায়। কত ঝড় যায়, ঝাপটা যায়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তবু টিঁকে থাকে, টিঁকিয়ে রাখতে হয়।'

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। সরু গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়ে বেগে চলতে লাগল গাড়ি। শহরতলী পার হয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত শহরে এসে পৌঁছল সুজাতারা। কিন্তু একেবারে নিজেদের বাড়ির সামনে না এসে পড়া পর্যন্ত সে কিছু টেরই পেল না। মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে তার চোখ পড়লেও তার সমস্ত মন পড়ে ছিল অসিতদের বাড়িতে তাদের পরিবারটির সঙ্গে। হাসি গল্পে,

আলাপে আলোচনায় ভারি চমৎকার একটি বিকেল আর সন্ধ্যা আজ কাটল সুজাতার। এমন একটি পারিবারিক স্বাদ সে যেন জীবনে আর কোন দিন পায় নি। বাবার কোন ধনী বন্ধুর বাড়িতে নয়, নিজেদের দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়িতে নয়। আজ যা পেল তা যেন সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত। এতদিন ছিল নিঃসঙ্গ দ্বীপের যেন এক বন্দিনী মেয়ে। আজ ছাড়া পেয়েছে। আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু শুধু কি পেয়েই এল, নিয়েই এল সুজাতা? কিছু কি দিয়ে আসতে পারে নি? না দিতে পারলে কি-নেওয়া সম্পূর্ণ হয়, নিয়ে আনন্দ হয় এত?

মাসখানেক পরে একদিন জেনারেল ম্যানেজার অবনীমোহনের ঘরে ডাক পড়ল অসিতের। বিল ডিপার্টমেণ্টের কয়েকজন সহকর্মী তার মুখের দিকে তাকাল।

সুধীর বলল, 'কী ব্যাপার, ভুল চুক কিছু করেছেন নাকি অসিতবাবু?'

প্রশান্ত বলল, 'না না, এ নির্ঘাত ট্রান্স্ফারের ব্যাপার। দেখুন গিয়ে একবার কোথায় ঠেলে দেয়। বোম্বে, না মাদ্রাজ।'

ইনচার্জ প্রৌঢ় মণিময়বাবু বললেন, 'এখানে বসে আর গবেষণা ক'রে দরকার নেই আপনাদের। মিঃ চ্যাটার্জী যখন ডেকে পাঠিয়েছেন তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াই ভালো।'

অসিত কোন কথা না বলে কলমটা রেখে জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘরখানির আকার অনেকটা ত্রিভুজের মত। সুন্দর সুপরিচ্ছন্ন। পূর্বে আর উত্তরে দু'টি ক'রে বড় বড় জানালা। মাঝখানে সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের ওপর দামী দোয়াতদানী, রঙীন কাগজ-চাপা, টেবিল ক্যালেণ্ডার। প্রত্যেকটি আসবাবে রুচি আর আভিজাত্যের ছাপ।

অবনী ছাড়া আর কোন লোক ছিল না। অসিতের সঙ্গে নির্জনে কথা বলবার জন্যই অবনী হয়ত এই অবস্থা ক'রে রেখেছিল। সে ঘরে ঢুকতেই সামনের গদি আঁটা চেয়ারগুলির একটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে অবনী স্মিতমুখে বলল, 'বসুন।'

অসিত একটা চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অবনীর দিকে তাকাল।

অবনী বলল, 'কেমন লাগছে ব্যাঙ্কের কাজ-কর্ম? খুব ভাল, খুব বোরিং মনে হচ্ছে না তো।'

অসিত বলল, 'না না, তা কেন। ভালই লাগছে।'

অবনী হেসে বলল, 'ভালো লাগবে। ওপর থেকে বিষয়টাকে একটু নীরস মনে হতে পারে, কিন্তু যদি একটু ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করেন, দেখবেন এর চেহারা অন্যরকম; দেখবেন নেশান বিল্ডিং-এর কাজে এর স্থান কত বড়।'

অসিত বলল, 'তা ঠিক। আমার অবশ্য সেইভাবে কাজ করবারই ইচ্ছা। নানা জায়গায় তো ঘুরে বেড়ালাম, কোথাও কোন সুবিধে হোলো না। এবার দেখি চেষ্টা ক'রে ব্যাঙ্কিংটাকে যদি ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে পারি।'

অবনী বলল 'হাঁা, তাই নিন। আমরা সকলেই তাই চাই; আপনার কাজকর্মের কথা আমরা শুনেছি। চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই নিয়ে কথাও হয়েছে। আমাদের এই ইনস্টিটিউসনে যোগ্য লোককে যোগ্য স্থান দেওয়া হয়। চেয়ারম্যানের ভাষায় শালগ্রাম দিয়ে যাতে বাটনা বাটা না হয় তার দিকে আমরা লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করি।'

অবনী একটু হাসল।

অসিত অবনীর দিকে তাকিয়ে তার আসল বক্তব্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

অবনী বলল, 'শুনুন। আপনাকে একটা ফার্স্ট ক্লাস ব্রাঞ্চের ম্যানেজার করেই আমাদের পাঠাবার ইচ্ছা। কিন্তু এখন তেমন কোন পোস্ট খালিও নেই, তাছাড়া আপনার আরো কিছু অভিজ্ঞতা বাড়াবারও দরকার আছে। আপাততঃ আপনি সেণ্ট্রাল এস্টাব্লিস্মেণ্টে আসুন। আমাদের যে সব ব্রাঞ্চ আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজটা দেখুন আপনি।'

অসিত বলল, 'আমার আপত্তি নেই। আপনারা যেখানে কাজ করতে বলবেন সেখানেই করব।'

অবনী বলল, 'শুনে খুসি হলাম। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিনে।'

অসিত বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন?'

অবনী বলল, 'আজকালকার কোন employeeর মুখে বেশি আনুগত্যের কথা শুনলে ভয় হয়। যা দিনকাল।' কিন্তু পরক্ষণে নিজেই হেসে উড়িয়ে দিল কথাটা। 'কিছু মনে করবেন না, আমি ঠাট্টা করছিলাম। এর মধ্যে আনুগত্যের কোন কথাই উঠতে পারে না। আমরা পরস্পরের কলীগ, এক সঙ্গে কাজ করতে এসেছি। আমাদের দুজনের আনুগত্যই ইনস্টিটিউসনের কাছে। কী বলুন, তাই না?'

অসিত ঘাড় নেড়ে অবনীর কথায় সায় দিল।

তারপর কয়েক মিনিট ধরে নতুন কাজের ধরণটা অসিতকে বুঝিয়ে দিল অবনী। বিভিন্ন ব্রাঞ্চেও কাজকর্ম কী ভাবে চলছে, তাদের ম্যানেজার এ্যাকাউণ্টাণ্টের স্টেটমেণ্টগুলি পরীক্ষা করা, তাদের কাছে চিঠিপত্র লেখা, চিঠির জবাব দেওয়া, প্রধানত এ ধরণের কাজগুলিই অসিতকে দেখতে হবে। কাজের যা ধরণ তাতে অবনীর সঙ্গেই তার প্রত্যক্ষ যোগ থাকবে, তার কাছেই দায়ী থাকতে হবে অসিতকে। মাঝখানে আর কোন বড় অফিসার থাকবে না।

অসিত বলল, 'মানে আপনার personal assistant.'

অবনী হেসে বলল, 'অফিসের ভাষায় বলতে গেলে ওই রকম একটা নামই দিতে হয় বটে। কিন্তু আসলে আপনার বন্ধুত্বই আমার কাম্য। আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়ের সুযোগ যাতে আরো বাড়ে সেইজন্যেই এ ব্যবস্থা করেছি।' বলে অবনী একটু হাসল 'আশা করি, আপনার কোন আপত্তি নেই?'

একটু যেন পরিহাসের সুর অবনীর গলায়।

অসিত বলল, 'না না, আপত্তির কী আছে। এ তো আমার সৌভাগ্য।'

এবার মনে হোলো অসিত খোঁচাটা ফিরিয়ে দিয়েছে।

কথা শেষ ক'রে অসিত চলে যাচ্ছিল, অবনী বাধা দিয়ে বলল, 'চিঠিটা আপনি এখান থেকেই নিয়ে যান, পরে পিওন বুকে সই করে পাটালেই হবে।'

টাইপ করা একটি চিঠি অসিতের হাতে দিল অবনী। চাকরির স্থায়িত্বের এবং বেতন বৃদ্ধির সংবাদ আছে চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরিত এই চিঠিতে। অসিতকে একশ টাকা মাইনে ও কুড়ি টাকা ভাতা দিতে পেরে কর্তৃপক্ষ খুসি হয়েছেন।

কিন্তু অসিতকে তেমন খুসি দেখাল না। মাত্র একশ কুড়ি! জেনারেল ম্যানেজার যেখানে বারশো পান সেখানে মাত্র একশ কুড়ি টাকায় অসিতকে তাঁর সহকারিতা করতে হবে! কিন্তু পরক্ষণে নিজেরই হাসি পেল অসিতের। কার সঙ্গে কিসের তুলনা করছে সে। অবনীমোহন ব্যাঙ্কিং-এর ডিগ্রী পাওয়া বিলাত-ফেরৎ মানুষ। আর সে সন্ত-নিযুক্ত একজন সাধারণ কেরানী। তুলনার কথা তো উঠতেই পারে না। বরং ক'মাস যেতে না যেতে তার এই আকস্মিক পদোন্নতি আর বেতনবৃদ্ধি সম্পূর্ণ অভাবিত ব্যাপার। নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের কাছে এজন্য তার বরং কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

অসিতের মুখের দিকে তাকিয়ে অবনী তার মনের ভাবটা কিছু আন্দাজ করে বলল, 'অবশ্য মাইনেটা আপনার যোগ্যতার তুলনায় তেমন কিছু নয়। আমি চেয়ারম্যানকে বলেওছিলাম কথাটা। কিন্তু তিনি মাথা নাড়লেন। বললেন, এর চেয়ে বেশি দেওয়ার সাধ্য ব্যাঙ্কের নেই। অবশ্য এ ধরণের সুযোগও এখানে খুব রেয়ার। বহু এম. এ. ডবল এম. এ. এখানে কাজ করছেন। দু'তিন বছরেও তাঁরা ব্যাঙ্কে আপনার স্যালারিতে উঠতে পারেন নি।'

অসিত ভাবলে জিজ্ঞাসা ক'রে তাহ'লে তার ওপরই বা হঠাৎ এমন দাক্ষিণ্য বর্ষণ কেন হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্নটা অশোভন হবে, নিজের স্বার্থের প্রতিকূল হবে ভেবে চুপ ক'রে রইল। একটু বাদে অবনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছে, হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। ইঙ্গিতে অসিতকে বসতে বলে রিসিভারটা তুলে নিল অবনী। ফোনের ভিতর দিয়ে যে কণ্ঠ সে শুনতে পেল তাতে তার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। অবনী বলল, 'ভালোই হোলো সুজাতা, তুমি ফোন করলে। এই মুহূর্তে একটা সুখবর দেওয়ার জন্যে আমিই তোমাকে রিং করতে যাচ্ছিলাম।'

অসিত চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই অবনী তাকে হেসে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়ান। সুজাতা তো আপনারও খুব পরিচিত, বলতে গেলে বন্ধু। সুখবরটা আপনিই ওকে ফোনে বলে দিন।'

একটু যেন আরক্ত হয়ে উঠল অসিতের মুখ। তাহলে কি নিজের যোগ্যতা দক্ষতায় তার এত তাড়াতাড়ি মাইনে বাড়েনি। বাপের কাছে, ভাবী স্বামীর কাছে, সুজাতার

সুপারিশের ফলেই অফিসে তার এই দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। মাত্র একশ কুড়ি টাকা মাইনে পাওয়ার মত কৃতিত্ব আর কর্মক্ষমতাটুকুও কি তার নেই। অসিত অবশ্য সুজাতাকে নিজে কোন অনুরোধ করেনি। উমা নীলাকে নিয়ে অরুন্ধতী একদিন সুজাতাদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও অসিত সেদিন যায়নি, কিন্তু ছেলের অসাক্ষাতে অরুন্ধতী যে তার মাইনে বাড়াবার জন্য সুজাতার কাছে অনুরোধ করেছেন, নিজের মাকে ততখানি আত্মমর্যাদাহীন বলে ভাবতে অসিতের কষ্ট হোলো। হয়ত স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন নি অরুন্ধতী। সুজাতা সব দেখে শুনে আন্দাজ করে নিয়ে অবনীকে অনুরোধ করেছে। আর ভাবী-স্ত্রীকে খুসি করবার জন্যেই অবনী অসিতের ওপর এই সামান্য দাক্ষিণ্যের পরিচয় দিয়েছে।

অবনীর কথার জবাবে অসিত বলল, 'আপনি যদি অনুমতি দেন মিঃ চ্যাটার্জী, আমি যাই। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

অবনী একটু হেসে বলল, 'কিন্তু সুজাতার সঙ্গে কোন কথাই বলবেন না?'

অসিত একটু আরক্ত হয়ে বলল, 'না।'

অসিতের লজ্জায় কৌতুক বোধ করল অবনী, বলল, 'আচ্ছা, যান আপনি।'

অসিত চলে গেলে অবনী আবার ফোনে আলাপ শুরু করল, 'কী রকম সুখবর? অনুমান কর।'

ওপাশ থেকে সুজাতা জবাব দিল, 'আমার অনুমান করবার ক্ষমতা নেই, তুমি বল।'

অবনী বলল, 'অসিত বাবুর প্রমোশন হয়েছে। তোমার বাবা তাঁকে মীরাট ট্রানস্ফার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি রাজী হইনি।'

সুজাতা বলল, 'কেন?'

অবনী হেসে বলল, 'তাঁর মেয়ের কথা ভেবে।'

সুজাতা বলল, 'তুমি বড় যা তা বলছ। তোমাদের অফিসের কে কোথায় ট্রানস্ফারড হোলো না হোলো তাতে আমার কি এসে যায়।'

অবনী বলল, 'যায় না বুঝি। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ লোকদের বেশ এসে যায়। আমরা ভেবে দেখলাম অসিতবাবুর মত লোককে অফিসে ধরে রাখতে পারলেই আমাদের লাভ বেশি।'

সুজাতা বলল, 'তোমারা ব্যাঙ্ক চালাচ্ছ বড় বড় পোস্টে কাজ করছ, লাভ লোকসানের কথা তোমরা বুঝবে। ও সব কথা আমাকে শুনিয়ে কী হবে। আমি যা বলছি শোন। আজ সিনেমায় যেতে পারব না। টিকিট কাটার দরকার নাই। কথাটা জানাবার জন্যেই তোমাকে ফোন করেছি।'

অবনী বলল, 'সে কি কথা। টিকিট যে অনেকক্ষণ আগেই কেটে রেখেছি।'

'কিন্তু আমার যে ভয়ানক মাথা ধরেছে', সুজাতা বলল, 'টিকিট দুটো আর কাউকে দিয়ে দিও। টাকাটা না হয় দণ্ড হিসাবে আমিই দেব তোমাকে।'

অবনী কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'তা দিয়ো। দণ্ডই বলো, পুরস্কারই বলো, তুমি যা দাও তাই হাত পেতে নেব। কিন্তু এমন একটা সুখবর পেয়েও তোমার মাথা ধরা যাচ্ছে না!'

সুজাতা এবার বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওই এক কথা ছাড়া আর যদি তোমার কিছু বলবার না থাকে আমি ফোন ছেড়ে দিচ্ছি।'

অবনী বলল, 'না, না, ছেড়ো না। রোজ তো আর সকাল সকাল ফিরতে পারিনে। ব্যাঙ্ক ছুটি হয়ে গেলেও তোমার বাবা আটকে রাখেন। ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ উন্নতির জল্পনা-কল্পনা বসে বসে শুনতে হয়। কিন্তু মন পড়ে থাকে বর্তমানের একজন বাস্তবিকার কাছে।'

এবার ফোনের ভিতর দিয়ে মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল। 'তাই নাকি? বলতে হবে তো বাবার কাছে। এমন অন্যমনস্ক জেনারেল ম্যানেজার দিয়ে তিনি ব্যাঙ্ক চালাবেন কী করে? রিপোর্ট করলে চাকরি যাবে যে।'

অবনী বলল, 'যাক চাকরি। তুমি যদি থাক, আমার সব থাকবে। তাহলে ওই কথা রইল। সাড়ে চারটের মধ্যে আমি সোজা যাব তোমাদের ওখানে, তারপরেও যদি তোমার মাথা ধরা থাকে তখন স্থান কাল পাত্রী বুঝে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।'

সুজাতা হেসে বলল, 'আচ্ছা এসো। মাথা একবার ধরলে কি তা ছাড়ে? কিন্তু তোমার বেলায় তো সে কথা বলা যায় না।'

'তবু ভালো, দেরিতে হলেও কথাটা বুঝতে পেরেছ।'

হেসে রিসিভারটা রেখে দিল অবনী।

এলাহাবাদ যাওয়ার আগে অবনী সুজাতাকে খুব গম্ভীর ও বিষণ্ণ দেখে গিয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হচ্ছে না, অথচ সুরপতি আর অবনীর আদেশ অনুরোধের চাপ পড়ায় তার মন আরো বিগড়ে যাচ্ছে। অবস্থাটা বুঝতে অবনীর বাকি ছিল না। প্রথম প্রথম অবনীও একটু বিরক্ত হয়েই উঠেছিল। কিন্তু তারপর স্থির ভাবে অবনী ভেবে দেখেছে ধৈর্য হারিয়ে লাভ নেই। সে যদি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে সুজাতা আরো বেঁকে বসবে। তার চেয়ে যে ভাবে চলছে সেই ভাবেই চলুক। যা করবার সুরপতি নিজেই করবেন। তিনি নিশ্চয়ই সুজাতাকে বেশি দেরি করতে দেবেন না। গরজ দেখানটা অবনীর সম্মানের পক্ষে হানিকর। তার চেয়ে খানিকটা নিস্পৃহতা আর ঔদাসীন্যের ভঙ্গি আনা ভালো।

ইউ. পি.-র গোটা তিনেক ব্রাঞ্চ পরিদর্শনের কাজ শেষ করে অবনী কলকাতায় ফিরে এল। কিন্তু সুজাতাদের সাদার্ণ এভিনিয়ুর বাড়িতে ফিরে গেল না। সুরপতি দু' দু' বার যেতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু অবনী কাজের অজুহাতে তা এড়িয়ে গেল। এরপর সুরপতি একদিন হেসে বললেন, 'ওহে, আমি না, বুলুই যেতে বলেছে তোমাকে। আজ রাত্রে আমাদের ওখানে খাবে। উঁহু, আজ আর কোন ওজর শুনব না।'

অবনী আর বেশি আপত্তি করতে পারেনি।

খাওয়ার সময়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে সুজাতা নিজে পরিবেশন করেছে। রান্নায় ঝাল নুনটা পরিমিত হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে সান্নিধ্যে।

অবনী খেতে খেতে মৃদু স্বরে বলেছে, 'এত গরজ কেন। নিজের হাতের রান্না বুঝি?'

সুজাতা বলেছে 'তোমার বুঝি ধারণা অন্যের হাত নিয়েই আমার যত মাথা ব্যথা?'

এই কদিনে হঠাৎ ভারি তরল, প্রগলভ হয়ে উঠেছে সুজাতা। দেখে অবনী কিছুটা বিস্মিত হোলো। কিছুদিন আগেকার সেই বিষন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে দেখে তার ভালোই লাগল। ভোজন পর্ব শেষ হওয়ার পর নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে সুজাতা অবনীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'খুব রাগ করেছিলে নাকি? একেবারে দেখাসাক্ষাৎ পর্যন্ত বন্ধ?'

অবনী বলেছিল, 'বল কি, রাগ অভিমান ও সব তো তোমাদেরই একচেটে। ওগুলি কি আমাদের মানায়?'

সুজাতা হেসে বলেছিল, 'যা বলেছ, সত্যিই মানায় না।'

হাসিটুকু কিন্তু সত্যিই সুজাতাকে সেদিন খুব মানিয়েছিল। অবনীর মনে হয়েছিল অনেকদিন এমন ক'রে ও হাসেনি, মন খুলে কথা বলেনি।

অবনী একটুকাল তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'একটা কথা বলব। তোমাকে কিন্তু আজ ভারি নতুন লাগছে।'

সুজাতা একটু লজ্জিত হয়ে মুখ নামিয়ে বলেছিল, 'এই বুঝি আরম্ভ হোলো?'

অবনী বলেছিল, 'আরম্ভ তো আজ হয়নি, মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে। তাই ফের গোড়া থেকে শুরু করতে হয়।'

এরপর দুজনেই খানিক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল সুজাতা, 'চল এবার ও ঘরে। বাবা অনেকক্ষণ একা বসে আছেন।'

অবনী হেসে বলেছিল 'তিনি মাঝে মাঝে একা থাকতেই ভালবাসেন। তারপর, তোমার খবর কী বলো। তুমিও কি দিনগুলি একা একাই ঘরে বসে কাটিয়ে দিলে?'

সুজাতা বলেছিল, 'তা কেন? আমি আর বাবাও সেদিন বেরিয়ে এলাম।'

'কতদূরে গিয়েছিলে?'

'বেশি দূরে নয়, এই বেলেঘাটা পর্যন্ত। সব সময় দূরের বেড়ানটাই বুঝি বেড়ানো।'

অবনী বলেছিল, 'তা কেন, ধারে-কাছেও বেড়াবার অনেক জায়গা আছে। কোথায় গিয়েছিলে বল, ভ্রমণ-কাহিনীটি শুনি।'

কাহিনীটা সবিস্তারেই বলেছিল সুজাতা। অসিতের বেলেঘাটার অবস্থা, তার দারিদ্র্য, অরুন্ধতীর স্নেহ, উমা আর নীলা দুই বোনের স্বভাবের বৈপরিত্য, খুঁটে খুঁটে সবই অবনীকে জানিয়েছিল। তারপর হঠাৎ বলে উঠেছিল 'যাই বলো অসিতবাবুর মত

একজন qualified ভদ্রলোক তোমাদের ব্যাঙ্কে মাত্র পঞ্চাশ টাকার মাইনেয় পড়ে আছেন এটা শুধু তাঁর পক্ষেই নয় তোমাদের পক্ষেও লজ্জার কথা।'

ঈর্ষার স্ূঁচ যে একটু বেঁধেনি একথা অবনী অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই সামান্য যন্ত্রণাবোধকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হেসে বলেছিল, 'তাই নাকি? তা নালিশটা তোমার বাবাকে জানালেই তো হয়।'

সুজাতা বলেছিল, 'সব নালিশই যদি তাঁকে জানাতে যাব তবে এত বড় জেনারেল ম্যানেজারটি রয়েছেন কিসের জন্যে ?'

অবনী বলেছিল, 'আচ্ছা, কথাটা মনে রইল।'

কিছুদিন বাদে প্রস্তাবটা সুরপতির কাছে অবনীই করেছিল। অসিতবাবুকে এবার একটা চান্স দিলে হয়। অবনী খোঁজ নিয়ে জেনেছে সব ডিপার্টমেণ্টের কাজই তিনি মোটামুটি শিখে নিয়েছেন। ওর সম্বন্ধে যে রিপোর্ট গেছে তা সন্তোষজনক বলা যায়।

সুরপতি অবনীর মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'বেশ তো, মীরাট ব্রাঞ্চে একজন এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট দরকার। যে ছিল সে নাকি কাজ ছেড়ে দিয়েছে, তুমিই তো সেদিন বলছিলে। অসিতকে সেখানে পাঠাতে পার।'

অবনী বলেছিল, 'না, ওখানে অন্যলোক দেব ঠিক করেছি।'

যে যুবকটির ওপর সুজাতার সহানুভূতি জন্মেছে তাকে দূরে চোখের আড়ালে পাঠাতে চায় না অবনী। বরং তাকে কাছে রাখবে। পরীক্ষা করে দেখবে কতখানি তার যোগ্যতা, কতখানি শক্তি। তারপর কোনদিন দ্বৈরথ যুদ্ধে যদি নামতেই হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীকে সব রকম সুযোগ সুবিধা দিয়েই নামবে। নিঃসম্বল ক্ষীণবল দীনাতিদীন এক যুবকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আনন্দ নেই। অবনী মনে মনে হাসল।

খাস বেয়ারা নীলরতন এসে সেলাম জানিয়ে দাঁড়াল। বড়বাজারের লৌহ ব্যবসায়ী জগবন্ধু দাস কার্ড পাঠিয়েছেন।

দাস মশাই ব্যাঙ্কের সম্ভ্রান্ত পার্টি। কারেণ্টে, ফিক্স্‌ড্‌ ডিপজিটে মোটা টাকা রেখেছেন।

অবনী বলল, 'আসতে বলো তাঁকে।'

ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগের ভাবনা ছেড়ে ফের বিষয় কর্মে ফিরে আসতে পেরে কাজের মানুষ অবনীমোহন খুশি হয়ে উঠল।

পরদিন থেকে গদি আঁটা চেয়ার ড্রয়ারওয়ালা বড় একখানা টেবিলের একক অধিপতি হোল অসিত। সারা অফিসের অনেকগুলি ঈর্ষাকাতর চোখ তাকে বার বার বিদ্ধ করতে লাগল। অফিসের নানা ডিপার্টমেণ্টে, স্টোররুমে, ছাদের ওপরে টিফিন খাওয়ার ঘরে তার এই আকস্মিক পদোন্নতি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলল। এতদিন যারা অসিতের বন্ধু ছিল, তারা যেন হঠাৎ বিরোধীপক্ষের লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু অল্প বয়সের অল্প

মাইনের কেরানীরাই নয়, 'এ' গ্রেডের বয়স্ক অফিসাররা পর্যন্ত অসিতের দিকে ঈর্ষা কুটিল চোখে তাকাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষের এই নতুন অনুগ্রহভাজন যুবকটি তাঁদেরও আসন দখল করে বসবে তাই বোধ হয় তাঁদের আশঙ্কা। অবশ্য মুখে সকলেই শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। চীফ এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট বিনয়বাবু, বিল, লোন, ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জরা সবাই হাসি মুখে বললেন অসিতের এই আকস্মিক সৌভাগ্যে তাঁরা সত্যিই খুব খুসি হয়েছেন।

অসিত অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'আপনারা খুসি হয়েছেন এ খুবই আনন্দের কথা, আমি নিজে কিন্তু তেমন উল্লসিত হবার কারণ দেখছিনে।'

বিনয়বাবু বললেন 'না, না, অসিতবাবু, আনন্দের কারণ আছে বইকি, তিনমাসের মধ্যে এত উন্নতি এ ব্যাঙ্কে আর কারো হয়নি।'

অসিত বলল, 'উন্নতির কী দেখলেন। চেয়ার টেবিলের একটু হাল ফিরেছে এই যা। আসলে বিশেষ কিছু বদল হয়নি।

চীফ এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট শ্রীপতি ভট্‌চায মোটা-সোটা প্রৌঢ় বয়সের ভদ্রলোক। তিনি তাঁর চেয়ার থেকে চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন অসিতের দিকে, 'হবে মশাই, হবে। ছটো দিন সবুর করুন, কেবল ওপরের রঙ চঙ না, ভিতরের শাঁস জলও হাতে পাবেন। এ জায়গায় কেবল খোসা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয় না, যে পায় সে সবই পায়। যোগ্যতা যখন আছে ভয় কি আপনার।'

শ্রীপতিবাবুর কথাটা ভারি ভালো লাগল অসিতের। তিনি অনেক দিনের পুরোন কর্মচারী। ব্যাঙ্কের একেবারে গোড়া থেকে আছেন। মাত্র চল্লিশ টাকা মাইনেয় ঢুকেছিলেন অফিসে। এখন শ চারেক টাকা পাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষের বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তি। তাঁর মুখে নিজের যোগ্যতার কথাটা শুনে অসিত খুসি হোল। সত্যি তার যা যোগ্যতা তাতে একশ কুড়ি টাকার চেয়ে বেশি মাইনে পাওয়ার অধিকার তার আছে। সেই তুলনায় দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক অনেক কমই দিচ্ছে তাকে। ব্যাঙ্কের কেরানীকুল যত ঈর্ষাকাতর হয় হোক, অড়ালে আব্‌ডালে যতই চোখ চাওয়া-চাওয়ি আর গা টেপাটেপি করুক তাতে কিছু এসে যায় না অসিতের। সে তো অন্যায় ভাবে কোন স্থযোগ নেয়নি।

ব্যাঙ্কের ছ'তলায় টিফিন রুম। টিফিনের অর্ধেক খরচ ব্যাঙ্ক বহন করে। কর্মচারীরা প্রত্যেকে ছ'টাকা দেয়। ব্যাঙ্ক বাদবাকি টাকাটা পুরণ করে। এ বদান্যতা নেহাৎ কম নয়। কারণ ছ'টাকার টিকিটে রোজ চারখানা করে লুচি মেলে। দালদায় ভাজা হলেও, আর সে লুচির আকার ফুল বাতাসার মত হলেও, এটা যে ব্যাঙ্কের বদান্যতা স্বীকার করতেই হয়। শুধু লুচি নয়, সেই সঙ্গে একখণ্ড করে মাছেরও ব্যবস্থা থাকে। এ ছাড়া মাসে ছ'দিন ডিম, ছ'দিন মাংস হয়। এসব সত্ত্বেও চুরির অভিযোগ শোনা যায়। ঠাকুর চাকর চুরি করে এবং তাদের যিনি চালান তিনিও অপবাদ থেকে মুক্ত থাকেন না। ব্যাঙ্কের এক একজন কর্মচারীর ওপর এসব ব্যবস্থার ভার পড়ে, কিন্তু ঝামেলা আর

বিরূপ আলোচনার ভয়ে এ দায়িত্ব কেউ নিতে চান না। মাস কয়েক যাবৎ লোন ডিপার্টমেণ্টের সুরেশ তালুকদারের ওপরই ভারটা রয়ে গেছে।

প্রথম মাস কয়েক অসিত এই টিফিন কার্ড করেনি। চা-টা বাইরে থেকেই খেয়ে আসত। সহকর্মী শ্যামল সরকার একদিন বলল 'ওকি করছ। ওতে খরচ যে আরো বেশি পড়ে যাবে। কার্ড করে নাও, কার্ড করে নাও।'

অসিত বলেছিল, 'কিন্তু রোজ রোজ দালদার লুচি—।'

শ্যামল জবাব দিয়েছিল, 'দালদার হোক নারকেল তেলের হোক ক্ষিদের সময় তবু তো কিছু পেটে ঢোকে। তাই বা আসে কোত্থেকে।'

অসিত হেসে বলেছিল, 'তা অবশ্য ঠিক।'

দ্বিতীয় মাস থেকে অসিত কার্ড করে নিয়েছে। কিন্তু লোকের ভিড় যখন বেশি থাকে অসিত তখন খেতে যায় না, বরং সবাই চলে আসবার পরে সে গিয়ে টিফিনরুমে ঢোকে। তখন ঘরে দু'চারজনের বেশি লোক থাকে না। ঠাকুর ব্রজবিলাস সহানুভূতি জানিয়ে বলে, 'রোজ এত দেরি করে আসেন বাবু, সব যে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।'

আজও অসিত হাতের কাজ সেরে সবাইর শেষে টিফিনরুমে ঢুকতে যাচ্ছে, হঠাৎ ভিতর থেকে নিজের নাম কানে আসায় দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকে নিয়ে দু'জন সহকর্মীর আলাপ চলছে। একজনের গলা চিনতে পারল অসিত, সেই বিষ্ণুবাবু, ব্যাঙ্কে এসে প্রথম দিন যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দ্বিতীয় লোকটির সঙ্গে অসিতের এখনো পরিচয় হয়নি। বোধ হয় অন্য কোন ব্রাঞ্চ থেকে বদলী হয়ে এসেছে।

'কি নাম বললেন বিষ্ণুবাবু, অসিত চন্দ ?'

'হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ। এ নাম আজকাল ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটি বেয়ারা থেকে অফিসারের মুখে মুখে ফিরছে আর এঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই ? কেবল দিল্লী লক্ষ্ণৌ করে বেড়াচ্ছেন ?'

'তাই তো দেখছি। তাহলে আলাপটা এবার করে নিতে হয়। কিন্তু ব্যাপার কী বলুন তো ? ভদ্রলোকের হঠাৎ এমন ভাগ্যোদয় হোল কী ক'রে ?'

ভাগ্যোদয় কি সাধে হয় প্রমোদবাবু ? সবই যোগাযোগের ব্যাপার। আমি চেয়ারম্যানের ড্রাইভারের কাছে সব শুনেছি।'

'কী শুনেছেন বলুন না।'

'না মশাই বড়ঘরের কথা, ও সব আলোচনায় আমাদের কাজ কি। এ সব জায়গায় দেওয়ালেরও কান থাকে প্রমোদবাবু।'

আহা বলুনই না ব্যাপারটা। কে আর বলতে যাচ্ছে। চেনন তো আমাকে। আমি অত মুখ পাতলা মানুষ নই। আমার কাছ থেকে কেউ কোন কথা জানতে পারবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

সহকর্মী বন্ধুর সাগ্রহ অনুরোধ এড়াতে পারলেন না বিষ্ণুবাবু, তাছাড়া মুখরোচক

বিষয়টি তাঁরও একেবারে ঠোঁটের আগায় এসে রয়েছে। গলা নামিয়ে বললেন, 'ছোকরার মার সঙ্গে নাকি আমাদের চেয়ারম্যানের আগে বেশ মাখামাখি ছিল। আবার এদিকে চেয়ারম্যানের মেয়ের নাকি নজর পড়েছে ওর ওপর। খানাপিনা পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গেছে এর মধ্যে। এক রক্ষা কবচের চোটেই অস্থির, আর একেবারে ডবল রক্ষা-কবচ। উন্নতি অসিত চন্দের হবে না, হবে কি আপনার আমার!'

'যা বলেছেন। তাহ'ল আমাদের জেন'রেল ম্যানেজারের আসন নড়ে উঠেছে বলুন।'

'তা জানিনে তবে ও ছেলে সহজ পাত্র নয়। স্ুঁচ হয়ে ঢুকছে, ফাল হয়ে বেরোবে। তা আমি প্রথম দিনই দেখে বুঝতে পেরেছি।'

শুনতে শুনতে দুই কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল অসিতের। খাওয়ার আর প্রবৃত্তি রইল না, ইচ্ছা করল না টিফিন ঘরে ঢুকতে। ফিরে গিয়ে লিফটের সামনে দাঁড়াল।

নিজের টেবিলে ফিরে এসেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাজে মন দিতে পারল না অসিত। ভিতরে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির জ্বালা বোধ করতে লাগল। ছি ছি ছি, সুরপতিবাবুর পরিবারের সঙ্গে তাদের সহজ মেলা মেশার যে এমন কদর্থ হবে তা সে ধারণা করতে পারেনি। ড্রাইভারের কি এত সাহস হয়েছে যে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এমন কুৎসা রটাবে? না কি তার কাছ থেকে পাওয়া তিলকে বিষ্ণুবাবুই তাল করে তুলেছেন। অসিত অনুমান করতে পারল এ আলোচনা শুধু বিষ্ণুবাবু আর প্রমোদবাবুর মধ্যেই আটকে থাকবে না। ব্যাঙ্কের সমস্ত ডিপার্টমেণ্টেই ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়বে। তার আড়ালে আবডালে সবাই এই নিয়ে হাসাহাসি করবে। কারো কাছে সম্মান সম্ভ্রম তার আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। এ ব্যাঙ্কের চাকরি তাকে ছেড়ে দিতেই হবে। অন্য কোথাও কাজ যোগাড় করে নেবে অসিত। এখানে থেকে সকলের কুৎসা অপবাদের লক্ষ্যস্থল হয়ে মর্যাদা হারাবে না।

টিফিন রুমের চাকর হরিপদ খাবার প্লেট হাতে সামনে এসে দাঁড়াল। অস্ফুট স্বরে ডাকল, 'বাবু।'

অসিত চমকে উঠল, 'কী?'

তারপর খাবারের প্লেট দেখে অসিতের হঠাৎ মেজাজ বিগড়ে গেল। হরিপদকে ধমকে উঠে বলল, 'এসব তোমাকে আনতে বলেছে কে?'

হরিপদ বলল, 'আজ্ঞে বাবু, ঠাকুরই বলে দিল আমাকে। কাজের চাপে বাবু ওপরে আসবার সময় পাচ্ছে না, খাবারটা তুইই দিয়ে আয়। খেয়ে নিন বাবু, জিনিস নষ্ট করে লাভ কি। ক্ষিদেও তো পেয়েছে।'

হরিপদের সহানুভূতি অসিতকে এবার স্পর্শ করল। খানিক আগের রূঢ়তার জন্যে ভারি লজ্জিত হোল অসিত। চৌদ্দ পনের বছরের ছেলে। কালো রোগাটে চেহারা, দেখলে মায়া হয়। যে বয়সে পড়াশুনো করার কথা সেই বয়সে পেটের দায়ে চাকরিতে

নেমেছে। ছিঃ, ওকে কেন ধমকাতে গেল অসিত। ওর কী দোষ। হরিপদকে ডেকে অসিত এবার স্নেহ কোমল স্বরে বলল, 'তুই খেয়ে নিয়েছিস তো ?'

হরিপদ লজ্জিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ বাবু, ঠাকুর বলল ; তা আপনার আর ওপরে যেতে হবে না বাবু, আমি রোজ এখানে আপনার খাবার দিয়ে যাব।'

অসিত ঘাড় নেড়ে বলল, 'আচ্ছা।'

খেতে খেতে মনের অবস্থা বদলে গেল অসিতের। ওসব মিথ্যা নিন্দা কুৎসায় তার বিচলিত হবার কী আছে। সে কেন পালাবে। বরং সমস্ত প্রতিকূলতা আর বিরূপতার সামনে দাঁড়াবে অসিত। সকলের কাছে প্রমাণ করবে নিজের যোগ্যতার জোরেই সে বড় হয়েছে। কাপুরুষের মত পালিয়ে গিয়ে সব অপবাদ সে কিছুতেই স্বীকার করে নেবে না। বরং সুযোগ সুবিধা মত বিষ্ণুবাবুকে দু'চার কথা শুনিয়ে ছাড়বে।

দিন তিনেক বাদে ছুটির পর অফিস থেকে বেরোচ্ছে অসিত, শুনতে পেল পিছন থেকে কে তার নাম ধরে ডাকছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল শ্যামল। এক সময়ে কলেজের সহপাঠী ছিল। সহকর্মী হিসাবে এতদিন বাদে ফের দু'জনের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে।

শ্যামল বলল, 'সপ্তাহখানেকের জন্য ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে সুখবরটি শুনতে পেলাম। তোমার কিন্তু নিজে থেকেই খবরটা দেওয়া উচিত ছিল অসিত।'

অসিত বলল, 'বারে, তোমার সঙ্গে আমার তো এই মাত্র দেখা হোল। খবর দেওয়ার সময় পেলাম কই। তাছাড়াএমন সুখবর নয় যে যেচে গিয়ে দিয়ে আসতে পারি।'

শ্যামল বলল, 'বাঃ, অফিসে মাইনে বাড়ল, মর্যাদা বাড়ল, চাকরি-জীবনে এও যদি সুখবর না হয় তাহলে সুখবর কাকে বলে শুনি! ওসব কথায় ভুলছিনে। কী খাওয়াবে বল। কোন্ রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাবে ঠিক করে ফেল।'

অসিত শ্যামলের মুখের দিকে তাকাল। কলেজে পড়বার সময় ও একটু মুখচোরা ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখত। কারো সঙ্গে তেমন মিশতো না। প্রফেসার তো ভালো, স্বল্পপরিচিত কোন সহপাঠীরও মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারত না। তার বন্ধুচক্রের সদস্যদের সংখ্যা দুই বা তিনের বেশি ছিল না। আর তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল অসিত। চাকরিতে ঢুকে শ্যামলের স্বভাবের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে অসিত লক্ষ্য করলো। আগের মত ততখানি মুখচোরা স্বভাব আর নেই।

শ্যামলের কথার জবাবে অসিত বলল, 'রেস্টুরেন্টে ঢুকবার মত পয়সা পকেটে নেই। তবে তুমি যদি দয়া করে আমার বাসায় আস এক কাপ চা জুটতেও পারে।'

বাসায় যাওয়ার কথায় একটু সংকোচ বোধ করল শ্যামল, বলল, 'না না, সে বরং আর একদিন যাওয়া যাবে। আজ থাক।'

অসিত বলল, 'থাকবে কেন চল। আমার মা আর বোনেরা সবাই তোমার নাম শুনেছে। এবার সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়টা হোয়ে যাক।'

শ্যামল এ কথায় আরও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল 'না অসিত, আজ আমার অন্য কাজ আছে। আর একদিন বরং যাবো।'

কিন্তু অসিত কিছুতেই ছাড়ল না। শিয়ালদায় এসে প্রায় জোর করেই বন্ধুকে বেলেঘাটার বাসে টেনে তুলল।

বাসায় এসে অসিত অরুন্ধতীকে ডেকে বলল, 'মা, আজ শ্যামলকে নিয়ে এসেছি। আমার সেই কলেজী আমলের বন্ধু, মনে আছে তো।'

অরুন্ধতী কথাটার সরাসরি জবাব এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'এসো বাবা এসো।'

বড় ঘরের আধখানা জুড়ে তক্তপোষ পাতা। তার ওপর সতরঞ্চি বিছানো। সেখানেই বসবার ব্যবস্থা হোলো। অসিত ছোট বোনকে ডেকে বলল, 'নীলা, এদিকে আয়। শ্যামলকে এক কাপ চা করে দে। কিছুতেই আসতে চায় না। শেষে এক কাপ চায়ের লোভ দেখিয়ে এ পর্যন্ত টেনে এনেছি।'

অরুন্ধতী হেসে বললেন, 'ওর কথাই ওইরকম বাবা, তুমি কিছু মনে কোর না।'

নীলা অসিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা এত ভালো চা খাইনে দাদা যে কাউকে তার লোভ দেখানো যায়।'

অসিত শ্যামলের সঙ্গে নীলার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার ছোট বোন। কিন্তু সব সময় ওর কাছ থেকে নিন্দামন্দ না হয় উপদেশনির্দেশ শুনতে হয় আমাকে। স্কুল মাস্টারী ক'রে ও অভ্যাস ওর মজ্জাগত হয়ে গেছে। আর শ্যামল সরকারের নাম তো তোরা জানিসই। আগে কবি হিসাবে খ্যাতি ছিল এখন দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের সুদক্ষ পাসিং অফিসার।'

শ্যামল নমস্কার জানিয়ে অপ্রতিভভাবে বলল, 'অসিত বাড়াবাড়ি করতে ভালোবাসে।'

নীলা স্মিতমুখে হাত তুলে নমস্কার জানাল। কোন জবাব দিল না। এই সৌম্য দর্শন লজ্জানম্র যুবকটির সামনে সে যেন হঠাৎ বড় সংকোচ বোধ করছে। তার সেই স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতা কোথায় যে লুকিয়েছে তার যেন আর কোন সন্ধান মিলছে না।

শ্যামল নীলার দিকে একটুকাল তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। নিজের মুগ্ধতা সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠেছে। পাছে আর কারো চোখে ধরা পড়ে এই তার ভয়।

নীলা বলল, 'আমি যাই দাদা।'

অসিত ঘাড় নাড়ল।

পাশের ঘরে উমা এতক্ষণ শ্রীমদ্‌ভাগবতে মগ্ন ছিল, হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ায় উঠে এসে দোরের পাশে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর থেকে তার খানিকটা দেখা যায়,

পুরোপুরিটা চোখে পড়ে না। একটুকাল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে উমা মৃদুস্বরে ডাকল, 'দাদা'।

অসিত শ্যামলের সঙ্গে অফিসের কথা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। একটু চমকে উঠে বলল, 'কে? ও, উমা? কী ব্যাপার, আয় ঘরে আয়।'

উমা সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল না। আগের মত আড়াল থেকেই বলল, 'আমার পোস্টকার্ডখানা এনেছ?'

অসিত বলল, 'না রে, আজও ভুলে গেছি।'

আর কোন কথা না বলে উমা চলে যাচ্ছিল, অসিত তাকে আবার ডাকল, 'যাচ্ছিস যে। আয়, ভিতরে আয়। শ্যামলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

যেন পরম অনিচ্ছায় উমা এসে ভিতরে ঢুকল।

সংক্ষেপে দুজনের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর শ্যামল আর উমা নমস্কার বিনিময় করল। মুহূর্তের জন্যে শ্যামল যেন পলক ফেলতে ভুলে গেল। এমন রূপ সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। বিনা প্রসাধনে বিনা আভরণে এ রূপ চোখকে ধাঁধিয়ে দেয়। সরু চুল পেড়ে একখানা ধুতির উমার পরনে। ব্লাউজের সাদা হাতা অনেকখানি নেমে এসেছে, গলায় সরু চিক চিকে একগাছি হার ছাড়া আর কোন আভরণ নেই। প্রখর রূপকে বরং ঔদাসীন্যের আবরণেই ঢাকবার চেষ্টা আছে। কিন্তু তবু তা ঢাকা পড়েনি, বরং কিসের এক ধরণের অতৃপ্তি আর ক্ষোভ ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে। উমার এই রূপের সঙ্গে সেই রুক্ষতার যেন তেমন সামঞ্জস্য নেই। ওর কৌতূহলী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটু অস্বস্তি বোধ করল শ্যামল। তাড়াতাড়ি বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।'

উমা মৃদু হেসে বলল, 'না না, আপনারা কথা বলুন, আমার একটু কাজ আছে।'

অসিত বলল, 'কাজের মধ্যে তো কতকগুলো সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করা। তার সময় পরে অনেক পাবি। এখন একটু রান্নাঘরে যা তো। চা-টা হোল কিনা দেখ গিয়ে।'

উমা হেসে বলল, 'সে সব দেখবার জন্যে আরো অনেক লোক আছে দাদা, তার জন্যে ভাবনা কি।'

বলে উমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ঠিক নিজের ঘরের দিকে গেল না। রান্নাঘরে যেখানে অরুন্ধতী আর নীলা বসে খাবার তৈরী করছিল, তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

নীলা বলল, 'এই যে দিদি। তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে। যাও, এবার খাবারের প্লেট দু'খানা ওঁদের দিয়ে এসো।'

উমা হেসে বলল, 'এত কষ্ট ক'রে খাবার তৈরী করতে পারলি আর হাতে ক'রে দিয়ে আসতে পারবি নে? নীলা আজ হঠাৎ কী রকম লজ্জাবতী হয়েছে দেখেছ মা?'

অরুন্ধতী বললেন, 'দেখেছি। তোরা দুই বোনে তর্ক কর, আর ওরা অফিস থেকে এসে শুকনো মুখে বসে থাকুক। তোদের জ্বালায় আর পারিনে বাপু।'

নীলার দিকে একবার তাকিয়ে খাবারের প্লেট আর জলের গ্লাস অসিত আর শ্যামলকে দিয়ে এল উমা। দু'বার ক'রে যেতে হোল তাকে। তারপর ফিরে এসে বলল, 'চা বোধহয় তুইই দিয়ে আসতে পারবি নীলা। চা দিতে তো আর লজ্জা নেই।'

নীলা বলল, 'না লজ্জা কিসের, আমার চা দিতেও লজ্জা নেই, খাবার দিতেও লজ্জা করত না, কিন্তু সবই যদি আমি গিয়ে দিয়ে আসতাম তাহলে আরেকজনের মুখের দিকে কি আর তাকান যেত?'

আচমকা খোঁচা খেয়ে রাগে গুম হয়ে রইল উমা, আর সেই সুযোগে দু'হাতে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে নীলা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

উমাকে খোঁচা দিলে হবে কি, নীলার লজ্জা করছিল ঠিকই। শ্যামলের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই সে চোখ নামিয়ে নিয়েছে, দ্বিতীয়বার আর তাকাতে পারেনি। চোখে চোখে কতদিন সুধীরও তো তাকিয়েছে, কিন্তু সে চাহনির একটিমাত্র পরিষ্কার অর্থ, তাতে রাখা-ঢাকা কিছু থাকত না। শ্যামলের এই লজ্জানম্র দৃষ্টির সাথে আরও কিসের যেন একটু ব্যঞ্জনা মিশে আছে।

শ্যামলের কবিতা নিয়ে তিন ভাই বোনের মধ্যে অনেকদিন আলোচনা হয়েছে। ওর কবিতা পড়ে ওর চেহারা সম্বন্ধে নীলার যে ধারনা হয়েছিল আজ দেখল সে চেহারার সাথে এ চেহেরার মিল নেই। কালো কোঁকড়ান একমাথা চুল, টানা নাক চোখ, অশ্চর্য ফর্সা রং, কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে কেমন যেন একটা রোদে পোড়া রুক্ষ ভাব। প্রথম দর্শনে সবটুকু ধরতে পারেনি, বরং ধরা দিতে হয়েছে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে নীলার মনে হয়েছিল শুধু একটি কৌণিক দৃষ্টি চালিয়ে শ্যামল বুঝি সব দেখে নিল।

ঘরে ঢুকে নীলা দেখল পরোটা খেতে খেতে দুই বন্ধু অফিসের আলোচনায় মত্ত হয়ে উঠেছে। তক্তপোষের ওপর চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে নীলা বলল, 'দাদা, চা—।'

দু'জনে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ টেনে নিল। সামান্য একটু চুমুক দিয়ে শ্যামল বলল, 'বাঃ, চমৎকার চা হয়েছে তো, অথচ শুনেছিলাম এ বাড়িতে নাকি ভাল চা আসে না, গুণটা তাহলে চায়ের না, হাতের।'

নীলা হেসে বলল, 'হাতেরও নয়, গুণটা মুখের। একটু আগে বাড়িয়ে বলার জন্যে দাদাকে দোষ দিচ্ছেলেন, কিন্তু বাড়াবাড়িতে আপনারা কেউ কম যান না।'

শ্যামল হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না।

অসিত বলল, 'নীলার সঙ্গে কথায় পেরে উঠবে না শ্যামল। তার চেয়ে হার

মানাই ভাল, তবে দুঃখ এই প্রথম দিনে প্রথম কথায়ই তুমি হেরে গেলে।' তারপর নীলার দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, 'অবশ্য জায়গা হিসেবে হার মেনে সুখ আছে।'

নীলা একটু আরক্ত হয়ে উঠল। দাদার মুখে কিছু আটকায় না। চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু অসিত বাধা দিয়ে বলল, 'যাসনে, দাঁড়া। অতিথি-অভ্যাগত বাসায় এলে কি ওরকম পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে চলে, বোস ওখানে. আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেলে প্লেট-কাপ নিয়ে যাবি, সুপারি হরতকি যার যা লাগে এনে দিবি, এসব বলে দিতে হবে কেন ভদ্রতা-টদ্রতাগুলো একটু শেখ দেখি ?'

নীলা বুঝতে পারল ওর আড়ষ্টতার ষোল আনা সুযোগ নিচ্ছে অসিত। এখন না, আগে শ্যামল চলে যাক তারপর এর মজা দেখবে। নীলা ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু বসল না।

শ্যামল বলল, 'ও কি, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।'

অসিত বলে উঠল, 'উঁহু, আপনি নয়, তুমি। নীলাকে তুমি অসংকোচে "তুমি" বলতে পার শ্যামল। ও আমার দিদি নয়, বোন। অবশ্য আর কিছুক্ষণ বসে গেলে দেখবে ও এক ফাঁকে দিদি হয়ে উঠেছে।'

'আঃ, তুমি কি আজ থামবে না দাদা ?' নীলা চাপা গলায় ধমক দিল।

অসিত বলল, 'হ্যাঁ, আমি থামি, আর তোরা শুরু কর।'

শ্যামল আর নীলা দু'জনেই এবার আরক্ত হয়ে উঠল। নীলা পালিয়ে এল ঘর থেকে।

যাওয়ার আগে অরুন্ধতী এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। শ্যামল নিচু হয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, 'এবার আসি মাসিমা।'

অরুন্ধতী বললেন, 'এস বাবা মাঝে মাঝে, শহরের এক কোণে পড়ে আছি, কে বাবা এসে খোঁজ নেয়। আর খোঁজ খবর নেবে কি, সে সময় কোথায় মানুষের। আমিই বা ক'জনের খোঁজ নিতে পারি। তবু যদি তোমরা আস যাও, মেয়ে দু'টোও দু'চারটে কথা বলার লোক পায়। তা নইলে তো দু'বোনে লেগেই আছে। আমি বলি এখন কি আর তোরা ছোট আছিস, কিন্তু আমার কথা শুনলে তো! আর ঐ এক ছেলে অসিত। আর তো কোন কাজে লাগে না, পারে কেবল বোনেদের সঙ্গে ঝগড়া করতে।'

শ্যামল হেসে বলল, 'কাজে লাগবে না কেন মাসিমা। অসিত আর সে অসিত নেই, রীতিমত কাজের মানুষ হ'য়ে উঠেছে। তা নইলে তিন মাসে কেউ লিফ্‌ট পায়! আমাদের ব্যাঙ্কে ও তো রেকর্ড করে ফেলল।'

শ্যামলের কথায় একটু যেন চমকে উঠল অসিত। ওর এই আকস্মিক প্রমোশনে শ্যামলের মনেও কি ঈর্ষার ছোঁয়াচ লেগেছে, না কি এ কেবল অসিতের নিজের মনেরই

দুর্বলতা। ওর শোনার ভুল, দেখার ভুল। না, শ্যামলকে অত ছোট ভাবতে কষ্ট হয় অসিতের।

ছেলের প্রশংসায় মনে মনে বুঝি খুসি হলেন অরুন্ধতী। বললেন, 'আরেকদিন এসো কিন্তু শ্যামল।'

শ্যামল বলল, 'আসব বৈকি মাসিমা। আমাদের মত বাউণ্ডেলেদের অত বেশি আপ্যায়ন করবেন না, শুধু কি একা আসব, দলবল নিয়ে এসে দেখবেন হাজির হব। তখন আবার বিরক্ত হয়ে উঠবেন। ভাববেন, পাপ বিদেয় হলে বাঁচি।'

অরুন্ধতী হেসে উঠলেন, 'কথা শোন ছেলের।'

শ্যামলের পিছনে পিছনে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল অসিত। যেতে যেতে গীতার একটি শ্লোকের সুললিত আবৃত্তি কানে ভেসে এল শ্যামলের।

প্রজহাতি যথা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্,
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।

বাঁশীর মত মধুর কোমল কণ্ঠ। শ্যামলের বুঝতে বাকি রইল না এ স্বর কার। তবু একবার জিজ্ঞাসা করল, 'গীতা পড়ে কে অসিত ?'

অসিত জবাব দিল, 'আবার কে, উমা। ও তো দিন রাত কেবল গীতা আর ভাগবত নিয়েই পড়ে আছে।'

'ওকে অন্য বই টই কিছু এনে দিতে পার না।'

অসিত বলল, 'এনে দিতে হবে কেন, বই কি বাড়িতেই কিছু কম আছে, কিন্তু পড়লে তো।'

শ্যামল জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা সুধীরবাবু মারা গেছেন কতদিন হল ?'

অসিত জবাব দিল, 'তা বছর চারেক হল বই কি।'

শ্যামল বলল, 'শোকটা উমা সামলে উঠতে পারছে না আজও। বইপত্র নিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকে ভালোই, কিন্তু কেবল ধর্মগ্রন্থ কেন, ও তো শুধু শাসন আর অনুশাসনের কড়াকড়ি। মনের ওপর তার ফলটা কি সব সময় ভাল হয় অসিত ?'

অসিত বলল, 'না, তা হয় না। কিন্তু কারো মনের ওপর মেজাজের ওপর জুলুম করতে যাওয়াও ভুল। ওকে আমি অনেকদিন অনেক করে বুঝিয়েছি, আজকাল আর কিছু বলি না। করুক ওর যা খুশি।'

শিয়ালদহে বাস থেকে নেমে শ্যামল দেখল বেশ একটু রাত হয়েছে। আকাশে ক্ষীণ এক ফালি চাঁদ। ঝিরঝিরে একটু হাওয়া দিল হঠাৎ। কেমন শীত শীত করছে, মাঘ মাস শেষ হয়ে এলো। শীত যায় বসন্ত আসে। এক ঋতু গিয়ে আরেক ঋতু আসে। কিন্তু রাজধানীর মানুষের সে হিসাব রাখার সময় কই ? কাজ আর কাজ। সবাইর চোখেই তো কাজের ঠুলি বাঁধা। তবু মাঝে মাঝে ঠুলি এক সময় সরে যায়, তাকাতে

ইচ্ছা করে আকাশের দিকে, চাঁদের দিকে। অনেক কাল আগের লেখা একটা কবিতার লাইন শ্যামলের মনে গুণ গুণ করে উঠল—'এবার বসন্ত বৃথা গেল'—মনে পড়ল সেও একদিন কবিতা লিখত। কিন্তু সে খাতা অনেকদিন বুজে গেছে, তার বদলে খুলেছে দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের মজবুত চামড়ার বাঁধাই চারখানা লেজার। সবগুলির পাতায় শ্যামলকে চোখ বুলাতে হয়, স্বাক্ষর রাখতে হয়। কিন্তু কেবল বিরাট বিরাট খাতাইতো নয়, সেগুলি কোলে করে ভাঙা চোরা নানা চেহারার যে মানুষগুলি বসে থাকে তাদের দিকে না তাকিয়েও তো পারা যায় না। এক একটি মানুষ নয়, যেন এক একটি রহস্যময় রাজত্ব। এই নিয়ে অসিতের সঙ্গে শ্যামল একদিন তর্ক করেছিল। অসিত বলেছিল, 'কি জানি, আমার কাছে ত সবই সমান মনে হয়। এক ঘরে বসে এরা যে কেবল একই ধরণের কাজ করে তাই নয়, এদের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, ঈর্ষা বিদ্বেষ সব কিছুতেই এক আশ্চর্য ঐক্য দেখেছি। সে ঐক্য তুমি আর কোন সমাজে খুঁজে পাবে না শ্যামল।' শ্যামল প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল, 'ওটা তোমার একেবারে বাইরের দেখা। আরেকটু ভালো করে মিশলে দেখতে প্রত্যেকটি মানুষের সমস্যা আলাদা। আর শুধু এক একটি মানুষই বা কেন ওদের, পিছনে যে একেকটি পরিবার আছে তাদের ছায়া দেখতে পাও না ওদের মধ্যে? আমি তো পাই। একেক সময় মনে হয় শুধু ছায়া নয়, মানুষগুলিকেও যদি দেখতে পেতাম! ওদের লেজারগুলি টেনে নিয়ে ওদের সকলের কথা লিখে রেখে যেতে পারতাম! কবিতা নয় অসিত, আমি গল্পই লিখব।' অসিত হেসে বলেছিল, 'তার চেয়ে শ্যামল তুমি গদ্য কবিতা লেখো, তাও তোমার হাতে ভাল খুলবে।'

সারকুলার রোড ধরে সিধে হাঁটতে লাগল শ্যামল। মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা বাস একটানা হেঁকে চলেছে, মানিকতলা শ্যামবাজার, শ্যামবাজার। উঠে পড়লেই হোত। বাসা তো একেবারে কাছে নয়। কিন্তু আজ যেন হেঁটে যেতেই ভাল লাগছে। ভালো লাগছে চারদিকে চোখ তুলে তাকাতে। বেশ আছে অসিত। মা আর বোনেদের নিয়ে পরিপাটি গুছানো ছোট সংসার। শ্যামল তো আজ পর্যন্ত বাসাই করে উঠতে পারল না। বাবা মা দেশের বাড়িতেই রয়ে গেলেন। তাদের আনার জন্য শ্যামল কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে আসতে বাবার মত হয়নি কিছুতেই। কলকাতার পাকাপাকি বাসা একটা করতে গেলেই বিয়ের প্রশ্ন ওঠে, কিন্তু সামান্য আয়ে বিয়ের বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তাছাড়া মাইনে যা পায় তার সবটুকুও তো নিজের নয়। পিসীমা কাশীবাসী হয়েছেন, মাসের প্রথমেই তাঁকে কিছু পাঠিয়ে দিতে হয়। ভাই আছে একটি, নিজের কাছে থাকে, বঙ্গবাসীতে আই. এ. পড়ছে। ঘরণী না থাকলেও ঘর একখানা ভাড়া নিয়েছে শ্যামল, সুকিয়া ষ্ট্রীটে একতলায়, দু'ভাই থাকে। ওদের ব্যাঙ্কের একটা ছোকরা বেয়ারা এসে দু'বেলা রান্না করে দিয়ে যায়, শোয় অন্যত্র। এতক্ষণে ভাইয়ের কথা মনে পড়ল শ্যামলের। পড়াশুনো হয়ে গেলে ও শ্যামলের অপেক্ষায় বসে

থাকবে। শ্যামল বাসায় না ফেরা পর্যন্ত বিমল খেতে বসবে না। তা সে যত রাতই হোক।

কিন্তু বাসায় পৌঁছে শ্যামল দেখল বিমল একা নয়, কার সঙ্গে যেন গল্প করছে। আর একটু কাছে যেতেই লোকটিকে শ্যামল চিনতে পারল। অফিসের বিষ্ণুবাবু। বিষ্ণুবাবুর বাসা বেশি দূরে নয়। ছুটি ছাটার দিনে আসেন মাঝে মাঝে, এসে গল্প-গুজব করে যান কিছুক্ষণ। আজ তাঁকে এ সময় দেখে শ্যামল একটু অবাক হল।

শ্যামলকে দেখে বিষ্ণুবাবু বললেন, 'এসো ভাই এসো। তোমার জন্যেই বসে আছি।'

শ্যামল বলল, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'আর ব্যাপার! এ দিকে তো এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসে আছি।'

কাণ্ডটা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন বিষ্ণুবাবু। আজ অফিস ছুটি হওয়ার একটু আগে ম্যানেজারের ঘরে হঠাৎ বিষ্ণুবাবুর ডাক পড়ল। কলিগরা চোখ টেপাটেপি করতে লাগল, ক'দিন আগে অসিতবাবুর ভাগ্য ফিরেছে, আজ বুঝি বিষ্ণুবাবুরও কপাল খুলে যায়। আজকাল ম্যানেজারের ডাক মানেই তো সু-ডাক। কিন্তু বিষ্ণুবাবু কি সেই কপাল করে এসেছেন, না অসিতবাবুর মত চেয়ারম্যান দুহিতার মন মজানোর বয়স আছে। তাঁর একেবারে উল্টো বার্তা। প্রথমে তো ধমকের পর ধমক। ম্যানেজারের কাছে যত তোতলাতে থাকেন বিষ্ণুবাবু, তত ধমক খেতে হয়। ধমকের ঝড় একটু থামলে বিষয়টা তিনি বুঝতে পারলেন। ব্যাঙ্কের বড় তোয়াজের পার্টি জগবন্ধু দাসের চেক ডিস্‌অনার হয়ে ফেরৎ গেছে। তার মূলে আছে বিষ্ণুবাবুর অন্যমনস্কতা। আর চেক ফেরৎ যাওয়া মানেই তো পাওনাদারের কাছে পার্টিকে বেইজ্জত করা। জগবন্ধু ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে আচ্ছা করে ম্যানেজারকে ধমকে দিয়েছে আর সেই ধমক হাজার গুণ হয়ে বিষ্ণুবাবুর কাছে এসে পৌঁছেছে। ম্যানেজার অবনীমোহন শেষ কথা বলে দিয়েছে, এর ফাইন্যাল ডিসিশন হবে কাল সকালে, চেয়ারম্যানের ঘরে। বিষ্ণুবাবুর চাকরি তো যায় যায়।

সব শুনে শ্যামল বলল, 'কিন্তু আমি এর কী করতে পারি বলুন।'

বিষ্ণুবাবু ম্লানমুখে বললেন, 'না, তোমরা আর কী করবে। আমার ভাগ্যে যা আছে তা হবেই, তা কেউ রুখতে পারবে না। তবু দেখ একবার বলে কয়ে এ যাত্রা যদি ঠেকাতে পার।'

শ্যামল একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি জানি, কেন যে আপনাদের এত ভুল হয়।'

বিষ্ণুবাবু লজ্জিত হয়ে একটুকাল চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'সেভিংস ডিপার্টমেন্টে ছিলাম, বেশ ছিলাম। আবার ঠেলে দিল কারেন্ট লেজারে। কাজের চাপ তো যত ঐখানে। এখন কি আর সেই বয়স আছে শ্যামল, না চোখের সেই জোর

আছে। এ সব ঐ বেটা অবনীর চক্রান্ত। কেবল চরকির মত এ ডিপার্টমেণ্ট সে ডিপার্টমেণ্ট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে।' বিষ্ণুবাবু আরেকটু এগিয়ে এলেন শ্যামলের কাছে। যেন ভারি একটা গোপনীয় বিষয়ের পরামর্শ করছেন তার সাথে। তারপর বললেন, 'আমি বলি শ্যামল, তুমি অসিতকে একটু ধর। ও বললে ম্যানেজার ওর কথা ফেলতে পারবে না। আর আমরা যে যাই বলিনা কেন অসিত আসলে খাঁটি ছেলে। দু'কথা বেশ গুছিয়েও বলতে পারবে।'

শ্যামলের মুখে সামান্য একটু হাসির আভাস ফুটে উঠল, পথে যেতে যেতে অসিত সবই ওর কাছে বলেছে। হঠাৎ মাইনে বাড়া নিয়ে তাকে যারা যারা কুৎসিত ইঙ্গিত করতে ছাড়েনি বিষ্ণুবাবু তাদের একজন, অথচ এখন এই বিপদের সময় তার ওপরই সবটুকু নির্ভর করতে বিষ্ণুবাবুর লজ্জা করছে না। আশ্চর্য এদের মনের গড়ন, অদ্ভুত এদের ভয়। অবশ্য ভয় পাওয়ারই কথা। বিষ্ণুবাবুর চাকরি গেলে তাঁর মত লোকের এ বাজারে ফের চাকরি জোটানো সহজ নয়। বিষ্ণুবাবু তো একা নন, তাঁর ভাগ্যের সাথে আরও চার পাঁচটি প্রাণীর ভাগ্যের সুতো বাঁধা। ওর মুখে শ্যামল যেন তাদের মুখেরও ছায়া দেখতে পেল। শ্যামল জানে অসিতকে কেন কাউকে বলেই কোন লাভ হবে না। এমন কি অবনী পর্যন্ত সরে দাঁড়াবে, যা করবার করবেন চেয়ারম্যান সুরপতি। সুরপতিকেও কি চিনতে বাকি আছে শ্যামলের? তিনি কোনদিক দেখবেন না, বিষ্ণুবাবুর দিকে চোখ তুলে তাকাবেন না পর্যন্ত, তাকাবেন শুধু ব্যাঙ্কের সুনামের দিকে। সুরপতি সব সইতে পারেন। কিন্তু ব্যাঙ্কের সামান্যতম বদনামও তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাঁর মতে আসলে ব্যাঙ্ক মানে তার গুড্ উইল, তার সুনাম। এই সুনাম তিনি তিলে তিলে অর্জন করেছেন। কারো অবহেলায়, অসাবধানতায় তা তিনি খোয়াতে পারবেন না। এ ব্যাঙ্কে নিষ্ঠা যোগ্যতার পুরস্কার যেমন আছে, তেমনি অমনোযোগীর ক্ষমা নেই। প্রত্যেকটি লোককে কাজে নেবার সময় একথা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। হয় নিজে নয়ত অবনীর মারফতে জানিয়ে দিয়েছেন এ ব্যাঙ্কের সাথে তাঁর রক্তের সম্পর্ক। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক শুধু কি তাঁরই, যারা গায়ের রক্ত জল করে খাটছে তাদের নয়?

পরদিন সুরপতির বিচারে একবারে চাকরি গেলনা বিষ্ণুবাবুর। তাঁকে শুধু তিনমাসের জন্য সাসপেণ্ড করা হল। এ ঘটনা নতুন নয়, দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে আরও দু'একবার এমন ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেদিন থেকে আরেকটি নতুন জিনিসের সূত্রপাত হ'ল। দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের টিফিন রুমে দালদায় ভাজা লুচি চিবুতে চিবুতে নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ভূপতিবাবুও বললেন, 'না না, এ বড় অন্যায়, এর একটা প্রতিকার হওয়াই দরকার. বিষ্ণুবাবু ভুল করেছেন ঠিকই, কিন্তু সে এমন কিছু মারাত্মক ভুল নয়। তার জন্যে একেবারে তিন মাসের সাসপেনসন? এ জুলুম ছাড়া কি?'

শ্যামল বলল, 'কিন্তু প্রতিবাদ করব বললেই তো করা যায় না! তার জন্যে তৈরী হওয়া চাই, sacrifice করতে পারা চাই। পারবেন করতে?'

পাশে বসে রেকর্ড-কীপার মাধববাবু চা খাচ্ছিলেন। বয়সে সবার চেয়ে না হলেও অনেকের চেয়ে বড়। লোকটি একটু রসিক প্রকৃতির। ভূপতিবাবুর হয়ে জবাবটা তিনিই দিলেন, 'কি রকমের sacrifice চাও বল তো ভায়া?'

শ্যামল বলল, 'sacrifice আজই কাউকে করতে হবে না। আপনারা শুধু দয়া করে ছুটির পর সবাই হাজির থাকবেন। আজই আমাদের ইউনিয়ন ফর্মড হবে।'

'ইউনিয়ন,' মাধববাবু অবাক হয়ে বললেন, 'ব্যাঙ্কের আবার ইউনিয়ন কী হে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এ কি কল কারখানা পেয়েছ? আজ ইউনিয়ন করবে আর কাল যেই সে কথা চেয়ারম্যানের কানে উটবে অমনি সব কটাকে কান ধরে ব্যাঙ্কের বাইরে বার করে দেবে, ফের নতুন লোক এনে বসাবে। আমি বাপু ও সবের মধ্যে নেই।'

শ্যামল অসহিষ্ণুভাবে জবাব দিল, 'আপনি ছাড়াও আরো অনেক লোক আছে। আমরা কাউকে মতের বিরুদ্ধে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসতে বলিনে।'

মাধববাবু বললেন, 'তা আর থাকবে না কেন। তুমি আছ, আমাদের তিন নম্বর লেজারের সুরেশ আছে। তোমাদের কি। মাগ-ছেলে তো নেই। নির্বিকার সাংখ্যের পুরুষ তোমরা। তোমাদের চাকরি থাকল আর গেল বয়ে গেল। একটা পেট টিউশনি করেও চালিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু—।'

ভূপতিবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'আহা হা আপনি অত চটে যাচ্ছেন কেন মাধববাবু। ইউনিয়ন করলেই যে রোজ কুঁদে চেয়ারম্যানকে মারতে যেতে হবে তার কি মানে আছে। আমরা অন্তত আমাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলো তো কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারব।'

'জানিয়েই বা লাভ কী হবে?' মাধববাবু প্রশ্ন করলেন, 'আর কর্তৃপক্ষ, কর্তৃপক্ষ করে চেঁচাচ্ছেন, পথ তো আসলে একটি, স্বয়ং সুরপতি। তার কাছে কাঁদুনি গেয়ে কোনদিন কিছু হয়নি, আজও হবে না। বেশ তো করতে হয় করুন, কিন্তু আমি ও সবের মধ্যে যেতে পারব না।'

শুধু মাধববাবুই নয়, আরও কয়েকজন বাদ পড়লেন, ইচ্ছে করেই দূরে সরে রইলেন। কিন্তু যারা রাজি হল দেখা গেল তাদের দলই ভারি হয়ে উঠেছে। সমস্ত ব্যাঙ্কময় চাপা একটা উত্তেজনা। সুরপতির মত জাঁদরেল চেয়ারম্যানের সাথে লড়বার জন্য ভারি এক হাতিয়ার যেন এদের হাতে এসে যাচ্ছে। কাজকর্মের ফাঁকে কেবল সেই আলোচনা, সেই ফিস্‌ফিসানি।

সাদা এক সিট কাগজের মাথায় মিটিং-এর নোটিশ টাইপ করান হ'ল। তারপর শ্যামল গিয়ে সকলের কাছ ঘুরে ঘুরে তাতে সই আনল। কয়েকটা চিঠির ড্রাফট নিয়ে ব্যস্ত ছিল অসিত। ব্যাঙ্কের জরুরী কাজে অবনীকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেতে হয়েছে। কিন্তু যাওয়ার আগে তার ঘাড়ে নিজের কাজও কিছু চাপিয়ে দিতে ভোলেনি। অসিতের সামনে শ্যামল নোটিশের কাগজখানা মেলে ধরল।

অসিত জিজ্ঞাসা করল, 'বিষয়টা কি ?'

মৃদু হেসে শ্যামল বলল, 'পড়ে দেখ।'

অসিত পড়ল। কিন্তু কোন কথা বলার আগেই অবনীর বেয়ারা এসে খবর দিল।

'বাবু, ফোন এসেছে।'

অসিত চোখ তুলে তাকাল, 'আমার, না ম্যানেজারের ? বলে দে ম্যানেজার এখন নেই, বাইরে গেছেন।'

বেয়ারা বলল, 'না বাবু, আপনারই নাম ধরে ডাকছে, বলল এক্ষুণি ডেকে দিতে।' চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে অসিত উঠে দাঁড়াল।

ম্যানেজারের ঘরে এসে অসিত দেখল টেবিলের ওপর টেলিফোনের রিসিভারটা নামানো রয়েছে। সেটা তুলে নিয়ে অসিত বলল, 'হ্যালো।'

'কে অসিতবাবু ?'

'হ্যাঁ, আমি অসিত চন্দ কথা বলছি।'

'আমি সুজাতা।'

'তা আপনার গলার স্বর শুনেই বুঝতে পেরেছি।'

'পেরেছেন ? আশ্চর্য। আমি ভেবেছিলাম আমাদের বাড়ির ঠিকানার মত গলার স্বরও বুঝি ভুলে গেলেন।'

'আমার স্মরণশক্তির ওপর আপনার মোটেই বিশ্বাস নেই দেখছি।'

'তা না থাকলেও আপনার বাক-শক্তির ওপর আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শক্তির কাছে আমি সাহায্য চাইছি।'

'সে শক্তি তো আপনারও কিছু কম দেখছি নে। কি ব্যাপার বলুন তো ?'

'সব কথা কি ফোনে বলা যায় ? অফিস ছুটির পর আপনি সোজা এখানে চলে আসুন। তখন বলব।'

'আচ্ছা।'

'তাহলে এই কথা রইল। ভুলে যাবেন না তো।'

'না।'

অসিত ফোন ছেড়ে দিল। এই নেতিবাচক শব্দটির মধ্যে কথা শেষ হলেও নিজের অস্তিত্ব সে যেন নতুন করে অনুভব করল।

সুজাতা তাকে ডেকেছে, যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছে। এ যেন তার জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

নিজের ঘরে ফিরে এল অসিত। শ্যামল তখনো তার সামনের চেয়ারটায় বসে ছিল। অসিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার, হাসছ যে ?'

অসিত অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'কই হাসছি না তো।'

শ্যামল আর কোন কথা না বলে নোটিশের কাগজখানার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'তাহ'লে সই করে দাও এবার।'

অসিত আর একবার লেখাটা পড়ল। আজই ছুটির পরে ছাদের ওপর ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের এক বৈঠক ডেকেছে শ্যামল। সেখানে ইউনিয়ন গড়ে তোলা সম্বন্ধে আলোচনা হবে। ছুটির পর। কিন্তু ছুটির পরে সুজাতা যে যেতে বলেছে অসিতকে। সুজাতা বড় চমৎকার ক'রে কথা বলে। তার গলাও বেশ মিষ্টি। ফোনে সেই গলার মাধুর্য যেন আরো বেড়ে যায়।

শ্যামল বলল, 'আমি তাহলে উঠি অসিত। হাতে কাজ আছে।'

বন্ধুর কথায় অসিতের চমক ভাঙল। ছি ছি, এ সব কি ভাবছে সে। সহকর্মীদের স্বার্থের চেয়ে একটি মেয়ের আমন্ত্রণই তার কাছে বড় হোল।

শ্যামলকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'আরে বসো বসো। কাজের লোক কখনো কাজের দোহাই পাড়ে না! কাজ তো আমারও আছে।'

সামনের চেয়ারটায় বন্ধুকে বসতে বলল অসিত, তারপর একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কবি মানুষ হয়ে এসব ইউনিয়ন-টিউনিয়নের মধ্যে যাচ্ছ যে শ্যামল, ব্যাপার কি?'

শ্যামল মৃদু হাসল, 'তাই যদি বল, কবি হয়ে ব্যাঙ্কে দশটা পাঁচটা কলমপেশাটাও তো কম অদ্ভুত ব্যাপার নয়।'

শ্যামল একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, 'বিষ্ণুবাবুর কথা শুনেছ তো?'

অসিত সংক্ষেপে বলল, 'শুনেছি।'

শ্যামল বলল, 'কত সামান্য একটা কারণে তাঁকে সাসপেণ্ড করা হোল তাও শুনেছ বোধ হয়।'

অসিত বলল, 'সবই শুনেছি শ্যামল। ব্যাপারটা বড়ই দুঃখের।'

শ্যামল একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'দেখ অসিত, কোন প্রতিকারের চেষ্টা না করে আমরা সবাই যদি শুধু মৌখিক দুঃখ জানিয়েই যাই তাহলে কারো পক্ষেই কোন লাভ হবে না।'

আশে পাশের টেবিল থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক অসিতের দিকে তাকালেন। প্রৌঢ় চীফ-একাউণ্ট্যাণ্ট শ্রীপতি ভট্টাচার্যও চশমার ওপর দিয়ে একবার চেয়ে দেখলেন। অসিত বলল, 'আচ্ছা তুমি এবার এসো। যা বলবার তা তো মিটিং-এই বলতে পারবে।'

শ্যামল অপ্রতিভ হয়ে উঠে নিজের সীটে গিয়ে বসল।

অসিতও মনে মনে একটু লজ্জিত হোল। শ্যামলকে কড়া কথা না বললেও চলত। কিন্তু ওর কাণ্ডজ্ঞান কম। এ সব কথা কি এত লোকের মধ্যে বলতে হয়। বিষ্ণুবাবুর কথা মনে পড়ল অসিতের। ভদ্রলোক তার পদোন্নতিতে হিংসা করেছেন! তার নামে নানা রকম কুৎসা রটনা করেছেন। সেজন্যে তাঁর ওপর মনে মনে অসিতের খুবই বিদ্বেষ

এসেছিল। কিন্তু মৌখিক অপমানই তো নয়, তিন মাস মাইনে বন্ধ রাখলে ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াবেন কি ?'

পাঁচটার পর থেকেই মিটিং-এর তোড়জোড় শুরু করল শ্যামল। ছাদের ওপর ছোট টিফিন রুমেই সভার ব্যবস্থা করা হোল। খানকয়েক টুল সেখানে পাতা আছে। বেয়ারাদের বলে গোটা দুই মাদুর আনিয়ে রাখাল শ্যামল। লোক যদি বেশি হয় তাদের বাইরে বসতে দেওয়া যাবে। কিন্তু সাড়ে পাঁচটা বাজল, ছটা বাজল, সব শুদ্ধ জন দশেকের বেশি লোক জমল না। প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্জকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে এসেছিল শ্যামল। কিন্তু তাঁরা কেউই এলেন না। কারো অফিসের কাজে এখনো ফুরসুৎ মেলেনি। কেউ বা অফিস সেরে অন্য দরকারী কাজে বেরিয়ে পড়েছেন। চীফ-এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট শ্রীপতি ভট্টাচার্যকে শ্যামল অনুরোধ করেছিল সভাপতিত্ব করবার জন্য। কিন্তু তিনি রাজী হন নি, এমনকি উপস্থিতও হন নি। সবচেয়ে আশ্চর্য, যাঁকে উপলক্ষ্য করে এই সভার আয়োজন সেই বিষ্ণুবাবু পর্যন্ত আসেন নি। অবস্থা দেখে নৈরাশ্যে নিরুদ্যম হয়ে পড়ল শ্যামল। অসিতকে ডেকে বলল, 'দরকার নেই আর মিটিং করে। সবাইকে চলে যেতে বল।'

অসিত একটু হেসে বলল, 'এত অল্পেই হাল ছেড়ে দিলে চলবে কি ক'রে শ্যামল, অত হতাশ হচ্ছ কেন।'

শ্যামল জবাব দিল, 'এদের সম্বন্ধে আশা কি ক'রে রাখি বল। এই দু'বছর ধরেই তো দেখছি। এই টিফিন রুমে বসে কত আলোচনা সমালোচনাই এরা করে। রোজ গরম গরম বক্তৃতা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। কিন্তু আজ সবাইকে যখন একসঙ্গে ডাকা হোল তখন আর কারোর সাড়া নেই।

অসিত বলল, 'এটা শুধু এই অফিসের বৈশিষ্ট্য নয়। সব জায়গারই এই রীতি। তবু এদের নিয়ে কাজ চালাতে হবে শ্যামল। যাঁরা এসেছেন তাঁদের নিয়েই সুরু করে দাও।'

লেজার-কীপার সুরেশ রায়ও বলল, 'তাই করুন শ্যামলবাবু। আর যদি দেরী করেন, যারা এসেছে তারাও চলে যাবে।'

তিন জন পরামর্শ ক'রে সভার কাজ আরম্ভ করাই ঠিক করল। সুরেশ প্রস্তাব করেছিল অসিতবাবুই সভাপতি হোন। কিন্তু অসিত বলল, 'এই ঘরোয়া বৈঠকে কাউকে সিংহাসনে বসবার দরকার হবে না। সকলেই এখানে সমান আসনের অধিকারী। ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সকলের স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে এই জনবিরলতা খুবই লজ্জার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে নিরাশ হলে চলবে না। প্রত্যেক সংগঠনের গোড়াকার ইতিহাস প্রায় এই একই রকম। শুরুতে তার আকার ছোট, যেমন ছোট বীজ, যেমন ছোট অঙ্কুর। কিন্তু তাই ক্রমে মহীরূপে রূপ নেয়।' তারপর ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করল অসিত। সকলের সমবেতভাবে

দাবী জানাবার এই হোল একমাত্র মাধ্যম। ব্যক্তিগতভাবে কারো ওপর অন্যায় অবিচার হলে এই ইউনিয়নই তার প্রতিকারের চেষ্টা করতে পারে।

কে একজন পিছনে থেকে অস্ফুটস্বরে বলল, 'আপনাকে আর স্কুল মাস্টারী করতে হবে না মশাই। ইউনিয়নের মাহাত্ম্য আমরা জানি। এবার কি করতে চান চটপট বলুন। আমাদের আরো কাজকর্ম আছে। দুটো টিউশন সেরে তবে বাড়ি ফিরতে হবে।'

অসিত তখন বিষ্ণুবাবুর ঘটনাটা সকলকে সংক্ষেপে জানাল। আজ তাঁর ওপর যে অবিচার করা হয়েছে, কাল তা অন্য যে কোন কর্মচারীর ওপর হ'তে পারে। তাই এখন থেকে সবাইকে সতর্ক হতে হবে। এখন তাদের বেশি কিছু করবার সাধ্য নেই। কিন্তু বেচারা বিষ্ণুবাবুর বিষয়টা যাতে কর্তৃপক্ষ ফের বিবেচনা ক'রে দেখেন ইউনিয়নের হয়ে সেই অনুরোধ অন্তত তারা জানাতে পারে।

সেই পিছনের বক্তা ছেলেটি বলল, 'এর মধ্যে আবার ইউনিয়ন টিউনিয়ন টেনে আনছেন কেন। অত যদি দরদ থাকে নিজে একবার চেয়ারম্যানকে গিয়ে বলুন না। তাহলেই ভদ্রলোকের চাকরিটি থেকে যাবে।'

অসিত বলল, 'আপনার নাম কি।'

'কেন রিপোর্ট করবেন নাকি?'

'না, রিপোর্ট করবার মত কিছু নেই। আপনার মত স্পষ্ট বক্তা ভবিষ্যতে ইউনিয়েনর অনেক কাজে লাগবেন। সেই জন্যেই নাম ধাম জানাতে চাইছি।'

শ্যামল বলল, 'ওঁর নাম নিরঞ্জন হালদার। লোন ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন।' তারপর নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করিনি নিরঞ্জনবাবু।'

নিরঞ্জন হঠাৎ একথার কোন জবাব দিল না।

অসিত বাধা দিয়ে বলল 'থাক শ্যামল, থাক। আমিই ওঁর কথার জবাব দিচ্ছি। আপনারা যদি চান, আমি চেয়ারম্যানের কাছে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করতে পারি। কিন্তু অনুরোধটা যদি সকলের পক্ষ থেকে করা হয় তাহলেই সেটা আরো জোরালো হয়ে ওঠে।'

নিরঞ্জন বলল, 'জোরালো হবে কি ঘোরালো হবে তা জানিনে মশাই। ব্যক্তিগতভাবেই করুন আর নৈর্ব্যক্তিকভাবেই করুন কাজ হাসিল হলেই হোল।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিরঞ্জন উঠে দাঁড়াল। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন উঠে গেল। স্থির হোল ইউনিয়ন গড়ে তোলা যখন গেলই না তখন বিষ্ণুবাবুর সম্বন্ধে বিবেচনার জন্যে একটা দরখাস্ত করা হবে। আর সেই দরখাস্তে স্বাক্ষরের জন্যে ছোট বড় সব কর্মচারীকেই অসিত আর শ্যামল অনুরোধ করবে। এই অগঠিত ইউনিয়নের অস্থায়ী সম্পাদক হোল শ্যামল। অসিতের অসম্মতি সত্ত্বেও শ্যামলের

আগ্রহে তার বন্ধুকেই সভাপতি করা হল। তারপর আরো খানিক বাদে সকলেই বিদায় নিল।

শ্যামল অসিতকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আমি ভারি লজ্জিত হচ্ছি অসিত।'

অসিত একটু হেসে বলল, 'কেন, তোমার ডাকা মিটিং-এ লোক এল না বলে? কিন্তু কারো আসা না আসা তো তোমার হাতে নেই।'

শ্যামল বলল, 'সে কথা নয়।'

অসিত বলল, 'তবে কোন কথা।'

শ্যামল একটু ইতস্তত করতে লাগল।

অসিত বলল, 'অত ভাবছ কি। বলেই ফেল না।'

শ্যামল আস্তে আস্তে বলল, 'ওদের মন বড়ই ছোট। এখানে নিরঞ্জন কেবল একজন নয়। ওরা অনেকেই তোমাকে বিশ্বাস করতে চায় না অসিত। ওদের ধারণা তুমি কর্তৃপক্ষের লোক।'

অসিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর আহত স্বরে বলল, 'তাই যদি বুঝতে পেরে থাক আমাকে তোমাদের দলে না টানাই উচিত ছিল।'

শ্যামল বলল, 'এ তোমার রাগের কথা। ওরা খারাপ মনে করলেই তো আর তুমি খারাপ হয়ে যাচ্ছ না। একটা কিছু গড়ে তুলতে হলে কেবল যে বাইরে থেকেই আমরা বাধা পাব তাই নয়, ভিতর থেকেও এমন অনেক বাধ বিঘ্ন আসবে। তার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে।'

শিয়ালদহ মোড় থেকে শ্যামল বিদায় নিল। কিছুক্ষণ আগে থেকে সুজাতার নিমন্ত্রণের কথা অসিতের মনে পড়ছিল। কিন্তু বন্ধুকে তা জানাতে কেমন যেন একটা সংকোচও বোধ করছিল অসিত। তার মনে হচ্ছিল এই আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই শ্যামল ভাল অর্থে নেবে না। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে সে পরিহাস করবে। তার কাছে গোপন করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু আমন্ত্রণ পেয়েছে বলেই কি যাওয়া সঙ্গত হবে অসিতের? সুজাতাদের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতার কথা শ্যামল আজ না জানুক একদিন তো টের পাবেই। তখন অসিতের সম্বন্ধে ধারণা কি আরো খারাপ হয়ে যাবে? কিন্তু ধারণা খারাপ হ'লেই তো আর অসিত খারাপ হবে না। ইউনিয়ন করবে বলে সুজাতার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় রাখতে কোন ক্ষতি নেই। নিমন্ত্রণ করলে তা রাখতে কোন ক্ষতি নেই। নিমন্ত্রণ করলে তা রাখতে যাওয়া শিষ্টাচার, রীতি। সেই রীতি লঙ্ঘন করবার কোন কারণ ঘটেনি।

ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখল অসিত। সাতটা প্রায় বাজে। সান্ধ্য নিমন্ত্রণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অত দেরিতে যাওয়াটা কি শোভন হবে? কিন্তু

সুজাতা তো ঘড়ির কাঁটায় সময়কে বেঁধে দেয়নি। ছুটির পর যেতে বলেছে। আরো কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অসিত দক্ষিণগামী একটা বাসে উঠে পড়ল।

বাড়ির সামনে খান দুই গাড়ি দাঁড়িয়ে। কি ব্যাপার। কোন জন্মদিনটিনের অনুষ্ঠান আছে নাকি। কিন্তু অসিত যে খালি হাতে এসেছে। তেমন কোন ব্যাপার থাকলে তাকে বড়ই অপ্রস্তুত হ'তে হবে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আর একবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠল। ভিতরে যাবে না ফিরে যাবে।

একটু বাদেই পুরোন চাকর নীলাম্বরের নজরে পড়ে গেল অসিত। নীলাম্বর তাকে চিনে রেখেছে। অসিতের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এই যে আসুন, এই ঘরে আসুন। আমি আপনার জন্যই এখানে দাঁড়িয়ে আছি।'

নীলাম্বরের পিছনে পিছনে একতলার একটি হল ঘরের দোরের সামনে এসে অসিত থেমে দাঁড়াল। তরুণ বয়সী আরো দশ বারোটি নারী পুরুষ জড়ো হয়েছে। বাঁ দিকে মেয়েরা বসেছে, ডান দিকে ছেলেরা। মাঝখানে একটি মেয়ে কি যেন সবাইকে পড়ে শোনাচ্ছে।

অসিতকে দেখে সকলেই দোরের দিকে তাকাল। ভিতর থেকে সুজাতা উঠে এসে বলল, 'আসুন, দেরি দেখে ভাবলাম আপনি বুঝি আর এলেনইনা।'

অসিত বললে, 'কিন্তু এমন সভা-সমিতির আয়োজন করবেন তা তো আমাকে জানাননি।'

সুজাতা একটু কৈফিয়তের সুরে বলল, 'সভা সমিতি কিছুই নয়। এ আমাদের একটি ঘরোয়া ক্লাব। ভিতরে এসে বসুন, সব শুনবেন।'

অসিত ঘরের ভিতরে এলে ক্লাবের সভ্য-সভ্যাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল সুজাতা। তারপর ত্রিশ বত্রিশ বছরের আর একটি শ্যামবর্ণা মেয়েকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি বীথিকা গুপ্ত। আমাদের যাত্রী সঙ্ঘের সম্পাদিকা। এ্যাড্‌ভোকেট সমীরণ গুপ্তের স্ত্রী।'

বীথিকা স্মিতমুখে চুপ করে রইল।

সুজাতা বলল, 'আর অসিতবাবুর কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি বীথিদি। একে আমাদের যাত্রী সঙ্ঘের সভ্য করে নিতে হবে।'

বীথিকা বলল, 'তুমি যখন সুপারিশ করছ তখন নিতে হবে বই কি।'

অসিত বলল, 'শুধু ওঁর সুপারিশই যথেষ্ট। আমার মতামতের বুঝি কোন প্রয়োজন নেই?'

বীথিকা অসিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন আপনার কি অমত আছে নাকি?'

অসিত বলল, 'যতদূর মনে হচ্ছে দলটা ডাকাতির। কিন্তু ও বিদ্যায় আমার মোটেই পটুতা নেই। এ সঙ্ঘের সভ্য হব কোন ভরসায়।'

অসিতের কথায় সভ্যাদের মধ্যে হাসির শব্দ শোনা গেল।

বীথিকা বলল, 'আপনি ঘাবড়াবেন না। ডাকাতির কায়দা-কানুন সব এখানে শিখিয়ে নেওয়া হয়। তার জন্যে আমরা আলাদা ফী নিইনে।'

অল্প সময়ের মধ্যেই মহিলাটি বেশ অন্তরঙ্গ সুরে আলাপ জমিয়ে তুললেন দেখে অসিতের খুব ভালো লাগল।

একটু বাদে বীথিকা গম্ভীর স্বরে বলল, 'চুরি ডাকাতি নয়, সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার জন্যেই এই আসর আমরা গড়ে তুলেছিলাম অসিতবাবু। কিন্তু কিছুতেই একে টিকিয়ে রাখতে পারছি না। যাত্রী সঙ্ঘের মেম্বারদের আজ সবান্ধবে নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু এত চেষ্টা চরিত্রের পরেও দেখছেন তো এ্যাটেন্‌ডেন্‌সের নমুনা।'

অসিত বলল, 'সমীরণবাবু অবনীবাবু এরা সব আসেন না?' প্রশ্নটা শেষ ক'রে সুজাতার দিকে তাকাল অসিত।

সুজাতা একটু আরক্ত হয়ে বলল, 'ভাইস-প্রেসিডেন্টের লিস্টে ওদের নাম আছে। বীথিদি মোটা টাকার চাঁদা ওদের কাছ থেকে আদায় করে নেন। কিন্তু ওরা নিজেরা বড় একটা আসতে চান না।'

অসিত বলল, 'কেন।'

বীথিকা বলল, 'তাঁরা সবাই কাজের মানুষ। এসব ব্যাপারকে বোধহয় ছেলেমানুষি মনে করেন।'

অসিত এ কথার পরে আর কোন মন্তব্য করল না।

ঘরের এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আর একটি যুবক এতক্ষণ এদের আলাপ শুনছিল। এবার সে বলে উঠল, 'মিসেস গুহ আমাদের বৈঠক বোধ হয় আজকের মত শেষ হয়ে গেছে, এবার আমরা উঠতে পারি?'

সুজাতা বাধা দিয়ে বলল, 'না না বিনয়বাবু, একটু বসুন আপনারা। আমি এক্ষুনি আসছি।'

বলেই পাশের ঘরে চলে গেল সুজাতা। একটু বাদে চাকর এসে প্রত্যেকের সামনে খাবারের প্লেট রেখে দিতে লাগল। সভ্য সভ্যাদের মধ্যে কিছু বেশি মাত্রার উৎসাহের সঞ্চার হোল। খানিক বাদে বড় ট্রেতে করে চায়ের কাপগুলি নিয়ে এল নীলাম্বর।

অসিত বলল, 'এত ভোজ্য পানীয়ের ব্যবস্থা সত্ত্বেও যদি আপনারা আসর না জমিয়ে তুলতে পারেন আমাদের যে অখ্যাতি হবে মিসেস্ গুপ্ত।'

বীথিকা বলল, 'অখ্যাতি হবে কি, হয়েছে। আপনাদের মত দু' একজন খ্যাতিমান এসে এবারে হাল না ধরলে আর ক্লাবের রক্ষা নেই।'

কিছুক্ষণ পরে সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেল। অতবড় হল ঘরে এখন শুধু দু'জন, অসিত আর সুজাতা। অসিত যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা ক'রে সরে বসেছে। সুজাতা কি একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে অসিতের কাছ থেকে কিছু শোনবারই প্রতীক্ষা করছে সে। কিন্তু অসিতও যে শুনতেই চায়।

আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর অসিত বলল, 'এবার আমিও চলি। রাত হয়ে যাচ্ছে।'

সুজাতা বই থেকে মুখ তুলে বলল, 'এখনই যাবেন ?'

অসিত বলল, 'হ্যাঁ এবার উঠি। দূর তো কম নয়।'

সুজাতা কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'আমাদের ক্লাব কেমন লাগল আপনার ?'

অসিত একটু হাসল, 'এত তাড়াতাড়ি কি সে কথা বলা যায় ?'

সুজাতা বলল, 'বুঝতে পারছি আপনার তেমন ভালো লাগে নি। কিন্তু আমরা যদি চেষ্টা করি একে নিশ্চয়ই ভালো লাগাবার মত করে গড়ে তুলতে পারি এ বিশ্বাস আমার আছে।'

'আমরা' কথাটা অসিতের কানে ভারি মধুর লাগল। সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেশ তো।'

একটু পরে সুজাতার কাছে বিদায় নিয়ে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল অসিত। বাস স্টপেজের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবল আজ একই দিনে দু' দু'টি সভায় উপস্থিত থাকবার সুযোগ হোল। সভ্য সংখ্যায় দুটি সভাই প্রায় সমান। তবু এদের ধরণ স্বতন্ত্র। নিজেদের এই ইউনিয়ন গড়ে তোলার কথা অসিত কেন সুজতোকে বলতে পারল না ? সুজাতা বিস্মিত হবে, ক্ষুণ্ণ হবে এই আশঙ্কা কি ছিল অসিতের মনে। নিশ্চয়ই না। বলবার সময় আসুক তখন বলবে বই কি। অসিত কিছুই গোপন করবে না। শ্যামলের কাছেও না, সুজাতার কাছেও না।

।

দিন কয়েক বাদে ছুটির পর শ্যামল ফের একদিন অসিতের বাসার দিকে রওনা হোল। দু'দিন ধরে অসিত অফিসে যায় না। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে বলে খবর পাঠিয়েছে। কেমন আছে একবার দেখে আসা দরকার, তা ছাড়া বিষ্ণুবাবুর ব্যাপারটা সম্বন্ধেও শ্যামল তার সঙ্গে পরামর্শ করবে। তিনি প্রায় রোজ এসে শ্যামলকে ধরছেন, 'একটা কিছু বিধি ব্যবস্থা করে দাও। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কি এই বুড়ো বয়সে না খেয়ে মরব।'

ইউনিয়ন গড়ে তোলবার উদ্যম অমন করে ব্যর্থ হওয়ায় শ্যামল সকলের ওপরই চটে ছিল। বিষ্ণুবাবুকে খুব ঝাঁঝাল গলায় জবাব দিয়েছে, 'মরে গেলে মরবেন। আমার কি করবার আছে বলুন ?'

কিন্তু পর মুহূর্তে এই শীর্ণদেহ ম্লানমুখ প্রৌঢ়টির দিকে তাকিয়ে শ্যামলের মন নরম হয়েছে, নিজের রূঢ় ভাষার জন্যে লজ্জা বোধ করেছে ভিতরে ভিতরে। কোমল স্বরে বলেছে, 'আপনি তো এ ব্যাঙ্কে অনেকদিন কাজ করছেন। কত বন্ধু বান্ধব আপনার। তাঁদের কাউকে ধরুন না।'

বিষ্ণুবাবু বলেছেন, 'ভুল করছ শ্যামল, কেউ কারো জন্যে এখানে টুঁ শব্দটি করবে না। সবাই যার যার নিজের চাকরি রাখতে, নিজের নিজের ইন্‌ক্রিমেন্ট প্রমোশন নিয়ে ব্যস্ত।

বলে তো নিজের জন্যে বলবে। নিজের আত্মীয়-কুটুম্বের চাকরির জন্যে ধরাধরি করবে, পরের জন্যে পরে বলতে যাবে কেন বল তো।'

শ্যামলের ইচ্ছে হয়েছে বলে, 'তা যদি না যায়, পরের জন্যে সত্যিই কেউ যদি কিছু না করে তাহলে আপনি আমার কাছে এসেছেন কোন ভরসায়।'

মনে এলেও শ্যামল অবশ্য মুখ ফুটে কথাটা বলেনি। কারণ তার কাছ থেকে বিষ্ণুবাবু যে কিছু প্রত্যাশা করছেন এতেই বোঝা যায় মানুষের ওপর এখনো তাঁর বিশ্বাস আছে। পরের বিপদে আপদে পর যে একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকবে না একথা তিনি এখনো ভিতরে ভিতরে মানেন। কিন্তু সহকর্মী বন্ধুদের ওপর বিষ্ণুবাবুর যদি তেমন আস্থা না থেকে থাকে তাহলে তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। বয়স্ক প্রবীণ সহকর্মীদের শ্যামলও তো এতদিন ধরে দেখে আসছে। প্রত্যেকেই একেকজন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বড় জোর পরিবারকেন্দ্রিক পুরুষ। স্ত্রী পুরুষ নিয়ে গড়া চার দেয়াল ঘেরা একএকটি ঘরই তাঁদের পৃথিবী। তাই বাইরে যে জগৎ আছে, মানুষ আছে, সেদিকে তাঁদের যেন কোন খেয়ালই নেই। অন্ততঃ নিজেরা যাঁরা পারিবারিক মানুষ তাঁদের তো অন্যের পরিবারের, তার স্ত্রী পুত্রের দুঃখ দুর্দশার কথা বুঝতে পারা উচিত। কিন্তু তাও যে তাঁরা পারেন না সে অভিজ্ঞতা শ্যামলের এই কয়েকদিনই হয়েছে। প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টের কর্তার কাছে সে অনুনয় বিনয় করেছে বিষ্ণুবাবুর জন্যে তাঁরা চেয়ারম্যানকে একবার বলুন। কিন্তু প্রত্যেকেই শ্যামলের প্রস্তাবটাকে একেবারে অসম্ভব আর অবাস্তব বলে মনে করেছেন। কারো মনের ভাব শুধু মৃদু হাসি কি মাথা নাড়ায় ব্যক্ত হয়েছে, কেউ বা দয়া করে দু একটি ভাষায় তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিষ্ণুবাবুর ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কি হয়েছে। চাকরি তো তাঁর একেবারে যায় নি। বরং এ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে একেবারে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সুরপতি বড় সহজ লোক নন। এ সব ব্যাপারে বরং ভারি কড়া, তাঁর মুখ থেকে একবার যা বেরোয় তা খণ্ডন হয় না। সহকর্মীদের এ সব যুক্তিজালের মধ্যে তাঁদের ঔদাসীন্য আর হৃদয়হীনতাই চোখে পড়েছে শ্যামলের। তাঁদের কাউকেই সে ক্ষমা করতে পারে নি। অবশ্য শ্যামল জানে বিষ্ণুবাবু এঁদেরই একজন। তিনিও আত্মসর্বস্ব স্বার্থপর। তবু তিনি আজ বিপন্ন। তাঁর দোষের কথা না ভেবে তাঁকে সাহায্যের উপায়ই সবাইকে আজ খুঁজে বের করতে হবে।

বাস স্টপেজে নেমে বড় রাস্তা পার হয়ে সরু গলির পথ ধরল শ্যামল। খানিকটা এগিয়ে অসিতদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বার দুই কড়া নাড়তেই মৃদু কণ্ঠে সাড়া এল, 'যাই'। তারপর খিল খোলার শব্দ। তারপর সংক্ষিপ্ত মধুর আমন্ত্রণ, 'আসুন।' শ্যামল চোখ তুলে দেখল উমা। শুধু গীতার সংস্কৃত শ্লোকই নয়, প্রকৃত বাংলা শব্দও ওর মুখে অদ্ভুত মিষ্টি লাগে।

শ্যামল ভিতরে ঢুকবার আগে জিজ্ঞাসা করল, 'অসিত কেমন আছে?'

উমা মৃদু হেসে বলল, 'ভালো। আজই ভাত খেয়েছে।' তারপর আর একবার

আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, 'আসুন, ভিতরে আসুন।' শ্যামল এবার উমার পেছনে পেছনে ওদের বড় ঘরখানিতে গিয়ে ঢুকল।

তক্তপোষের ওপরে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে অসিত পুরোন একটা মাসিক পত্রিকার পাতা উন্টাচ্ছিল। অরুন্ধতী নিচে বসে চাল বাছতে বাছতে বললেন, 'এই সন্ধ্যা বেলা ও সব বই টই রেখে দে অসিত। কি যে তোদের অভ্যাস হয়েছে, সব সময় চোখের সামনে একটা কিছু নিয়ে থাকাই চাই।'

অসিত হেসে বলল, 'তুমিও তো একটা কিছু নিয়ে না থেকে পার না মা।'

অরুন্ধতী বললেন, 'আমার সঙ্গে তোর তুলনা।'

এই সময় শ্যামলকে নিয়ে উমা ঘরে ঢুকল।

উমা বলল, 'দেখ মা কে এসেছেন।'

অরুন্ধতী ফিরে তাকিয়ে শ্যামলকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'এসো বাবা এসো।'

শ্যামল স্মিত মুখে বলল, 'ভালো আছেন মাসীমা?'

অরুন্ধতী বললেন, 'তোমরা কি ভাল থাকতে দাও যে ভালো থাকব? এই দেখ না ছেলে আবার কদিন ধরে জ্বর বাধিয়ে বসেছে।'

অসিত বন্ধুকে কাছে ডেকে বলল, 'এসো শ্যামল। মার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। একটু সর্দি জ্বর কি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছে আর কি রক্ষা আছে। এমন মাতৃস্নেহের পাল্লায় তুমি যদি পড়তে—।'

শ্যামল একটু হেসে বলল, 'তা ঠিক, পাছে স্নেহের বাঁধনে হাঁসফাঁস করতে হয় তাই বারা মার কাছ থেকে দূরে সরে এসেছি। শত ডাকাডাকি করলেও আর কাছে যাই না।'

অরুন্ধতী বললেন, 'কথা শোন ছেলের। বড় হয়ে গেলে তোমরা আমাদের এড়িয়ে চলতেই চাও।'

শ্যামল বলল, 'একেবারে এড়াতে পারি কই, মাকে এড়াই তো মাসীমা এসে জোটেন।"

অরুন্ধতী হাসি মুখখানা উমার দিকে ফিরিয়ে বললেন, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস। যা এবার শ্যামলের জন্যে একটু চা ক'রে আন।'

শ্যামল বলল, 'ওকে আর তাড়া দিতে হবে না মাসীমা। আমি যখন এসেছি চা-ও যথা সময়ে আসবে।'

কিন্তু মায়ের কথা শোনার পর উমা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল। মা মানুষকে ভারি অপ্রস্তুত করতে পারে, ভারি লজ্জা দিতে পারে। সত্যিই কি উমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাউকে দেখছিল। ছিঃ। শ্যামলবাবু না জানি কী-ই মনে করলেন।

শ্যামল অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একজনকে তো চা করতে পাঠালেন। আর একজন কই।' বলে একটু যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল শ্যামল। বন্ধুর বোন সম্বন্ধে এই

ঔৎসুক্য কতটুকু শোভন হবে তাই ভাবল। অরুন্ধতী সহজভাবে বললেন, 'নীলার কথা জিজ্ঞেস করছ? সে তো স্কুল থেকে এখনো ফেরেনি। দেখ মেয়ের কাণ্ড। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে তো সেই সাড়ে চারটেয়। ছ'টা বাজতে চলল এখনো বাড়ি আসার নাম নেই। এখনো কি ছাত্রীরা ওর কাছে পড়বার জন্মে বসে আছে। অসিত তুই একটু বলে দিস্ তো নীলাকে।'

অসিত বলল, 'দেব মা, দেব। অত ভাববার কিছু নেই। নীলা পথ ঘাট সব চেনে। কোথাও হারিয়ে যাবে না। কোন ভয় নেই তোমার।'

অরুন্ধতী বললেন, 'না, আমার ভয় ভাবনা কিসের। এখন তোমরা প্রত্যেকেই বড় হয়েছ। যার যার ভাল নিজেরা বুঝতে শিখেছ। আমার ভয় ভাবনাকে কি আর তোমরা গ্রাহ্য করবে?'

চালের ডালা নিয়ে অরুন্ধতী উঠে চলে গেলেন।

অসিত হেসে বলল, 'আচ্ছা মুশকিল হয়েছে মাকে নিয়ে। কথায় কথায় রাগ, কথায় কথায় অভিমান। আগে কিন্তু এমনটা ছিল না। বয়স বাড়লে বোধহয় মান যাওয়ার ভয়টাও বাড়ে শ্যামল। ভালো কথা বিষ্ণুবাবুর খবর কি?'

শ্যামল বলল, 'তাঁর বহু ভাগ্য যে এখনো তাঁর কথা তোমার মনে আছে।'

অসিত হেসে বলল, 'তুমি আমার মার উপযুক্ত বোনপো। লোককে অনর্থক অনুযোগ দিতে পারলে তুমি আর কিছু চাও না। বিষ্ণুবাবুর কথা আমার না হয় মনে নেই। কিন্তু তোমরাই বা মনে রেখে কী করতে পেরেছ শুনি?'

শ্যামল নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে বলল, 'সত্যি অসিত, কিছুই ক'রে উঠতে পারিনি। খোঁটা দেওয়ার তোমার অধিকার আছে। এতদিন ধরে প্রত্যেকটি সিনিয়র অফিসারের কাছে আমি গেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে কারো কিছু সাহায্য সহানুভূতি পাওয়ার আশা নেই। বেশ, চাইনে কারো সাহায্য। আমি একাই যাব।'

জুতোর শব্দে শ্যামল পিছন ফিরে তাকাল। নীলা এসে বাইরে দাঁড়িয়েছে। হাতে দড়ি বাঁধা একরাশ খাতা।

শ্যামলের দিকে চোখাচোখি হ'তে নীলা একটু হেসে বলল, 'ও, আপনি।'

সারাদিনের খাটুনিতে নীলার মুখে একটু ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। কিন্তু শ্যামলের মনে হোল একটু ক্লান্তি যেন প্রসাধনের মত ওর মুখের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। উমার মত মুখের ডৌল অত নিখুঁত নয় নীলার। গায়ের রঙও ময়লা। কিন্তু ওর স্বাভাবিক সপ্রতিভতা দেহের সব খুঁৎ যেন ঢেকে দিয়েছে।

অসিত বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয়, ঘরে আয়। মা তো তোর জন্যে মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। হাসছিস যে। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

নীলা বলল, 'তা হচ্ছে।'

'তবে?'

নীলা সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'শ্যামলবাবু একা একা কোথায় যাবেন বলে তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন দাদা ?'

অসিত হেসে বলল, 'ও, বাইরে থেকে শ্যামলের আস্ফালনটা বুঝি তোরও কানে গেছে।'

নীলা লজ্জিত হয়ে বলল, 'ছিঃ দাদা, ওকি কথা। আমি কি তাই বলেছি।'

অসিত বলল, 'ভাষায় বলিস নি বটে, কিন্তু ভঙ্গিতে অনেকটা সেই রকমই ফুটে উঠেছে।'

নীলা বলল, 'তুমি মানুষের নামে বড় মিথ্যে কথা বলতে পার দাদা।' তারপর শ্যামলের দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি একা একা কোথায় যাওয়ার সংকল্প করছিলেন ?'

শ্যামল লক্ষ্য করল ঠিক আগের দিনের আড়ষ্টতা নীলার মধ্যে আর নেই। ওর কথাবার্তার এই সহজ সরস ভঙ্গি শ্যামলের ভালোই লাগল। শ্যামল মৃদু হেসে বলল, 'দূর দুর্গম কোন দেশে নয়। কাছেই। একটা বিশেষ দরকারে আমাদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করবার কথা বলছিলাম।'

নীলা বলল, 'ও।'

শ্যামল বলল, 'আপনি হাসছেন। কিন্তু আপনি যদি আমাদের ব্যাঙ্কের কোন কেরানী হতেন তাহলে টের পেতেন ব্যাপারটা অত সহজ নয়।'

নীলা মৃদু হেসে বলল, 'কেরানী না হয়েও তা টের পাচ্ছি।'

শ্যামল বলল, 'কি করে।'

নীলা বলল, 'আপনাদের দেখে।'

চায়ের কাপ হাতে উমা এবার ঘরে ঢুকল। বোনের দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে কাপটি শ্যামলের দিকে এগিয়ে দিল উমা। তারপর বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

নীলা ওর পেছনে পেছনে বাইরে এসে উমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'অমন বিনা বাক্য ব্যয়ে চলে এলে যে দিদি।'

উমা একটু পিছিয়ে গিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'বাক্যের জন্যে তো তুমিই আছ।'

নীলা বলল, 'তা ঠিক। আমার কথা তোমার কাজ। আসতে না আসতেই চায়ের কাপটি হাতে করে নিয়ে হাজির। দু মিনিটও সবুর সইল না।'

উমা মুহূর্তকাল নীলার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ছোট বোনের এই তরল প্রগলভতায় যেন মহা বিরক্ত হয়েছে তেমনি ভঙ্গি ক'রে বলল, 'দেখ নীলা, ও সব বাজে রসিকতা তোর ভাল লাগতে পারে আমার মোটেই লাগে না। আমি তোকে বারণ করে দিচ্ছি ওসব ঠাট্টা আমার সঙ্গে তুই আর করতে আসিস নে। আশ্চর্য, এত কাণ্ডের পরও ঠাট্টার সাধ তোর আজও মিটল না।'

এত সামান্য ব্যাপারে সেই পুরোন কলঙ্কের খোঁটা যে উমা তাকে দিয়ে বলবে তা নীলা ভাবতে পারেনি। এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'না দিদি মিটল আর কই।'

উমা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার বোনের দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ ক'রে দিল।

রান্না ঘর থেকে অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। তারপর চাপা গলায় শাসনের সুরে বললেন, 'কী আবার হোল তোদের।'

নীলা বলল, 'কিছু হয় নি মা।'

অরুন্ধতী বললেন, 'কিছু হয় নি! আচ্ছা, বাইরের একজন লোকের সামনেও কি তোরা এমন করবি। লজ্জা সরমের মাথা কি তোরা একেবারেই খেয়েছিস?'

নীলা মৃদুস্বরে বলল, 'না না একেবারে খেতে পারি নি।'

একথা শুনে অরুন্ধতী যেন বাকশক্তি হারিয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

নীলা আর কোন কথা না বলে খাতাগুলি সামনের একটা জল চৌকির ওপর নামিয়ে রেখে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

খানিক বাদে হাত মুখ ধুয়ে সে যখন বেরিয়ে এল তার মুখে বিরাগ বিদ্বেষের কোন চিহ্নই আর দেখা গেল না।

তাদের যৌথ ঘরে উমা একা গিয়ে খিল এঁটে দিয়েছে দেখে নীলা ফের অসিতদের ঘরেই চলে এল। দুই বন্ধুর মধ্যে তখন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে জোর আলোচনা চলছে।

দোরের পাশে দাঁড়িয়ে নীলা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'আসতে পারি?'

শ্যামল বলল, 'নিশ্চয়ই, আসুন না।'

অসিত হেসে বলল, 'তোর আর অতো ভদ্রতা করতে হবে না। আয়, বোস এসে এখানে।'

বিষ্ণুবাবুর ব্যাপারটা নিয়েই দুই বন্ধুর মধ্যে তর্ক হচ্ছিল। অসিত বলছিল, তাদের যা বক্তব্য তা লিখে চেয়ারম্যানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাক। তারপর সেই আবেদনে যদি কোন ফল না হয় তখন না হয় কয়েকজনে মিলে সুরপতিবাবুর কাছে হাজির হওয়া যাবে।

শ্যামলের ধারণা ওসব আবেদন নিবেদনে কোন কাজ হবে না। সুরপতিবাবু যে ধরণের মানুষ তাতে তিনি কাগজখানা হয় ছিঁড়ে ফেলবেন না হয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য চেপে রাখবেন। তার চেয়ে যা বলবার মুখে মুখে বলা আর সঙ্গে সঙ্গে জবাব আদায় করাই ভালো।

অসিত বলল, 'কিন্তু তেমন জবাব যদি তিনি না দেন।'

শ্যামল বলল, 'তখন যা হয় অবস্থা বুঝে করা যাবে।'

তারপর হঠাৎ নীলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কী মত? আপনি কী বলেন?'

নীলা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আপনাদের অফিসের ব্যাপারে আমি কী বলব। তাছাড়া কী হয়েছে না হয়েছে আমি তো ভাল করে কিছুই জানিই না।'

শ্যামল বলল, 'জানেন না, জেনে নিন।'

প্রথম দিকে নীলার মনে হয়েছিল শ্যামল বুঝি লাজুক মুখচোরা। কিন্তু এখন দেখা গেল তা মোটেই না। দু' একদিনের অপরিচয়ের সংকোচ আর আড়ষ্টতা শ্যামল কাটিয়ে উঠতে পারে। সৌজন্য শিষ্টাচারের ছোট ছোট সিঁড়িগুলি সে লাফে লাফে ডিঙিয়ে যায়। শ্যামলের বেলায় এই উল্লঙ্ঘনকে মোটেই অশোভন বা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। তার প্রকৃতির সঙ্গে এই ব্যস্ততা আর দ্রুততার যেন বেশ সঙ্গতি আছে।

দু' তিন মিনিটের মধ্যে বিষ্ণুবাবুর কাহিনীটা শ্যামল নীলাকে আনুপূর্বিক বুঝিয়ে বলল। সামান্য ভুলের জন্যে তাঁকে কী ভাবে suspend করা হয়েছে; মানের দায়ে নয়, প্রাণের দায়ে তিনি কী ভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন; তাঁর এই বিপদে সহকর্মীরা কেমন নির্বিকার উদাসীন হয়ে রয়েছেন; তার বিবরণ দিতে শ্যামলের বেশি সময় লাগল না।

সব কথা শুনে নীলা বলল, 'বেচারা ভদ্রলোক তো তাহলে সত্যিই খুব অসুবিধায় পড়েছেন।'

শ্যামল বলল, 'রোজ এসে আমার কাছে ধন্না দিচ্ছেন। কিছু করতেও পাচ্ছি না আবার কিছু না করেও কোন স্বস্তি পাচ্ছি না।'

নীলা হঠাৎ বলে ফেলল, 'আমি হলে অস্বস্তি ভোগ করতাম না। সোজা সুরপতিবাবুর কাছে গিয়ে বলতাম, আপনি এমন অন্যায় করতে পারবেন না।'

নীলার ভঙ্গি দেখে অসিত হেসে বলল, 'আর সুরপতিবাবু তোর পিঠে হাত বুলিয়ে বলতেন, খুকি পুতুল খেলার পক্ষে জায়গাটা সুবিধের নয়, যাও ঘরের কোণে কি তক্তপোষের তলায় বসে খেল গিয়ে।'

নীলা রাগ করে বলল, 'দাদা তোমার পিঠে যে সে হাত বুলিয়ে যায় বলে আমার পিঠে হাত দেওয়ার কারো সাধ্য নেই।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'তাছাড়া অন্যায়কে অন্যায় বলা যদি পুতুল খেলা হয়, সে খেলা আমি চিরদিন খেলতে রাজী আছি।'

শ্যামল একটুকাল বিস্মিত মুগ্ধ চোখে নীলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমারও সেই কথা। এত ভাববার, এত ভয় করবার কী আছে অসিত। আমরা তো লাঠি-সোটা নিয়ে হৈ-হাঙ্গামা করতে যাচ্ছি না। শান্ত ভদ্রভাবেই চেয়ারম্যানকে অনুরোধ ক'রে বলব বিষ্ণুবাবুর কেসটা আপনি দয়া ক'রে আর একবার বিবেচনা ক'রে দেখুন স্যার।'

অসিত একটু চিন্তা ক'রে বলল, 'বেশ, তাই যদি তোমরা সবাই মিলে স্থির ক'রে থাক, আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। আমার আর আপত্তির কী আছে।'

শ্যামল বলল, 'ও কি কথা হোল। তুমি আমাদের সঙ্গে কেন যাবে, আমরাই বরং তোমার সঙ্গ নেব। বুদ্ধি বিবেচনার কোন একটা বিষয় সাজিয়ে গুছিয়ে বলবার জন্ত তোমার মত আমাদের মধ্যে কেউ আর নেই। তুমি সত্যিই আমাদের মুখপাত্র, অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা।'

অসিত একটু হেসে বলল, 'থাক থাক। তুমি যত প্রশংসাই কর, যত সুখ্যাতিই কর, আমার সম্বন্ধে নীলার ধারণা মোটেই বদলাবে না। কী বলিস নীলা?'

পরদিন অসিত অফিস গেলে শ্যামল স্থির করল, আর কাল বিলম্ব নয় সেইদিনই সুরপতিবাবুর সঙ্গে তারা দেখা করবে। লোন ডিপার্টমেন্টের শৈলেন কর, লেজারের সত্য চাটুয্যেও তাদের সঙ্গে যেতে রাজী হোল। দুজনেরই বয়স পঁচিশের নীচে। বেপরোয়া স্পষ্ট বক্তা হিসাবে দুজনেরই খ্যাতি আছে।

ছুটির পরে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন সুরপতিবাবু। চারজন গিয়ে তাঁর টেবিলের সামনে দাঁড়াল। তিনি চশমার পুরু কাঁচের ভিতর দিয়ে সকলের মুখে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার। আমার হেড অফিসে কি মাত্র এই চারজন ক্লার্ক? আর বেশি নেই?'

সুরপতির টেবিলের সামনে সারি সারি খান চারেক গদি আঁটা চেয়ার রয়েছে। আশে পাশে সোফা কোচেরও অভাব নেই। কিন্তু কর্মচারীদের কাউকে বসতে বললেন না সুরপতি। তারা দাঁড়িয়েই রইল।

একটু বাদে অসিত সবিনয়ে বলল, 'আপনি বিরক্ত হবেন বুঝতে পেরেও একটা জরুরী ব্যাপারে আপনার কাছে না এসে পারলাম না।'

সুরপতি রূপালী এ্যাসট্রেতে চুরুটের ছাই ঝেড়ে শান্তভাবে বললেন, 'বিরক্ত হব জেনেও যখন এই দলবল নিয়ে এসেছ তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব জরুরী। বিষয়টা শুনি।'

অসিত একবার শ্যামলের দিকে তাকাল, তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আমরা বিষ্ণুবাবুর কেসটা সম্বন্ধে আপনাকে একটু বলতে এসেছি।'

সুরপতি ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমার সময় কম। ভণিতার দরকার নেই। যা বলবার বলে ফেল।'

অসিত মৃদু হেসে বলল, 'আমরা তাড়াতাড়িই বলব। কিন্তু আপনাকে একটু ধীরে সুস্থে ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। সামান্য ভুল-চুকের জন্যে বিষ্ণুবাবুকে অমন গুরুতর শাস্তি দেওয়াটা—।'

সুরপতি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কোনটা সামান্য আর কোনটা গুরুতর সে বিচার যদি তুমিই করবে, তাহলে এই চেয়ারে তুমি এসে বোস অসিত।'

অসিত বলল, 'আপনি রাগ করছেন!'

সুরপতি বললেন, 'এটা রাগের কথা নয়, বিচার বিবেচনার কথা।'

শ্যামল এবার বলল, 'আপনাকে বিবেচনা করবার জন্তেই অনুরোধ করছি। বিষ্ণুবাবুর অনেক পোষ্য। এই সামান্য আয়ে তাঁর সংসার চলা কঠিন। এরপর যদি দু' একমাস তাঁর মাইনে বন্ধ থাকে ছেলেপুলে নিয়ে সব শুদ্ধ উপোস করতে হবে।'

শ্যামলের কথার কোন জবাব না দিয়ে সুরপতি অসিতের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন, 'তোমরা কি চতুর্মুখে চেঁচাবার জন্তে জোট বেঁধে এসেছ?'

অসিত বলল, 'না, না, আমি একাই বলছি। সত্যি বিষ্ণুবাবুর সংসারের জন্তে—।'

সুরপতি বললেন, 'তোমরা একজন বিষ্ণুবাবুর সংসারের কথা ভাবছ, আমাকে হাজার হাজার পরিজনের জন্তে মাথা ঘামাতে হয়। কর্মচারীদের অনিয়ম অনাচারে ব্যাঙ্কের সুনাম যদি নষ্ট হয়, তাহলে কারবার বন্ধ ক'রে দিতে হবে। আর তাতে কত জন বিষ্ণুবাবুর স্ত্রীপুত্রকে নিরন্ন হতে হবে সে কথা ভেবে দেখেছ?'

এই ধমকের জবাবে হঠাৎ কেউ কোন কথা বলতে পারল না। সুরপতিবাবু বলে চললেন, 'এ ভাবালুতার জায়গা নয় অসিত। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা নিয়ে কারবার। লোকে তাদের কষ্টের ধন আমার হাতে বিশ্বাস ক'রে রেখে যায়। আর আমাকে দিন রাত জেগে সেই ধনকে পাহারা দিয়ে রাখতে হয়। সে পাহারা সিন্দুকে চাবি তালা দিয়ে নয়, সব ঝুঁকি নিজের ঘাড়ে নিয়ে দেশের কল্যাণের জন্তে সে টাকা দশজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে। এরই নাম ব্যাঙ্কিং। ব্যক্তিগত ভাবালুতায় যদি একবার ভাসতে শুরু করি তাহলে সব ভেসে যাবে।'

উত্তেজিত সুরপতি একটু থেমে দম নিলেন, তারপর তাদের চলে যাওয়ার ইঙ্গিত ক'রে বললেন, 'আচ্ছা এবার এসো তোমরা। জেনারেল ম্যানেজার এক্ষুনি আসবেন এখানে। তাঁর সঙ্গে অনেক দরকারী কথাবর্তা আছে।'

তবু অসিত একবার শেষ চেষ্টা ক'রে বলল, 'যদি এবারের মত তাঁকে ক্ষমা করেন—।'

সুরপতি অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বললেন, 'তাঁকে ক্ষমাই করা হয়েছে। অন্য কোথাও হ'লে তিনি একেবারেই discharged হতেন।'

কলিং বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে সুরপতি বললেন, 'অবনীবাবুকে আসতে বল এ ঘরে।'

অসিতরা আর দেরি না ক'রে চেয়ারম্যানের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ব্যাঙ্কের বাইরে এসে অসিত শ্যামলদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম।'

শ্যামল গম্ভীর মুখে সংক্ষেপে বলল, 'হুঁ।'

এই প্রথম পরাভবে শ্যামল যে ভেঙে পড়েছে তা তার মুখ দেখে মনে হোল না। সুরপতির এই ব্যবহারে সে মোটেই বিস্মিত হয় নি। বরং চেয়ারম্যান যদি তাদের প্রার্থনা সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করতেন তাহলেই বিস্ময়ের কারণ ঘটত। আর কিছু না হোক,

কজনে মিলে যে বিষয়টা নিয়ে সুরপতির সামনে দাঁড়াতে পেরেছে এও কম কথা নয়। ব্যাঙ্কের ইতিহাসে এমন ঘটনাও এই প্রথম।

বিষ্ণুবাবুর বিষয়টা বিবেচনা ক'রে দেখবার জন্য অসিতরা চেয়ারম্যানকে অনুরোধ ক'রে আসবার পর আরো দু' সপ্তাহ গেল। কিন্তু বিষ্ণুবাবু মাইনে পেলেন না।

সন্ধ্যার পর তিনি আজ নিজেই অসিতের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। অপরিচিত এই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখে অরুন্ধতী মাথায় আঁচল টেনে দিলেন। তারপর মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কাকে চান?'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'অসিতবাবুকে। তিনি আছেন?'

অরুন্ধতী স্মিতমুখে বললেন, 'আছে। আসুন, ভেতরে আসুন।'

তাঁর অসিত আজ এত বড়, এত গণ্যমান্য হয়েছে যে বাপের বয়সী বৃদ্ধ তাকে অসিতবাবু বলে ডাকছেন। ভেবে মনে মনে হাসলেন অরুন্ধতী। তারপর ঘরের ভিতর থেকে ছেলেকে ডেকে বললেন, 'কে এক ভদ্রলোক তোমার খোঁজ করছেন। বোধহয় তোমাদের অফিসের কেউই হবেন।'

একটু আগে অফিস থেকে ফিরে অসিত বোনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। বিষ্ণুবাবুকে দেখে উঠে এসে বলল, আরে আপনি যে. আসুন আসুন, ঘরে আসুন।'

অসিতের গলায় একটু অতিরিক্ত উল্লাসের সুরই ফুটে উঠে থাকবে। কিন্তু বিষ্ণুবাবুর চেহারা দেখে নিজের উৎসাহের আধিক্যে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ল অসিত। এই কয়েকদিনেই ভাবনা চিন্তায় একেবারে আধখানা হয়ে গেছেন বিষ্ণুবাবু। মুখে সপ্তাহখানেকের দাড়ি জমেছে, গায়ে একটা ময়লা র‍্যাপার জড়ানো। পায়ে একজোড়া জীর্ণ স্যাণ্ডাল। অসিতের মনে পড়ে গেল বিষ্ণুবাবু আজ মাইনে পান নি। এবার মৃদু বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে অসিত বলল, 'আসুন বিষ্ণুবাবু।'

বিষ্ণুবাবু একবার ইতস্ততঃ করে বললেন, 'ঘরের ভিতরে যাব?'

অসিত বলল, 'আসুন না। আমাদের সদর অন্দর বলে আলাদা কিছু নেই। আসুন। ওরা আমার দু' বোন, উমা আর নীলা। আর ইনি বিষ্ণুবাবু।'

নীলা হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'ও।'

তারপর কৌতূহলী দৃষ্টিতে বিষ্ণুবাবুর দিকে তাকাল। এর সমস্যা নিয়েই শ্যামল আর তার দাদা এতদিন ধরে এত আলোচনা করেছে।

কিন্তু বিষ্ণুবাবুর চোখে কোন কৌতূহল ফুটে উঠল না। নীলাদের নমস্কারের বিনিময়ে শিষ্টাচার মেনে কোন নমস্কারও করলেন না তিনি। অসিতের দিকে তাকিয়ে শুরুতেই কাজের কথা পাড়লেন, 'আমার কী ব্যবস্থা করলেন অসিতবাবু?'

অসিত একটু বিব্রতভাবে নীলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা একটু চা-টা ক'রে আনতো।'

ইঙ্গিত পেয়ে উমা আর নীলা দু'বোনই ঘর থেকে চলে এল।

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'চা-টায়ের দরকার নেই অসিতবাবু। আমার কী উপায় করলেন তাই বলুন। আমি যে আপনাদের ভরসাতেই আছি।'

তক্তপোষের একধারে বিষ্ণুবাবুকে বসতে বলে অসিত আস্তে আস্তে বলল, 'আপনি তো জানেন আমরা চেষ্টার ক্রটি করিনি। এখনো সাধ্যমত চেষ্টা করছি—।'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু সংসারটা কী করে চালিয়ে রাখব বলুন! এতগুলি কাচ্চা বাচ্চা। অথচ একটা পয়সা নেই ঘরে।'

অসিত বলল, 'কিছু তো অজানা নেই বিষ্ণুবাবু। বিপদে পড়লে মানুষকে ধৈর্য ধরে থাকতে হয়। আমরা সহজে ছাড়ব না। আমরা আর একবার চেয়ারম্যানের কাছে যাব ঠিক করেছি।'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'আর গেছেন আপনারা! ততদিন আমি বোধ হয় সারা হয়ে যাব।'

অসিত একটু হেসে বলল, 'বিপদে আপদে অত অধীর হলে চলে না বিষ্ণুবাবু। মাথা ঠিক রাখতে হয়।

বিষ্ণুবাবু অসিতের দিকে তাকিয়ে দুঃখিত ভাবে বললেন, 'আমার মত বুড়ো মানুষকে ওসব কথা আর বেশি বোঝাতে হবে না অসিতবাবু। ওসব উপদেশ আমিও অনেককে দিয়েছি।'

অসিত একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'না না বিষ্ণুবাবু, এসব কী বলছেন। আপনাকে উপদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতা আমাদের কারোরই নেই। শুধু অবস্থাটা বুঝে বলছি।'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'অবস্থা খুবই বুঝেছি অসিতবাবু, কিন্তু রাত পোহালে ছেলেপুলে-গুলির সামনে কী ধরে দেব সেই কথাটা আমাকে আপনারা বুঝিয়ে দিন।'

অসিত লক্ষ্য করল বিষ্ণুবাবুর চেহারাও যেমন রুক্ষ, কথাবর্তার ধরণও তেমনি নীরস কাঠখোট্টা রকমের। তাঁর ভাষায় কোন অনুনয়ের সুর নেই। অসিতরা তাঁর পরিবার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতে যেন বাধ্য, তাদের ওপর যেন জন্মগত দাবী আছে বিষ্ণুবাবুর। মনের অপ্রসন্নতা মুখে ফুটতে দিল না অসিত। আগের মতই শান্তভাবে বলল, 'আপনার সমস্যার সমাধান করা তো কারো একার সাধ্য নয় বিষ্ণুবাবু। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি। ইচ্ছা আছে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু কিছু চাঁদা তুলে দেব। শ্যামলের সঙ্গে সেই আলোচনাই হয়েছে। আজকে গোটা দশেক টাকা আমার কাছ থেকে নিন আপনি। নিয়ে দু'একদিন খরচপত্তর চালান। তারপর দেখি কতদূর কী ক'রে ওঠা যায়। আপনি কোন সংকোচ করবেন না। পরে এক রকম সুবিধে মত দিয়ে দিলেই হবে।'

নীলা চা আর খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। দুটো সিঙ্গাড়া আর একটি সন্দেশ আনিয়ে নিয়েছে গলির মোড়ের মিষ্টির দোকান থেকে। তাই ডিসে ক'রে সাজিয়ে বিষ্ণুবাবুর সামনে দিল। তিনি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বললেন, 'আবার এসব কেন।' কিন্তু একটা সিঙ্গাড়া

যখন ভেঙে মুখে দিলেন তখন আহারে তাঁর স্পৃহার অভাব আছে বলে মোটেই মনে হোল না অসিতের। সিঙ্গাড়ার টুকরো মুখে দিয়ে চিবানো বন্ধ ক'রে তিনি বললেন, 'নিজে তো রাক্ষসের মত খাচ্ছি অসিতবাবু, ওদিকে বাড়িতে বাচ্চাগুলির যে কী অবস্থা—।'

নীলা আর সেখানে দাড়াল না। তাড়াতাড়ি সরে এল সামনে থেকে।

অসিত বলল, 'আপনি কিছু ভাববেন না। তাদের ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই হবে।'

উঠে গিয়ে মার কাছ থেকে একখানা দশ টাকার নোট চেয়ে বিষ্ণুবাবুর সামনে রেখে দিল অসিত। তিনি হাত মুছে নোটখানাকে ভাজ করে সযত্নে ঘড়ি-পকেটে রেখে দিয়ে বললেন, 'আপনার আশ্রয় যখন নিয়েছি একটা গতি আমার হবেই তা আমি জানি।' একটুকাল চুপ করে রইলেন বিষ্ণুবাবু, তারপর হঠাৎ বললেন, 'কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না অসিতবাবু, পাকাকাকি একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।'

অসিত সবিনয়ে বলল, 'বলুন কী করতে পারি।'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'বলব বইকি, আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলব অসিতবাবু। বলবার মত আর আছে কে। আর তা ছাড়া যাকে তাকে বলে লাভই বা কি।'

তারপর একটু গলা নামিয়ে বিষ্ণুবাবু ফের বললেন, 'আমি বলি কি অসিতবাবু, ওসব দল বেঁধে টেধে কোন লাভ নেই। চেয়ারম্যান তেমন লোকেই নন। পাঁচজন কেন পঁচিশ জন জোট বেঁধে গেলেও তিনি তাঁর জিদ ছাড়বেন না। কিন্তু একজন যদি বলে তার কথা তিনি নিশ্চয়ই শোনেন।'

অসিত বলল, 'বলুন অফিসের কার কথায় কাজ হবে। কাকে দিয়ে বলাব।'

বিষ্ণুবাবু ফিস ফিস করে বললেন, 'অফিসের কাউকে দিয়েই কোন সুবিধে হবে না অসিতবাবু। ম্যানেজারই বলুন একাউণ্ট্যাণ্টই বলুন, কারো সাধ্য নেই চেয়ারম্যানের কথার ওপর কথা বলে। সে সাহসই নেই কারো। শুধু একজন পারে।'

অসিত বলল, 'কে সে?'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'চেয়ারম্যানের মেয়ে। সুজাতা। শুনেছি তার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। আপনি যদি একটু তাকে বলেন—।'

অসিত উত্তেজিত স্বরে বলল, 'অসম্ভব। আমি তা বলতে পারব না।'

বিষ্ণুবাবু কাতরভাবে বললেন, 'আপনি নিজের জন্যে তো বলবেন না, আমার জন্যে বলবেন। এতই যখন করেছেন, দয়া করে এই উপকারটুকু করুন অসিতবাবু। মুখ ফুটে আপনি তাকে একবার বলুন তাহলে সব হবে।'

বলতে বলতে হঠাৎ অসিতের দু'খানা হাত জড়িয়ে ধরলেন বিষ্ণুবাবু। অসিত মুহূর্তকাল স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আপুনি যা বলছেন, তা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আমার যতটুকু সাধ্য আমি তা করেছি। আমাকে মাপ করবেন।'

বিষ্ণুবাবুও অসিতের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হোল খুব একটা কঠিন রূঢ় কথাই তিনি বলে বসবেন। কিন্তু না, একটু বাদে তাঁর মুখ থেকে ঠিক আগের মতই নরম অনুনয়ের ভাষা বেরিয়ে এল।

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'সম্ভব না হলে আর বলবেন কি করে অসিতবাবু। আমি ভেবেছিলাম বুঝি সম্ভব হবে। যাক, আপনাকে অনর্থক বিরক্ত করে গেলাম। কিছু মনে করবেন না। আপনি যা উপকার করেছেন মায়ের পেটের ভাইও আজকাল তা করে না। আপনার কাছে চিরকালের জন্যে কেনা হয়ে রইলাম।'

কৃতজ্ঞতার এই অতিশয়োক্তি বড়ই কৃত্রিম মনে হোল অসিতের। অদ্ভুত এক বীতস্পৃহায় এমন কি বিদ্বেষে তার সমস্ত মন ছেয়ে গেল। নিঃশব্দে বিষ্ণুবাবুকে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল অসিত। সাধারণ সৌজন্য রাখবার জন্যেও একটা কথা তার মুখ থেকে বেরোল না।

ছেলে গম্ভীর মুখে ফের ঘরে এসে বসল দেখে অরুন্ধতী তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু হেসে বললেন, 'কী হোল রে। ভদ্রলোকের সঙ্গে চটাচটি করে এলি নাকি !'

অসিত বলল, 'না চটাচটি করতে যাব কেন। কিন্তু মানুষের আবদারের একটা সীমা আছে।'

নীলা কোথায় ছিল এগিয়ে এসে ফোড়ন কেটে বলল, 'আছে নাকি। আমার তো মনে হয় নেই।'

অরুন্ধতী মেয়েকে তাড়া দিয়ে বললেন, 'তুই যা তো এখান থেকে। সব কথার মধ্যেই তোর এসে হাজির হওয়া চাই, না ?' তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভদ্রলোক কী বললেন তোকে—।'

বিষ্ণুবাবুর বক্তব্যটা এবার মাকে জানাল অসিত। অনুরোধটা যে মোটেই রুচিসম্মত নয়, ন্যায়সঙ্গত নয় সে সম্বন্ধেও তার মতামতটা খুব জোরের সঙ্গেই প্রকাশ করল।

অরুন্ধতী বললেন, 'তা দেখলিই বা বলে, যদি তাতে ভদ্রলোকের উপকার হয়।'

অসিত উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'মা, মহা উপকার হলেও আমি তা পারব না। আমার তা পারা উচিত নয় মা।'

'দেখ ভেবে যা ভালো বোঝ।' বলে অরুন্ধতী ফের রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কিন্তু নীলা সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল না। সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'পারলে মন্দ হোত না দাদা। এই উপলক্ষে সুজাতার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎটা হয়ে যেত। অনেকদিন তো যাওনা ওদিকে।'

অসিত এবার চটে উঠে বলল, 'দেখ নীলা তুই বড্ড বেড়ে গেছিস। তোর ধারণা ওই ধরণের ঠাট্টা তামাসা সকলের সব সময় ভাল লাগে।'

নীলা গম্ভীর ভাবে বলল, 'না, আমার সে রকম ধারণা নেই। তবে কোন কোন লোকের কোন কোন সময় খুবই ভালো লাগে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু ঠাট্টার

কথা থাক দাদা। বিষ্ণুবাবুর জন্যে সুজাতাকে তুমি অনুরোধ করতে পারবে না, কি করতে চাও না সে কথা আলাদা, কিন্তু পারা একেবারেই উচিতই নয়, এমন কথা অত জোর ক'রে তুমি বলতে পার না।'

অসিত রুক্ষস্বরে বলল, 'কেন পারব না শুনি? প্রত্যেকেরই একটা প্রিন্সিপ্‌ল আছে। আমি আমার এই প্রিন্সিপ্‌ল মেনে চলি।'

নীলা একটু বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'সে কথা অবশ্য ঠিক। তবে সে প্রিন্সিপ্‌লটা নিজের বেলায় একরকম আর অন্য লোকের বেলায় অন্য রকম।'

অসিল বলল, 'তার মানে?'

নীলা জবাব দিল, 'মানেটা সোজা। তোমার নিজের চাকরির বেলায় মেয়েদের সাহায্য যে তুমি নাওনি একথা তুমি হলফ ক'রে বলতে পার না। সাধ্যমত মাও তোমাকে সাহায্য করেছে, সুজাতাও যে একেবারে না করেছে তা নয়। বিষ্ণুবাবুর মত নিজে যদি তুমি কোন দিন অমন বিপদে পড় তাহ'লে ফের তোমাকেও হয়ত ভিখারী শিব সেজে সুজাতার দোরে গিয়ে হাত পাততে হবে। কিন্তু পরের জন্যে অতখানি পারা যায় না। সেই কথাটুকু স্বীকার করলেই সব গোলমাল মিটে যায়।'

বলতে বলতে নীলা ঠোঁট টিপে একটু হাসল, 'ওসব বড় বড় কথা আউড়ে লাভ নেই দাদা। নিজের মনের কাছে নিজে যত পরিষ্কার থাকা যায় ততই ভালো।'

নীলার কথা শুনে খানিকক্ষণ স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে বসে রইল অসিত। তার এই ছোট বোনটির দৃষ্টি বড় বক্র। সে মানুষের সব কিছু যাচাই করে নিতে চায়। মানুষের শুভ বুদ্ধি সদুদ্দেশ্য ও মর্য্যাদাবোধের মধ্যেও নীলা অনেক মেকি জিনিস আবিষ্কার করে। ওর যুক্তি বুদ্ধির প্রাবল্য আছে। সে কথা অসিত অস্বীকার করেনা। কিন্তু যুক্তির তীক্ষ্ণতাই কি সব? যদি মায়া মমতা সহানুভূতিই না থাকল ওর মনে তাহলে শুষ্ক যুক্তির পথ ওকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে কে জানে। অসিত বারবার নিজের মনকে যাচাই করে দেখল। কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করতে পারল না বিষ্ণুবাবুর ওপর তার কর্তব্যের ত্রুটি হয়েছে। সুজাতার কাছে এই নিয়ে আবেদন নিবেদন করতে যাওয়ার প্রস্তাবে কিছুতেই তার মন সায় দিল না। তার পৌরুষে আর সম্ভ্রমবোধে বাধল। অসিতের মনে হোল আসলে নীলাও ব্যাপারটা সমর্থন করে না; শুধু তাকে চটাবার জন্যে, জব্দ করবার জন্যেই অমন তর্ক করেছে।

বিষ্ণুবাবু কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না। বসে থাকবার তাঁর জো ছিল না। ব্যাঙ্কের চীফ একাউন্ট্যান্ট শ্রীপতি ভট্টাচার্য থাকেন মধু বোস লেনে। বিষ্ণুবাবু সেই রাত্রেই তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ডাক শুনে শ্রীপতিবাবু তাঁর দোতলার ঘর থেকে নিচে নেমে এলেন। রাস্তার ধারের ঘরখানিতে একধারে তক্তপোষ পাতা। তার ওপর শ্রীপতিবাবুর ছোট ভাই ভূপতি দুটি ছেলেকে পড়াচ্ছিল। বিষ্ণুবাবুকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকলেন শ্রীপতিবাবু।

দেয়াল ঘেঁষে তিনখানা চেয়ার পাতা রয়েছে। তার একখানির দিকে চেয়ে বললেন, 'বোসো। কী ব্যাপার হে বিষ্ণু। এত রাত করে যে।'

শ্রীপতিবাবু ব্যাঙ্কের বহুদিনের পুরোন কর্মচারী। সুরপতিবাবুর ব্যাঙ্কের সেই সুরু থেকে আছেন। মাইনে ও পদমর্যাদায় দু'তিন জন তাঁর উপরে চলে গেলেও শ্রীপতিবাবু ব্যাঙ্কে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছেন। এই একান্ত বিশ্বস্ত আর অনুগত কর্মচারীকে সুরপতিবাবু খুবই প্রীতির চোখে দেখেন। তখনকার আমলের অনেক পুরোন কর্মচারীকেই তিনি নানা অজুহাতে ব্যাঙ্ক থেকে সরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু শ্রীপতিবাবুর আসন অটুট রয়েছে। এখনো সুরপতিবাবু শ্রীপতি ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈষয়িক অবৈষয়িক নানা ব্যাপারে পরামর্শ করেন। বাড়িতে কোন কাজ-কর্ম হলে সেখানে সব চেয়ে আগে শ্রীপতিবাবুর ডাক পড়ে। ব্যাঙ্কে তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি সম্বন্ধে কারো মনে কোন সন্দেহ নেই। ক্ষমতা আছে শ্রীপতিবাবুর। কিন্তু সেই ক্ষমতা তিনি যত্রতত্র ব্যবহার করেন না। সাধারণ অনুনয় বিনয়ে তাঁর মন গলে না। এদিক থেকে নির্মম নিষ্ঠুর বলে খানিকটা অখ্যাতি আছে শ্রীপতিবাবুর। সবাই বলে সুরপতির অনুকরণে, অনেকটা তাঁর ছাঁচে ঢেলে নিজেকে তিনি তৈরী করে নিয়েছেন। সুরপতির মত অতটা ভয় তাঁকে কেউ না করলেও সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলে। পারতপক্ষে কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষে না।

বিষ্ণুবাবুও যতদূর সম্ভব তাঁকে এড়িয়েই চলেছেন। এমন বিপদের দিনেও শ্রীপতিবাবুর দ্বারস্থ হবার কথা প্রথম দিকে তার মনে হয় নি। কিন্তু আজ ভাবলেন ফল হোক আর না হোক একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি। বড় জোর গালমন্দ করবেন বকাবকি করবেন, বড়জোর বলে দেবেন, 'আমার দ্বারা কিছু হবে না।' তার বেশি তো কিছু বলতে পারবেন না।

পথে আসতে আসতে স্ত্রী সুরবালার পরামর্শও মনে পড়েছে বিষ্ণুবাবুর। সুরবালা বলেছে, 'দেখ বিপদের দিনে অত মান অভিমান সাজে না।'

মান অভিমানের বালাই বেশি রাখেন নি বিষ্ণুবাবু। সম্মান ও সম্ভ্রম ভুলে ছোট বড় সকলেরই হাতে পায়ে ধরাধরি করেছেন। কিন্তু স্ত্রীর কাছে সে কথা তিনি স্বীকার করতে পারেন নি। বরং এমন ভাব দেখিয়েছেন যেন সত্যিই খুব একটা বিচলিত হন নি। যেন দুদিন বাদে চেয়ারম্যান নিজে থেকেই তাঁর মত যোগ্য লোককে ডেকে নেবেন। শুধু তাঁর ভুল ভাঙবার জন্যে কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে এই যা। সুরবালা যে স্বামীকে না চেনে না বোঝে তা নয়। যেন তেন প্রকারে চাকরিটা ফিরে পাওয়ার জন্যে স্বামী যে চেষ্টার কসুর করবেন না এ বিশ্বাস তার আছে। তবু এ ব্যাপারে বেশি বলায় দোষ নেই। সুরবালা তাই স্বামীকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে, 'আজ তোমার মান অভিমানের দিন নয়। নিজেদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু চার চারটি ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তো তাকাতে হবে। যেমন করেই হোক ওদের নুনভাতের জোগাড় তো রাখতেই

হবে তোমাকে। তুমি যদি না পার, তোমার যদি সাহসে না কুলোয় কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে আমি যাই সুরপতিবাবুর বাড়িতে।'

বিষ্ণুবাবু স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বলেছেন, 'থামো বেশি বকবক করো না। ওদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। তাই বলে মান সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে—।'

মনে মনে ভেবেছেন অন্য কোন উপায়ে যদি ফল না হয় সেই চরম ব্যবস্থা তো আছেই। কিন্তু তাতেই কি কোন সুরাহা হবে—সুরপতি এসব পছন্দ করেন না। এর আগেও দু'একজনে এভাবে চেষ্টা করে দেখেছে। সুরপতি তাতে আরো রেগে গেছেন। গালমন্দ করে সেই সব কৃপাপ্রার্থীকে বিদায় করেছেন। ফল আরো খারাপ হয়েছে তাতে।

শ্রীপতিবাবুর কথার জবাবে বিষ্ণুবাবু বললেন, 'বড় বিপদে পড়েছি। আপনি তো সব জানেন।'

শ্রীপতিবাবু বললেন, 'না কিছুই জানিনে। তুমি কি কিছু জানিয়েছ যে জানব? আজকাল তোমার বড় সাঙাৎ বড় বন্ধু হয়েছে ছোকরার দল। সিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশেছ তুমি। তারা তোমাকে উদ্ধার করবে। কেন করল না উদ্ধার? আমার কাছে আজ এসেছ কেন? যাও তাদের কাছে যাও। দল পাকাও গিয়ে। পাণ্ডাগিরি কর গিয়ে দলের।'

মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যে বিষ্ণুবাবু একটি কথা বলবারও সুযোগ পেলেন না। সে চেষ্টাও করলেন না। অপরাধীর মত মাথা নীচু ক'রে রইলেন। শ্রীপতির রূঢ় ভাষার অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলল কিছুক্ষণ ধরে। কিশোর বয়সী দুটি ছেলে পড়া ভুলে মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকাতে লাগাল। শ্রীপতি তা লক্ষ্য ক'রে ছেলেদের আর তাদের প্রাইভেট টিউটারকে এক সঙ্গে ধমক দিলেন, 'তোরা এদিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে কি দেখছিস শুনি। তোদের পড়া তোরা পড়বি। ওহে মাস্টার, তোমার ছাত্রদের সামলাও দেখি। বলে বলে তো আমি হয়রাণ হয়ে গেলাম।' কানের কাছে এত গোলমাল করলে যে পড়াশুনোর ব্যাঘাত হয় একথা মাস্টার ছাত্র কারোরই বলবার সাহস হোল না।

একটু বাদে শ্রীপতিবাবু বিষ্ণুবাবুর দিকে চেয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় এবং শান্ত স্বরে বললেন, 'যদি বাঁচতে চাও ও সব দলবল ছাড়। একা যাও। একা গিয়ে কর্তার দু' পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাও। অফিসের কাজে ভুল হয়েছে তাতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি, অমনি ভুল অনেকেরই হয়। কিন্তু তুমি কোন আক্কেলে ওই হুজুকে ছোকরাদের সঙ্গে মিলে মিশে দল পাকাতে গেলে শুনি? বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে গোল্লায় দিয়েছ? মাথার চুল তো অর্ধেকের বেশি সাদা হয়েগেছে দেখছি। এত চুল কি বয়সে পাকল না বাতে?'

সত্যিই অত বেশি চুল পাকবার মত বয়স বিষ্ণুবাবুর হয়নি। অল্প বয়সে বেশি চুল পাকাটা তাঁদের বংশের নিয়ম। কিন্তু সে কথা স্ত্রীকে বললেও তা ওপরওয়ালা

মুরব্বিকে বলবার মত সাহস পেলেন না বিষ্ণুবাবু। শ্রীপতিবাবুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ গালমন্দ সবই ন্যায্য শাস্তি বলে মাথা পেতে নিলেন।

অনেকক্ষণ পরে শ্রীপতিবাবু এক সময় বললেন, 'আচ্ছা, একবার সন্ধ্যার দিকে যেয়ো অফিসে। চেষ্টা ক'রে দেখা যাবে কতটা কি ক'রে ওঠা যায়। কর্তার মেজাজ তো জানো। আর কারো অনুরোধ উপরোধে কোন ফল হবে না। যদি কিছু হয় তোমার নিজের কাকুতি মিনতিতেই হবে। চেয়ারম্যান নিজেও তাই চান। যার যা বলবার সে নিজের মুখে বলুক। আমমোক্তারী আর জোট পাকানো তিনি দু'চোখে দেখতে পারেন না।'

শ্রীপতিবাবুর কাছ থেকে এতটা দাক্ষিণ্যও আশা করেন নি বিষ্ণুবাবু। তিনি কিছুটা ভরসা নিয়েই বাসায় ফিরলেন।

দু'দিন বাদে অফিসের সবাই অবাক হয়ে দেখল বিষ্ণুবাবু আবার তাঁর নিজের উঁচু চেয়ারটিতে লেজার খুলে বসেছেন। গম্ভীর রাশভারি মুখের ভঙ্গি। বিষ্ণুবাবুর মুখখানাও যেন চেয়ারম্যান চীফ একাউণ্ট্যাণ্টের ছাঁচে ঢালাই হয়ে এসেছে। কোন সহকর্মীর দিকে আর তাকাচ্ছেন না বিষ্ণুবাবু। যেন কারো সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় নেই। অসিত আর শ্যামলের সঙ্গে যতবার চোখাচোখি হোল ততবারই তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তাঁর। কারো কৌতূহল মিটাবার জন্য তার বিন্দুমাত্র গরজ নেই।

মেয়ের জন্মদিনে সুরপতি প্রতিবছরই নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করেন। মেয়ের বন্ধুদের বলবার ভার অবশ্য তার উপরই ছেড়ে দেন। এবারও তাই দিলেন। সুজাতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার বন্ধুদের মধ্যে যাকে যাকে বলবে আগে থেকেই বলে রেখ বুলু। দেখ যেন কেউ বাদ না পড়ে।'

সুজাতা হেসে বলল, 'সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে না বাবা। আমার বন্ধুরা তো তোমার বন্ধুদের মত অগুণতি নয়। দু'একজন যা আছে পাড়ার মধ্যেই আছে। কিন্তু বাবা —।'

'থামলে কেন, বল।'

সুজাতা বলল, 'আমি বলছিলাম কি যে, এবার আর ওসব আড়ম্বর অনুষ্ঠানের দরকার নেই। এবার ইচ্ছে করছে জন্মদিনে চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকি। না হয় বাইরে কোথাও গিয়ে দিনটা একা একা কাটিয়ে আসি।'

রবিবারের বিকাল। খোলা বারান্দায় ইজি চেয়ারে ঠেস দিয়ে চুরুট টানতে টানতে মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন সুরপতি। চোখ ছিল সামনের লনটির দিকে। কিন্তু সুজাতার কথার ভঙ্গিতে তিনি হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটু চড়া গলায় ডাকলেন, 'বুলু।'

সুজাতা বিস্মিত হয়ে মুখ তুলল, 'কী বলছ বাবা।'

সুরপতি বললেন, 'আমাকে একটা কথা সত্যি ক'রে বলবি ?'

সুজাতা বলল, 'তোমার কাছে কোন কথাই কি মিথ্যা করে বলি বাবা। তার কি জো আছে।'

সুরপতি অধীর হয়ে বললেন, 'ও সব কথার মার প্যাচ আমার ভালো লাগে না। আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার স্পষ্ট জবাব চাই। কেন তুই এমন করে বেড়াচ্ছিস বল তো। মুখে হাসি নেই, মনে স্ফূর্তি নেই, কারো সঙ্গে মিশবিনে। একি স্বভাব হচ্ছে তোর। কেন এমন যৌবনে যোগিনী হয়ে থাকবি তুই? তোর কিসের অভাব ?'

সুজাতা মৃদু হাসল, 'আমার কোন অভাব নেই বাবা। সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

সুরপতি ধমক দিয়ে উঠলেন, 'না, আমাকে ভাবতে হবে কেন? ভাববে এসে বুঝি পাড়ার আর পাঁচজন? আমি জানি তোর কিসের অভাব।'

সুজাতা এবার একটু কৌতুক বোধ করল, 'জানো না কি? বল দেখি।'

সুরপতি হাসলেন না, গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোর মত বয়সের মেয়ের এমন চুপচাপ, নিষ্কর্মা থাকা উচিত নয়।'

সুজাতা বলল, 'বাঃ রে, আমি নিষ্কর্মা থাকতে চেয়েছি? আমি তো বলেইছিলাম, বাড়িতে বসে বসে আমার আর সময় কাটতে চায় না। আমাকে স্কুলের চাকরিটা নিতে দাও বাবা। তা তুমিই তো দিলে না। এতদিনে হেডমিস্ট্রেস হয়ে যেতে পারতাম।'

সুরপতি বললেন, 'দরকার নেই তোমার হেডমিস্ট্রেস হয়ে। যারা সময় কাটাবার জন্যে কাজ নেয় তাদের দিয়ে কাজ হয় না। তারা সখ মেটাতে আসে সখ মিটিয়ে যায়। সত্যিকারের কাজ তারাই করতে পারে যাদের কাজ না করলে চলে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাদের পেটের ভাত জোগাড় করতে হয়, কাজ যা করবার তারাই করে। এই জন্যেই তোমাকে আমি কোন চাকরি বাকরিতে ঢুকতে দিইনি। তাতে তোমারও সময় নষ্ট; যেখানে কাজ করতে হবে তাদেরও কোন লাভ নেই।'

সুজাতা একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তাহলে কি সারাজীবন এমনি বিনা কাজেই কাটবে?'

সুরপতি জবাব দিলেন, 'বিনা কাজে কাটবে কেন? মাস্টারী আর কেরানীগিরি ছাড়া কি সংসারে আর কোন কাজ নেই? ঘর সংসারের কাজ কর। তোমার বয়সে মেয়েদের পুরো একটা সংসারের মধ্যে থাকা দরকার। যে সংসারে মেয়েদের স্বামী আছে, ছেলে মেয়ে আছে, সেখানে তার কাজের অভাব নেই। সেখানে সময় কাটাবার ভাবনা তাকে ভাবতে হয় না।'

সুজাতা বলল, 'কিন্তু স্বামী আর ছেলেমেয়ে থাকলেই কি সংসারে সকলের কাজ থাকে বাবা? আমাদের পাড়ার ডাঃ সেনের স্ত্রী মিসেস সেনকেই দেখ না। নিজের সংসারে তিনিও তো কোন কাজ খুঁজে পান না। সব ঝি চাকররাই সারে। তিনি সিনেমা দেখেন, ব্রীজ খেলেন, পার্টিতে যান, তবু তাঁর সময় কাটতে চায় না।'

সুরপতি চটে উঠে বললেন, 'কিন্তু মিসেস সেনেদের সংখ্যা কজন, শুনি? ও যার যার অভ্যেস, স্বভাব। কুঁড়ে মেয়েমানুষ শুধু বড়লোকের ঘরে নেই, গরিবদের ঘরেও আছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলেন। খানিক বাদে সুজাতা উঠতে যাচ্ছিল, সুরপতি তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'বোসো বুলু, তোমার সঙ্গে আরো কথা আছে।'

সুজাতা ফের বসে বলল, 'কি কথা বাবা।'

সুরপতি একটু লঘু কোমল স্বরে বললেন, 'এবার তোমার মন স্থির ক'রে ফেল, আমি দিন স্থির করি। অবনীর বাবা অভয়চরণ অধীর হয়ে উঠেছেন। তার শরীরও ভালো যাচ্ছে না। ষাটের ওপর বয়স হয়েছে। হার্টের রোগী। কখন কি হয় বলা যায় না। ওর ইচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলেন। অবনীও তাই চায়। ব্যাপারটাকে কেউ আর এমন ক'রে ঝুলিয়ে রাখতে চায় না।'

সুজাতা একথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। এবার সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আলো জ্বলে উঠেছে রাস্তায়। চাকর নীলাম্বর এসে এদিকের আলোগুলি জ্বেলে দিয়ে গেল, কিন্তু সুজাতার মনে হোল খানিকক্ষণ এই পাতলা আঁধারে বসে থাকতে পারলে যেন ভালো হোত। এত কড়া আলো চোখে সব সময় যেন সহ্য হয় না। এই আলো মনের নিভৃত কোণে যেন অকস্মাৎ গিয়ে অনধিকার প্রবেশ করে।

একটু চুপ করে থেকে সুজাতা বলল, 'আর এককাপ চা খাবে বাবা? যাই তোমার জন্যে চা ক'রে নিয়ে আসি।'

সুরপতি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'না, না, চায়ের আমার এখন দরকার নেই। তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও।'

সুজাতা মৃদু স্বরে বলল, 'আমাকে আরো কিছুদিন সময় দাও বাবা।'

সুরপতি বললেন, 'আরো সময়? তোমাকে দু'বছর ধরেই তো সময় দিচ্ছি। এর আবার সময় অসময়ের আছে কি? পাত্র ঠিক হয়ে আছে, কথাবার্তা ঠিক হয়ে আছে, মেলামেশা মাখামাখির কিছুরই আর বাকি নেই। বাকি শুধু বিয়ে। শুধু পিঁড়িতে বসে পুরুত ডেকে কয়েকটা মন্তর আওড়ানো। এইটুকু সময় তোমার আর এর মধ্যে হয়ে উঠল না?'

সুরপতির ভাষা ক্রমেই রূঢ় হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু সুজাতা তাতে বিস্মিত হোলো না। বাবার স্বভাব সে ছেলেবেলা থেকে জানে। মেজাজ বিগড়ে গেলে তাঁর মুখের

ঠিক থাকে না। সভ্য শিক্ষিত নাগরিকের ভাষা থেকে অতি সহজেই তিনি প্রাকৃত ভাষায় নেমে আসেন।

মেয়েকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে সুরপতি ফের বললেন, 'বাধাটা কী? আটকাচ্ছে কোথায় তাই বল তো আমাকে। এতো আর ঘটকালি করা বিয়ে নয়। তোদের মধ্যে অনেক আগে থেকেই আলাপ হয়েছে। দুজনে দুজনের গুণাগুণ জেনেছিস। এখন ফের দোমনা হচ্ছিস কেন। অবনী যে তোকে ভালোবাসে তাতে তো আর কোন সন্দেহ নেই।'

আগে সুরপতি এসব প্রসঙ্গ পাড়লে সুজাতা লজ্জিত হোত। বাবার মুখে কি এসব কথা মানায়?

কিন্তু শুনে শুনে সুজাতার সংকোচ এখন আর তেমন নেই। দরকার হলে বাবা তার সঙ্গে সবরকম আলোচনা করেন, না করে উপায় কি। বাড়িতে থাকবার মধ্যে আছেন শুধু দূর সম্পর্কের বিধবা কাকীমা। সেকেলে চাল চলনে অভ্যস্ত। ভাসুরের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলেন না, ঘোমটা টেনে চলা ফেরা করেন। সুজাতার সঙ্গেও যে তার মনের কথার তেমন বিনিময় হয় তা নয়। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা রুচি-সব বিষয়েই দুজনের মধ্যে গভীর পার্থক্য। তবু কাকীমা আর মেয়ের মধ্যে প্রায় খোলাখুলি ভাবে সব রকম আলোচনা চলে।

মেয়েকে নীরব দেখে সুরপতি আর একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তেমন সন্দেহের কোন কারণ নেই। অবনী যে তোকে ভালোবাসে এ একেবারে নিশ্চিত কথা।' সুজাতা হঠাৎ বলে উঠল, 'তার চেয়েও বেশি ভালোবাসে তোমার সম্পত্তিকে, তোমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সকে। তোমার যদি টাকা না থাকত বাবা আমার দাম তার কাছে কাণাকড়ির চেয়ে বেশি হোত না।'

সুরপতি স্থিরদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় কথা বুলু। অবনীর সঙ্গে পরিচয় আমাদের আজকের নয়। তাকে আমি চিনি। সে শুধু অর্থলোভে তোমাকে ভালোবাসে এমন মিথ্যে অপবাদ আমি তার নামে কিছুতেই দিতে পারব না। ধন সম্পত্তি কে না চায়। কিন্তু তাই তার একমাত্র চাওয়া নয়। জানিনে অবনীর ওপর এমন ধারণা তোমার কোত্থেকে এলো। কিন্তু এ তোমার একেবারে ভুল ধারণা।'

সুজাতা একথার কোন জবাব দিল না।

সুরপতি বললেন, 'যদি বিয়েতে তোমাদের আরো দেরি হয়, তাহলে এই ভুল বোঝাবুঝি আরো বেড়ে যাবে। আমারই ভুল হয়েছে, অনেক আগেই জোর করে তোমার বিয়ে দেওয়া আমার উচিত ছিল।'

সুরপতির গলার স্বরে চাপা রাগ আর অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল।

আরো কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর সুজাতা এক সময় উঠে পড়ল। উঠে এসে আস্তে

আস্তে নিজের ঘরে ঢুকল সুজাতা। কাকীমা অনুপমা কখন এসে আলো জেলে দিয়ে গেছেন, কিন্তু এ মুহূর্তে আলোটা কিছুতেই যেন সহ্য হতে চাইল না সুজাতার। সুইজটা অফ্‌ করে দিয়ে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে জানালার কাছে এসে বসল। সেদিনের সেই ঘটনাটার কথা আজও সে ভুলতে পারছে না।

সুজাতার জীবনের সঙ্গে সেই ছোট্ট ঘটনাটুকুর এমন কি যোগ আছে যে কদিন ধরে তার মন কেবলই তা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে!

ব্যাপারটা ঘটেছিল সেদিন বীথিকা সেনের বাড়িতে। ঘটনাটা অবশ্য সেদিনের নয়। বছর পাঁচেক আগেকার। শুধু তার ইতিবৃত্তটুকু সুজাতা সেদিন শুনতে পেয়েছিল।

যাত্রী সঙ্ঘের সেদিন বৈঠক ছিল বীথিকা সেনের বাড়িতে। সভ্য সভ্যাদের কয়েকটি গল্প পাঠের পর তা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা চলল। ছেলেরা মেয়েদের লেখার নিন্দা করল, পাণ্টা জবাবে মেয়েরা বলল ছেলেদের গল্পগু'লি একেবারেই কিছু হয় নি। তর্কে বিতর্কে রাত বেড়ে চলেছিল, বোধহয় শেষই হয়ে যেত যদি না প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ক'রে বীথিকাদি সকলের মুখ বন্ধ ক'রে দিতেন।

সবাই কথা বলছিল, হৈ চৈ করছিল, শুধু একটি মেয়ে চুপচাপ এক কোণে বসেছিল আর থেকে থেকে সুজাতার দিকে তাকাচ্ছিল। সেই দৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু ছিল যার জন্যে বার বার অস্বস্তি বোধ করছিল সুজাতা। কি আছে সেই দৃষ্টিতে। নতুন পরিচয়ের কৌতূহল না অন্য কিছু সুজাতা ভেবে পাচ্ছিল না। সভার প্রথমে বীথিকাদি অবশ্য এই নবাগতার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন; 'মাধুরী ভট্টাচার্য, ফুলতলা গার্লস স্কুলে টিচারী করেন; সাহিত্য, সংস্কৃতির ব্যাপারে খুব উৎসাহ আছে।'

সুজাতার মতই বয়স, তেইশ চব্বিশ। কি দু' এক বছর বেশিও হতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ মেয়েটি সভায় ছিল উৎসাহব্যঞ্জক কোন লক্ষণ তার চোখে মুখে দেখা যায়নি, লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু সুজাতার দিকে তাকানো ছাড়া। অমন করে এতদিন ছেলেরাই তাকিয়েছে। তার অর্থ বুঝতে সুজাতার দেরি হয়নি, কিন্তু মেয়েটির এই দৃষ্টির মানে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না সুজাতা, আর তা না পেয়ে তার মন ক্রমেই অস্বস্তিতে ভরে উঠছিল।

বৈঠক শেষ হয়ে যাওয়ার পর দলে দলে সবাই বিদায় নিল। কেবল সুজাতারই যাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না।

বীথিকা বলল, 'কি ব্যাপার, আজ কি তুমি এখানে থাকতে চাও নাকি?'

সুজাতা জবাব দিল, 'অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।'

বীথিকা হেসে বলল, 'না ভাই আপত্তি না থাকলেও সাহস নেই, মেসোমশাই তোমার খোঁজে এক্ষুণি এসে পড়বেন।'

সুজাতা বলল, 'আমার ফিরতে দেরি হলে বাবা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েন বটে, কিন্তু

ছুটোছুটি করেন না। কিন্তু ওকথা থাক। আমি অন্য একটা বিষয় আপনার কাছে জিজ্ঞেস করব বলে এখনো অপেক্ষা করছি।'

বীথিকা মৃদু হেসে বলল, 'সেটুকু তুমি না বললেও আমি বুঝতে পারতাম। ভূমিকা রেখে এবার আসল কথাটি বল!'

সুজাতা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'আচ্ছা বীথিকাদি, এই মাধুরী মেয়েটি কে?'

বীথিকা মুখ টিপে হেসে বলল, 'তোমার স্মরণশক্তি এত কমে গেল কী করে সুজাতা। এইতো খানিকক্ষণ আগেও তার নাম আর পেশার কথা তোমাকে বললাম।'

সুজাতা বলল, 'শুধু নাম আর পেশার কথা শুনলেই কি কাউকে পুরোপুরি চেনা যায়?'

বীথিকা হেসে বলল, 'ওরে বাবা। এত শক্ত শক্ত কথা জিজ্ঞেস করলে আমার মাথা ঘুরে যাবে সুজাতা।'

সুজাতা বলল, 'তাহলে একটা সহজ কথাই জিজ্ঞেস করি। মাধুরী আমার দিকে বারবার অমন করে তাকাচ্ছিল কেন? সে কী দেখেছিল আমার মধ্যে?'

হঠাৎ বীথিকার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, 'নিজের সতীনকে।'

দুজনেই একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বীথিকা মুখে ফের হাসি টেনে বলল, 'তুমি অমন পাথর বনে গেলে কেন সুজাতা। আমি তোমাকে ঠাট্টা করছিলাম। শঙ্করকে গাড়ি বার করতে বলি। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক, আর তোমার দেরি ক'রে কাজ নেই। রাত ন'টা বাজতে চলল।'

সুজাতা বলল, 'তা বাজুক। সব কথা আপনার কাছ থেকে না শুনে আমি আজ কিছুতেই এখান থেকে নড়ব না। কী ব্যাপার, সব আমাকে খুলে বলতেই হবে।'

বীথিকা কিছুই বলবে না, সুজাতাও কিছুতে না শুনে ছাড়বে না। তার জবরদস্তিতে শেষ পর্যন্ত বীথিকাকেই হার মানতে হলো। বীথিকা সংক্ষেপে বলল, 'শুনেছি মাধুরী ভট্টচাযের সঙ্গে অবনীবাবুর এক সময় আলাপ পরিচয় ছিল। বিয়ের কথাবার্তাও এগিয়েছিল।'

সুজাতা বলল, 'তারপর পিছিয়ে গেল কী ক'রে।'

বীথিকা বলল, 'অবিবাহিত ছেলে মেয়ের মধ্যে এমন কথাবার্তা কত এগোয় কত পিছোয় তার হিসেব কে রাখে বল।'

সুজাতা বলল, 'আর কেউ না রাখলেও মাধুরী রেখেছে বলে মনে হোল। ওর তো এখনো বিয়ে হয় নি।'

বীথিকা বলল, 'না। শুনেছি বিয়ে করবে না বলে ও পণ করেছে। এসব ব্যাপারে ও বড় সেন্টিমেণ্টাল, বড় সেকেলে!'

সুজাতা বলল, 'হুঁ।' তারপর একটু থেমে ফের বলল, 'আচ্ছা বীথিকাদি আমাকে একটা সত্যি কথা বলবেন? ওদের বিয়ের সম্বন্ধ ভাঙল কেন?'

বীথিকা বলল, 'অবনীবাবুর বাবা নাকি কিছুতেই মত দিলেন না।'

সুজাতা বলল, 'কেন ?'

বীথিকা বলল, 'তুমি যে একেবারে উকিলের জেরা আরম্ভ করলে। যতটা শুনেছি দুই-পরিবারের আর্থিক সামাজিক অবস্থার ভারি অমিল ছিল তাই। মাধুরীর বাবা ছিলেন সামান্য পোস্ট মাস্টার। আর অবনীবাবুদের ধন সম্পদের অসামান্যতার কথা তো তুমি নিজেই জানো।'

সুজাতা আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু তাই কি সব ?'

বীথিকা বলল, 'সব না হলেও অনেকখানি। আমাদের সমাজে বিয়ে মানে তো একটি পরিবারের সঙ্গে আর একটির পরিবারিক কুটুম্বিতা। সে দুটি পরিবার যদি বিত্তে প্রতিপত্তিতে এক রকম না হয় তাহলে তাদের মিল হবে কি ক'রে।'

সুজাতা বলল, 'কিন্তু অবনীবাবু কেন সুবোধ ভাল ছেলের মত তাঁর বাবার মত মেনে নিলেন ? যে মেয়েকে ভালোবাসেন সে মেয়েকে শুধু বাপের নিষেধে বিয়ে করলেন না ! আজকালকার ছেলেরা কি এমনি ব্যক্তিত্বহীন ?'

বীথিকা একটু হাসল। 'তুমি মিছি মিছি রাগ করছ সুজাতা। অবনীবাবুর বাবা কি যে সে বাবা যে তাঁর কথা তিনি না মেনে পারেন ? তুমি পার তোমার বাবার কথা আগ্রহ্য করতে ?'

সুজাতা মৃদু স্বরে বলল, 'তা ঠিক।'

বীথিকা সুজাতাকে গাড়িতে করে বাড়ি পর্যন্ত সেদিন এগিয়ে দিয়েছিল। ফিরে আসার সময় বলেছিল, 'এ সব নিয়ে মন খারাপ কোরো না সুজাতা। আর দোহাই তোমার এ নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করতেও যেয়ো না। আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। তুমিই কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বের করলে। কিন্তু সাপের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছ এ সাপ একেবারে মরা সাপ। তোমার কোন ভয় নেই।'

সুজাতা একটু হাসল, 'ভয় ! ভয় আমার কিছুতেই নেই বীথিকাদি।'

বীথিকা বলল, 'অবশ্য পিতৃভক্ত হওয়ার ফল অবনীবাবুর বেলায় আরো এক দিক থেকে ভালোই হয়েছে। সেদিন যদি গোয়ার্তুমি করে বিয়ে করে বসতেন তাহলে ঠকতেন। তোমার মত রত্ন তাঁকে আর লাভ করতে হোত না।'

সুজাতা বলল 'রত্ন ! কিন্তু সে রত্ন তো তাঁর হাতে গিয়ে এখনো পৌঁছায় নি।'

বীথিকা বলল, 'ওই হোলো। হাতের মুঠিতে না হোক হাতের নাগালের ভিতর তো পেয়েছেন। এবার তোমরা বিয়েটা ক'রে ফেল সুজাতা, আর দেরি কোরো না।'

সুজাতা বলল, 'অনেক ধন্যবাদ বীথিকাদি।'

সুজাতার গলার স্বরে একটু শ্লেষ ছিল তা বীথিকার কান এড়াল না।

বীথিকা তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যদি এ নিয়ে মন খারাপ করো সুজাতা আমি সত্যি বড় দুঃখ পাব। এসব অনেকদিন আগেকার কথা। চার পাঁচ বছর হলো। তারপর অবনীবাবু সমুদ্র পারাপার করেছেন। কালসমুদ্রও এতদিনের সব ধুয়ে মুছে ফেলেছে।'

সুজাতা একথার কোন জবাব দিল না। মনে মনে ভাবল সব যে মুছে যায়নি তার প্রমাণ মাধুরীর চোখ, আর সে চোখের দৃষ্টি।

এরপর অবনীর সঙ্গে দু'দিন দেখা হয়েছে। ব্যাঙ্কের কাজ সেরে অবনী চলে এসেছে সুজাতাদের বাড়ি। চা খেয়েছে, গল্প করেছে। ভুলেও বিয়ের কথা তোলেনি। অসীম ধৈর্য অবনীর। সুজাতার বারবার ইচ্ছা হয়েছে মাধুরীর কথাটা অবনীকে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কিসের একটা সংকোচ তার মুখ চেপে ধরেছে। অবনী যদি নিজে সে সব কথা বলবার প্রয়োজন বোধ না ক'রে থাকে সুজাতারই বা এমন গরজ কিসের। তাছাড়া তাদের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠই হোক সামাজিক ভদ্রতা, শোভনতার নিয়ম কানুনগুলি তাকে মেনে চলতেই হবে।

সুজাতার ইচ্ছা ছিল না এবারকার জন্মদিনে কোনো আড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। তার মন এসব ব্যাপারে যেন আর কিছুতেই সাড়া দিচ্ছে না। কিন্তু সুরপতি কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন, 'বছরে এই একটি মাত্র দিন আমার আনন্দ আহ্লাদের জন্যে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আসে, গল্প গজব করে তাও তোর সহ্য হয় না।'

সুজাতা বলল, 'বেশ তো অন্য কোন উপলক্ষে ওসব কর। জন্মদিনের উৎসব অল্পবয়সীদের আর বুড়ো বয়সীদের মানায়। আমাদের বয়সীদের এসব সাজে না। বেশ তো এরপর থেকে তোমার জন্মদিনেই এসব অনুষ্ঠান হোক।'

সুরপতি ছদ্ম কোপে বললেন, 'তুই আমাকে বুড়ো বললি বুঝি।'

সুজাতা হেসে বলল, 'বালাই, বুড়ো হতে যাবে কোন দুঃখে। কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না বাবা, সামনের বার থেকে আমরা সত্যিই তোমার জন্মদিন করব।' সুরপতি বললেন, 'দাঁড়া চুলগুলি আরো ভালো ক'রে পাকুক, দাঁতগুলি পড়তে আরম্ভ করুক! তারপর ওসব শুরু করা যাবে।'

শেষ পর্যন্ত বাপ আর মেয়ের মধ্যে আপোষ হয়ে গেল। সুজাতার জন্মদিনে সুরপতি তাঁর অল্পসংখ্যক বন্ধুদের বলবেন বটে কিন্তু মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষেই যে বলেছেন সে কথা কাউকেই জানাবেন না। জানালে সবাই কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসবেন। এখন তো আর ছোট মেয়ে নেই সুজাতা। তাই এ ধরণের অনুষ্ঠানে কারো কাছ থেকে উপহার নিতে বড় সংকোচ বোধ হয় তার। তা তিনি বাবার বন্ধুই হোন আর নিজের বন্ধুই হোন।

সুরপতি বললেন, 'আমি তো কাউকে তোর জন্মদিনের কথা বলিনে। বছর বছর শুধু এই দিনটিতে তাদের আসতে বলি। কিন্তু উপলক্ষটা তারা কি করে যেন মনে রাখে। তার জন্যে কেউ কিছু না কিছু নিয়ে আসতে ভোলে না।'

সুজাতা বলল, 'সেই জন্যেই তো তোমাকে বলি বাবা তোমার বন্ধুদের খাওয়ার তারিখটা বদলাও। একুশে অগ্রাণটা বাদ দিয়ে ক্যালেণ্ডার থেকে আর যে কোন একটা তারিখ বেছে নাও, তাহলে উপহারের হাঙ্গামা আর পোহাতে হবে না।'

সুরপতি বললেন, 'আচ্ছা সে যা হয় পরের বছর দেখা যাবে।'

বেছে বেছে যাত্রী সঙ্ঘের কয়েকজনকে বলল সুজাতা। এ পাড়ায় যে সব খ্যাতিমান বিত্তবান রয়েছেন, বিশেষ করে যাঁরা ব্যাঙ্ক ইন্‌সিওরেন্স ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাঁদের সঙ্গে সুরপতির ঘনিষ্ঠতা। যাঁর সঙ্গে সুরপতির বন্ধুত্ব তাঁর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে সুজাতার তেমন অন্তরঙ্গতা না থাকলেও, সামাজিক শিষ্টাচার বজায় রাখবার জন্যে তাঁদের নিমন্ত্রণ করে আসতে গেল। এই উপলক্ষে আর একজনের কথা মনে পড়ে গেল সুজাতার। অসিত। কিন্তু অসিতকে না ডাকলে সে আর আসে না। সে যদি সুজাতার বন্ধুত্ব স্বীকারই করবে তাহলে একবারও কি সে নিজে থেকে খোঁজখবর নিতে পারত না? তাকে ডেকে দরকার নেই সুজাতার। সে যদি সাধারণ সৌজন্য শিষ্টাচারের সম্পর্কটুকুও না রাখতে চায় তাহলে সুজাতারই বা কি এমন দায় পড়েছে যে সে বারবার যেচে তাকে ডাকতে যাবে?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা টিকিয়ে রাখতে পারল না সুজাতা। অসিতকে আসতে বলে দু'লাইনের একখানা আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে তবে সে স্বস্তি পেল। সে চিঠিতে কোন উপলক্ষের কথা লিখল না। শুধু লিখল অসিত যদি বুধবার দিন সন্ধ্যার পর সুজাতাদের বাড়িতে একবার বেড়াতে আসে তাহলে তারা বড়ই খুশি হবে। ওদিন খাওয়ার নিমন্ত্রণও রইল অসিতের।

অবনীকে বিশেষ ভাবে বললেন সুরপতি। তিনি অনুমান করেছিলেন অবনীর সঙ্গে সুজাতার ঝগড়ার পালা চলেছে। এবয়সে অতি সামান্য কারণে বড় উল্টো পাল্টা হাওয়া বয়। জোয়ার ভাঁটার কোন সময় ঠিক থাকে না। অভিভাবক হিসেবে সুরপতিকেই সব দিক সামলে নিতে হবে। যদি সুজাতার মা বেঁচে থাকত তাহলে এদিকে সুরপতির কোন দায়িত্ব থাকতনা। কিন্তু সে অকালে মারা যাওয়ায় ঘরে বাইরের সবরকম কাজের চাপ তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছে।

একুশে অগ্রহায়ণ ভোরবেলা থেকেই বাড়ির চাকর বাকরদের দল ব্যস্ত হয়ে উঠল। সুরপতি প্রতিপদে তাদের ধমকাতে শুরু করলেন। একাজ হচ্ছে না, ও কাজে দেরি হচ্ছে, সুরপতির বিরক্তির আর সীমা নেই।

সুজাতা একবার এসে হেসে বলল, 'আজও যদি তুমি ওদের অমন ধমকাও বাবা

তাহলে এ দিনটির কোন মাধুর্যই থাকবে না। নিজেদের খুশিমত ওদের কাজ করতে দাও, দেখবে সময়মত সবই হয়ে গেছে।'

সন্ধ্যার পর থেকে অভ্যাগতরা আসতে শুরু করলেন। সুরপতি নিজে তাঁদের অভ্যর্থনা করে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেলেন। প্রত্যেকের পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে হাসিমুখে রসিকতা করলেন। বাবার এই প্রসন্ন সরস ব্যবহার দেখে সুজাতা নিজেই যেন অবাক হয়ে গেল। নিজের জন্মদিনের অনুষ্ঠানটিকে যদি কিছু মাত্র ভালো লেগে থাকে সুজাতার তা এই জন্যেই। বাবার প্রসন্ন মন এমন আর বছরের অন্য কোন দিন সে দেখতে পায়না।

সুরপতির বন্ধু মেজর দত্ত এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, 'কই অবনীকে দেখছিনে তো, সে কোথায়?'

সুরপতিও তার জন্যে মনে মনে উদ্বেগ বোধ করছিলেন। মেয়েটা কি তাকে তেমন করে বলেনি? বুলুর বয়স বাড়ছে কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান বাড়ছে না।

মেজর দত্তের জবাবে মুখে হাসি টেনে বললেন, 'বোধহয় অফিসের কাজ সেরে বেরুতে দেরি হচ্ছে। কাজ থাকতে অবনীর আর কোন দিকে খেয়াল থাকে না।'

মেজর দত্ত বললেন, 'ঠিক আপনার মতই হয়েছে। শ্বশুরের উপযুক্ত জামাই-ই হবে। কিন্তু শুভকাজটি এবার সেরে ফেলুন। এ সব ব্যাপার এমন করে ঝুলিয়ে রাখা তো কাজের কথা নয়।'

মেজর দত্তের সঙ্গে এডভোকেট মজুমদার আর অধ্যাপক সেহানবীশও সায় দিলেন।

সুরপতি গম্ভীর মুখে বললেন, 'হ্যাঁ, আমারও তাই ইচ্ছে। অঘ্রাণ তো গেলই, পৌষে তো এসব কাজ চলেই না, ভেবেছি মাঘের প্রথমেই—।'

মেজর দত্ত বললেন, 'খুব ভাল কথা। মাঘ খুব প্রশস্ত মাস। ও সময় খেয়ে আর খাইয়েও বেশ আরাম।' কথা শেষ করে সশব্দে হেসে উঠলেন মেজর দত্ত।

কেউ কেউ এরই মধ্যে ঘড়ি দেখতে শুরু করেছিলেন। এদের প্রত্যেকেরই অন্য কাজ, অন্য দরকার রয়েছে। ইঙ্গিত বুঝে সুরপতি তাঁদের খেতে দেওয়ার কথা বললেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করলেন বন্ধুদের। ঠিক এই সময় অবনীও এসে পৌঁছল।

সুরপতি অপ্রসন্নভাবে বললেন, 'এত দেরি করলে যে।'

অবনী লজ্জিত ভাবে বলল, 'একটু দরকার ছিল।'

ওর মুখের ভঙ্গি দেখে সুরপতির বুঝতে বাকি রইল না যে, সে দরকার ব্যাঙ্কের জন্যে নয়, তাঁর মেয়ের জন্যেই। মৃদু হেসে বললেন, 'যাও, উপরে যাও। বুলু বোধ হয় ওর বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।'

অবনী স্মিতমুখে সুরপতির নির্দেশ মেনে নিল। দোতলার হল ঘরটি একদল মেয়ের

কলরবে ভরে উঠেছে। অবনী সেই ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই সকলের মুখপাত্রী রূপে বীথিকা সেন তাকে আপ্যায়ন করে বলল, 'আসুন মিঃ চ্যাটার্জি, আসুন। এত দ্বিধা করছেন কেন।'

অবনী হেসে বলল, 'দ্বিধার কিছু কারণ আছে বইকি। পাছে রসভঙ্গ করি এই ভয়।'

বীথিকা হেসে বলল, 'কিছু ভাবনা নেই, আমরা অভয় দিচ্ছি, 'আপনি এসে পড়ুন।'

সুজাতাকে পাওয়া গেল আরো ঘণ্টাখানেক বাদে, খেয়ে দেয়ে সবাই বিদায় নেওয়ার পর।

অবনী সুজাতাকে ইসারায় তার ঘরে ডেকে নিল। তারপর পকেট থেকে একটি সুন্দর কেস্ বার করল। কেসের ভিতর থেকে আরো সুন্দর একটি আংটি। তার ভিতরের হীরাটি জ্বল জ্বল করছে।

সুজাতা বলল, 'একি।'

অবনী স্মিত মুখে বলল, 'তোমার জন্মদিনের যৎসামান্য উপহার! আঙুলে পরিয়ে দিই কি বলো?'

সুজাতা হঠাৎ বলে উঠল, 'কিন্তু তার আগে আমার একটি কথার জবাব দেবে?'

অবনী বলল, 'কেন দেব না বল?'

সুজাতা বলল, 'মাধুরী ভট্টাচার্যকে তুমি চেন?'

অবনী একটু কাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'এক সময় চিনতাম। কিন্তু হঠাৎ তার কথা কেন? তার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে নাকি?'

সুজাতা বলল, 'হ্যাঁ, কিছুদিন আগে সে আমাদের যাত্রী সঙ্ঘের মেম্বার হয়েছে। কথাটি কি সত্যি যে একসময় মেয়েটিকে তুমি ভালোবেসেছিলে আর তারা গরিব বলেই শেষপর্যন্ত তোমাদের বিয়ে হয়নি?'

অবনী একটু রুক্ষ স্বরে বলল, 'এসব বাজে কথা তুমি কার কাছে থেকে শুনেছ?'

সুজাতা বলল, 'তার চেয়ে বড় কথা কথাটা সত্যি কিনা।'

অবনী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না পুরোপুরি সত্যি নয়। কিন্তু এসব আলোচনা আজ থাক। তোমার যদি এতই কৌতূহল হয়ে থাকে বরং আর একদিন বলা যাবে।'

সুজাতা আংটির কেসটা হঠাৎ অবনীর পকেটে টুপ করে ফেলে দিয়ে বলল, 'উপহারটাও তাহলে সেইদিনই নেব। এসব জিনিস তো তোমার হাত থেকে আরো অনেকদিন নিয়েছি। আজ না হয় নাই নিলাম, কী বলো?'

অবনী মুহূর্তকাল স্তব্ধ গম্ভীর হয়ে রইল। অপমানে থম থম করতে লাগল ওর মুখ। একটু বাদে শান্ত স্থির ভাবে বলল, 'বেশ, সেই ভালো।'

সেদিন রাত্রে অনেক অনুরোধে উপরোধেও অবনী কিছু খেল না। বলল 'শরীর ভালো নেই।' একটু পরে সে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সুরপতি গম্ভীর ভাবে সব দেখাশুনা করলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ তার সেই শান্তি অটুট রাখতে পারলেন না। বাড়ির চাকর-বাকরের দল ফের তাঁর অযথা ধমকানির চোটে অস্থির হয়ে উঠল।

পরদিন খুব গম্ভীর মুখ নিয়ে অফিসে ঢুকল অবনী। অবশ্য জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে সে চিরদিনই রাশভারি গুরুগম্ভীর প্রকৃতির। শুধু নিম্নতন কর্মচারীরা নয়, বাইরের সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তিরাও তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অবনীর দীর্ঘ দৃঢ় দেহ এবং ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক মুখাবয়বের মধ্যে এমন কিছু আছে যা একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

তাই অবনীর রূপান্তর ভাবান্তর অফিসের কারোরই তেমন চোখে পড়ল না। দারোয়ান বেয়ারার দল তাকে দেখে অন্যদিনের মতই সম্ভ্রমের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, উঁচু চেয়ারের লেজার-কীপাররা একটু নড়ে চড়ে বসল। কিন্তু এই কর্মক্ষেত্রে এসে অবনীর মন অন্যদিন যেমন প্রসন্ন হয়ে ওঠে আজ কিছুতেই তেমন হতে চাইল না। কিসের একটা বিরক্তি অস্বস্তি আর বিদ্বেষে তার মন ভরে উঠল। আর কারো চোখে ধরা না পড়লেও নিজের কাছে নিজে ধরা দিল অবনী। সে বদলে গেছে। সে যা ছিল তা আর নেই।

কিন্তু মন যত চঞ্চল আর অশান্তই হয়ে উঠুক অফিসের দৈনন্দিন কাজ সে যন্ত্রের মতই করে গেল। টাইপ করা জরুরী চিঠিপত্রগুলিতে সই করল। বাইরে থেকে যে সব পার্টির প্রতিনিধিরা এসেছে তাদের সঙ্গে অন্যদিনের মতই বৈষয়িক কথাবার্তা বলল। তারপর কাজকর্মের চাপ কমে গেলে বিকেলের দিকে অবনী হঠাৎ সুরপতিবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকল। তাঁর সামনের চেয়ারটায় বসে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।'

সুরপতি ছাইদানিতে চুরুটের ছাই ঝেড়ে নিয়ে বললেন, 'বলো।'

অবনী একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমি এই ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে দেব বলে ঠিক করেছি। আপনার সঙ্গে এতদিনের জানাশোনা। লিখে জানাবার আগে তাই মনে হোল কথাটা আপনাকে একবার বলে নেওয়া ভালো।'

সুরপতি বললেন, 'তা ঠিক, জানাশোনা আমাদের অনেকদিনেরই।' জেনারেল ম্যানেজারের এমন একটা গুরুতর সিদ্ধান্তে তাঁর মন যে কিছুমাত্র বিচলিত হয়েছে তা তাঁর মুখ দেখে মোটেই বোঝা গেলনা। তিনি যেন এ কথার জন্য তৈরী হয়েই ছিলেন।

অবনী বলল, 'আশাকরি আপনি আমাকে ছেড়ে দিতে দেরি করবেন না। আমি দু' একদিনের মধ্যেই চার্জ বুঝিয়ে দেব।'

সুরপতি স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। প্রথমে মনে হোল সে দৃষ্টি রুক্ষ বিরক্ত

অসন্তুষ্ট। কিন্তু একটু বাদেই তাঁর ঠোঁটে হাসির আভাস ফুটে উঠল। চোখের দৃষ্টিও অনেক শান্ত আর কোমল হয়ে গেল।

সুরপতি স্নেহ-কোমল স্বরে বললেন, 'অবনী তুমি ভারি ছেলে মানুষ, ভারি ছেলে মানুষ।'

অবনী বিস্মিত হয়ে বলল, 'ছেলেমানুষ!'

সুরপতি বললেন, 'ছেলেমানুষ ছাড়া কি, আমি ভেবেছিলাম এত বড় বিদ্বান বুদ্ধিমান বিলাত ফেরৎ ব্যাঙ্কিং বিশেষজ্ঞ মানুষ-এর কাছে আমাকে বোধ হয় ভয়ে ভয়েই থাকতে হবে। কিন্তু তুমি যে আমার মেয়ের চেয়েও বেশি ছেলেমানুষ অবনী, তা আমার জানা ছিল না।'

অবনী বিস্মিত হয়ে বলল, 'এতে ছেলেমানুষীর কী দেখলেন?'

সুরপতি বললেন, 'ছেলেমানুষী নয়? বুলুর সঙ্গে ঝগড়া করে তুমি এই ব্যাঙ্ক ছেড়ে দিতে চাইছ? তোমাদের ঝগড়া একদিন মিটবে। কিন্তু এ অর্গানিজেসন যদি ছেড়ে দাও এখানে আর ফিরে আসবার জো থাকবে না।'

অবনী এতে ভারি অপমানিত বোধ করল, সুরপতির কথার উত্তরে একটু তীব্রতার সঙ্গে বলল, 'আপনি কি ভেবেছেন এ ব্যাঙ্ক ছেড়ে গেলে আমার অন্য কোথাও চাকরি জুটবে না?'

সুরপতি বুঝতে পারলেন কথাটা তিনি বেফাঁস বলে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিয়ে কোমল স্বরে মধুর হেসে বললেন, 'তুমি রাগ করছ অবনী, চাকরি ছেড়ে যে জুটবে তা তুমিও জান আমিও জানি। তোমার মত qualified যুবকের আরো অনেক বড় ব্যাঙ্কে আরো বেশি টাকার চাকরি নিশ্চয় জুটবে। কিন্তু যত বড়ই হোক সে চাকরিই।'

সুরপতি একটু থেমে বললেন, 'তুমি তা জানো অবনী, এখানে তুমি একজন সাধারণ চাকুরে মাত্র নও। তুমি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের একজন। তাছাড়া দু'দিন বাদে এ ব্যাঙ্কে তুমিই আমার জায়গা নেবে। একথা নিশ্চিত জেনেও তুমি কোন মুখে এ অর্গানিজেশন ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তাব করছ।'

অবনী একটুকাল চুপ করে থেকে টেবিলের ওপর দাগ কাটতে লাগল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'কিন্তু আপনি যা ভেবেছেন তা যদি না হয়। যদি আমার পক্ষে সুজাতাকে বিয়ে করা সম্ভব না হয়ে ওঠে।'

সুরপতি স্থির দৃষ্টিতে অবনীর দিকে তাকালেন, তারপর দৃঢ়স্বরে বললেন, 'বিয়ে না হওয়ার কোন কারণ নেই, আমার মনে হয় তোমাদের এই মান অভিমান আর ভুল বোঝা-বুঝির একদিন নিশ্চয় শেষ হবে। কিন্তু তা যদি নাও হয়, যদি আমার কথার অবাধ্য হয়ে সুজাতা অন্য কাউকে বিয়ে করে তাহলেও এ ব্যাঙ্কে তোমার স্থান কেউ নিতে পারবে না। দেখ অবনী সন্তানকে সবাই ভালোবাসে। বুলু আমার মেয়ে। আমি তাকে

নিশ্চয়ই ভালোবাসি। কিন্তু সে আমার ব্যাঙ্কের চেয়ে বড় নয়। কোন অযোগ্য লোককে সে যদি স্বামী হিসেবে বেছে নেয়, তুমি কি ভেবেছ জামাই বলে আমি তাকে ব্যাঙ্কে ঢুকতে দেব? কক্ষনো না।'

অবনী বলল, 'আচ্ছা আপনার কথা আমি ভেবে দেখব।'

সুরপতি অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠলেন, 'এর মধ্যে নতুন করে ভেবে দেখবার আর কিছু নেই অবনী। পুরুষের কাছে মাথাটা বড়, হাত দুখানা বড়, মেয়েদের মত তারা হৃদয়সর্বস্ব নয়; কর্মী হও, খ্যাতিমান হও, অর্থবান হও, নারী তোমার পিছনে পিছনে আপনিই আসবে। যাও অবনী, মন দিয়ে কাজ কর গিয়ে। অনেক কাজ পড়ে আছে। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের ইলেকসনের দিন এগিয়ে আসছে। এমপ্লয়ীদের এ্যানুয়াল ইনক্রিমেণ্টের ব্যাপারটাও এবার ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। কাজের কি অভাব আছে? ওসব বাজে কথা বলবার সময় কই?'

হাত বাড়িয়ে সুরপতি অবনীর কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'যাও, সুস্থ মনে কাজ কর গিয়ে। বুলুর জন্যে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।' বলে মৃদু হাসলেন সুরপতি। সে হাসির অর্থ অবনীর বুঝতে দেরি হোল না। 'ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে তোমার যত বিদ্যাবুদ্ধিই থাক, এত বড় একটা ব্যাঙ্ক পরিচালনার কাজে তুমি যতই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাক, এ সব ব্যাপারে তুমি সুরপতির সমকক্ষতার যতই দাবী কর না কেন, সুজাতার সামান্য দুটো কথা, সামান্য একটু আচরণের পার্থক্য তোমাকে যখন এত অশান্ত আর বিচলিত করতে পারে তখন তোমার বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্ব অনেকখানি নেমে যায়। তোমাকে আর পূর্ণবয়স্ক পুরুষের সম্মান দেওয়া যায় না।'

অবনী আস্তে আস্তে উঠে নিজের কামরায় ফিরে এল। সুরপতির কথার মধ্যে যুক্তি আছে। সত্যিই তো সুজাতার সঙ্গে এই ব্যাঙ্কের চাকরির কী সম্বন্ধ। তার ওপর অভিমান করে কেন অবনী এমন সুযোগ সুবিধা ছাড়তে যাবে? বরং এখানে থেকে যত তার ক্ষমতা আর আধিপত্য বাড়িয়ে নিতে পারবে তত সুজাতার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার শক্তি বাড়বে অবনীর। সুজাতা তার সঙ্গে অনেক টালবাহানা করেছে, তার পৌরুষকে নানাভাবে অপমান করেছে। সে সব কিছুর প্রতিশোধ না নিয়ে অবনী বিনাবাক্যে চলে যাবে এমন নির্বিরোধ ভালো মানুষ সে নয়।

পরক্ষণেই অবনীর মনে হোল সুজাতা তো তাকে প্রত্যাখ্যান করেনি। তার দেওয়া আংটি ফিরিয়ে দেওয়ার মূলে আছে মাধুরী সম্বন্ধে তার ঈর্ষা। মাধুরীর সঙ্গে যদিও কোন সম্পর্ক এখন আর অবনীর নেই, কিন্তু এক সময় যে ছিল এই চিন্তাও সুজাতার কাছে অসহনীয়।

চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা শেষ করে নিজের চেম্বারে ফিরে এল অবনী। সুরপতির কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করবার পর তাঁর পরামর্শ যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হোল তার কাছে। অবশ্য অবনীকে যেতে না দেওয়ায় সুরপতিরও যথেষ্ট স্বার্থ আছে। অবনীর

মত এমন যোগ্য কর্মদক্ষ এবং বিশ্বস্ত মানুষ এই ব্যাঙ্কে অপর দ্বিতীয় কেউ নেই একথা অবনী ভালো করেই জানে। কিন্তু শুধু সুরপতির স্বার্থেই নয়, এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত থাকলে অবনীর নিজেরও লাভ আছে। অবশ্য এখন পর্যন্ত সুরপতিই এ ব্যাঙ্কের সর্বেসর্বা। ব্যাঙ্কের ছোট বড় সব ব্যাপারই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু এদিন তো চিরদিন থাকবে না। অবনীর হাতে ধীরে ধীরে সব ক্ষমতাই এসে পৌছবে। তার সূচনা এখন থেকেই টের পাচ্ছে অবনী। সুজাতার ঈর্ষার কারণটাও অবনী ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখল। তার ঈর্ষার তীব্রতায় তার মনের অনুরাগের প্রাবল্যই ধরা পড়ে, প্রণয়ের অভাব প্রমাণ হয় না। অবনী স্থির করল সে আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে। ব্যাঙ্কের কাজ আগের মতই দক্ষতার সঙ্গে করে যাবে, কিন্তু চেয়ারম্যানের বাড়ি সে আর কিছুতেই যাবে না। সুরপতিবাবু কি তাঁর মেয়ে যতই অনুরোধ করুন না কেন নিজের সঙ্কল্পে অবিচল থাকবে অবনী। সুজাতার কাছে নিজেকে বড়ই সুলভ করে ফেলেছে সে। তাই বারবার এমন করে তাকে অপমানিত হতে হয়। নিজেকে দূরে রেখে, দুর্লভ করে রেখে অবনীকে তার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

বাড়িতে মা বাপ অবশ্য তার এই দুর্বলতা দেখে অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছেন। মা তো স্পষ্টই বলা শুরু করেছেন, 'কেন, হোলই বা সে বড়লোকের মেয়ে। কিন্তু তুইই বা কম কিসে। বিদ্যায় বুদ্ধিতে ক্ষমতায় কোন জিনিসে তোর ঘাটতি আছে যে তোকে সে বার বার এমন করে অপমান করবে। মাসের পর মাস বছরের পর বছর যাচ্ছে তার টালাবাহানা আর ফুরোয় না। এই কলকাতা শহরে সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের কি অভাব আছে নাকি? আমার পরামর্শ যদি তুই শুনিস তাহলে ভুলেও ও মেয়ের নাম তুই মুখে আনিসনে। যদি পুরুষের মত পুরুষ হোস তাহলে ও সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে আর কোথাও বিয়ে কর। আমি যদি একবার টুঁ শব্দ করি কতজন সেধে এসে মেয়ে দিয়ে যায়।'

অবনী হেসে বলে, 'দরকার নেই মা তোমার আর টুঁ শব্দ ক'রে।'

মা রাগ করে বলেন, 'তোর হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।'

কিন্তু অবনীর মা যেমন সোজা স্পষ্ট ভাষায় ছেলেকে অন্য জায়গায় বিয়ে করতে নির্দেশ দিতে পারেন অবনীর বাবা অভয়চরণ তত সহজে তা পারেন না, কারণ তিনি জানেন সুজাতা যেদিন এ ঘরে আসবে শুধু হাত আসবে না। ব্যাঙ্কার সুরপতি চক্রবর্তীর সে একমাত্র মেয়ে। তার অগাধ ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিণী। তাই ঝাঁপি শুদ্ধ লক্ষ্মীকে ঘরে আনতে হলে এত অধীর আর অসহিষ্ণু হলে চলে না। ধৈর্যের সঙ্গে শুভক্ষণের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। এখনকার মতো সেই ধনী নন্দিনীর মান অভিমান খামখেয়াল যদি কিছু কিছু মেনে নিতেও হয় তাহলেও ক্ষতি নেই। পুত্রবধূরূপে অভয়চরণ যদি তাকে একবার ঘরে এনে তুলতে পারেন তখন সুদে আসলে এর শোধ নিয়ে ছাড়বেন!

বাপ মার মতের আর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অবনী ভালো করেই জানে। আর সেই

সঙ্গে এও জানে এর কোনটিই তার নিজের মত নয়। সুজাতাকে সে চায় তাকেই ভালোবাসে বলেই। তার বাবার ধন সম্পদ নয়, সুজাতার নিজেরই বিদ্যাবুদ্ধি রূপরুচি দিয়ে গড়া মধুর ব্যক্তিত্ব অবনীকে আকর্ষণ করেছে। এতদিনের সান্নিধ্য সাহচর্যেও সুজাতা কি অবনীকে বুঝতে পারেনি? প্রথম তারুণ্যে কবে কোন মেয়ের সংস্পর্শে অবনী এসেছিল কিনা এতদিন বাদে সুজাতার কাছে সেই প্রশ্নই কি সব চেয়ে বড় হয়ে উঠল! এত সৌহৃদ্য, বন্ধুত্ব, প্রীতি আর প্রেমের কোন মূল্যই কি রইল না! মাঝে মাঝে অভিমানে বিক্ষোভে মন ভরে উঠতে লাগল অবনীর। একেকবার সন্দেহ হোল মাধুরী অজুহাতটা সুজাতার একটা ছল। এই অজুহাতে সুজাতা তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চায়, অবনীকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। আসলে সুজাতা অবনীকে হয়তো আর ভালোবাসে না। তাদের মাঝখানে আর এক দ্বিতীয় 'ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। কে সে? অসিত? নামটা মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই হিংসায় বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে অবনীর। রূপে, গুণে, অর্থে, সামর্থ্যে কোন দিক থেকেই অবনীর সঙ্গে অসিতের তুলনা হয় না। অসিত অবনীর অনেক নিচে, অনেক নিচে। তবু সুজাতার হৃদয় তার জন্য কেন উন্মুখ হয়ে ওঠে? মেয়েদের মন বোঝা শক্ত। জলের মত মেয়েদের মনের গতিও কি উঁচু থেকে নিচুর দিকে? কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের এই দুর্বল ঈর্ষার কথা ভেবে অবনী নিজের মনেই হাসে। তা কিছুতেই হতে পারে না, সুজাতার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে এমন ভুল কিছুতেই করতে পারে না। শুধু হৃদয়ের আবেগে চালিত হওয়ার মত মেয়ে সুজাতা নয়। সে যা করবে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে ভেবে চিন্তে করবে। সুজাতা কি জানেনা অসিতের জাত আলাদা। সুরপতির মতো গোঁড়া ব্রাহ্মণ কিছুতেই অসবর্ণ বিয়েতে রাজী হবেন না। আর যাই করুক বাবাকে কিছুতেই আঘাত দিতে পারবেনা সুজাতা। তাঁর অবাধ্য হওয়ার মতো দুঃসাহসও তার নেই। আর এদিক থেকে সুরপতি অবনীর সহায়। তাই আজ হোক, কাল হোক, সুজাতাকে বিয়েতে রাজী হতেই হবে। একথা ভেবে অবনী মনে মনে ভারি নিশ্চিন্ত বোধ করল। এ ব্যাপারে অন্যের ওপর নির্ভর করার যে হীনতা আছে, অপমান আছে, অত বড় ব্যক্তিত্ববান্ জেনারেল ম্যানেজারের সে কথা এক মুহূর্তে মনে পড়ল না।

কিন্তু সুজাতার হৃদয়তত্ত্ব নিয়ে বেশি বিচার বিশ্লেষণের আর সময় হোল না অবনীর। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের ইলেক্শন এসে পড়ল। সেই ইলেক্সনে অবশ্য সুরপতিদেরই জয়লাভ হোল। কারণ স্বনামে বেনামে শতকরা নব্বই ভাগ শেয়ারই সুরপতির কেনা। তবু কিছু বিরোধিতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল সুরপতির দলকে। ডিরেক্টর পদ প্রার্থী ডঃ রাজ্যেশ্বর দত্ত আর সতীনাথ সিংহের মধ্যে প্রতিযোগিতায় সুরপতি সমর্থন করলেন নতুন তৈল ব্যবসায়ী সতীনাথকে। অথচ ডঃ দত্ত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহুদিন থেকে সংশ্লিষ্ট। ব্যাঙ্কের শৈশব সঙ্কটে তিনি একে সাহায্য করেছেন। লোকে ভাবত সুরপতির আর ডঃ দত্তের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বই আছে। সুরপতি ডঃ দত্তের সঙ্গে বন্ধুত্বকে

স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁর মতামতকে গ্রাহ্য করেন না। তিনি বলেন, 'দত্ত তোমার অসম্ভব আদর্শবাদ কলেজের চৌহদ্দীর মধ্যে বেশ মানিয়ে যায়, কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর একটু বাস্তব বোধের দরকার হয়। আমার কাজে বাধা দিয়োনা। তাতে তোমারও লাভ নেই আমারও লোকসান।'

কিন্তু অধ্যাপক দত্ত সে কথায় কান দেননি। তিনি ডিরেক্টরদের বৈঠকে প্রত্যেকবার সুরপতির সমালোচনা করেছেন। তিনি বার বার জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমি নীতি-শাস্ত্রের দোহাই পাড়ছিনে, অর্থনীতির নিয়মের কথাই বলছি। সুরপতি যে পথে চলছে সেটা নিয়মের পথ নয়, অনিয়মের পথ। এ পথে যে কোন সময় পা পিছলাবার আশঙ্কা আছে।'

কিন্তু অন্যান্য অংশীদারগণ অধ্যাপকের কথা গ্রাহ্য করেননি। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে তাঁদের লভ্যাংশ বছর বছর বাড়ছে ছাড়া কমছে না।

ইলেক্‌সনে হেরে গিয়ে রাজ্যেশ্বর প্রতিষ্ঠান থেকেই বিদায় নিয়ে গেলেন। এই ব্যাঙ্কে অনেককে চাকরি দিয়েছিলেন রাজ্যেশ্বর। তাদের কেউ কেউ তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল।

তারপর তারা সহানুভূতির স্বরে বলল, 'আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? পরের ইলেক্‌সনে—।'

রাজ্যেশ্বর তাঁদের বাধা দিয়ে বললেন, 'কোন ইলেক্‌সনেই আমার আর সুবিধে হওয়ার কোন আশা নেই। এ বেড়াজাল কেটে এখন যদি না বেরোতে পারি পরিণামে অনেক দুষ্কৃতির ভাগ ঘাড়ে এসে পড়বে।'

কর্মচারীরা বলল, 'আপনি গেলে আমাদের কী দশা হবে?'

রাজ্যেশ্বর বললেন, তোমাদের ব্যাপারটা অত জটিল নয়। তোমরা চাকরি করতে এসেছ, যতদিন চাকরি থাকে চাকরি করবে, যখন থাকবে না খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে।'

রাজ্যেশ্বর বিদায় নিয়ে গেলে তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে সুরপতির বিরুদ্ধে কিছু অসন্তুষ্টির গুঞ্জন উঠল। কিন্তু সে শুধু গুঞ্জনই। সুরপতি তা কানে তুললেন না।

তবে জেনারেল ইনক্রিমেণ্টের লিস্ট নিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হোল তাকে অত সহজে এড়িয়ে যেতে পারলেন না সুরপতি। তাদের প্রতিবাদের গুঞ্জন 'শুনব না' বলে কানে আঙুল দিয়ে বসে থাকা সম্ভব হোল না।

যাঁদের ওপর বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব আর যারা সুরপতি কি অবনীর অনুগত, বেতন বৃদ্ধির বরলাভ তাদের ভাগ্যে যেমন ঘটেছে অন্যদের বেলায় তেমন হয়নি। বিশেষ করে যাঁরা রাজ্যেশ্বরের দলের লোক বেছে বেছে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে।

অবনী অবশ্য সুরপতির এই কাজের সবটুকু সমর্থন করেনি। সে প্রতিবাদ করে বলেছে, 'এর ফল হয়তো ভালো হবে না।' সুরপতি জোর দিয়ে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই

হবে। এর জন্যে যদি কিছু অবাঞ্ছিত লোক ব্যাঙ্ক ছেড়ে চলে যায় সেটা আমাদের পক্ষে কুফল নয়।'

অবনী জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তু যদি ভিতরে থেকে গোলমাল করে?'

সুরপতি জবাব দিয়েছিলেন, 'তার ওষুধ আমার কাছে আছে। সে জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।' কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে যা ঘটল তাতে সুরপতি আর অবনী দু'জনকেই খানিকটা চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন হতে হোল।

বিষ্ণুবাবুর ওপর অবিচারের প্রতিবাদে যখন ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মধ্যে ইউনিয়ন গড়বার চেষ্টা হয়েছিল তখন তা সফল হয়নি। কারণ সে অবিচার ছিল বিশেষ করে একজনের ওপর। কিন্তু এবার ইনক্রিমেট দেওয়ার বেলায় কর্তৃপক্ষের কথা টের পেয়ে ছোট বড় অনেক কর্মচারীই একজোট হোল। সকলেই বলাবলি করতে লাগল, 'এ ভারী অন্যায়, এর একটা প্রতিকার করা উচিত।'

অসিত বলল, 'কী করে প্রতিকার করবেন? আপনাদের না আছে মনের বল, না আছে দলের বল। প্রতিকার যদি করতে হয় তাহ'লে সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। তবেই কিছু করা সম্ভব।'

তরুণ অল্পবয়সী কর্মচারীদের বেশির ভাগ অসিত আর শ্যামলের নেতৃত্ব মেনে নিল। কিছু হোক না হোক চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। তাছাড়া দল গড়ার মধ্যে একটা নতুন ধরণের উত্তেজনা আছে, চাঞ্চল্য আছে, কর্মতৎপর হওয়ার একটা উপলক্ষ পাওয়া যায়। তরুণেরা সবাই অসিত আর শ্যামলের দিকে একে একে আকৃষ্ট হতে লাগল। প্রবীণেরা যাঁরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘর সংসার করেন তাঁরা বললেন, 'আপনারা কাজ করুন, আমরা পিছনে আছি। বোঝেন তো ছাপোষা মানুষ। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে হয়। আপনাদের তো অত ভাবনা চিন্তার কিছু নেই। আপনাদের বয়সে আমরাও—।'

শ্যামল রূঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, 'থাক থাক। আমাদের বয়সে আপনারা কোন বিশ্বজয় করেছিলেন সে খবরে আমাদের দরকার নেই। ইউনিয়নের মেম্বার আপনারা হবেন কিনা সেইটাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।'

অসিত শ্যামলকে আড়ালে ডেকে একটু ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'দেখ শ্যামল, তুমি যদি অমন কথায় কথায় মাথা গরম কর তাহলে সব পণ্ড হবে। তোমার ধারণা যে জিভের জোরেই সব হয়।'

শ্যামল প্রতিবাদ করে বলল, 'না তা হয় না, কিন্তু জিভের জোরকেও মাঝে মাঝে ব্যবহার করা দরকার।'

ক্রমে ক্রমে দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের অসন্তুষ্ট কর্মচারীদের একটি সঙ্ঘ গড়ে উঠল। তাদের দাবীর তালিকা তৈরী হতে লাগল, কর্মীর তালিকা তৈরী হ'তে লাগল। ক্ষীণজীবী কেরানীকুলের মধ্যে হটাৎ যেন এক নতুন উৎসাহের জোয়ার এসেছে।

ব্যাঙ্ক থেকে খানিকটা দূরে একটা রেস্টুরেন্ট আছে। তার একটা টেবিলে ছুটির পর

চারজনের ঘনঘন মিটিং হতে লাগল। অসিত, শ্যামল, ক্লিয়ারিং-এর তারক সেন আর বিল ডিপার্টমেন্টের উমাপদ সরকার। কী করে এই ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়নের অনুমোদন পাবে, কবে চেয়ারম্যানের কাছে দাবীর তালিকা পেশ করা হবে তাই নিয়ে আলাপ-আলোচনা আর তর্কবিতর্ক।

এই বৈঠক একদিন অসিতের বাড়িতেও বসল। শ্যামল প্রস্তাব করল কর্তৃপক্ষ দাবী না মানলে সাতদিনের নোটিশে অসিতদের ইউনিয়ন ধর্মঘটই করবে। ব্যাঙ্কের সামনে পিকেট করে কোন কর্মচারীকেই অফিসে ঢুকতে দেবে না। অসিত বলল, 'অমন একটা চরম পথ নেওয়ার সময় এখনো আসেনি।' এই নিয়ে অসিত আর শ্যামলের মধ্যে মতবিরোধ হোল। তখনকার মত ব্যাপারটা অমীমাংসিতই রয়ে গেল।

অসিতেরা যে ভিতরে ভিতরে কি একটা মতলব আঁটছিল তা অরুন্ধতী গোড়া থেকেই টের পেয়েছিলেন, ক্রমে ব্যাপারটা তাঁর কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, 'আচ্ছা অসিত, এসব তোরা কী শুরু করছিস শুনি?'

রান্নাঘরের বারান্দায় বসে তরকারী কুটছিলেন অরুন্ধতী। অসিত তার কাছে এসে বলল, 'কেন মা, কী আবার শুরু করলাম।'

অরুন্ধতী বললেন, 'দেখ অসিত, আমার কাছে কিছু লুকাতে চেষ্টা করিসনে। আমি সব জানি।'

অসিত বলল, 'জানোই যদি মা, তাহলে আর জিজ্ঞেস করছ কেন?'

অরুন্ধতী বললেন, 'জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারছি না। আচ্ছা তুই কী কোরছিস বল তো। এইসব ইউনিয়নের মধ্যে তোর কি যাওয়া উচিত।'

অসিত একটুকাল অরুন্ধতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'মা, তোমার মুখ থেকে এমন কথা শুনতে হবে তা কোনদিন ভাবিনি।'

ছেলের কথার ধরণে একটু লজ্জিত হলেন অরুন্ধতী, তবু একেবারে হার মানলেন না, 'কেন এমন কী মন্দ কথা আমি বলেছি।'

অসিত বলল, 'তুমি তো সব কথা বলনি মা। একটুখানি বলেছ। এবার আমি তোমার বক্তব্যটা তোমাকে সবটা শোনাই। তারপর তুমি শুনে নিজের মনেই বিচার ক'রে দেখ কথাগুলির কতটা ভাল কতটা মন্দ।'

অরুন্ধতী মুখভার ক'রে বললেন, 'থাক বাপু, তোমার আর অত ভনিতার দরকার নেই।'

কিন্তু অসিত তাঁর বাধা না মেনে বলতে লাগল, 'সুরপতিবাবু আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচিত। অল্পদিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের চাকরিতে আমার খুবই উন্নতি হয়েছে। হয়তো আরো উন্নতি হবে। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত লাভের আশায় আমি যদি আমার সহকর্মীদের

ছেড়ে সরে দাঁড়াই, তাদের ন্যায্য দাবির সমর্থন না করি, সেটা তোমার মতো মার ছেলের পক্ষে যোগ্য কাজ হবে ?'

অরুন্ধতী বললেন, 'থাক থাক, আমাকে আর ফুলিয়ে তুলতে হবে না। কিন্তু এই সব আন্দোলন-টান্দোলন ক'রে কি কোন লাভ হবে ! ব্যাপারটা তো অত ছেলেখেলা নয় !'

অসিত একটু হেসে বলল, 'তোমার ছেলে এতে আছে বলেই ব্যাপারটা ছেলেখেলা যে নয় তা আমরাও জানি !'

অরুন্ধতী বললেন, 'হ্যাঁ, সে কথা জেনে শুনে তবে এগিও। কতজন লোক তোমাদের দলে আছে, তারা কতক্ষণ থাকবে, কতটুকু তাদের শক্তি তা হিসেব করে তবে কাজে হাত দিয়ো।'

অসিত বলল, 'তা তো দেবই। কিন্তু হাতের জোরটা কি ঠিক ঠিক অত আগে থেকে আন্দাজ করা যায় মা ! কাজে হাত দিলে তবে বোঝা যায় জোর সত্যি সত্যি কতখানি আছে। জোরের জোগান যে কোত্থেকে আসে তা কাজে না নামলে টের পাওয়া যায় না।'

অরুন্ধতী বললেন, 'সবদিক বুঝে শুনে, ভেবে চিন্তে যা করবার কোরো। এছাড়া আমার আর কিছু বলবার নেই। লড়াইতে নামতে হলে বিপক্ষ আত্মপক্ষ দু'পক্ষের শক্তির হিসেব নিতে হয়। সেইটাই বিচক্ষণের কাজ। আমি শুধু আমাদের অসুবিধের কথাই ভাবছিনে, চাকরি গেলে তোমার মতো আরো অনেক ছেলের গরিব মায়েরা আজকালকালকার বাজারে কি বিপদে পড়বে সে কথা ভেবেই এত কথা তোমাকে বললাম।'

অসিত বলল, 'এই তো আমার মায়ের মত কথা। তুমি ভেব না মা। সব ভেবে চিন্তে বুঝে শুনেই আমরা কাজে হাত দেব। আমাদের দলের সকলেই যে শ্যামলের মত রগচটা আর মাথা গরম ছেলে তা ভেব না।'

'নিজের ঠাণ্ডা মাথার ওপর দাদার অগাধ বিশ্বাস,' বলতে বলতে ঘরে ঢুকল নীলা। হাতে একখানা নীলচে রঙের এনভেলপ। অসিতের দিকে সেখানা বাড়িয়ে বলল, 'এই নাও।'

অসিত চিঠিখানা হাতে নিতে নিতে বলল, 'কি ব্যাপার।'

নীলা একটু হেসে বলল, 'তোমার চিঠি, ঠিকানা ভুল হওয়ায় পাশের বাড়িতে এসে পড়েছিল। ওদের একটি মেয়ের পাটিগণিতের তলা থেকে আজ এতদিন বাদে বেরিয়ে এসেছে। তোমার ভাগ্য ভালো।'

অসিত চিঠিখানা হাতে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। নীলা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একটু মুচকি হেসে বলল, 'কী দাদা, এখন মাথার অবস্থা কি রকম। গরম না ঠাণ্ডা। ইউনিয়ন-টিউনিয়ন সবই বুঝি চিঠি চাপা পড়ল।'

অসিতও হেসে জবাব দিল, 'ফাজিল মেয়ে কোথাকার। পিঠে লাঠি না পড়লে তোমার বাচালতা যাবে না।'

নীলা বলল, 'কেন পিঠে কেন, আমার মাথায় লাঠি মারলেও আমার স্বভাব বদলাবার কোন আশা দেখিনে দাদা, ছেলেবেলায় পড়নি অতীত্যহিগুণাণ সর্বান স্বভাবো মূর্দ্ধি বর্ত্ততে। লাঠির ঘায়েও সেই মাথায় চড়া স্বভাবকে নামানো যায় না।'

সুজাতার লেখা পুরোন চিঠি; তার সেই জন্মদিনের আমন্ত্রণ। ঠিকানা ভুল হওয়ায় চিঠিখানা যথাকালে যথাস্থানে এসে পৌঁছেনি। এর জন্যে দায়ী অবশ্য পত্র লেখিকাই। কিন্তু অসিতের সে কথা মনে পড়ল না; চিঠিটা দেরিতে পাওয়ায় সে যে সুজাতার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারল না, অন্তত একখানা চিঠি লিখে শুভেচ্ছা জানাবার সৌজন্য থেকে বঞ্চিত হোল এই ক্ষোভেই তার মন ভরে উঠল। তারপর আর একবার সুজাতার চিটিটা পড়ল অসিত। ছোট একটু আমন্ত্রণ লিপি। কিন্তু ভারি সুন্দর, ভারি মধুর আর আন্তরিকতায় ভরা। সমস্ত তিক্ততা রুক্ষতার উপর সেই মাধুর্যের স্নিগ্ধ প্রলেপ লেগে। সামান্য একখানা চিঠি নিয়ে নিজের মনের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে অসিত নিজেও লজ্জিত হোল, কিন্তু সে লজ্জা অবিমিশ্র লজ্জা নয়। তার মধ্যে আনন্দের স্বাদ আছে। অথচ বিষয়টি তো সামান্য। একটি ধনী অভিজাত ঘরের মেয়ে নিতান্তই নাগরিক শিষ্টাচারের খাতিরে অসিতকে জন্মদিনে একখানি চিঠি পাঠিয়েছে। তাই নিয়ে অত কাব্য করবার, অত স্বপ্ন দেখবার কি কোন দরকার আছে অসিতের। কিন্তু কাব্য আর স্বপ্ন তো সংসারে দরকারের জিনিস নয়, অদরকারের জিনিস। তাই নিজের মনকে যত ধমকই দিক অসিত, দিনের বেলাকার নানা চিন্তা নানা কাজ দিয়ে যতই একটি কোমল আর গোপন ইচ্ছাকে চাপা দিয়ে রাখুক, গভীর রাত্রে সেই লজ্জা সংকোচের সমস্ত আবরণ উন্মোচন করে, সমস্ত শাসন আর অনুশাসন অগ্রাহ্য করে মনের কোণ থেকে সেই গোপন ইচ্ছাটি মুখ বাড়াল। সে মুখের সঙ্গে একটি অভিজাত ঘরের সুন্দরী মেয়ের মুখের অবিকল আদল আছে।

এমন অন্যমনস্কতা নিয়ে বই পড়া অসম্ভব। হাতের বইখানা বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে রাখল অসিত, তারপর সাদা প্যাডটা টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে শুরু করল। সারাদিনের রুদ্ধ বাসনা প্যাডের পাতায় মুক্তি পেল এতক্ষণে :

'সুচরিতাসু,

আপনি হয়ত ভেবেছেন আমি কি অভদ্র। আপনার জন্মদিনের নিমন্ত্রণের অমন সুন্দর একখানা চিঠি পেয়ে না পারলাম নিজে গিয়ে হাজির হতে, না দিলাম জবাব। আমার ব্যবহারে শিষ্টাচার আর সৌজন্যের একান্ত অভাব দেখে আপনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু আপনাকে আর একটু বিস্ময়কর সংবাদ দিই, আপনার চিঠিটা আমি আজই পেলাম। ঠিকানা বিভ্রাটে চিঠিটা আমার এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে বইয়ের তলায় আত্মগোপন করেছিল। আমার বহু ভাগ্য সেই গোপনলোকেই সে অচল হয়ে থাকে নি।

আপনার জন্মদিনের উৎসবের মিষ্টি পাতে পড়ল না এ নিয়ে আজ আর আপশোষ করছিনে, বরং এমন একটা উপলক্ষে আমাকে যে স্মরণ করেছিলেন সে জন্যেই বিস্ময় বোধ করছি।

আমাদের পরিচয় কতদিনেরই বা। কিন্তু এই কদিনের মধ্যে আপনি যে আমাকে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন তা আপনারই ঔদার্যের পরিচায়ক।

কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমাদের এই সৌহার্দ্যের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই না বিনষ্ট হয়ে যায়। পাছে আপনি আমাকে ভুল বুঝেন, পাছে আবার আমরা সেই অপরিচয়ের অন্ধকারে তলিয়ে যাই। তেমন কিছু একটা ঘটবে বলে যেন আভাস পাচ্ছি। সব কিছু খুলে বলবার সময় এখনো আসেনি। যদি আসে তখন আপনার কাছে নিশ্চয়ই কিছু গোপন করব না, সব জানাব। আপাতত আপনাকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও নমস্কার জানিয়ে দিই।

ইতি—

অসিত চন্দ।'

পরদিন ভোরে চিঠিটা পোস্ট করবার পর অসিতের মনে অনুশোচনা এল। ছি ছি, একখানা সামান্য আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ পত্রের জবাবে ওসব কথা সুজাতাকে কেন লিখতে গেল অসিত? মেয়েটি কী ভাববে? কী অর্থ করবে চিঠিটার। অসিতের চিত্তদৌর্বল্যের কথা ভেবে হাসবে কিংবা তার প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে সুজাতার মনে সংশয় আসা অসম্ভব নয়। সারাদিন ভারি অস্বস্তিতে কাটল অসিতের, বড় মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছে অমন একটা চিঠি লিখে।

ইউনিয়নের কাজ সম্বন্ধে পরামর্শ করতে শ্যামল অসিতের অন্যমনস্কতা দেখে বিস্মিত হোল। বন্ধুর মুখের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমার কী হয়েছে বল দেখি?'

অসিত বলল, 'কী আবার হবে।'

শ্যামল বলল, 'উঁহু, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। কি একটা যেন সাংঘাতিক দুষ্কার্য করে এসেছে। ভাবভঙ্গিটা সত্যিই তোমার একেবারে খাঁটি culprit এর মতো মনে হচ্ছে। কী করে এসেছ বল দেখি, ডাকাতি, রাহাজানি না নরহত্যা?'

অসিত বলল, 'ওসব বাজে কথা রাখ। কাজ কতটা এগোল তাই বল।'

শ্যামল বলল, 'কাজের দিকে কি আর তোমার নজর আছে?

অসিত বলল, 'তা বটে। নজর যত তোমারই।'

শ্যামল জানাল যে অসিতের কথাটা সে ভেবে দেখেছে। তৈরী না হয়ে যুদ্ধং দেহি বলে ঝাঁপিয়ে পড়াটা কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু তৈরী হওয়ার অজুহাতে বসে বসে ঘুমিয়ে বছর কাটিয়ে দিলে চলবে না।

অসিত হেসে বলল, 'সে সম্বন্ধে কারো কোন মতদ্বৈধ নেই।'

সুজাতার জবাব আসতে দেরি হোল না। প্রায় পিঠাপিঠই সে চিঠি দিয়েছে। লিখেছে চিঠিতে ঠিকানা ভুলের জন্যে সে লজ্জিত। এমন ভুল সাধারণত তার হয় না। যাহোক দেরিতে হলেও চিঠিটা যে শেষপর্যন্ত মালিকের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে এতে সে খুসি হয়েছে। কারণ চিঠি হারালে ভারি খারাপ লাগে। সুজাতা অসিতের চিঠি পেয়েছে বটে কিন্তু তার পুরোপুরি অর্থবোধ করতে পারেনি। অসিতের কি সময় হবে অর্থটা নিজে গিয়ে একটু বুঝিয়ে দিয়ে আসবার। আর একটা কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের একবার পরিচয় ঘটে গেলে কী করে তারা আবার অপরিচয়ের আড়ালে চলে যেতে পারে তা তো সুজাতা ভেবে পায় না। অবশ্য স্মৃতিভ্রংশ হলে তেমন ব্যাপার হয়ত সম্ভব। কিন্তু দু'একটা ঠিকানা মাঝে মাঝে ভুল হলেও সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রংশতার লক্ষণ কি সুজাতার মধ্যে সত্যিই দেখা গিয়েছে? তবে তো বড় চিন্তার কথা। কিন্তু তাহলেও অসিতের একবার আসা দরকার। বন্ধু বান্ধবের অসুখ বিসুখে বন্ধুরাই সব চেয়ে আগে এগিয়ে আসেন।

সুজাতার কাছ থেকে এত লঘু সুরের চিঠি এর আগে অসিত আর কোনাদিন পায়নি। মনটা হালকা হয়ে গেল। তার চিঠির দুর্বোধ্যতা দেখে সুজাতাও যে দুর্বোধ হয়ে ওঠেনি তাতে খুশিই হোল অসিত। সুজাতার এবারকার চিঠি আরো হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতার দ্যোতক। অসিত ভারি তৃপ্তি বোধ করলে। ভাবল এবার শিগগিরই একদিন যাবে। তার চিটির বক্তব্যটা বুঝিয়ে দিয়ে আসবে সুজাতাকে। ইউনিয়নের দাবী নিয়ে যদি সুরপতির সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টিই হয় তাহলে সুজাতার সঙ্গে অসিতের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিশ্চয়ই ব্যাহত হবে এই ছিল অসিতের বক্তব্য। আর কিছু নয়। সে কথা সুজাতাকে বুঝিয়ে দিয়ে এলেই হবে।

কিন্তু সুজাতাদের বাড়িতে যাওয়ার কিছু দেরি হয়ে পড়ল অসিতের। উমার শ্বশুরবাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এল তার ছেলের শক্ত অসুখ। ডবল নিউমোনিয়া। যদি ছেলেকে দেখতে চায় উমা তাহলে যেন অবিলম্বে রওনা হয়ে আসে।

চিঠি পেয়ে উমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বলল, 'মরুকগে। ও ছেলে তো তাদের। ও ছেলে তো আর আমার নয়। আমার হলে তো আমার নিজের কাছেই রাখতে পারতাম।'

অরুন্ধতী কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, 'মুখপুড়ী, এই কি তোর মান অভিমানের সময়।'

কারো কোন কথাই উমা কানে তুলল না। সে যেন পাথর দিয়ে গড়া। মায়া মমতা তো ভালো, কোন প্রাণের স্পন্দনই যেন তার মধ্যে নেই।

কিন্তু বেলা যত বাড়তে লাগল সেই অবিচল পাথরের মূর্তি চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। তার দুচোখ দিয়ে জলের ধারা বইল।

সস্নেহে বোনের পিঠে হাত রেখে অসিত বলল, 'উমা আমাদের কথা শোন—চল আমরা যাই খোকনকে দেখে আসি।'

উমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'দেখা কি আমার ভাগ্যে আছে দাদা।'

ঠিক হোল সেইদিনই উমাকে নিয়ে অসিত সন্ধ্যার গাড়িতে রংপুর রওনা হয়ে যাবে। কিন্তু উমা ভারি ছটফট করতে লাগল। একটা মিনিটও এখন আর কাটতে চায় না। অথচ এই ছেলেকে ফেলে এতগুলি বছর সে কেমন করে ছিল।

যাওয়ার সময় নীলা তার সঞ্চিত একশটি টাকা দিদির হাতে দিয়ে ছলছল চোখে বলল 'খোকনের চিকিৎসা করিয়ো দিদি।'

বহুদিন পরে এই আত্মীয় সম্বোধনটি নীলার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। এই দীর্ঘদিনের ঈর্ষা দ্বেষ হিংসা সব দুই বোনের চোখের জলে কোথায় ভেসে গেল।

উমা বলল, 'তোর ওপর অনেক অবিচার করেছি। তুই আমাকে ক্ষমা করিস।'

নীলা বলল, 'ওসব কথা থাক দিদি। আগে খোকন ভালো হয়ে উঠুক।'

সপ্তাহখানেক বাদে অসিত ফিরে এল। উমার ছেলে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠেছে। আর আশঙ্কার কোন কারণ নেই। উমা তার ছেলের কাছেই রয়ে গেছে। তাকে ছাড়া সে আর এক পাও নড়বে না। এদিকে মা আর ঠাকুরমা দুজনে দুপাশে না বসলে খোকন ওষুধ খায় না, পথ্য খায় না।

অসিত বলল, 'শাশুড়ী বউয়ের মিলটা খোকনই ঘটিয়ে দিলে মা।'

অরুন্ধতী মৃদু হেসে বললেন, 'তাই তো ঘটে থাকে।'

আজকাল মাঝে মাঝে সুরপতির নিজের ওপরই কেমন সন্দেহ হয়। চালে ভুল করেছেন না তো তিনি? সুরপতি বেশ বুঝতে পারেন দিনকাল বদলে যাচ্ছে। উল্টো হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ার ওপর নিরিখ রেখে পালের দড়ি টানতে না পারলে নৌকো বেসামাল হবেই। অফিসের পর গাড়ীতে করে বাড়িতে ফিরতে ফিরতে সুরপতির এই কথাটাই বার বার মনে পড়ছিল। রাজ্যেশ্বর দত্তকে ব্যাঙ্ক থেকে তাড়ানো আর তাঁর দলের এমপ্লয়ীদের ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করা দুটো কাজ এক সঙ্গে না করলেই বুঝি ভাল হত। তাহলে গোলমালটা এতদূর গড়াত না। অবশ্য এই সামান্য গোলযোগে, অসিত-শ্যামলের নেতৃত্বে গুটিকত নগণ্য কেরানীর হুমকিতে ভয় পাবেন, সুরপতি এখনও তত বুড়ো হননি, তত দুর্বল হয়ে পড়েননি। কিন্তু সময়টা ভাল না। কর্মচারীদের শায়েস্তা করার সময় এখন নয়। বাইরের কাউকে জানতে না দিলেও সুরপতি তো জানেন ভিতরে ভিতরে ব্যাঙ্কের আয়ে চিড় ধরেছে। যুদ্ধের ক'বছর 'দেশলক্ষ্মী' যে বিজনেস করেছে, গত দু'বছরের মধ্যে তার অর্ধেকে নেমে এসেছে, তবু সুরপতি হিসাবে মোটামুটি লাভ দেখিয়েছেন। ওটা দেখাতে হয়।

নইলে ব্যাঙ্কের সুনাম থাকে না, কর্মচারীদের মন ভেঙ্গে যায়। আসল আয় ব্যয় কতটুকু দেখাব সেইটিই তো আসলে ব্যাঙ্কিং, কিন্তু স্পেকুলেসনে কেবলই যেন গোল মাল হয়ে যাচ্ছে। স্পেকুলেসনের ভুলই বা বলেন কী করে? অন্নপূর্ণা আয়রণ ফাউণ্ড্রির টাকাটা যে এভাবে পড়ে যাবে এটা তিনি কোনদিন ভাবতে পারেননি। চালু ফাউণ্ড্রি, ব্যবসা ভালই চলছিল। শরিকি বিবাদ শুরু না হলে টাকাটা সুদ সমেত উঠে আসত ঠিক। এখন মামলা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, তাতেও কত পার্সেণ্ট আদায় হবে সন্দেহ আছে সুরপতির। তাছাড়া নিজে জোর দিয়ে যে টাকা ইনভেষ্ট করেছিলেন তা নিয়ে মামলা মোকদ্দমা শুরু হলে নিজের বদনামকে তিনি আটকাবেন কী করে। আরেকটা ঘা দিয়েছে দু'টো কোল কোম্পানীর মোটা কয়েকখানা শেয়ার। চড়া দামে কেনা শেয়ার কিন্তু আজ প্রায় মূল্যহীন। এটাও অভাবিত, দেশলক্ষ্মীর ভাগ্য খারাপ? না, ভাগ্য-টাগ্য মানেন না সুরপতি। তবে যোগাযোগটা বুঝি মানতে হয়। বিরাট কিছু, মহৎ কিছু করতে গেলে এমনি ঝড় ঝাপটা আসে বৈকি? পুরুষ মানুষের তাতে দমে গেলে চলে না। একদিকে ডোবে তো আরেক দিক ভেসে ওঠার অপেক্ষায় থাকতে হয়। দেশলক্ষ্মীর সিস্টার কনসার্ন 'ভারতী ফায়ার জেনারেল' ভাল কাজ দিচ্ছে। দেশলক্ষ্মীর লাভের টাকাকে সুরপতি সিন্দুকে বন্ধ করে রাখেননি। দেশময় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, দেশলক্ষ্মীর ব্রাঞ্চে ব্রাঞ্চে ভারতবর্ষের ম্যাপকে তিনি চতুর্দিকে চিহ্নিত করে রেখেছেন। ব্যাঙ্কের আওতায় আরও চার পাঁচটি কনসার্ন আছে, দুঃসময়ে যাদের ওপর নির্ভর করে, যাদের ওপর ভর দিয়ে চলতে পারে দেশলক্ষ্মী। কিন্তু সে সব জটিল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবেন কি, পিঁপড়ের মত ক্ষুদে কেরানীর কামড়ে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এক এক সময় তাঁর ইচ্ছে হয় পিঁপড়ের মতই এর কতগুলিকে তিনি পিষে মারেন। একধার থেকে বরখাস্ত করে তাড়িয়ে দেন ব্যাঙ্ক থেকে। দেবেনও তাই। তবে একদিনে নয়। আস্তে আস্তে এক একজন করে। হ্যাঁ আজ তিনি একরকম ওদের ইউনিয়নের দাবী মেনেই নিয়েছেন। ভরসা দিয়েছেন ইনক্রিমেণ্ট লিস্ট রিভাইস করা হবে। বলেছেন, এ ব্যাঙ্কে আর যাই হোক অবিচার অন্যায় কারো ওপর হবে না। যোগ্যতার পুরস্কার দেশলক্ষ্মী চিরদিন দিয়ে এসেছে, আজও দেবে। কিন্তু মনে মনে ভেবেছেন দু'টি লোকের পুরস্কারের ব্যবস্থা একটু তাড়াতাড়িই করতে হবে। অসিত আর শ্যামল। অসিতের ব্যবস্থা তিনি ঠিক করেই রেখেছেন। বাকি শ্যামল, তার ব্যবস্থাও তিনি শিগগিরই করবেন। এই দু'টিকে সরাতে পারলেই কিছুদিন অন্তত নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। মানসিক স্বস্তিতে গাড়ীর গদিতে পিঠ রাখলেন সুরপতি। রাসবিহারীর মোড়ে এসে ড্রাইভার একবার ব্রেক কসল। একটা ট্যাক্সির সঙ্গে আরেকটু হলেই ধাক্কা লেগে যেত। অন্যদিন হলে সুরপতি ধমকে উঠতেন, 'একটু দেখে শুনে চালাতে পার না।' বেশি স্পিডে গাড়ী চালানো পছন্দ করেন না সুরপতি। কিন্তু ড্রাইভার বেচারী আজ রেহাই পেয়ে গেল। সুরপতি চুপ করেই রইলেন। হর্নের শব্দ করে গাড়ী এসে গেটে দাঁড়াল। নেমে এলে

সুজাতা। হাত বাড়িয়ে বাবার কাঁধ থেকে চাদরটা তুলে নিয়ে বলল, 'আজ বড্ড রাত করে ফেলছে বাবা। এরকম যদি দেরি কর তাহ'লে ব্যাঙ্কে যাওয়াই তোমার বন্ধ করে দেবো কিন্তু।'

সুরপতি স্নিগ্ধ হেসে বললে, 'তাই দিস, এবার থেকে তোকেই ব্যাঙ্কে পাঠাব ঠিক করেছি বুলু।'

সুজাতা বলল, 'না ঠাট্টা নয়, দেখতো কত রাত হয়েছে।'

সুরপতি আবার একটু হাসলেন, 'হ্যাঁ মধ্য রাত, সাড়ে সাতটা যখন বেজে গেছে তখন মাঝ রাতের আর বাকি কী?'

মেয়েকে দেখলে, মেয়ের কাছে এসে দাঁড়ালে সুরপতির সব ভাবনা চিন্তা থেমে যায়। সুরপতি জামা কাপড় বদলে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন, চায়ের সরঞ্জাম আনিয়ে নিজের হাতে চা করল সুজাতা। সুরপতি বললেন, 'তোর বুঝি এখনও চা খাওয়া হয়নি বুলু। কতদিন বলেছি আমার দেরী দেখলে তুই বসে থাকিসনে, চা খেয়ে নিস্।'

সুজাতা মুখ নিচু করে রইল। সুরপতি জানেন হাজার বললেও সুজাতা কথা শুনবে না। সুরপতি না ফেরা পর্যন্ত বিকেলের চা কোনদিন খাবে না সুজাতা। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সুরপতির মনকে যেন দুই শরিকে ভাগ করে নিয়েছে। তাঁর আধখানা মন জুড়ে আছে দেশলক্ষ্মী। আর আধখানা মেয়ে সুজাতা। নিষ্ক্রিয় অবসর মুহূর্তে সুরপতি ভেবে দেখেছেন কোনদিন যদি এই দুই শরিকে বিবাদ বিসম্বাদ শুরু হয়, একের স্বার্থের জন্য অন্যকে ত্যাগ করতে হয়, কাকে ছাড়বেন তিনি? সুরপতি ভেবে দেখেছেন সেদিন বুলুরই জয় হবে। না বুলুর, কাছে কেউ না। প্লেট থেকে একটুরো সন্দেশ ভেঙে নিয়ে প্লেট-টা মেয়ের দিকে ঠেলে দিয়ে সুরপতি বললেন, 'সন্দেশ দু'টো খেয়ে ফেল বুলু।'

চায়ের কাপে আস্তে একটু চুমুক দিয়ে সুজাতা বলল, 'তোমার ধারণা কিন্তু ঠিক নয় বাবা।'

'কিসের ধারণা?'

সুজাতা বলল, 'এই যে তখন ঠাট্টা করে বললে এখন থেকে তোকেই ব্যাঙ্কে পাঠাব। তুমি ভাব তোমার অবনী ছাড়া আর বুঝি কেউ ব্যাঙ্কিংয়ের কিছু বোঝে না। অবশ্য তোমাদের ব্যাঙ্কের খবর জানি না। কিন্তু বাড়িতে ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে তোমার যে সব বই রয়েছে তা আমি প্রায় শেষ করে এনেছি।'

সুরপতি খুশি হয়ে বললেন, 'তাই নাকি?'

সুজাতা বলল, 'হ্যাঁ ভারি ইনটারেস্টিং কিন্তু। আমার একেক দিন ভারি ইচ্ছে হয় তোমার ব্যাঙ্কে গিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখে আসি। একটা প্রতিষ্ঠানের কত রকমের কাজ। কত সতর্ক হয়ে কত মনোযোগ দিয়ে এমপ্লয়ীদের কাজ করতে হয়।'

সুরপতি ম্লান হেসে বললেন, 'এমপ্লয়ীরা সব সময় কি আর মনোযোগ দেয়। দেয়

না। তা হলে তো কথাই থাক তো না। মাঝে মাঝে অন্যদিকেও মন দেয়। দল পাকায়। সেই গোলমাল মেটাতেই তো আজ এত দেরী হয়ে পড়ল।'

সুজাতা প্রশ্ন করল, 'কিসের গোলমাল বাবা?'

সুরপতি বললেন, 'এমপ্লয়ীরা ইউনিয়ন করেছে। দাবী পেশ করেছে, তাদের মাইনে বাড়াতে হবে, তাদের দাবী মানতে হবে। না মানলে ব্যাঙ্কে স্ট্রাইক হতে পারে। কেন, মাইনে আমি বাড়াইনি?' সুরপতি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'এবছরও কয়েকজনকে ইনক্রিমেণ্ট দিয়েছি। হ্যাঁ, যারা ইনক্রিমেণ্ট পাওয়ার যোগ্য তাদের দিয়েছি। আর কে যোগ্য, যোগ্য নয় সে বিচার কি আমি করব, না ওরা করবে। ওরা বায়না ধরেছে সবাইকে ইনক্রিমেণ্ট দিতে হবে। আসলে ইনক্রিমেণ্টের ধুয়াটা উপলক্ষ। আসল লক্ষ্য আমাকে জব্দ করা। বিষ্ণুবাবু বলে একজন ক্লার্ককে একটা মারাত্মক ভুলের জন্য তিন মাস সাসপেণ্ড করেছিলাম, সেই আক্রোশে ওরা এ সব করেছে। আর সব চাইতে আশ্চর্য কি জানিস বুলু, অসিত হয়েছে এদের লিডার। যে একরকম পায়ে ধরে এ ব্যাঙ্কে ঢুকেছিল, তিন মাসের মাথায় যাকে ইনক্রিমেণ্ট দিয়েছি।'

বিস্মিত হয়ে সুজাতা বলল, 'অসিতবাবু রয়েছেন এ সবের মধ্যে? কিন্তু তাঁকে দেখে তো সে রকম মনে হয়নি।'

সুরপতি বললেন, 'মনে আমারও হয়নি। কিন্তু এখন দেখছি সব কিছুর মূলেই সে, দেখতে শুনতে ভালোমানুষ হলে হবে কি। ভিতরে ভিতরে ছেলেটি ভারি চালাক, নইলে সুরপতি চক্রবর্তীর সাথে বড়ে'র চাল চালতে আসে।'

সুজাতা যেন একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল, বলল, 'ইউনিয়নের দাবীর জবাবে তুমি কী বলেছ বাবা?'

সুরপতি অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হেসে বললেন, 'না বুলু, ওদের আমি চটাই নি, সবাইকে চেম্বারে ডেকে এনে ওদের দাবীর ফর্দ যখন পড়ে শেষ করলাম, তখন রাগে চোখ দিয়ে আমার আগুন বেরোচ্ছিল, তবু তো এক চোখে জল এনে বলতে হ'ল, দেশলক্ষ্মী দেশের লক্ষ্মী, তোমাদের লক্ষ্মী। তোমাদের অবহেলা অবজ্ঞায় যদি ব্যাঙ্কের ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি তোমাদেরও। ইনক্রিমেণ্ট লিস্ট নিশ্চয়ই রিভাইজ্‌ড্‌ হবে। আমার যদি ভুল হয়, ভুল তোমরাই শুধরে দেবে।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'তুই ভাবছিস বুলু, বাবা এরকম মনে এক মুখে আর এক করল কেমন করে, কিন্তু করতে হয় মা! ব্যাঙ্ক তো নয়, যেন এক রাজত্ব চালান, কত রকম সব এলিমেণ্ট। ওই ইউনিয়ন-ফিউনিয়ন ভেঙে দিতে আমার বেশী দিন লাগ'বে না। আসলে তোরা যাদের জনগণ বলিস, মগজের দিক থেকে তারা তো এককেটি গণেশ। হ্যাঁ, তবে গণপতির ব্যবস্থা আমি করেছি। অসিতকে নাগপুরে ট্রানসফার করলাম। কালই ও ব্যাঙ্কের চিঠি পাবে।'

অসিতের নেতৃত্বের খবর শুনে মনে মনে তার ওপর ভারি রাগ হচ্ছিল সুজাতার।

এসব ব্যাপার নিয়ে তার মাথা ঘামানোর কী প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নাগপুর বদলি করার কথায় একটু যেন চমকে উঠল, বলল, 'সে তো অনেক দূর বাবা।'

স্বরপতি তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, ওকে একটু বেশী দূরেই কিছুদিন রাখতে চাই বুলু।'

সুজাতা বলল, 'কিন্তু ঠিক এই সময় অসিতবাবুকে ট্রান্স্‌ফার করলে আর পাঁচজন হয়ত সেটা ভালো চোখে দেখবে না। আর অসিতবাবুই কি বুঝতে পারবেন না যে এর পিছনে তোমার একটা উদ্দেশ্য আছে।'

স্বরপতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আমিও সেইটেই চাই। অসিত বুঝুক যে, যার খাব তারই মাথায় লাঠি মারব এ নীতি স্বরপতি চক্রবর্তী কোনদিন সহ্য করে না। তাছাড়া অসিতকে না সরিয়ে শ্যামলকে আমি বরখাস্ত করতে ভরসা পাই না বুলু। আর পাঁচজনের কথা বলছিস্ তাদের আমি বুঝিয়ে দিয়েছি, অসিতের পক্ষে এটা যোগ্যতার পুরস্কার ছাড়া কিছু নয়।'

সুজাতা চুপ করে রইল।

স্বরপতি একটু হেসে বললেন, 'বুঝেছি বুলু, শ্যামলকে বরখাস্ত করার ব্যাপারটাও তোর ভাল লাগছে না। কিন্তু মা, বহুজনের স্বার্থের পথে একের স্বার্থ যেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেখানে নিষ্ঠুর হওয়া ছাড়া উপায় নেই!'

আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে চায়ের কাপ শেষ করলেন স্বরপতি।

স্বরপতির অনুমান মিথ্যে হয়নি। অসিতকে নাগপুরে বদলি করার ব্যাপারটাকে অনেকেই তার সৌভাগ্য বলে ধরে নিল। ডেসপাচের অবিনাশ খবর শুনে নিজের কপালে হাত বুলিয়ে বলল, 'দাদা কপাল করে এসেছিলেন আপনি। চাকরি পেয়ে বছর ঘুরতে পারল না। এক লাফে একেবারে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। একেই বলে ভাগ্য। আর আমরা শালারা যে তিমিরে সেই তিমিরে। তা চলে যান দাদু, পাহাড়ী জায়গা। জল বাতাস ভাল, শুনেছি দেড় টাকা মাংসের সের। দু'আনায় দু'টো ডিম। ছ'মাসে ডবল হয়ে ফেরা চাই।'

টাইপিস্ট সুধাংশু চাটুয্যে হাতের কাজ থামিয়ে হেসে বলল, 'আরে শুধু ডিম মাংস কেন। স্ফূর্তির আরো জিনিস আছে, এতো আর তোমার শ্যামবাজার কলেজ ষ্ট্রীট নয়, কার দিকে একটু নজর দিলে কে কোথায় দেখে ফেলল। ওসব জায়গায় কে আর কার খবর নিচ্ছে। দাশগুপ্ত এতদিন মাটি কামড়ে পড়ে আছে কি সাধে? রস আছে রে ভাই, পাহাড়ী দেশে রস আছে।'

ইনক্রিমেণ্টের ব্যাপারে স্বরপতির প্রতিশ্রুতিকে সকলে সুলক্ষণ বলেই ধরে নিয়েছে। সমস্ত ব্যাঙ্কময় একটা খুশির চাপা ফিসফিসানি। ইউনিয়নকে শেষ পর্যন্ত তা'হলে স্বীকার করে নিল স্বরপতি। না নিয়ে কি আর উপায় আছে। বাপ কি আর সাধে বলে,

চাপে পড়লে তবে তো বাপ বলে। খুশি হয়নি শুধু শ্যামল, ছুটির পর কিছুটা পথ অসিতকে এগিয়ে দিয়ে শ্যামল বলল, 'সুরপতির চালটা বুঝতে পেরেছ অসিত ?'

অসিত হেসে বলল, 'না তা পারিনি। তবে শ্যামল সরকারের হিংসেটা বুঝতে পারছি। অসিত চন্দের জায়গায় শ্যামল সরকারের নামটা কেন হল না, এইত ?'

শ্যামল বলল, 'তোমার সব কিছুতেই কেবল ঠাট্টা। কিন্তু ভেবনা সুরপতি চক্রবর্তী এখানেই থামবে। এটা ওর প্রথম চাল। ইনক্রিমেন্টের ব্যাপারটা আসলে ভাওতা, তুমি দেখে নিও।'

অসিত গম্ভীর হয়ে বলল, 'তা জানি, অবশ্য বদলিটা একদিক থেকে ভালই হ'ল। শুধু হেড অফিসেই নয়, ব্রাঞ্চগুলোকেও আমাদের অর্গানাইজ করা দরকার। সে কাজ বাইরে থেকেই করা সহজ হবে। আর হেড অফিসের জন্য তো তুমিই রইলে।'

শ্যামল বলল, 'তা রইলাম। কিন্তু তুমি চলে গেলে কোন বিষয় নিয়ে পরামর্শ করব এমন লোক কেউ রইল না।'

অসিত জবাব দিল, 'কেন থাকবে না। নীলা রইল, সুপরামর্শ ছাড়া কুপরামর্শ সে তোমাকে কোনদিন দেবে না। আর আমি যাওয়ার পর যখন তখন পরামর্শ করতে যাওয়াটাও সহজ হবে।'

শ্যামল সলজ্জ হেসে বলল, 'ফের বুঝি আবার হালকামি শুরু করলে।'

শ্যামলকে বিদায় দিয়ে পথে আসতে আসতে অসিত ভাবল, সে তো তাইই চেয়েছিল ! চেয়েছিল সমস্ত জীবনটা লঘু রসিকতার মধ্যে কাটিয়ে দিতে। গুরু দায়িত্বের কাজকে সে ভয় করে, কর্মের বন্ধন তার ভাল লাগে না। কিন্তু যে পথে চলতে চায় সে পথে চলতে পারে কই ? সব পথ যেন ডালহাউসির ব্যাঙ্কের দুয়ারে এসে শেষ হয়েছে। দুঃখ দারিদ্র্য অভাবক্লিষ্ট এই ভাঙ্গাচোরা মানুষগুলির দিকে তাকালে এক আশ্চর্য বিস্মৃতি এসে মনকে ঢেকে ফেলে। মনে হয় এরা ছাড়া পৃথিবীতে আর বুঝি মানুষ নেই, এদের কাজ ছাড়া আর কোন কাজ নেই। মনে মনে ভাবে অসিত এমনি করেই বুঝি অনেক মানুষের নেতৃত্ব একজনের উপর এসে ভর করে। সাধ করে কেউ নেতা হতে যায় না।

নীলা আর অরুন্ধতী দুজনকে ডেকে অসিত জানিয়ে দিল তিনদিনের মধ্যে তৈরী হয়ে নিতে হবে। সময় কম। অতএব ফর্দ করে ফেল, কি আছে আর কি নেই। বালিস যা আছে ওতেই চালিয়ে নেওয়া যাবে। বিছানার চাদর চাই বোধহয় একটা।

সব শুনে অরুন্ধতী কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন। না, টাকার হিসাব করে সুরপতি পাষাণ হয়ে গেছে। নাগপুরে পাঠাবার আর লোক পেল না সুরপতি। সে কি জানেনা অসিত কি প্রকৃতির মানুষ। রান্নার একদিন একটু এদিক ওদিক হলে যার পেট ভরে না সে খাবে মেসহোটেলের রান্না। আর সেই খাওয়া খেয়ে শরীর টিকবে।

অরুন্ধতী বললেন, 'অতদূরে তোমাকে আমি যেতে দেব না অসিত।'

অসিত হেসে বলল, 'পরের চাকরী করতে হলে দূর কাছ বিচার করতে গেলে চলবে কেন মা?'

কথাটা খচ করে কানে বিঁধল অরুন্ধতীর, পরের চাকরী—তাছাড়া কি, সুরপতি পর ছাড়া কি?

তিনি বললেন, 'আমিই না হয় সুরপতি ঠাকুরপোকে একবার বলে দেখব—।'

বাধা দিয়ে নীলা বলল, 'না, তুমি কেন বলতে যাবে। এ চাকরিই দাদাকে ছেড়ে দিতে হবে। চাকরি দিয়েছেন বলে তিনি মাথা কিনে বসেননি যে, যা হুকুম করবেন তাই করতে হবে। আর তুমি বুঝতে পারছ না মা, ইউনিয়ন করার অপরাধেই সুরপতিবাবু দাদাকে এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন।'

অসিত বলল, 'কিন্তু নিজে থেকে চাকরি ছেড়ে দিলেই বা ওদের কী, অন্য লোক নিয়ে নেবে। ভাত ছড়ালে কি কাকের অভাব আছে?'

নীলা ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'যে কাক উড়তে জানে তারও কোনদিন ভাতের অভাব হয়না দাদা, অবশ্য সে কাক যদি এর মধ্যেই পায়ে সোনার শিকল পরে ফেলে থাকে তবে সে কথা আলাদা। আর সে শিকলের জোরই বা বুঝি কোথায়? ইচ্ছা করেলে বদলিটাকে তিনি নাকচ করতে পারতেন না!'

ইঙ্গিতটা অসিতের বুঝতে বাকি রইল না। মৃদু হেসে বোনকে বলল, 'তোর বক্তৃতা এবার একটু থামা তো নীলা।'

তৈরী হয়ে নিতে তিন দিন কেন দু'দিনের বেশি সময় লাগল না অসিতের। বিছানা-পত্রের গোছগাছ করল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ শেষ করল। একটা কাজ শুধু বাকি। যাওয়ার আগে সুজাতার সাথে একবার দেখা করে যেতে হবে। আর কোন প্রয়োজনে নয়, শুধু ভদ্রতা, শুধু সৌজন্যের জন্যেই। ইউনিয়নের ব্যাপারটা সুজাতাও কি জানতে পেরেছে? যদি জেনে থাকে অসিতের সম্বন্ধে কি ধারণা হয়েছে তার? একবার ভাবল রংপুর থেকে ফিরে এতদিনে যখন যাওয়া হয়ে ওঠেনি তখন আর গিয়ে কাজ নেই। একেবারে নাগপুরে পৌঁছে একটা চিঠি দিলেই চলবে। মুখের কথার চাইতে চিঠির কথায়ই বরং বেশী সহজ হয়ে উঠতে পারে অসিত। নাগপুরে গিয়ে আর কিছু না হোক অখণ্ড সময় পাওয়া যাবে চিঠি লেখার। আবার ভাবল পরিমিত সংক্ষিপ্ত একটু সাক্ষাতেই বা ক্ষতি কি? দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে অসিত বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

শুয়ে বসে সময় আর কাটতে চায় না সুজাতার। মাঝে মাঝে বড় একঘেয়ে লাগে। এই অফুরন্ত সময় নিয়ে কী যে করবে ভেবে পায় না। সময় সমুদ্র। কিন্তু এ সমুদ্রের এক বিন্দু জলও পান করবার জো নেই। একেক সময় মনে হয় সুজাতার এত সময় নিয়ে কী করবে। ইচ্ছে করলে বই পড়তে পারে। কলকাতা শহরে আর যাই হোক বইয়ের

অভাব নেই। হাত বাড়ালেই হোল। পছন্দমত যে কোন বইয়ের এখানে নাগাল পাওয়া যায়। কিন্তু হাত বাড়াতেই যে ইচ্ছে করে না। মনে হয় কী হবে বইয়ের পাতায় বাইরের পৃথিবীকে আড়াল করে রেখে। কী হবে বইয়ের পাতায় নিজের সমস্যা-ভুলে থেকে ; তাছাড়া ভুলে থাকতে চাইলেই কি ভুলে থাকা যায়। পড়তে বসে কোলের ওপর বই খুলে রেখে যদি এলোমেলো অসম্বদ্ধ চিন্তায় মনকে জড়িয়ে ফেলতে হয় তা হলে তেমন লোক দেখানো বই পড়ে লাভ কী।

কী এত চিন্তা করবার আছে সুজাতার। সত্যি মাঝে মাঝে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়। এত ভাবনার কী আছে তার। খাওয়ার ভাবনা নেই, পরার ভাবনা নেই, কোন রকম দুরূহ দায়িত্ব নেই। দিব্যি নিশ্চিন্ত নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। সে একটু টু শব্দ করলে বাড়ির তিন চারজন চাকর ছুটে আসবে। তিন তিনটি ব্যাঙ্কে তার নিজের নামে এ্যাকাউন্ট্ আছে। ইচ্ছা হলেই সে চেক কেটে টাকা তুলতে পারে। সে টাকায় যা খুসি তাই করা যায়। সিনেমা দেখ, থিয়েটার দেখ, সমুদ্রে পর্বতে বেড়িয়ে এস, শাড়ি কেন, গয়না কেন—কিছুতেই বাধা নেই। জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ টাকায় মেটে। পৃথিবীর সব স্বাচ্ছন্দ্য অর্থের মধ্যে ঘনীভূত হয়েছে। এমন কি সুজাতা বিত্তবানের একমাত্র মেয়ে বলেই নিজেদেরই সমশ্রেণীর স্বাস্থ্যবান সম্পদশালী এক কৃতী যুবককেও সে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েছে। প্রাণভরে ভালোবাসার সাধ মেটাও। কিন্তু হাতের কাছে পেলেই কি বুকের কাছে পাওয়া যায়? কেন এত প্রাচুর্য সত্বেও রিক্ততার শেষ হয় না।

এক একদিন ভাবে কোন একটা কাজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকবে। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে কাজ খুঁজে পায় না সুজাতা। ঘর সংসারের কাজ তার কাকীমাই দেখেন। ঘরবাড়ি গুজানোর কাজের জন্য আছে পুরোন চাকরের দল। নিজের হাতে কিছু করেছে দেখলে তারা ছুটে এসে তার হাত থেকে কাজ কেড়ে নেয়। বাবা রাজী নন বলে, কি তাঁর মর্যাদার হানি হবে বলে বাইরে কোন চাকরি-বাকরি নিতে পারে না সুজাতা। তাছাড়া নিজের দিক থেকে কেমন যেন আড়ষ্টতাও আছে। নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে ভয় রয়েছে মনে। কর্মময় জগৎকে ভয়, আবার অকর্মণ্যতাকেও ভয়। এই সীমাহীন ভয় নিয়ে কোথায় লুকাবে সুজাতা। এ যেন নিজের কাছ থেকে নিজের পালিয়ে বেড়ানো।

কাকীমা বলেন, 'এর চেয়ে তুমি বিয়ে কর বুলু। বিয়ে করলে মনের এই বিষণ্ণ ভাব কেটে যাবে।'

সুজাতা সাগ্রহে বলে, 'কাটবে? তুমি ঠিক জান কাকীমা?'

কাকীমা বলেন, 'জানি বইকি। সময় মতো বিয়ে না হলে মেয়েরা তোমার বয়সে অমন মনমরা হয়ে থাকে। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের মধ্যে গিয়ে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যায়। যে বয়সের যা।'

হয়ত কাকীমার কথাই ঠিক। হয়ত বিয়ে করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের ওপর অমন গভীর বিশ্বাস যদি সুজাতার থাকত তাহলে আর কোন কথা ছিল না। নিজেদের সমাজে অসুখী দাম্পত্য জীবনের ছবি দেখে তেমন বিশ্বাস সুজাতা রাখতে পারছে কই। নিজেদের জানাশোনার মধ্যেই তো কজন আছে। এ্যাডভোকেট নিরেন বোসের মেয়ে অমিতাদি স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। ডাক্তার সুধাংশু মুখয্যের স্ত্রী সীতা স্বামীর ঘরেই আছে বটে, কিন্তু রোজ ঝগড়া তাদের মধ্যে লেগেই আছে। একই বাড়িতে তারা আলাদা আলাদা ভাবে থাকে। তবু কলহ কেলেঙ্কারি থেকে রেহাই পায় না। অবনীকে বিয়ে করলে তার ভাগ্যেও যে এমন দুর্দশা হবে না তা কে নিশ্চিত করে বলতে পারে। ভাগ্য! ভাগ্য ছাড়া কী। কিছু না জেনে না দেখে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়া। নিচে সমুদ্র না মরুভূমি তা জানেনা সুজাতা। কিন্তু এই চোখ বুজে ঝাঁপ দেওয়ার বয়স সে পার হয়ে এসেছে। এখন দেখাশোনা বিচার বিবেচনা ছাড়া একপাও নড়তে ভরসা হয় না। বয়স হলেই এমন হয়। হিসেবী হয়ে যায় মানুষের মন। সেই সূক্ষ্ম হিসেবে ধরা পড়েছে অবনীর সঙ্গে তার মিল যতখানি আছে, অমিল তার চেয়ে ঢের বেশী। এই অমিলের সমুদ্র কী করে পার হবে সুজাতা। এতো একটু হাসি একটু ছোঁয়া একটু চোখে চোখে চাওয়া নয়, এ যে সমস্ত জীবন বাজী রেখে ঝুঁকি নেওয়া। নিজের মনকে না বুঝে অন্যের প্রকৃতিকে না জেনে কী করে এমন মারাত্মক ঝুঁকি নিতে পারে সুজাতা।

'দিদিমণি!'

বাড়ির পুরোণ প্রৌঢ় চাকর অমূল্যের ডাকে সুজাতা চমকে উঠল। ইজি চেয়ারে আধশোয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে উঠে বসল, বলল, 'কীরে?'

অমূল্য বলল, 'অসিত বাবু এসেছেন। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান দিদিমণি।'

সুজাতা বিস্মিত হয়ে বলল, 'অসিতবাবু! হঠাৎ এসময়ে।'

অমূল্য বলল, 'তিনি আপনাকে কী একটা জরুরী কথা বলেই চলে যাবেন। নিচের বসবার ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি। ওপরে ডেকে আনব?'

সুজাতা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না, আমিই নিচে যাচ্ছি। তুই যা। বল গিয়ে অমি আসছি এক্ষুণি।'

খানিকবাদে শাড়ি বদলে, চুলে চিরুণী আর মুখে পাউডারের পাফ বুলিয়ে নিচের ড্রয়িং রুমে নেমে এল সুজাতা।

লম্বা সোফাটার এক কোণে অসিত চুপ করে বসেছিল। সুজাতাকে দেখে স্মিতমুখে বলল, 'আসুন।'

সুজাতা বলল, 'ব্যাপার কী। নিমন্ত্রণ ক'রেও যাকে আনা যায় না তিনি আজ—।'

সুজাতার অসমাপ্ত কথা অসিতই হেসে শেষ করল, 'হ্যাঁ, সেই দুর্লভ ব্যক্তিটি আজ রবাহুত অবস্থায় আপনার দ্বারে এসে হাজির। আমি কাল বাইরে চলে যাচ্ছি সুজাতা দেবী। জানেন বোধ হয় আমি নাগপুরে বদলি হয়েছি।'

সুজাতা গম্ভীর ভাবে বলল, 'জানি। বাবা সেদিন বলছিলেন।'

অসিত বলল, 'ও। এসব ছোটখাটো নিয়োগ বদলির কথাও বুঝি আপনার সঙ্গে আলোচনা করেন ?'

সুজাতা এবার অসিতের সামনের সোফাটায় বসল। তারপর অসিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সকলের নিয়োগ বদলির কথাই যে বলেন তা নয়। তবে বিশেষ বিশেষ দু' একজনের কথা বলেন বই কি ?'

অসিত হেসে বললেন, 'তবু ভালো। আমাকে আপনারা বিশেষ দু' একজনের মধ্যে রেখেছেন, একেবারে নির্বিশেষের ভিড়ে ঠেলে ফেলেননি।'

অসিতের কথার ভঙ্গিতে সুজাতার মুখ একটু পরে আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সুজাতা গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার বাবার বিরুদ্ধে যিনি দল গড়েন, দলপতি হন তাঁকে আমরা নির্বিশেষের মধ্যে ফেলব এমন সাধ্য কী। সত্যি, আপনি যে এমন ব্যবহার করবেন তা আমি আশা করিনি।'

সুজাতার কথায় শুধু ক্ষোভ নয়, অভিমান ফুটে উঠল। অসিত একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনাদের পরিবারের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগত ভাবে আপনার বাবার বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষ নেই। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসাবে যে রীতিপদ্ধতি তিনি বেছে নিয়েছেন আমাদের আপত্তি শুধু তার বিরুদ্ধে।'

সুজাতা বলল, 'কিন্তু আমার বাবা আর ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তো আলাদা নয়।'

অসিত বলল 'আলাদা বই কি। আপনার বাবা কন্যা বৎসল, কিন্তু আমাদের চেয়ারম্যান কর্মচারী বৎসল নন। তাঁর শত শত কর্মচারীর দরিদ্র পরিবার কী খাচ্ছে, কী পরছে তা যদি তিনি দিনের মধ্যে একবারও ভাবতেন তা হলে অতগুলি লোককে সামান্য মাইনেয় তিনি বছরের পর বছর ফেলে রাখতে পারতেন না।'

সুজাতা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমিও আগে আপনার মত ওই রকমই ভাবতাম অসিতবাবু। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে অনেকদিন তর্কবিতর্কও হয়েছে। কিন্তু এ কথার জবাবে বাবা কী বলেন জানেন ?'

অসিত সোৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল 'কী বলেন ?'

সুজাতা বলল, 'তিনি বলেন এতো কেবল একজনের ভাবালুতার কথা না, দানশালার ব্যাপারও নয়। দেশের আর্থিক ব্যবস্থার শিকলে আমরা সবাই জড়িয়ে আছি। শুধু একজনের চেষ্টায়, একটি ব্যাঙ্কের উদ্যোগে এ শিকল ভাঙা যাবে না। তিনি বলেন যে, দেশলক্ষ্মীর মতো দেশের আর পাঁচটি ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের যে মাইনে, যে সুযোগ-সুবিধে, আমার ব্যাঙ্কেও তাই। আর শুধু কি ব্যাঙ্ক ? যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরই তো এই

অবস্থা। একটির সঙ্গে আর একটি গাঁটছড়ায় বাঁধা। বাবা একা কী করতে পারেন?'

অসিত এদিক থেকে সমস্যাটা ভেবে দেখেনি। তাই চট ক'রে সুজাতার কথার কোন জবাব দিতে পারল না। আর সেই অবসরে অমূল্য আবার ঘরে ঢুকল। সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিদিমণি, কাকীমা জিজ্ঞেস করছেন, আপনাদের চা কি এখানে পাঠিয়ে দেবেন?'

সুজাতা স্মিতমুখে বলল, 'হ্যাঁ খাবার আর চা এখানেই নিয়ে এসো অমূল্য।'

অসিত বলল, 'না না, আমার জন্যে চা আনতে হবে না।'

সুজাতা হেসে বলল, 'কেন। এই তো একটু আগেই না আপনি বললেন ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আপনার কোন রাগ নেই। তবে আমাদের বাড়িতে চা খেতে আপত্তি কিসের?'

অসিতও হাসল। বলল, 'আপত্তিটা সেজন্যে নয়।'

সুজাতা বলল, 'যে জন্যই হোক ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে চা না খেলে সৌজন্যের হানি হয়।'

খেতে খেতে দুজনের আলোচনা চলতে লাগল। গুরুতর অর্থনীতি থেকে সেই আলাপের ধারা কখন যে অন্য খাতে বয়ে চলল তা কেউ টেরও পেল না। সাহিত্য সংস্কৃতির পর অসিতের মা বোনদের গল্প উঠল। তার বদলির খবরে মা খুব প্রসন্ন হননি একথা জানাল অসিত। নীলারও ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। কিন্তু অসিত খুব খুশি হয়েছে।

সুজাতা বলল, 'কেন, আপনার এত খুশি হওয়ার কী কারণ ঘটল? ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়েছেন বলে?'

অসিত বলল, 'মোটেই সে জন্যে নয়। ব্রাঞ্চ অফিসের ম্যানেজার হওয়ার দায়িত্ব যত বেশি পুরস্কার তেমন নয়। তা আমি জানি। আমি খুশি হচ্ছি এই উপলক্ষে কলকাতার প্রাচীর ডিঙিয়ে যেতে পারছি বলে। এ ধরণের কোন একটা উপলক্ষ না ঘটলে তো আমাদের পক্ষে বাইরে যাওয়া হয়ে ওঠে না।'

সুজাতা বলল, 'শুধু সেই জন্যেই বাইরে যাচ্ছেন? আপনি বড় নিষ্ঠুর।'

অসিত বিস্মিত হয়ে সুজাতার দিকে তাকাল।

সুজাতা একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমি আপনার বাড়ির সকলের কথা ভেবে বলছি।'

অসিত মৃদু হেসে বলল, 'তা তো নিশ্চয়ই। আপনি যে আপনার নিজের কথা ভেবে বলছেন না তা জানি।'

সুজাতা এ কথার কোন জবাব না দিয়ে আরক্ত মুখ নিচু ক'রে চায়ের কাপে চিনি মেশাতে লাগল। একটু বাদে ফের মুখ তুলল সুজাতা, বলল, 'কেন, আমার পক্ষে

ভাবনাটা কি একেবারেই অসম্ভব। কোন পরিচিত বন্ধুবান্ধবকে বাইরে যেতে দেখলে আপনার নিজেরও কি মন খারাপ লাগে না? আপনি স্বীকার করুন আর নাই করুন।'

অসিত বলল, 'কেন স্বীকার করব না? আমি সব স্বীকার করি। আজ আমার সব স্বীকার করতে ইচ্ছে হচ্ছে। দূরে যাওয়ার সময় শুধু মা বোনের কথাই নয়, পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কথা ভেবেও কষ্ট হয়। কিন্তু সে কষ্ট তো শুধু কষ্টই নয়। তার মধ্যে আরো কিছু পাওয়ার স্বাদ যদি না থাকত—।'

বাইরে থেকে অমূল্য বলল, 'আলোটা জেলে দেব দিদিমণি? সন্ধ্যা হয়ে গেছে।'

সুজাতা বলল, 'সন্ধ্যা হলে আলো তো জ্বালতেই হয়। তার আবার জিজ্ঞেস করবার কী আছে?'

কিন্তু আলো জ্বালবার পর কেউ আর কোন কথা বলল না। শুধু কথাই যে বন্ধ হল তাই না। কেউ কারো মুখের দিকে তাকালও না। আবছা অন্ধকারে যা বলা যায়, উজ্জ্বল আলোয় মুখ তুলে সে কথা বলাই যায় না।

একটু বাদে অসিত উঠে দাঁড়াল, বলল, 'যাই এবার। গোছগাছ কিছু এখনো বাকি আছে।'

সুজাতা নিঃশব্দে অসিতের পিছনে পিছনে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত গেল। অসিত গেট পার হয়ে যাবে, সেই সময় হঠাৎ ডেকে বলল, 'শুনুন!'

অসিত মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কী বলছেন?'

সুজাতা বলল, 'গিয়ে চিঠি দেবেন।'

অসিত বলল, 'দেব। চলি এবার। আপনি বাড়ি যান।'

খানিকক্ষণ গিয়ে অসিত যদি পিছন ফিরে না তাকাত তাহলে সুজাতা ধরা পড়ে যেত না। দেখতে পেত না সুজাতা তখনও সেই গেটের পাশে দাঁড়িয়েই আছে। কিন্তু শুধু কি সুজাতাই ধরা পড়ল? ফিরে তাকাতে গিয়ে অসিত নিজেও কি ধরা দিয়ে গেল না?

কী মধুর এই ধরা পড়া আর ধরা দেওয়া। সুজাতা মনে মনে ভাবল কী মধুর। খানিকক্ষণ আগের শূন্য পৃথিবী হঠাৎ যেন কানায় কানায় ভরে উঠেছে।

দিন কয়েক অরুন্ধতীর ভারি ফাঁকা ফাঁকা লাগল। ছেলেকে ছেড়ে এর আগে কোনদিন যে তিনি থাকেন নি তা নয়। অসিত যখন কলেজে পড়ত, যখন সস্তা মেসে হোটেলে থেকে কলকাতায় চাকরির চেষ্টা করত, তখনও ছেলের কাছ থেকে তাঁকে দূরেই থাকতে হয়েছে। একখানি চিঠির প্রত্যাশায়, কি লোকের মুখ থেকে তার কুশল সংবাদ শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় এসে বাসা করবার পর অসিত একটি দিনের জন্যেও বাইরে কোথাও গিয়ে থাকেনি। এতদিন কাছাকাছি থাকবার পর

হঠাৎ এমন করে বাইরে চলে যাওয়ায় অরুন্ধতীর মনে হতে লাগল যেন ঘরের অনেকখানি জায়গা খালি হয়ে গেছে।

তিনদিন বাদে অবশ্য পৌঁছ সংবাদ এল অসিতের। পোস্টকার্ডে মাত্র চার পাঁচ ছত্র লেখা। মঙ্গলমতো পৌঁছেছে। গাড়ীতে কোন কষ্ট হয়নি। নীলাকে পরে চিঠি দিচ্ছে। সে যেন রাগ না করে।

নীলা সেই চিঠি পড়ে বলল, 'বয়ে গেছে আমার রাগ করতে। তার চিঠি না পেলে যেন আমার নাওয়া খাওয়া বন্ধ হবে, কাজকর্ম অচল হয়ে যাবে।'

অরুন্ধতী বললেন, 'যাই বল বাপু, তোমাদের ফ্যাসানের জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে গেলাম। কেন পোস্টকার্ডে কি আর জায়গা ছিল না? না আর দুটি ছত্তর বেশী লিখতে হাতে ব্যথা হচ্ছিল? খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করেছে সে সম্বন্ধে কোন কথা নেই—।'

নীলা বলল, 'তুমি অত ব্যস্ত হয়ো না মা। সেখানে দাদা ম্যানেজার হয়ে গেছে। তার কত দারোয়ান, কত বেয়ারা—।'

অরুন্ধতী বললেন, 'তুই থাম। দারোয়ান বেয়ারা থাকলেই যেন মানুষের খাওয়ার সব সমস্যা মিটে যায়। যেমন তেমন রান্না সে খেতেই পারে না।'

নীলা হেসে বলল, 'তাহলে তো যাওয়ার সময় দাদার বিয়ে ক'রে বউ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আগে বললে না কেন মা, সুরপতিবাবুকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলতাম।'

অরুন্ধতী চটে উঠে বললেন, 'কেবল ঠাট্টা আর ঠাট্টা। তোর প্রাণে কি কোন মায়া দয়া নেই নীলি! তুই কি সব ধুয়ে মুছে ফেলেছিস? যা সরে যা, আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা।'

নীলা আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে গেল। এ ঘরে আজ তারই পূর্ণ একাধিপত্য। অংশীদার হিসেবে উমা আজ আর উপস্থিত নেই। কিছুদিন আগে তার চিঠি এসেছে ছেলেকে নিয়ে মোটামুটি শান্তিতেই আছে সে। শাশুড়ী আর দেওরও তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছেন। নীলা মনে মনে ভাবল বিবাহিতা মেয়ের স্বামী গেলে আরও পাঁচজন থাকে। বিশেষ করে যদি ছেলে থাকে, তাহলে তাকে নিয়েই সে ভুলে থাকতে পারে। কিন্তু নীলার মত যারা—। যাক নিজের কথা ভেবে আর লাভ নেই। তার স্নানের বেলা হয়ে গেছে।

নারকেল তেলের শিশিটা তাক থেকে পেড়ে আনল নীলা। একেবারে তলার দিকে অল্প একটু তেল পড়ে আছে। আজ এটুকুতেই হয়ে যাবে। অরুন্ধতী গন্ধ তেল মাখেন না। তাঁর তেল আলাদা।

চুলে তেল মাখতে মাখতে নীলা ভাবল মার মেজাজটা ক্রমেই খিটখিটে হয়ে উঠেছে। নীলার মুখে একটু হাসি, সামান্য একটু নির্দোষ পরিহাসও তিনি সহ্য করতে পারেন না।

কিন্তু তিনি কি জানেন না নীলার জীবনের শূন্যতার কথা ? তার আশাহীন, আশ্বাসহীন ভবিষ্যতের কথা ? হাসি-তামাসায় আর কাউকে নয়, নিজেকেই ভুলিয়ে রাখতে চায় নীলা। যে জীবনটা সীসার মতো ভারি হয়ে চেপে রয়েছে তা যদি একটু নড়ানো যায়, একটু যদি হালকা ক'রে তোলা যায়। কিন্তু তার যেন তাও সহ্য হয় না।

একটু বাদেই অরুন্ধতী সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'নীলি, রাগ করলি ?'

নীলা সংক্ষেপে বলল, 'না।'

অরুন্ধতী মৃদু হেসে বললেন, 'মুখে বলছিস না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে—।'

নীলা বাধা দিয়ে বলল, 'ভিতরের কথা দিয়ে কী হবে মা, বাইরে শান্তশিষ্ট হয়ে আছি কিনা তাই দেখে নাও। তোমার সামনে কোন দিন আর না হাসলেই তো হোল।'

অরুন্ধতী বললেন, 'কেন, হাসবিনে কেন, আমি কি হাসতে বারণ করেছি। দেখ, তোরা যদি সব কথাই অমন করে ধরিস, তাহলে আমি কী করে পেরে উঠি বল ? উমা তার শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে, অসিত বদলি হয়ে গেল, তুইও তো সারাদিনের মতো চললি স্কুলে। একা একা আমার দিন কী ক'রে কাটে বল তো দেখি। দুপুর বেলায় ঘর দু'খানা যেন খাঁ খাঁ করতে থাকে। ছেলেমেয়ে হলে বুঝবি, তাদের ছেড়ে থাকার দুঃখটা কী।'

নীলা অদ্ভুত একটু হাসল, 'সে দুঃখ আমাকে আর বুঝতে হবে না মা, তুমি ভেব না।'

অরুন্ধতী বললেন, 'বালাই, কেন বুঝতে হবে না। তুই কি ভেবেছিস এমনি করেই সারা জীবন কাটাবি ? বিয়ে থা ঘর গেরস্থালী করবিনে ? তুই ভাবলেই আমি তোকে তা করতে দিলাম আর কি।'

নীলা গম্ভীরভাবে বলল, 'ওসব কথা থাক মা। ওসব সমস্যার মীমাংসা তো অনেক দিন আগেই হয়ে গেছে।'

অরুন্ধতী প্রতিবাদ করে বললেন, 'হয়ে গেছে ! তুই বললেই হোল, হয়ে গেছে ? কেন কিসের জন্যে তুই এমন সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবি ? উমা তার ছেলেকে নিয়ে সুখে আছে। তুইও বিয়ে থা ক'রে সুখী হ' নীলা। আগের সে সব কথা ভুলে যা। দোষ তোর একার ছিল না। তা ছাড়া তোর তখন কীই বা বয়স। সব দোষ করেছে সুধীর। প্রাণ দিয়ে সে তার প্রায়শ্চিত্তও করে গেছে। তা প্রায়শ্চিত্ত তোরা দু' বোনেও কম করিসনি, কম জ্বলিসনি, কম পুড়িসনি। ঢের হয়েছে—।'

নীলা এ সব কথার কোন জবাব না দিয়ে শাড়ি আর গামছা নিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

অরুন্ধতী নিজেই একটু অপ্রস্তুত হলেন। নিজেরই ওপর রাগ হতে লাগল তাঁর। সত্যিই তাঁর কি আক্কেল বুদ্ধি সব নষ্ট হয়ে গেছে ? কোন্ আক্কেলে তিনি সেই সব পুরোন কথা নীলার সামনে তুললেন ? শুকিয়ে যাওয়া ঘা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফের নতুন করে দিলেন ?

সবাই যেমন ভুলেছে, উমা যেমন ভুলেছে, নীলাও তেমনি ভুলবে। ভুলবে কি, এই ক' বছরে অনেকখানি ও ভুলেও গেছে। মা হিসেবে এখন উচিত নীলার বিয়ে দেওয়া। যদি আপত্তি ও করে সে আপত্তি মোটেই গ্রাহ্য না করা। মেয়ের সুখের জন্যেই নিজেকে একটু কঠিন হতে হবে অরুন্ধতীর। কিন্তু মেয়ে মানুষ হয়ে তিনি একা কী করবেন। অসিত তো মানুষ নয়; সে যদি তেমন ছেলে হ'ত তাহলে অনেক দিন আগেই বিয়ে থা দিতে পারত বোনের। কিন্তু তার কি কোন দায়িত্বজ্ঞান আছে, নাকি লক্ষ্য আছে সংসারের কোন দিকে? বদলি হয়ে আরো ভালো হয়েছে তার। মা-বোনের কাছে শুধু দু-একখানা পোস্টকার্ড লিখবে আর মাস ফুরুলে খরচের টাকা পাঠাবে। কিন্তু শুধু টাকা পাঠালেই কি মানুষের সব দায়িত্ব সব কর্তব্য শেষ হয়? ছেলের ওপর ভারি রাগ হ'তে লাগল অরুন্ধতীর।

নেয়ে-খেয়ে সকাল সকাল স্কুলের জন্যে তৈরী হোল নীলা। ঘর থেকে কেবল পা বাড়িয়েছে, অরুন্ধতী ডেকে বললেন, 'নীলা শোন্।'

নীলা মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'কী বলছ?'

অরুন্ধতী বললেন, 'শ্যামলকে একবার খবর দিতে পারিস? অসিত যাওয়ার পর একদিনও এ মুখো হোল না।'

নীলা বলল, 'তার যদি এ মুখো হতে ইচ্ছে না হয়, তুমি কী করবে বল?'

অরুন্ধতী বললেন, 'কথার ছিরি দেখ মেয়ের। ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা এর মধ্যে এল কিসে। হয়তো কাজকর্মে ব্যস্ত আছে ভগবান না করুন অসুখবিসুখ হওয়াও বিচিত্র নয়। মানুষের শরীরের কথা কি কিছু বলা যায়! চারদিকে যে জরজ্বারি হচ্ছে আজকাল। আমি বলি কি নীলি, তুই একবার ফোন ক'রে শ্যামলের খবর নে।'

নীলা মুখ ফিরিয়ে মায়ের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করল। কিন্তু অরুন্ধতীর শান্ত সরল দৃষ্টিতে ছেলের বন্ধুর জন্যে স্বাভাবিক উদ্বেগ ছাড়া আর কিছু আছে বলে তার মনে হোল না। নীলা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'অত ভাবছ কেন মা। এই তো দিন তিনেক আগেই শ্যামলবাবুর সঙ্গে আমরা দাদাকে হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে এলাম। সেদিনই তো তিনি বলেছিলেন দাদা বদলি হওয়ায় ইউনিয়নের কাজ তাঁর ওপর আরও বেশী ক'রে চাপবে। বোধহয় সেই জন্যেই সময় পেয়ে উঠছেন না।'

নীলার কথার মধ্যে একটু যেন মমত্ব আর সহানুভূতির ছোঁয়া পাওয়া গেল। মেয়ের মনের এই কোমলতা ভালোই লাগল অরুন্ধতীর। ও যে সব সময় মানুষকে খোঁটা দেয়, খোঁচা দেয়, কড়া কড়া কথা বলে তাতে তিনি অসন্তুষ্টই হন। শুধু অসন্তুষ্ট নন, চিন্তাই হয় তাঁর মেয়ের জন্যে। ভাবেন মেয়েটা বুঝি চিরদিনের জন্যে বিগড়ে গেল। ও বুঝি সেই জ্বালা ভুলে গিয়ে শান্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারল না। তাই মাঝে মাঝে ওর মধ্যে যখন দয়ামায়া স্নেহমমতার আভাস মেলে অরুন্ধতী একটু নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

নীলার ওপর নির্ভর ক'রে চুপচাপ বসে রইলেন না অরুন্ধতী। শ্যামলের বাসার ঠিকানায় একখানা পোস্টকার্ডে তার কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করে তাকে আসতে লিখে দিলেন।

দিন দুয়েক বাদে সন্ধ্যার একটু আগে শ্যামল এসে হাজির হয়ে বলল, 'ব্যাপার কী মাসীমা, এমন জরুরী তলব যে।'

অরুন্ধতী অভিমানের ভঙ্গিতে বললেন, 'আর মাসীমা। মাসীমা বলে যে কেউ এখানে আছে তা কি আর তোমার মনে আছে বাপু?'

শ্যামল হেসে বলল, 'খুব মনে আছে মাসীমা। শুধু আপনি কখন ডেকে পাঠান তার অপেক্ষায় ছিলাম। আর একবার সাধিলেই খাইব সেই দশা আর কি।'

অরুন্ধতী মুখ টিপে হাসলেন, 'কথা শোন ছেলের। কেন, না ডাকলে কি তুমি এখানে আসতে পার না? অসিত বদলি হয়ে গেছে বলে আমরা কি এমনই পর হয়ে গেছি?'

শ্যামল বলল, 'হয়েছেন কিনা তাই পরীক্ষা ক'রে দেখলাম।'

অরুন্ধতী হেসে বললেন, 'আচ্ছা ছেলে বটে! স্নেহভালবাসারও আবার পরীক্ষা নিতে হয় বুঝি?'

শ্যামল গম্ভীরভাবে বলল, 'হয় বৈকি।'

অরুন্ধতী বললেন, 'তা পরীক্ষার ফল কী হোল, পাশ করেছি!'

শ্যামল বলল, 'আপনি কোন রকমে উৎরে গেছেন। কিন্তু আর একজন একেবারে ডাহা ফেল।'

বলে শ্যামল ইসারায় নীলাকে দেখিয়ে দিল।

নীলা আরক্ত হয়ে বলল, 'আমার ফেলই ভালো। আপনার পরীক্ষায় আমার পাশ করবার ইচ্ছে নেই।'

একটু বাদেই সেখান থেকে উঠে গেল নীলা। অরুন্ধতী চা আর খাবার দিয়ে যেতে বললেন শ্যামলকে।

একটু পরে অসিতের কথা উঠল। সে শ্যামলকেও ওই রকম পোস্টকার্ডের ছোট চিঠি লিখেছে। শুধু পৌঁছ সংবাদ আর কুশল সংবাদের আদান-প্রদান। আর কোন কথা নেই।

শ্যামল বলল, 'তার জন্যে দুঃখ করিনে মাসীমা। মানুষ যত বড় হয় তার পত্র তত ছোট হতে থাকে।'

অরুন্ধতী বললেন, 'তোমার যা কথা, বড় না ঘোড়ার ডিম হয়েছে।'

এর পর শ্যামলের আশা যাওয়া নিয়মিত চলতে লাগল। অফিস ছুটির পর প্রায়ই নীলাদের বাসায় চলে আসে। চা খেতে খেতে ব্যাঙ্কের গল্প বলে। ইউনিয়নের জোর কী ভাবে বেড়ে চলেছে তার খবর দেয়। তিনজনের সেই ছোট্ট সভা বেশ জমে ওঠে।

শ্যামলের অসংকোচ ব্যবহারে নীলার সংকোচও কমে গেছে। সেও সহজভাবে আলোচনায় যোগ দেয়। মাঝে মাঝে শ্যামলকে খোঁটা দিয়ে বলে, 'জোরের বড়াই আর করবেন না। আপনার যত জোর কাগজে কলমে। শক্তি পরীক্ষার সময় যেদিন আসবে সেদিন কাউকেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

শ্যামল বলে, 'পাওয়া যায় কি না যায় দেখবেন। কর্তাদের মনের ইচ্ছে ছিল আমাকেও অসিতের মতো ওইরকম ছোটখাট একটু ইন্দ্রত্ব দিয়ে বাইরে পাঠান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় সেটা নিরাপদ মনে করলেন না। বড়কর্তা তো একেবারে সরাসরি বরখাস্তের কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু ছোট কর্তা বাধা দিয়ে বলেছেন হৈ চৈ হবে। আর কিছু না হোক অন্তত হৈ চৈ-এর ভয়টা কর্তারা আজকাল পেতে শুরু করেছেন।'

নীলা বলল, 'হৈ চৈও বলা যায়, আবার চড়াই পাখির কিচির-মিচিরও বলা যায়। বুদ্ধিমান গৃহস্থ সেই কিচির-মিচিরটুকু এড়িয়ে যেতে চায়। সুরপতিবাবুরাও তাই চাইছেন।'

নীলা শ্যামলের কোন কৃতিত্ব স্বীকার করতে চায় না। তার সমস্ত আত্মপ্রসাদকে ঠাট্টা তামাসায় ধূলিসাৎ করে দেয়। তবু শ্যামলের এখানে আসতে ভালো লাগে, নীলার সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভালো লাগে। এ ভালো লাগা যে তার একার নয়, সে কথা শ্যামলের বুঝতে বাকি নেই।

অরুন্ধতীও তা বুঝতে পেরেছেন এবং পেরে খুশি হয়েছেন। তিনি অপেক্ষা করছেন শ্যামল কবে মুখ ফুটে বলবে। ও যদি না বলে অরুন্ধতীকেই অবশ্য বলতে হবে। কিন্তু যা দিনকাল, তাতে ওদের দিক থেকে প্রস্তাবটা এলেই সব চেয়ে ভালো হয়।

জায়গাটা অসিতের ভালোই লাগছে, নাগপুর শহরের উপান্তে দেশলক্ষ্মীর এই ছোট্ট ব্রাঞ্চ। সব মিলিয়ে দশ বার জন কর্মচারী। সে তুলনায় ব্যবস্থা খারাপ নয়। একতলায় ব্যাঙ্ক, উপরের তলায় কর্মচারীদের মেস। ম্যানেজারের ঘরটা অবশ্য কোণের দিকে, একটু নিরিবিলি। বেশ বড় ঘর। ইচ্ছে করলে সস্ত্রীক থাকার বাধা নাই। চওড়া বারান্দায় অস্থায়ী একটু পার্টিসনের অপেক্ষা শুধু, অবশ্য বিদায়ী ম্যানেজার গোপেনবাবু এ ঘরে একাই থাকতেন। অসিতের তো সস্ত্রীক থাকার প্রশ্নই ওঠে না। প্রশস্ত ঘর পেয়ে মনে মনে খুশি হল অসিত। কলকাতার ইঞ্চি মাপা জায়গা নয়। ইচ্ছেমতো ছড়িয়ে-টড়িয়ে থাকা যাবে। পুবদিকে বড় একটা জানলা। জানলা দিয়ে তাকালে মধ্য ভারতের রুক্ষ কঠিন রূপ চোখে পড়ে। দিকচক্রবালে ধূসর পাহাড়ের আভাস। সেদিকে তাকিয়ে অসিত একেক সময় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এই বিচিত্র পৃথিবী, বিচিত্র প্রকৃতির কতটুকুই বা দেখা যায়, কতটুকুই বা দেখার সুযোগ হয় এক জীবনে। তবু ভাগ্যচক্রে এখানে যখন একবার এসে পড়েছে তখন যেখানে যেটুকু দ্রষ্টব্য আছে সব ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে। অবশ্য এই ভাল লাগা, এই ঘুরে ঘুরে দেখার প্রতিজ্ঞা এ সমস্ত আজ; এখানে আসার এক

সপ্তাহ পরে। প্রথম দিন রীতিমতো খারাপ লাগছিল। স্টেশনে নেমে কেমন যেন ভারি অসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে, মনে হয়েছিল কলকাতা থেকে কতদূরে এসে পড়েছে। এখন শুধু চিঠি ভরসা। যোগাযোগের সেতু শুধু চিঠি। নাম ধাম জেনে নিলেও এই ব্র্যাঞ্চের কারো সঙ্গেই অসিতের মৌখিক আলাপ ছিল না। স্টেশনে নামতেই বাইশ তেইশ বছরের একটি ছেলে ওকে অভ্যর্থনা করল।

'আসুন স্যার, টাঙ্গা ঠিক করে রেখেছি।'

অসিতের বুঝতে দেরি হল না গোপেনবাবু আসেননি, অন্য কোন এমপ্লয়ীকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ছেলেটি কে?

আত্মপরিচয় দিয়ে ছেলেটি বলল, 'আমি স্যার চিত্ত সেন, এখানে ডেসপাচে আছি। ব্রাঞ্চের ব্যাপার আর বলেন কেন, ডেসপাচ রিসিভিং দুটোই এক হাতে দেখতে হয়। গোপেনবাবুরই আসার কথা ছিল। কিন্তু ভোরের গাড়ী, এত সকালে তাঁর ঘুম ভাঙলে তো। সকালে ডাকাডাকি করতেই পাশ বালিশ জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে বললেন, আঃ আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন। রাদার লেট আওয়ার, রিসিভার রিসিভ হিম্, চিত্ত লক্ষ্মী ভাইটি প্লিজ.—কেউ না গেলে ভদ্রলোক কী ভাববেন বল দেখি।' একটু থেমে চিত্ত ফের বলল, 'আমার আবার কী দোষ জানেন, কেউ কিছু রিকোয়েস্ট করলে ফেলতে পারি না। তাছাড়া আপনি আসছেন, আপনাকে রিসিভ করা আমাদের সবারই তো কর্তব্য।'

অসিত চুপ করে রইল।

কিন্তু নতুন মানুষ পেয়ে চিত্তর কথা আর ফুরোতে চায় না। রাস্তায় যেতে যেতে আঙুল দিয়ে এ রাস্তার নাম বলে ও পাশের বিল্ডিংয়ের পরিচয় দেয়। তারপর এক সময় বলে, 'আমাদের বিষয় কিছু শুনলেন নাকি স্যার?'

'কোন বিষয়?'

চিত্ত বলল, 'এই রিট্রেঞ্চমেন্টের কথা, শুনছি এ ব্রাঞ্চেও নাকি ছাটাই-এর কথা উঠেছে।'

অসিত বলল, 'না এখন পর্যন্ত কিছু শুনিনি। তবে কর্তৃপক্ষের যা মতিগতি তাতে কিছুই বলা যায় না।'

চিত্ত একটু যেন চিন্তিত হয়ে উঠল।

অসিত হেসে বলল, 'অমনি ভয় পেয়ে গেলেন বুঝি। না না, হঠাৎ কিছু করবে বলে মনে হয় না।'

খুশি হয়ে চিত্ত বলল, 'তা জানি স্যার। আর সেটা যে কাদের ভয়ে তাও কিছু কিছু শুনেছি। আপনার কথা, শ্যামলবাবুর কথা আমরা প্রায়ই বলাবলি করি। কিন্তু বড় জাঁদরেল লোক সুরপতি। কোন দিক দিয়ে কী চাল চালবেন সেটা টের পেতে পেতেই দেখব চাকরি নট হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, আপনারাও ছেড়ে দেবেন না।'

অসিত হেসে বলল, 'আমরা কি আপনাদের ছাড়া চিত্তবাবু? আর আপনি ওরকম "স্যার" "স্যার" করেন, শুনতে বড় খারাপ লাগে, আমাকে অসিতবাবু বলেই ডাকবেন।'

চিত্ত লজ্জিত হয়ে বলল, 'সে আর বলে দিতে হবে না। আস্তে আস্তে দেখবেন সবই খসে পড়বে। গোপেনবাবুকে তো শেষে গোপেনদায় এসে ঠেকিয়েছিলাম। ভারি আমুদে লোক কিন্তু গোপেনবাবু।'

অসিত হেসে বলল, 'খুব বুঝি আমোদ ফুর্তি করেন আপনারা?'

চিত্ত বলল, 'তেমন কিছু নয়, এই কাঠখোট্টা পাথুরে দেশে আমোদ করার কীই বা আছে। মাঝে মাঝে একটু গান-টানের আসর বসে, এই আর কি। আমার আবার একটু ডান্সের বাতিক আছে কিনা।'

অসিত অবাক হয়ে বলল, 'আপনি নাচতে জানেন নাকি।'

লজ্জিত ভঙ্গিতে চিত্ত বলল, 'জানি এক-আধটু, অবশ্য তেমন কিছু নয়। নাচ-গানের ব্যাপারে গোপেনদারও ভারি উৎসাহ। তবে মাঝে মাঝে বড় বাড়াবাড়ি করে বসেন।'

অসিত বলল, 'কী রকম?'

চিত্ত গলা নিচু করে বলল, 'একটু ড্রিঙ্ক ফ্রিঙ্ক করার দোষ আছে কিনা। সরস্বতী পূজার দিন সন্ধ্যাবেলা একটু জলস'র মতো করা হয়েছিল। হুকুম হোল আমাকে মেয়ে সেজে নাচতে হবে। ঝিয়ের মারফৎ শাড়ি ব্লাউজ এসে হাজির। নাচতে পারব না কেন। পারি। নাচলাম মেয়ে সেজেই। কিন্তু গোপেনদার কাণ্ড! সবাইর মাঝখানে একেবারে ঝাপটে জড়িয়ে ধরলেন।'

অসিত আড়চোখে চেয়ে দেখল লজ্জায় চিত্তর মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

লজ্জিত হয়ে চিত্ত বলল, 'সেই থেকে সবাই আমাকে "গোপা" বলে ডাকে। আমি অবশ্য তাতে চটি না। সবাই যদি তাতে একটু আমোদ পায় তো পাক।'

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে গোপেনবাবু রাত্রের ট্রেনেই কলকাতা রওনা হলেন। তার ছেড়ে যাওয়া ঘরে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত অসিতের চোখে ঘুম এলো না। স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে এসে এই বিদেশ বিভুঁয়ে সামান্য একটু আমোদ-প্রমোদের জন্য এই ক'টি লোকের কি আকুলি-বিকুলি, ভুলে থাকবার ভুলে যাবার কত উদ্ভট সব আয়োজন। বড় কোন আশা নয়, কামনা নয়, শুধু যেটুকু আছে, এ চাকরিটুকু যেন বজায় থাকে। শুধু সেই দুশ্চিন্তা।

নতুন ম্যানেজারকে পেয়ে কেবল চিত্ত সেনই নয় অন্যান্য কর্মচারীরাও যে খুশি হয়েছে এই কয়েক দিনেই অসিত সেটা টের পেয়েছে। কিন্তু অসিত এদের পেয়ে সুখী হতে পারল কই। প্রত্যেকটি মানুষই কেমন যেন স্বার্থসর্বস্ব, কী এক ধরণের বিকারপ্রাপ্ত। সেদিন বিল ক্লার্ক অমিয়বাবু এসে অনেকক্ষণ অসিতের ঘরে কাটিয়ে গেলেন! চারুদর্শন অমায়িক ভদ্রলোক। নাগপুরের অনেক গল্প করলেন, শোনালেন বিচিত্র অভিজ্ঞতার

কাহিনী। কিন্তু যাওয়ার আগে সেই অমিয়বাবুই যখন একাউন্ট্যান্টের বিরুদ্ধে কিছুটা বিষোদ্গার না করে পারলেন না, অসিতের সমস্ত মন ঘৃণায় রি রি করে উঠল। কেন মানুষের এই সঙ্কীর্ণতা? পরস্পরের প্রতি এই বিদ্বেষ ভাবের আসল উৎস কোথায়? এ নিয়ে শ্যামলের সঙ্গে অনেক দিন তর্ক হয়েছে অসিতের। শ্যামলের মতে এর মূল কারণ আমাদের অর্থনীতি। আমাদের অসম অর্থব্যবস্থাই এর জন্য সর্বাংশে দায়ী। সর্বাংশে না হোক, কিছু অংশে যে দায়ী একথা অসিতও অস্বীকার করে। কিন্তু আর্থিক বৈষম্যই কি সব। মানুষ ইচ্ছা করলে কি এর মধ্যে থেকেও একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ পেতে পারে না! নাকি সে পথে সে ভাবে ভেবে দেখবার ধৈর্যই আজ আর কারো নেই। সমবণ্টন, সমান অধিকার এই দাবীতেই সকলে মত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাতেই বা ফল কি? দেশলক্ষ্মীর ব্যাপার নিয়ে সমস্যাটাকে অসিত অনেকবার ভেবে দেখেছে। সুরপতি যে পথে চলেছেন তাতে একটা বিরোধ অনিবার্য হয়েছে। সে বিরোধ যে আসন্ন এটাও কোন পক্ষের জানতে বাকি নেই। কিন্তু অসিত যেন এই সংগ্রামে আর তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। সংগ্রাম মানেই তো এক পক্ষের জয় আর অন্য পক্ষের হেরে যাওয়া। হয়ত শ্যামলদেরই জয় হবে শেষ পর্যন্ত। সুরপতিকে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হবে! কিন্তু অসিত কি তাতেই সুখী হতে পারবে। সুরপতির পরাভবের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি মুখও তো ম্লান হয়ে যাবে। শেষ দেখে আসা সুজাতার মুখখানা অসিতের মনে পড়ল। ওর এই মুহূর্তের মনের খবর জানতে পারলে শ্যামল নিশ্চয়ই বাঁকা হাসি হেসে বলত, ও তোমার আসল নিস্পৃহার কারণটা তাহলে এই। অবশ্য তা কি আমরাই জানি না। কিন্তু কিছুই জানে না শ্যামল। শুধু সুজাতারই নয়, কারও মুখই ম্লান দেখতে চায় না অসিত।

গোপেনবাবু কয়েক ঘণ্টায় চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে গেলেও তার মধ্যে যে কিছু কিছু ফাঁক আর ফাঁকি রেখে গেছেন কাজে হাত দিয়েই অসিত তা বুঝতে পারল। কিন্তু সেটুকু সামলে নিতে অসিতের বিশেষ বেগ পেতে হল না। ব্যাঙ্কের আজকর্ম এখন আর অসিতের কাছে জটিল নয়। বছর খানেকের মধ্যেই এক ধররণর অভ্যস্ততা এসে গেছে। অধস্তন কর্মচারীদের ওপর হম্বিতম্বিটুকু বাদ দিতে পারলে ব্রাঞ্চের কাজ এমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু অবনী মাঝে মাঝে পত্রাঘাতে অসহ্য করে তুলছে। সুরপতির আড়াল রচনা করে নানা ধরণের কৈফিয়ত তলব করছে। অবশ্য ওর অভিসন্ধি অসিতের বুঝতে বাকি নেই। রেকর্ড পত্রে ত কে ইনএফিসিয়েন্ট প্রমাণ করার জন্যই অবনীর এই হীন চেষ্টা। অবনীর ঈর্ষা এবার নতুন পথ খুঁজছে। কাছাকাছি থেকে যে জ্বলুনিকে অবনী অতি কষ্টে নিজের মধ্যে চেপে রাখত দূর থেকে এখন সেই জ্বালা চিঠি পত্রে ছড়িয়ে দিতে পেরে শান্তি পাচ্ছে। তা পাক। অসিত সে সব গায়ে মাখে না। তিন চারখানা চিঠি আসার পর নিতান্তই যে জবাবটুকু না দিলে নয়, সংযত সংক্ষিপ্ত চিঠিতে সেই বিষয়টুকুই অবনীকে অসিত লিখে পাঠায়।

চার্জ বুঝে নিয়ে অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে তাদের কাজের ধরণ ধারণ দেখে নিতে নিতে দিন কয়েক কেটে গেল অসিতের। বেশ একটু ব্যস্ততার মধ্যেই কাটল। এর মধ্যে শুধু শ্যামল আর মাকে দু'খানা পোস্টকার্ডে পৌঁছ সংবাদ দেওয়া ছাড়া ব্যক্তিগত আর কোন চিঠিপত্র অসিত লিখতে পারেনি। কিন্তু এক জনের কাছে চিঠি লেখার কথা তার নানা ব্যস্ততার মধ্যে বারবার মনে পড়েছে। অবশ্য যতবার মনে পড়েছে ততবার এই মনে পড়ার কারণকে বিচার বিশ্লেষণ করতেও অসিত ছাড়েনি। নিজের মনের কাছে তো আর কিছু গোপন নেই। অনেকদিন গোপন করবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছে। সুজাতার ওপর তার এই আকর্ষণ অনুরাগকে বন্ধুত্বের ছদ্মনামে ডাকবার চেষ্টা করেছে বহুদিন। কিন্তু নিজেই বুঝতে পেরেছে এ ঠিক বন্ধুত্ব নয়। সুজাতার সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ দিনের পর দিন প্রচ্ছন্নভাবে গড়ে উঠছে, নিছক বন্ধুত্বের স্বাদ থেকে তার স্বাদ আলাদা। সুজাতার কথা মনে হ'লে এক অপূর্ব উল্লাসে মন ভরে ওঠে। তার সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে যতবার কথা হয়েছে সব মনের মধ্যে ফের গুঞ্জন করতে থাকে। মনে হয় সব বাধা ডিঙিয়ে সুজাতা কাছে আসুক, সব বাধা চুরমার করে অসিত তার সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়াক। নিজের মনকে জানতে আরে বাকি নেই অসিতের। কিন্তু সুজাতার মন! তার আচারে আচরণে কি এমন কোন নিদর্শন পেয়েছে অসিত যা শিষ্টাচার সৌজন্যের অতিরিক্ত, যা সাধারণ বন্ধুত্বের চেয়ে বেশি। সুজাতা ধনী ব্যাঙ্কারের একমাত্র মেয়ে। সেই ধনী সমাজেরই একজন কৃতি যুবকের সঙ্গে বিবাহের বাগদানে আবদ্ধ। অসিতের মত একজন দরিদ্র কর্মচারীর সঙ্গে তার ভদ্রতার সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে? কিন্তু এই বাস্তব বিচারে অসিতের মন বেশিক্ষণ আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। অবাস্তব কল্পলোকে মন আপনা থেকেই ভেসে যায়। একটি মেয়ের সাধারণ তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাবার্তা, চোখের দৃষ্টির, মুখের হাসিকে ঘিরে মন রঙিন স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে।

অসিত যত ভাবে এই পাকে নিজেকে জড়াবে না, ধরা দেবে না, ততই যেন আরো বেশি ক'রে জড়িয়ে পড়ে। এ কি ঊর্ণনাভের বৃত্তি তাকে পেয়ে বসল!

নাগপুরে আসা অবধি একটি ছোট অনুরোধ এক টুকরো গানের কলির মত অসিতের মনের মধ্যে গুণ গুণ করছে 'চিঠি দেবেন।' আসবার আগের দিন সুজাতা বলেছিল। যত ব্যস্তই থাকুক একখানা চিঠি অসিত নিশ্চয়ই লিখতে পারত। কিন্তু কী লিখবে সেই তো সমস্যা। আজও ব্যাঙ্কের আর সব সহকর্মীরা ঘুমিয়ে পড়বার পর নিজের ঘরে বসে গভীর রাত্রে প্যাডের পাতা খুলে সেই সমস্যার কথাই ভাবতে শুরু করল অসিত—কী লিখবে। মনের মধ্যে যত কথা ভিড় করে আসে তার সবই তো লেখা যায় না! কিছুটা বাদ দিয়ে কিছুটা রাখতে হয়। খানিক্ষণ ভেবে অনেক চিঠির খসড়া মনে মনে রচনা করে এবং মনে মনে বাতিল ক'রে শেষ পর্যন্ত অসিত স্থির করল সুজাতাকে কিছুতেই দু'চার লাইনের বেশি লিখবে না। কিছুতেই ধরা দেবে না অসিত। নিতান্তই

পৌঁছ সংবাদ ও শিষ্টাচারসূচক দুটি একটি কুশল প্রশ্নের পরই আজকের চিঠি অসিত শেষ করবে।

কিন্তু লিখতে বসে মনের সে সঙ্কল্প কোথায় ভেসে গেল অসিত টেরও পেল না! পাতার পর পাতা তার ছোট ছোট অক্ষরে ভরে উঠতে লাগল। মনের কত আবেগ, কত ক্ষোভ, কত নৈরাশ্য, কত আশার কথা যে সে একজন অনাত্মীয়া মেয়েকে লিখতে লাগল তার কোন হিসাব রইল না! এ যেন ঠিক চিঠি নয়, ডায়েরী। নিজের মনে মনে কথা বলা। এমন কথা যা আর একজনের কানে কানে বলা যায়।

ব্যাঙ্কের গায়েই ডাক বাক্স। চিঠি শেষ করে সেই রাত্রেই খামে ভরে অসিত সেটা পোস্ট ক'রে এল। কি জানি যদি পরদিন ভোরে উঠে এ চিঠি শেষ পর্যন্ত আর না পাঠাতে পারে অসিত। যদি নিজের কাণ্ড দেখে নিজেই লজ্জিত হয়। এমন এর আগেও দু' একবার হয়েছে। সুজাতাকে রাত্রে লেখা চিঠি দিনের বেলায় অসিত ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তারপর ছিঁড়ে ফেলার জন্যে আবার খুঁৎখুঁৎও করেছে মনে মনে: না ছিঁড়লেই হত, কী এমন দোষ হ'ত সুজাতাকে চিঠিটা পাঠিয়ে দিলে। এই দ্বিধা আর অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে চিঠি রাত্রেই পোস্ট করে এল অসিত। তারপর থেকে জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগল। রোজ বহু বৈষয়িক চিঠিপত্র ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নামে এল, কিন্তু সেই বহুবাঞ্ছিত চিঠিখানা আসবার লক্ষণ দেখা গেল না।

সুজাতার চিঠি পাওয়ার আগে শ্যামলের চিঠি পেল অসিত। আর পেল অরুন্ধতীর। দু'খানা চিঠির মধ্যেই দুটি বিশেষ ধরণের সংবাদ ছিল।

শ্যামল লিখছে:

'অসিত,

তোমার দু' লাইনের পৌঁছ সংবাদ ঠিকই পেয়েছি। ডাকের গোলযোগে তা হারিয়ে যায়নি। চিঠি হারায়নি, কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের গুরু দায়িত্বের আর পদগৌরবের মধ্যে আমাদের ছোট ইউনিয়নের ছোট প্রেসিডেন্টকে আমরা হারিয়ে না ফেলি। তোমার চিঠিতে আমাদের ইউনিয়ন সম্বন্ধে কোন উপদেশ নির্দেশও নেই, কোন ঔৎসুক্য কৌতূহলও নেই। এই নাস্তিত্বই আমাদের কাছে পরম ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক তোমার যদি ভিতরে ভিতরে ছিন্নই হয়ে থাকে, তাহলে তা স্পষ্ট জানাতে দ্বিধা কোরো না। লজ্জা কি, জীবনে এমন কত সম্পর্ক ভাঙে, আবার কত সম্পর্ক নতুন করে গড়ে ওঠে।

তুমি যদিও জিজ্ঞাসা করনি, তবু এখানকার কিছু খবর তোমাকে শোনাচ্ছি। এ খবর তুমি হয়ত আগেই পেয়েছ। কিংবা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সরকারী টীকাটিপ্পনীর সঙ্গে পাবে। তখন সে খবরের চেহারা অন্যরকম হয়ে যাবে। স্থানকাল ভেদে মানুষের চেহারাই বদলায়, আর এ তো খবর।

আমাদের ভাতা, বোনাস আর ছুটির ছোট খাট দাবির তালিকা পেশ নিয়ে যখন জল্পনা করছি তখন দু' একটা বড় বড় কাণ্ড ঘটল। শহরের তিনতিনটি ব্যাঙ্ক রাতারাতি তালাবন্ধ ক'রে ফেললে। সে খবর তোমার নিশ্চয়ই কানে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের হেড অফিসেও যে হঠাৎ সেদিন 'রান' হয়েছিল সে সংবাদ কি তুমি যথাযথ ভাবে পেয়েছ? অবশ্য সুরপতিবাবু হুঁসিয়ার মানুষ। এবারকার মত টাল তিনি সামলেছেন। তিনি তাল ঠুকে বলেছেন তাঁকে কেউ কাত করতে পারবে না। কিন্তু বাইরের লোকের চোখে সংশয় দেখা দিয়েছে, তাদের কানে নানা রকম কথা যাচ্ছে। হয়ত এখনই আশঙ্কা করবার কোন কারণ ঘটেনি। কারণ সুরপতিবাবুর ওপর এ বিশ্বাস সকলের আছে যে, তিনি পৃথিবীর আর কিছুকে ভালো না বাসুন নিজের ব্যাঙ্ককে নিজের প্রাণের মতোই ভালোবাসেন। ব্যাঙ্কের ওপর তাঁর অগাধ মমতা, সে সম্বন্ধে কারো মনে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু মমত্ব আর ইষ্ট বুদ্ধি কি মানুষকে সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করতে পারে? এই কার্য কারণের শিকলে আবদ্ধ আর্থিক দুনিয়ার একজন মানুষের মমতা আর ক্ষমতার জোর কতখানি সে সম্বন্ধে আমাদের সংশয় আছে। কিন্তু সুরপতিবাবুর কোন সন্দেহই সম্ভবতঃ নেই। নিজের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোবা" অনুরূপ। তাই আমার মনে হয় আমাদের পক্ষেও অস্তিত্বের সংগ্রাম আসন্ন। আমাদের ইউনিয়নকে সেই ভাবেই তৈরী হতে হবে।

শোনা যাচ্ছে ব্যাঙ্কের পরিচালনার ব্যাপার নিয়ে সুরপতিবাবুর সঙ্গে অন্য দু' একজন ডিরেক্টরের মতদ্বৈধ ঘটছে। কিন্তু এ সব উঁচু মহলের খবর তোমারই তো বেশী জানবার কথা। আমরা আদার ব্যাপারী। আর তুমি জাহাজে উঠি উঠি করছ, কি জানি হয়ত বা উঠেও বসেছ!

এবার বিদায় নিই। কড়া কড়া কথায় চিঠি ভরে দিলাম। তুমি রাগে কী রকম ছটফট করছ তা চর্মচক্ষে দেখতে না পেলেও কল্পচোখে অবলোকন করতে পারছি। তুমি আমাকে একবার ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিলে যাত্রা দলের বিবেক। কিন্তু সেনাপতি আর রাজকন্যার মাঝখানে এমন এক একজন বিবেককে মাঝে মাঝে আসতে হয়। নইলে পালা জমে না। ইতি—

তোমার রূঢ়ভাষী মূঢ় বন্ধু
শ্যামল'

দ্বিতীয় চিঠি অরুন্ধতীর। তিনি লিখছেন:

'পরম কল্যাণীয়েষু,

দু'দিন দু'রাত উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় কাটাবার পর তোমার পৌঁছ সংবাদ পেলাম। "নিরাপদে পৌঁছেছি, ভালো আছি।" দুটি তো মাত্র কথা। এই দুটি কথা যদি একটু আগে আমাকে জানাতে, আমাকে এমন অস্থিরভাবে অশান্তিতে কাটাতে হত না। কিন্তু তোমার গুণ তো আমি ছেলেবেলা থেকেই জানি। যাকে দুশ্চিন্তা ও অশান্তির মধ্যে না

রাখতে পারলে তোমার শান্তি নেই। যাক, তুমি আর ছোট নও। ভালো মন্দ বুঝবার বয়স তোমার হয়েছে। যা ভালো বুঝেছ তাই করেছ। মান অভিমান ক'রে কোন লাভ নেই। দুশ্চিন্তার দুর্ভাবনার কে কোথায় দিন গুণছে সে ভাববার কি আর তোমার সময় আছে? ছেলেরা বড় হ'লে মার কথা তাদের কতটুকু বা মনে থাকে।

যাক, আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। দয়া করে নিজের শরীরের দিকে একটু লক্ষ্য রেখ। আর নাওয়া খাওয়ার সময়টা ঠিক রেখ। খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা হয়েছে, কে রান্না ক'রে দেয় কী রকম রান্না সব জানায়ো।

অবশেষে আর একটা কথা লিখছি। নীলার বিয়ের কথা। আমি ভেবেছিলাম বড় ভাই হিসাবে নিজেই উদ্যোগী হয়ে এ সব কর্তব্য করবে। কিন্তু তুমি তো এক ব্যোম ভোলানাথ। নিজের বিয়ের কথা তো কানেই তোল না। বোনের যে একটা গতি করতে হবে সেদিকেও তোমার খেয়াল নেই। নীলা যাই বলুক, অল্প বয়সে একটা ভুল করেছিল বলে সারাজীবন ধরেই যে সে তার শাস্তি পাবে এমন কথায় আমার প্রাণ সায় দেয় না। উমার ভাগ্যে যা ঘটবার ঘটেছে। তার তো আর কিছু করবার নেই। ভগবানের আশীর্বাদে ওর একটি ছেলে আছে। সে বেঁচে থাকুক। উমার জীবন তাকে নিয়ে একরকম ক'রে কেটে যাবে। কিন্তু নীলার কী ক'রে কাটবে? ওর কী আছে? আমি তাই কিছুদিন ধরেই নীলার বিয়ের কথা ভাবছিলাম। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। এবার পেলাম। শ্যামলের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ ভাবটা লক্ষ্য করে থাকবে। আমিও গোড়া থেকেই করছিলাম। তুমি চলে যাওয়ার পর ওদের সেই ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়েছে। না, বাড়াবাড়ি কিছু করেনি। শ্যামল আমার তেমন ছেলে নয়। অমনিই রোজ আসে, গল্প করে, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম, ইউনিয়ন-টিউনিয়ন নিয়ে পরামর্শ করে, তর্কবিতর্ক করে। কিন্তু তর্ক আর ঝগড়াই করুক, যত কাটা কাটা কথাই বলুক, আমার মেয়ের যে শ্যামলকে পছন্দ হয়েছে তা আমার বুঝতে বাকি নেই। আর শ্যামলের মনের ভাবও আন্দাজ করতে আমার ভুল হয়নি। তাই তোমার মত জিজ্ঞাসা না ক'রেই কাজটা ক'রে বসেছি। কাল নীলা এবং ওর এক বন্ধু স্কুলের আর একটি টিচারের ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। শ্যামলকে বোধ হয় সময়মতো খবর দিতে পারেনি। তাই সে কালও ছুটির পরে এসে হাজির। আমি চা-টা দিলাম। শেষে এ কথা ও কথার পর বলে ফেললাম: শ্যামল, আমাদের নীলাকে কি তোমার অযোগ্য মনে হয়? শ্যামল বলল, না না, অযোগ্য হবে কেন? ওতো খুব চমৎকার মেয়ে। ও যার ঘরে যাবে সে তো ভাগ্যবান। আমি তখন বললাম, তোমার সম্বন্ধে নীলারও সেই ধারণা। শ্যামল, তোমারা যদি সংসার বাঁধ সে সংসার সুখের সংসার হবে। শ্যামল খানিকক্ষণ চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি ব্যাপারটাকে এভাবে ভেবে দেখিনি মাসিমা। আমাকে একটু সময় দিন। তা ছাড়া

আমি তো গরিব। ব্যাঙ্কের সামান্য চাকরিই সম্বল। সে চাকরিও কবে আছে কবে নেই। আমাদের ব্যাঙ্কে নানা রকম গোলমাল চলছে। এ অবস্থায়—আমি বললাম, অবস্থা মানুষের চিরকাল একরকম থাকে না শ্যামল। তাছাড়া নীলা আমার বোকা নয়, অক্ষম নয়। পাশে দাঁড়িয়ে ও তোমার সব কাজে সাহায্য করতে পারবে। আজই তোমার জবাব দেওয়ার দরকার নেই, তুমি ভেবে দেখ। শ্যামল ঘাড় নেড়ে শান্তভাবে চলে গেল।

নীলা বাসায় আসবার পর শ্যামলকে আমি যা বলেছি তা তাকে সব বললাম। কথা শুনে মেয়ে কিন্তু শ্যামলের মত শান্ত রইল না। মেয়ে আমার রেগে ক্ষেপে চটে মটে একেবারে অস্থির। আমাকে ওসব কথা বলবার কে অধিকার দিয়েছে? আমার কি কোন মান-সম্মান বোধ নেই? একধার থেকে আরো কত কী বলতে লাগল সে আর তোমাকে কী বলব। কিন্তু আমি ওর সেই চণ্ডীমূর্তি দেখে ভয় পাইনি। নিজের পেটের মেয়েকে যদি না চিনব তবে আর এতদিন চিনলাম কী!

আমার তো মনে হয় আমি ভালোই করেছি। ওরা নিজেরা মুখ ফুটে যা বলতে পারছিল না আমি তা বলে দিলাম। এবার তোমার মতামত জানতে চাই। তাড়াতাড়ি চিঠির জবাব দিয়ো। স্নেহাশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি—

তোমার মা।'

চিঠি পড়ে অসিত মৃদু হাসল। শ্যামল আর নীলার মধ্যে এমন একটা ঘনিষ্ঠ আর পরম মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠুক তা সেও চেয়েছিল। কিন্তু নীলার উগ্র মেজাজ দেখে এগুতে সাহস পায়নি। ভেবেছিল যা করবার তা ওরা নিজেরাই করুক। অসিত যদি মধ্যবর্তী হতে যায় তাহলে তাতে ওদের মন জানাজানির পালায় বাধা ঘটবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মা তার চেয়ে অগ্রবর্তিনী। সাহসও তাঁর অনেক বেশী। এ সম্বন্ধে সম্মতি জানানো ছাড়া অসিতের আর করবার কিছু নেই। অবশ্য তার সম্মতিও এক্ষেত্রে অধিকন্তু। শ্যামল আর নীলার নিজেদের মত, নিজেদের মতিটাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট। কিন্তু কাণ্ড দেখ শ্যামলের। ওর চিঠিতে কেবল কড়া কড়া গাল, কড়া কড়া কথা। মধুর আর কোমল কথাগুলি সে বুঝি শুধু নীলার জন্যেই তুলে রেখেছে!

অসিতের পক্ষে এ খবর পরম সু-খবর, আনন্দের বার্তা। নীলা ঘর সংসার করুক, সুখী হোক, এর চেয়ে বড় কাম্য আর কী আছে। কিন্তু বোনের সৌভাগ্যে সুখী হ'তে হ'তে কিসের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল অসিতের। পড়া উচিত নয়, তবু পড়ল। মনে পড়ল সুজাতার চিঠি আজও আসেনি।

মীর্জাপুর স্ট্রীটের একটি চায়ের দোকানে নীল পর্দা ঘেরা একটি কেবিনের মধ্যে দু'কাপ

চা সামনে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল শ্যামল আর নীলা। শ্যামল নিজেই নীলাকে ডেকে এনেছে। তার জরুরী কথা আছে নীলার সঙ্গে। কথাটা যে কি নীলা তা অনেক আগেই আন্দাজ করতে পেরেছে। সে ভেবেছিল শ্যামলের ডাকে সে সাড়া দেবে না। স্পষ্টই জবাব দেবে যে, শ্যামলের বলবার মতো একটা কেন অনেক কথাই থাকতে পারে কিন্তু সে সব কথা শোনবার নীলার সময় নেই, গরজ নেই, প্রয়োজনও নেই। তবু বলি বলি ক'রেও অমন স্পষ্ট ভাষায় রূঢ়ভাবে শ্যামলকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি নীলা। নানা রকম ওজর আপত্তি করেও শেষ পর্যন্ত স্কুল ছুটির পরে শ্যামলের সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে দেখা করতে সে রাজী হয়েছে। সেখানে ভিড় দেখে শ্যামলের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চায়ের দোকানে এসে উঠেছে। নিজের এই কাণ্ড দেখে নিজেই বিস্মিত হয়ে উঠেছে নীলা। যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্যামল তাকে পিছনে পিছনে টেনে নিয়ে চলেছে। কিন্তু তার কোন স্বাধীন ইচ্ছা নেই এ কথা স্বীকার করতেও নীলার সম্মানে বাধে। না, শ্যামলের ইচ্ছার জোরেই সে তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে একথা ঠিক নয়। নিতান্তই যেন কৌতুক করে শ্যামলের ইচ্ছার সঙ্গে সে নিজের ইচ্ছাকে মিলতে দিয়েছে। তার বেশি কিছু নয়। দেখা যাক শ্যামলের কতখানি দৌড়, কতখানি সাহস। সে কী বলে, কী ভাবে তা একটু পরখ করে দেখুকই না নীলা। তারপর তার গাম্ভীর্যভরা কথাগুলি হেসে উড়িয়ে দিলেই চলবে।

কিন্তু কেবিনে ঢুকে শ্যামলের মুখোমুখি বসে মহড়া দেওয়া মনের জোর যেন আগের মত রাখতে পারছিল না নীলা। অকারণে বুক কাঁপছিল, মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। শ্যামল যে কী বলবে তা জানা কথা। মা আগেই তার ভূমিকা রচনা ক'রে রেখেছেন। তবু সেই জানা কথা শুনতে গিয়েও কী এক অজানা আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করতে থাকে নীলার। শুধু অবিমিশ্র আশঙ্কাও নয়। এমন অনুভূতি এক কথায় যার নাম দেওয়া চলে না। অন্তত এই মুহূর্তে নীলা তাকে কোন নাম দিতে পারে না, নাম দিতে চায় না।

অবশ্য কথা শুরু করতে শ্যামলও কম সময় নিল না। চিঠিপত্র লিখতে অসিতের গাফিলতির কথা পাড়ল, ব্যাঙ্কের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা নীলাকে শোনাল, কিন্তু এ কথাগুলির কোনটিই যে আজ আসল কথা নয়, সবই যে অপ্রাসঙ্গিক তা যে বলল সেও বুঝতে পারল, যে শুনল তারও বুঝতে বাকী রইল না।

তারপর নীলা এক সময় বলল, 'সন্ধ্যা হয়ে এল এবার উঠতে হয়।'

শ্যামলের যেন চমক ভাঙল, বলল, 'কিন্তু উঠলে তো চলবে না নীলা, যে কথা বলতে তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি তা তো এখনো বলা হল না।'

নীলা বলল, 'তাহলে বল সে কথা।'

হঠাৎ তুমি কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় নীলা ভারি লজ্জিত হল, তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, 'বলুন।'

শ্যামল একটু হেসে বলল, 'না, আর বলুন নয়, এবার থেকে ওই ভুলটাই শুদ্ধ বলে ধরে নেব। সম্বোধনের এই অমিলটা আর কি চলতে দেওয়া ঠিক?'

প্রগলভা নীলা এর জবাবে হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না। শ্যামলও যে তার কথার জবাব খুব প্রত্যাশা করল তা নয়। নীলার এই অভিনব মৌনতায়, তার লজ্জিত ভঙ্গিতে যে উত্তর মিলল তা মুখের কথার চেয়েও বেশি।

শ্যামল বলল, 'তোমার মায়ের প্রস্তাবে তোমার সম্মতি আছে আমি এই আশা নিয়ে রয়েছি। তোমার মুখ থেকে সেই সম্মতির কথা আমি স্পষ্ট ক'রে শুনতে চাই।'

নীলা বলল, 'আমি জীবনে কোনদিন বিয়ে করব না বলে ঠিক করেছি।'

শ্যামল মৃদু হেসে বলল, 'তোমার এই কঠিন সঙ্কল্পের কারণ কি নীলা? আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে।'

নীলা একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'সব কথাই কি সবাইকে বুঝিয়ে বলা যায়? জীবনে অনেক কথা হয়ত কাউকেই বলা যায় না।'

শ্যামল স্থির দৃষ্টিতে নীলার দিকে তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'যে কথা কাউকেই বলা যায় না তাও হয়ত কোন বিশেষ একজনকে বলা যায়। সেই বিশেষ একজন যদি আমি কোনদিন তোমার হ'তে পারি তাহলে সে কথা তুমি নিজের থেকেই বলবে। তার আগে সে কথা আমারও জেনে কাজ নেই, তোমারও বলে দরকার নেই।'

শ্যামলকে স্পষ্ট বক্তা, সভা-সমিতি-করা কাজের মানুষ বলেই নীলা এতদিন জানত, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরেও যে এমন করুণ বেদনার সুর লাগতে পারে তা যেন ধারণার অতীত ছিল নীলার। শ্যামলের কথা শুনে তার মনে হ'তে লাগল একজন মানুষকে অত সহজে চেনা যায় না। এক কথায় বলা যায় না সে এমন বা তেমন। ভালোয় মন্দে কোমলে কঠিনে মেশানো মানুষের চেয়ে বিচিত্র কিছু পৃথিবীতে বোধ হয় নেই। নীলার মনে হল এমন আন্তরিকতার সুর ও সহানুভূতির সুর সে অনেক দিন শোনেনি, এমন সহানুভূতির স্পর্শ সে যেন জীবনে কোনদিন পায়নি। শ্যামলকে সব কথা খুলে বলবার জন্য নীলার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু সব খুলে বলতে চাইলেই তো আর বলা যায় না। কিসের একটা সঙ্কোচ আর লজ্জা এসে কণ্ঠ রোধ করতে চায়। অথচ না বলেও মুক্তি পাওয়া যায় না। নীলা অনেক চেষ্টার পর ফের কথা শুরু করতে পারল। বলল, 'কিন্তু সব কথা শোনবার পর যদি মনে হয় বিশেষ একজন না হওয়াই ভালো ছিল, তার চেয়ে, তার—।'

নীলা আর কিছু বলতে পারল না। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল।

শ্যামল এবার আস্তে আস্তে ওর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলল, 'তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নেই। তেমন কথা আমার কিছুতেই মনে হবেনা।

অতীতে তুমি হয়ত এক রকম ভুল করেছ, আমি আর এক রকম ভুল করেছি। কিন্তু কোন ভুলই সংশোধনের অযোগ্য নয়। তাছাড়া আমরা তো অতীত সর্বস্ব নই, আমাদের বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ আছে। আমরা দুজনে মিলে আমাদের সেই ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলব নীলা। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক আমি দারিদ্র্যকে ভয় পাইনে, সুরপতিবাবুর শত্রুতাকে না।'

নীলা বলল, 'আমাকে ভেবে দেখতে দাও।'

শ্যামল একটু হাসল, 'আমিও মাসীমার কাছে এমনি ভেবে দেখবার সময় চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি কী বললেন জানো? তিনি বললেন, শ্যামল ভেবে দেখবার সময় তুমি নিতে হয় নাও, কিন্তু নীলাকে কোন সময় দিয়ো না। ভেবে ভেবে মেয়েটার মাথা মেজাজ সব খারাপ হয়ে গেছে।'

নীলা এবার একটু হাসল, 'মা বলেছে এই কথা? চিরকাল মা আমার বদনাম করেই এল।'

শ্যামলও হেসে বলল, 'মায়ের দেওয়া বদনামটা সুনামের ছদ্মবেশ। তাঁর কথার জবাবে আমি বললাম, মাসীমা, যে ভাবনাটা আমার আর তার দুজনেরই, তা কি শুধু আমার একার ভাবলে চলবে? তিনি বললেন, চলবে বাবা চলবে, এখন থেকে অনেক সময় একজনকে দুজনের ভাবনাই ভাবতে হবে। সংসারে তাই নিয়ম। তিনি কতদূর ভেবে রেখেছেন, কতদূর এগিয়ে গেছেন তাই দেখ।'

নীলা বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটার দায়িত্ব তো তাঁর চেয়ে আমাদেরই বেশি। আমাদের ভাবনা তো সত্যি সত্যি তিনি ভেবে দিতে পারেন না।'

শ্যামল বলল, 'তা পারবেন কেন। যে সব ভাবনা একান্তভাবেই আমাদের তা আমাদের নিজেদেরই ভেবে ঠিক ক'রে নিতে হবে। এই যেমন আর্থিক সমস্যার কথা। আমার একার যা রোজগার তাতে এমন সাধ্য নেই ভাল বাড়ি ক'রে ঝি চাকর রেখে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে গৃহস্থালী করি। তাই আপাতত আমাদের সেই একতলার একটি মাত্র ঘরেই তোমাকে সংসার পাততে হবে।'

নীলা এবার চটুল ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'আমার দায় পড়েছে। পুরো একটি তেতলা বাড়ি আর একপাল দাসদাসী ছাড়া আমি মোটে সংসার পাতবই না।'

নীলার কথার ভঙ্গি দেখে শ্যামলও হাসল, বলল, 'তাহলে তো আমার আর কোন আশাই নেই। শুধু তাই নয়, আমার একার রোজগারে সেই একতলার সংসারও চলবে তেমন ভরসা নেই। তাই তোমাকেও আধখানা সংসারের ভার নিতে হবে। আমি যেমন চাকরি বাকরি করব, তোমাকেও তেমনি কাজকর্ম করতে হবে, টাকা রোজগারের চেষ্টায় বেরোতে হবে। ঠিক এখন যেমন বেরোচ্ছ।'

নীলা এবার গাম্ভীর্যের ভান করে বলল, 'তাহলে আর বিয়েতে সুখ হল কী।

আমি আরো ভেবেছিলাম বিয়ের পরে এক গা গহনা পরে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকব আর কর্তৃত্ব করব। কিন্তু এযে দেখছি ডবল দাসত্ব—।'

শ্যামল বলল, 'ওইখানেই ভুল হল। ডবল দাসত্ব মোটেই নয়। আমাদের খাস তালুকে কেউ আমরা কারো অধীন থাকব না। সেখানে আমাদের দুজনেরই সমান অধিকার। এক রাজধানীতে এক সিংহাসনে দুজনেই রাজা রাণী।'

নীলা বলল, 'আচ্ছা, শর্তগুলির কথা ভালো ক'রে ভেবে দেখি।' রেস্টুরেন্ট থেকে দুজনে এবার বেরিয়ে পড়ল। নীলার মন অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। সেই ভারাক্রান্ত অবস্থা আর নেই সে কথা টের পেয়ে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠল শ্যামল। নীলা যতই ভাবুক না কেন, তার সিদ্ধান্ত অন্যরকম কিছু হবে না। এ আশ্বাস নিজের মনে শ্যামল অনুভব করল।

শ্যামলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে এল নীলা। আজ তাকে রজনীগন্ধার তোড়া উপহার দিয়েছে শ্যামল, আর খোঁপায় গুঁজে দিয়েছে একটি রক্ত গোলাপ। শ্যামলের এমন সাহস আর সপ্রতিভতা এর আগে নীলা আর দেখেনি। মায়ের তাগিদে রাত নটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে হল। অন্যদিনের মতোই বই হাতে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু আজ আর বইতে মন লাগল না। নিজের জীবনের ছোট বড় অধ্যায়গুলিই বারবার করে উলটে যেতে লাগল নীলা। কিন্তু নিজের দোষ ত্রুটি ভুল ভ্রান্তির কথা বেশিক্ষণ তার মনে স্থান পেল না। উৎসাহে উদ্দীপ্ত শ্যামলের মুখই বারবার করে তার মনে পড়তে লাগল। নীলার মনে হল যে এরপর থেকে তার আত্মপীড়ন সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যাবে। তার কৃচ্ছ্রতার মধ্যে কোন আন্তরিকতা থাকবে না। সুধীরের মুখ আজ তার মনের পটে অস্পষ্ট। নিজের ভীরুতা আর দুর্বলতার জন্যে নিজেকে হনন ক রে যে অঘটন সুধীর ঘটিয়ে গেছে তার জন্যে নীলা তো আর একা দায়ী নয়। নিজের আংশিক অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে এই ক'বছর ক'রেছে। কিন্তু তার সেই কৃচ্ছ্রসাধন আজ একটা যান্ত্রিক অভ্যাস মাত্র, কোন মূল্যই তার আর নেই। তাই যদি হয় তাহলে অতীতের অপরাধের বোঝা নিয়ে কেন নীলা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে? কেন ফের উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে না? কেন নতুন ক'রে সুখী করবে না? স্মৃতিপূজা কি শুধু শূন্যতার আর শোকের শুকনো ফুলেই করতে হয়? পরিপূর্ণ সুখের ভিতর দিয়ে চলে না? যে সব যুক্তি আর উপদেশ অসিত এতদিন ধরে দিয়ে এসেছে অথচ নীলা মোটেই তাতে কান দেয়নি আজ সেই সব কথাই পরম যুক্তিগ্রাহ্য আর কল্যাণকর বলে তার মনে হ'তে লাগল।

পরদিন অরুন্ধতী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কী ঠিক করলি নীলা? হ্যাঁ কি না শ্যামলকে তো আমায় যা হোক কিছু একটা বলে দিতে হবে।'

নীলা বিরক্তির ভঙ্গিতে অন্যদিনের মত আজও জবাব দিল, 'তোমার যা ইচ্ছে তাই বলে দিতে পার, মা আমি কিছু জানিনে।'

অরুন্ধতী হেসে বললেন, 'কিছু জানিনে। তবে যে এতদিন সবজান্তার বেশ ধরে বসেছিলি। আমার জবানীতে অসিতকে আসবার জন্যে একটা টেলিগ্রাম করে দে। তার তো দু'চারদিন আগেই এসে পৌঁছানো দরকার। আর উমাকেও একটা চিঠি লেখা দরকার। আচ্ছা সে চিঠি আমিই লিখে দেব। স্কুল থেকে ফেরার পথে একখানা এনভেলপ আমার জন্যে মনে ক'রে নিয়ে আসিস।'

উমার নামটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলার বুকের মধ্যে ধক্ ক'রে উঠল। আশ্চর্য! এতদিন দিদির কথা তার মনেই পড়েনি। এই বিয়ের খবরটা কীভাবে নেবে উমা? মনে মনে উমা কি বাঙ্গের হাসি হাসবে না? নীলার কথা ভেবে তার ঠোঁটে কি শ্লেষ ফুটে উঠবে না? দরকার নেই, দরকার নেই। তার চেয়ে নিজের কৃতকর্মের ফল নীলা আজীবন বয়ে বেড়াবে। তবু উমার কাছে সে কোন অনুকম্পার পাত্রী, উপহাসের পাত্রী হয়ে থাকবে না।

কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা নীলা যে অটুট রাখতে পারবে এমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তার সুস্পষ্ট সম্মতি দানের অপেক্ষা না রেখেই অরুন্ধতী বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন নীলার দ্বিধা দৌর্বল্যকে আর তিনি প্রশ্রয় দেবেন না। শ্যামলের ওপর তার অনুরাগ আছে একথা তিনি জানতে পেরেছেন, শ্যামলও তাঁর মেয়েকে পছন্দ করেছে একথা তাঁর অজানা নেই। এর পরেও দেরি করাটা তাঁর পক্ষে মূঢ়তা হবে। কারণ শুভকাজে কখন হঠাৎ কী ব্যাঘাত এসে পড়বে তা কেউ বলতে পারে না। বোনের বিয়ে উপলক্ষে অসিত ছুটি পায় ভালো, না পায় অরুন্ধতীকে নিজেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। আপাতত পুরোহিত ডেকে দু'হাত এক ক'রে দেবেন, তারপর খাওয়ানো দাওয়ানো আড়ম্বর অনুষ্ঠান সাধ্যে কুলোয় করবেন, না হয় করবেন না। তিনি প্রতিবেশী অমূল্য রায়ের কাছে গিয়ে বললেন, 'নীলার সম্বন্ধ ঠিক করেছি। কিন্তু আমার তো লোকজন নেই। ছেলে বিদেশে, ছুটি পায় কি না পায় তার কিছু ঠিক নেই, আপনারা যদি আমাকে এ দায় থেকে উদ্ধার না করেন—।'

প্রৌঢ় অমূল্যবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'ওকি কথা বলছেন বউদি, আমাদের যা হুকুম করবেন তাই করব। কী করতে হবে বলুন।'

পাড়া প্রতিবেশীদের কয়েকটি পরিবারে অরুন্ধতীর খুব যাতায়াত আছে। সকলের অসুখে বিসুখে উৎসবে আনন্দে তিনি খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। তাই ছেলে বুড়ো সকলেরই তিনি শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেছেন। অমূল্যবাবুদের সাহায্যে তিনি বিয়ের বাজার শুরু করে দিলেন। মায়ের জেদ আর দৃঢ়তা দেখে নীলা অবাক হয়ে গেল।

কিন্তু সব থেকে বিস্মিত হল সে উমার চিঠি পেয়ে। নীলার বিয়ের আলোচনার কথা অরুন্ধতীই তাকে জানিয়েছিলেন। তার জবাবে উমা শুধু মাকেই চিঠি লেখেনি

নীলাকেও দীর্ঘ চিঠি দিয়েছে। উমা মাকে লিখেছে শ্যামলের সঙ্গে নীলার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে শুনে উমার খুবই খুশি হয়েছে। এতদিন বাদে নীলা যে মন স্থির ক'রে নিজের চলার পথ বেছে নিতে পেরেছে তাতে উমার চেয়ে বেশি আনন্দ কেউ পাবে না একথা যেন নীলা বিশ্বাস করে।

উমা নীলাকে লিখেছে :

'তুই এতদিন ধরে বিয়ে না করে সন্ন্যাসী হয়ে থাকায় আমার আত্মগ্লানির আর সীমা ছিল না। আমার কেবলই মনে হয়েছে এর জন্যে আর কেউ নয় আমিই একমাত্র দায়ী। আমার দুঃখ দুর্ভাগ্যের কথা ভেবেই তুই বিয়ে করছিসনে। যা ঘটে গেছে তা আমাদের দুজনের জীবনেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। গোড়ায় আমি ভেবেছিলাম সেই দুর্ঘটনার জন্যে তুইই একমাত্র দায়ী। তোর জন্যেই আমি অকালে স্বামী হারিয়েছি। সেই ভুল ধারণার বশে তোকে কত যে হিংসা করেছি তোর কাছে গোপন করব না। সেই সর্বনাশা আঘাতে আমার এমনই মাথা খারাপ হয়েছিল যে, তুই যে আমার ছোট বোন, আমি যে তোর দিদি সে কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমার সেই ভুল ভেঙেছে, মনের পরিবর্তন হয়েছে বলেই নিজের দোষের কথা এমন খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করতে পারছি। আমার দোষ তুই ক্ষমা করিস নীলা, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিস। আমি বুঝতে পেরেছি সেই দুর্ঘটনায় তুই নিমিত্ত মাত্র ছিলি, তোর ওপর আমি অযথা দোষারোপ করেছি। সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ কাটিয়ে তুই যে আর একজনকে ভালোবেসেছিস তাতে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি নীলা। আমাদের মধ্যে যে হানাহানি হয়ে গেছে তাতে একথা শোনা মাত্র তুই বিশ্বাস করতে পারবি কি না জানিনে, হয়ত বিশ্বাস করা সহজ হবে না। কিন্তু আমাদের সেই ছেলেবেলার পুতুল খেলার কথা, দুই বোনে মিলে মাকে লুকিয়ে কুলের আচার চুরি করে খাওয়ার কথা, বর্ষার দিনে দুজনে মিলে বৃষ্টিতে ভিজে মায়ের গাল খাওয়ার কথা যদি মনে পড়ে তাহলে আমার আজকের কথাও তুই অবিশ্বাস করবিনে। আমাদের মধ্যে যত শত্রুতাই হোক তোর সুখে যে আমারও সুখ, তোর আনন্দে যে আমারও আনন্দ আজ না হোক কাল এ কথা তোকে বিশ্বাস করতেই হবে।

খোকন বড় বিরক্ত করছে ভাই, বেশি কিছু আর লিখতে দিচ্ছে না। কখনো চুল ধরে টানছে, কখনো আমার গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খাচ্ছে, কখনো বা পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে সুড়সুড়ি দিতে দিতে নিজেই হেসে উঠছে। ওর হাসির মধ্যে আমি সব পেয়েছি, আমার আর কোন জ্বালা মনে নেই নীলা। ওকে তুই আশীর্বাদ কর ও যেন বেঁচে থাকে, ও যেন মানুষ হয়। আমি তোকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করি ওর মত খোকা এসে তোরও কোল ভরে তুলুক।

তোর বিয়েতে আমি কিন্তু দূর থেকেই আশীর্বাদ পাঠাব। আনন্দ উৎসবে যোগ দেওয়া বোধ হয় ভাগ্যে হবে না। বুড়ি শাশুড়ী শয্যা নিয়েছেন। সবাই বলছে এই

শেষ শয্যা। এ অবস্থায় ওঁকে ফেলে গেলে অকর্তব্য হবে। সব ভুলে যাস নীলা, সব ভুলে যাস। শুধু স্নেহ ভালোবাসার কথাই মনে রাখিস। পৃথিবীতে আর কিছু মনে রাখবার মতো নয়। ইতি—উমা।'

দীর্ঘ চিঠিখানা পড়তে পড়তে বহুবার নীলার চোখ জলে ভরে উঠল। জল গড়িয়ে পড়ল চিঠির ওপর। উষর মরুভূমিতে এতদিনে বর্ষার ধারা নেমেছে।

বোনের বিয়ের জন্যে ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ছুটি চেয়ে পাঠাল অসিত। ছুটি যে পাবেই এ সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ ছিল না। চাকরিতে ঢুকে অবধি সে দু'চার দিনের বেশি ছুটি নেয়নি। নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। তাই অনেক ছুটি তার পাওনা আছে। কর্তৃপক্ষ অনায়াসে তাকে এক মাসের ছুটি মঞ্জর করতে পারেন। ব্যাঙ্কে এ সময় জরুরী কোন কাজের চাপও নেই। গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা কিছু আছে সে আগে থেকেই এ্যাকাউন্ট্যান্ট ক্ষীরোদবাবুকে বুঝিয়ে দিতে লাগল। যাতে ছুটি মঞ্জুরীর চিঠি আসবার সঙ্গে সঙ্গে সে কলকাতা রওনা হ তে পারে।

চিঠি আসতে অবশ্য দেরি হল না। কিন্তু চিঠির মর্ম একেবারে অভাবিত অপ্রত্যাশিত। জেনারেল ম্যানেজার অবনী চাটুয্যে নয় স্বয়ং চেয়ারম্যান সুর ⁺তি চক্রবর্তীর স্বাক্ষরিত চিঠি। এক মাসের ছুটি চেয়েছিল অসিত, সুরপতি তাকে চিরদিনের জ:ন্য ছুটি দিয়েছেন। অযোগ্যতা এবং ব্যাঙ্কের স্বার্থ-বিরোধী যড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তিনি অসিতকে বরখাস্ত করেছেন। সে যেন এ্যাকাউন্ট্যান্টকে অবিলম্বে চার্জ বুঝিয়ে দেয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে সুরপতি এ্যাকাউন্ট্যান্টকে স্বতন্ত্র চিঠি দিয়েছেন সে কথা ক্ষীরোদবাবুর কাছেই অসিত জানতে পারল।

চিঠি হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ বিমূঢ় হয়ে বসে রইল অসিত। সুরপতির এই অসঙ্গত আচরণের কোন কারণ সে খুঁজে পেল না। হঠাৎ সুজাতার সেই উচ্ছ্বসিত চিঠির কথা মনে পড়ল অসিতের। একখানা নয় দু'খানা চিঠি। প্রথমে অনুল্লিখিত বিপদ থেকে উদ্ধারের আশ্বাস জানিয়ে পরদিনই দ্বিতীয় চিঠিতে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেছিল সুজাতা। অনুরোধ করে লিখেছে তার কোন অর্থ নেই। অসিত যেন সে চিঠিকে কোন গুরুত্ব না দেয়। আর তাদের দু'জনের কল্যাণের জন্যেই আপাতত কিছুদিন অসিত যেন সুজাতার কাছে চিঠিপত্র লেখা বন্ধ রাখে।

সুজাতার এই চিঠি দু'খানার সঙ্গে সুরপতির আজকের এই চরম পত্রের কোন সংযোগ আছে কিনা অসিত ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু স্থির হয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। সুরপতির চিঠির ভাষা, তাঁর ভি ি হীন অভিযোগ অসিতের মনে যে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে তাতে তার মত ধীরবুদ্ধি মানুষও বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে উঠল। অসিত মনে মনে সঙ্কল্প করল এ অপমানের শোধ তার নিতেই হবে। সুরপতির এই অন্যায় আর অসঙ্গত ব্যবহার সে কিছুতেই সহ্য করবে না।

অসিতের পদচ্যুতির খবরটা ক্ষীরোদবাবুর কাছ থেকে অফিসের প্রায় সকলেই কিছু-ক্ষণের মধ্যে জানতে পারল এবং এর কারণ নিয়ে তাদের মধ্যে নানা ধরণের জল্পনা কল্পনা চলল। অসিতের দিকে এমনভাবে তারা তাকাতে লাগল যেন পর্বত চূড়া থেকে সে হঠাৎ এক অন্ধকার গহ্বরে পড়ে গেছে। অসিত সবই বুঝতে পারল। কিন্তু বাইরের লোকের হাসি আলোচনা অনুকম্পার দৃষ্টি কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করতে পারল না।

প্রবীণ ক্ষীরোদবাবু অসিতকে ডেকে সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'ঘাবড়াবেন না অসিতবাবু, এ অফিসে এমন অনেকবার হয়ে গেছে। এখানে চাকরি যেতেও সময় লাগে না, হ'তেও সময় লাগে না। আপনি আর দেরি করবেন না, আজই কলকাতা চলে যান। কর্তাকে গিয়ে ধরুন। প্রথমে হয়ত তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন, কাছে ঘেঁষতেই দেবেন না। কিন্তু তাতে ভয় পাবেন না। লেগে থাকতে পারলে শেষ পর্যন্ত আপনার সুবিধে হবেই। বিশেষ ক'রে আপনাদের সঙ্গে চেয়ারম্যানের এত জানাশোনা রয়েছে।'

অসিত বাধা দিয়ে বলল, 'জানাশোনার কথা আপনি কোত্থেকে শুনলেন?'

ক্ষীরোদবাবু হেসে বললেন, 'শুনেছি। হয়ত এত ঘনিষ্ঠতা আছে বলেই চেয়ারম্যান সামান্য কারণে আপনার ওপর অত বেশি বিরক্ত হয়েছেন এবং লঘু পাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। দণ্ডের পরিমাণটা এত বেশি বলেই আমার মনে হচ্ছে এ দণ্ড স্থায়ী হবে না। একথা জেনে রাখবেন এ আগুন যত দপ করে জ্বলে ওঠে তত দপ করে পড়ে যায়।'

অসিত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার উপদেশ মনে রাখব।'

ক্ষীরোদবাবু একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'আপনি ঠাট্টা করছেন। আপনারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান। অনেক লেখাপড়া শিখেছেন। আপনাদের উপদেশ দেব এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে বয়স হয়েছে, সংসারে পাঁচ রকম দেখে শুনে কিছু অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছি। তাই—।'

অসিত হাত জোড় করে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন ক্ষীরোদবাবু, আপনি যে সত্যিই স্নেহ করেন তা আমি জানি। কিন্তু আজ নানা কারণে আমার মন বড় চঞ্চল। যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি বিদায়ের দিনে সেকথা মনে রাখবেন না।'

ক্ষীরোদবাবু জিভ কেটে বললেন, 'ও কি কথা বলছেন অসিতবাবু! আপনার দোষ ক্রটি বিচার করবার ভার আমাদের নয়। আমরা আপনার অধীনস্থ কর্মচারী। সে হিসাবে যে অমায়িক ব্যবহার আপনার কাছ থেকে পেয়েছি তা এ ব্রাঞ্চের আর কোন ম্যানেজারের কাছেই পাইনি সে কথা জোর গলায় বলতে পারি। আমাদের তো আর কিছু করবার সাধ্য নেই, শুধু দূর থেকে মঙ্গল কামনাই করতে পারি।'

ক্ষীরোদবাবুর আন্তরিকতা অসিতকে স্পর্শ করল। এবার তার কণ্ঠেও আবেগের ছোঁয়া লাগল।

অসিত বলল, 'সেই কামানাই তো বড় কামনা ক্ষীরোদবাবু। আপনার আশীর্বাদ মনে থাকবে।'

ক্ষীরোদবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'ঝড়ঝাপটা জীবনে অনেক আসে অসিতবাবু, আবার চলেও যায়। সুখই বলুন, দুঃখই বলুন সবই অস্থায়ী। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হল মাথা ঠিক রেখে মাথা সোজা রেখে চলা। 'দুঃখেষু বিগতমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' গীতার এই উপদেশ আমাদের মত সংসারী লোকের পক্ষে মেনে চলা বড় শক্ত। কিন্তু যদি দু'একবারও মানতে পারেন দেখবেন তার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুতেই নেই।'

অসিতকে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন ক্ষীরোদবাবু। দু'চারজন নিম্নতম কর্মচারীও তার সঙ্গে দেখা করে বিদায় নমস্কার জানাল। দুঃসময়ে সহকর্মীদের এইটুকু সহানুভূতি সমবেদনাও অসিতের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিল। অসিত ভাবল সংসারে সুখ দুঃখ কিছুই অবিমিশ্র নয়।

গাড়ীতেই মনে মনে কর্তব্য স্থির করে নিল অসিত। নীলার এই আসন্ন বিয়ের মুহূর্তে নিজের চাকরি যাওয়ার খবরটা সকলের কাছ থেকেই সে গোপন রাখবে। তা না হ'লে মা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়বেন, নীলার বিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে। তা অসিত চায় না। বরং বোনের বিয়ের তারিখকে এগিয়ে আনাই তার ইচ্ছে। বিয়ের ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি চুকে যায় ততই ভালো। তারপর অনেক কাজ রয়েছে অসিতের। শক্ত বোঝাপড়ার কাজ। নীলার বিয়ের উৎসবের সঙ্গে সেই হাঙ্গামাকে অসিত জড়িয়ে ফেলতে চায় না।

ছেলেকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে অরুন্ধতী বিস্মিত হয়ে গেলেন। হেসে বললেন, 'কিরে, এত তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে গেলি। তবে যে লিখেছিলি ছুটি পাবি কিনা তার কিছু ঠিক নেই। খবর বার্তা না দিয়ে একেবারে হুট করে এসে হাজির।'

অসিত বলল, 'নিজেদের বাসায় আসতে হলেও একেবারে কেতা দুরস্ত ভাবে খবর টবর জানিয়ে আসতে হবে নাকি।'

অরুন্ধতী হাসলেন, 'তা আসতে হবে বৈকি। নইলে ম্যানেজার বাবুর উপযুক্ত অভ্যর্থনা আমরা যদি না করতে পারি।. গরীব মানুষ তো আমরা।'

অসিতের মুখে কিসের একটা ছায়া পড়ল। মুহূর্তের জন্যে তাকে যেন একটু অন্যমনস্ক মনে হ'ল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মুখে হাসি টেনে বলল, 'তাতো ঠিকই। কিন্তু যাই বলো মা, তোমার মতলবটা ভালো ছিল না। নীলার বিয়েটা চুপচাপ একা একাই দেবে এই তোমার ইচ্ছা ছিল। নইলে আমরা একেবারেই কিছু জানিনে শুনিনে—।'

অরুন্ধতী হেসে বললেন, 'যা বলেছিস। আমার মনের কথাটা অতদূর থেকেও কি ক'রে টের পেলি বল তো। নাগপুরে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারী করার সঙ্গে সঙ্গে তুই জ্যোতিষ চর্চাও করছিলি নাকি?'

অসিত লক্ষ্য করল দু'এক কথা বাদে বাদেই তার ব্যাঙ্কের চাকরির পদ-গৌরবের কথা অরুন্ধতী উৎসাহের সঙ্গে উল্লেখ করছেন। তিনি যখন জানতে পারবেন যে অসিতের সে চাকরি আর নেই তখন নিশ্চয়ই দারুণ আঘাত পাবেন। কিন্তু সে আঘাত তো তাঁকে পেতেই হবে! আজ গোপন করলেও অসিত কদিন আর মার কাছ থেকে সেই দুঃসংবাদ লুকিয়ে রাখতে পারবে।

অসিতকে রক্ষা করল নীলা। সে তাকে ডেকে বলল, 'মুখ হাত ধুয়ে ঘরে এসো দাদা, তোমার চা আর খাবার দিয়েছি।'

একটু বাদে অসিত নীলার ঘরে গিয়ে বলল, 'ও তুই। আমি ভাবলাম যেন চেনা চেনা একটি মেয়েকে দেখছি। অথচ ঠিক চিনে উঠতে পারছিনে।'

নীলা ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তার মানে।'

অসিত চায়ের কাপে একটু ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, 'তার মানে বিয়ের কথা কানে আর বিয়ের গন্ধ নাকে গেলে বোধ হয় মেয়েরা এমনই বদলায়।'

নীলা একটু আরক্ত হয়ে বলল, 'থাক থাক। তোমার আর ঠাট্টা করতে হবে না। একটা জরুরী কথা বলব বলেই তোমার কাছে এসেছি।'

অসিত বলল, 'বলিস কি। আমি তো ভেবেছিলাম এখন থেকে সব জরুরী কথা শুনবে আমার বন্ধু শ্যামল। আর যত অজরুরী কথা—।'

নীলা বাধা দিয়ে বলল. 'দোহাই দাদা, আমাকে বলতে দাও। আমি এখনো মন স্থির করতে পারছিনে।'

অসিত গম্ভীর হবার ভঙ্গি করে বলল, 'তা যত পার এই দুদিন মনকে অস্থির হ'তে দাও। শুধু বিয়ের পিঁড়িতে স্থির হয়ে বসলেই চলবে।'

নীলা রাগ ক'রে চলে যাচ্ছে দেখে অসিত হাত বাড়িয়ে বোনের হাতটা ধরে ফেলল, তারপর মৃদু কোমল স্বরে বলল, 'দ্বিধা দ্বন্দ্বে অনেক সময় গেছে নীলা, আর নয়। এই সব চেয়ে ভালো হল। আমার কথা তুই বিশ্বাস কর।'

নীলা বলল, 'তুমি ঠিক বলছ দাদা, এই ভালো?'

অসিত বলল, 'নিশ্চয়ই। জীবনে আরো অনেক কাজ পড়ে রয়েছে নীলা, শুধু এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে অতীত নিয়ে রোমন্থন করবার সময় আর নেই। আমাদের বহু কাজ পড়ে রয়েছে।'

অসিত যা ভেবেছিল তা হল না, বিয়েটা পার ক'রে দিতে পারল না, বাসি বিয়ের দিনই শ্যামল অসিতের চাকরি যাওয়ার কথাটা জেনে ফেলল। অফিস থেকে সে সপ্তাহ-খানেক ছুটি নিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে এসে সহকর্মী বন্ধু সুরেন সেন তাকে গোপনে সংবাদটা জানিয়ে গেছে।

শ্যামল অসিতকে পাকড়াও ক'রে বলল, 'তুমি কেন এতদিন খবরটা আমাদের কাছে গোপন রেখেছো? আগে জানলে—।'

অসিত হেসে বলল, 'আগে জানলে কি করতে?'

শ্যামল বলল, 'বিয়েটা অন্তত বন্ধ রাখতাম। এ আমাদের আনন্দ উৎসবের সময় নয়।'

অসিত বলল, 'কেন নয়? জীবনে চাকরি হওয়া আর চাকরি যাওয়াটা কি এতই বড় জিনিস তার জন্যে সব আনন্দ উৎসব বন্ধ রাখতে হবে?'

শ্যামল বলল, 'তা নয়। কিন্তু মিথ্যে বদনাম নিয়ে তোমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার অধিকার সুরপতি চক্রবর্তীর নেই। এ আমরা কিছুতেই মেনে নেব না অসিত।'

অসিত বলল, 'আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে। এই বর বেশে অত বীরত্ব ঠিক মানায় না।'

কাজের ভিড় আর ব্যস্ততার মধ্যেও কথাটা কানে গেল অরুন্ধতীর। তিনি ছেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সত্যি!'

অসিত স্বীকার করে বলল, 'সত্যি।'

'আমার কাছে কথাটা লুকিয়ে রেখেছিলি কেন?'

অসিত বলল, 'তোমার কাছে কি সত্যিই কিছু লুকোতে পারি মা? আজ না বললেও কাল ঠিক বলতামই।'

অরুন্ধতী আর কিছু না বলে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সন্ধ্যার অনেক পরে সেদিন জনবিরল অফিস অঞ্চলে দশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের ছ'তলা বাড়িটা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দূরে দূরে ট্রাফিকের শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোন সাড়া নেই। এত বড় বাড়িতে এই মুহূর্তে যে কোন জনপ্রাণী আছে বাইরের নিস্পন্দ ভাব দেখে তা কিছুতেই বুঝবার যো ছিল না। কিন্তু বাইরে থেকে না বোঝা গেলেও একটি ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল। সে ঘর চেয়ারম্যানের। নিজের মোটা চুরুট মুখে সুরপতি তাঁর চেয়ারে চুপ করে বসেছিলেন। অন্যদিনের তুলনায় আজকের দিনটির যে কোন বিশিষ্টতা আছে তা তাঁর বসবার ভঙ্গিতে, কি মুখের ভাবে টের পাওয়া যাচ্ছিল না। তার সামনের চেয়ারে বসে জেনারেল ম্যানেজার অবনী গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই সুরপতির মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু মনের মধ্যে সুরপতির যদি কোন চাঞ্চল্য ঘটেই থাকে, যদি কোন তোলপাড় চলতেই থাকে তাঁর মুখের রেখায় কি চোখের দৃষ্টিতে তা মোটেই ধরা পড়ছিল না। বরং মতের বিরুদ্ধে কথা বললে অন্যদিন খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন সুরপতি, রূঢ় কথা বলেন, গালাগাল করেন, কিন্তু আজ তাঁর মেজাজ খুব শান্ত, মুখের ভাষা ভদ্র, আজ তিনি অধীন কর্মচারীর কাছে অসাধারণ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিচ্ছিলেন।

অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের মধ্যে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিলো। সে আলোচনার ভাষা সাঙ্কেতিক এবং সংক্ষিপ্ত। ঘরে আর কেউ নেই, ধারে কাছেও অন্য কেউ ছিল না। তবু তাঁরা ইচ্ছা ক'রেই যেন সহজ সরল বোধ্য ভাষা এড়িয়ে চলছিলেন।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে, অনেকক্ষণ ধরে কি যেন চিন্তা ক'রে অবনী মৃদু গলায় ছোট একটি প্রশ্ন করল, 'তাহলে আপনার ডিসিশন থেকে একচুলও আপনি নড়ছেন না?'

সুরপতি বললেন, 'না। নড়বার যো থাকলে নড়তাম। আশ্চর্য, অন্য দুজন ডিরেক্টরকে কথাটা এত ক'রে বোঝাতে হয়নি। অথচ তারা বাইরের লোক। নামেই ডিরেক্টর। ভিতরে কোন খোঁজখবরও জানে না, কাজ কর্মও বোঝে না। তুমি অন্দরের মানুষ। সব জানো সব বোঝ। হাতে কলমে নিজেই সব করেছ। তবু তোমাকে বোঝাতে এত সময় লাগছে, একে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য যদি বলি তাহলে খুব বেশি বলা হয়।'

মনে হ'ল সুরপতি যেন একটু হাসলেন। তাঁর শুকনো কালো ঠোঁটে এই মুহূর্তে হাসির আভাসটুকু অবনীর চোখে বড়ই বিসদৃশ লাগল।

অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত স্বরে অবনী বলল, 'কিন্তু এর পরিণাম কি ভেবে দেখেছেন?'

সুরপতি শান্ত নিরুত্তেজ গলায় জবাব দিলেন, 'দেখেছি বৈকি। পরিণাম না ভেবে, চোখের সামনে তাকে স্পষ্ট ক'রে না দেখে আমি কোন কাজে হাত দিইনে। এ অভ্যাস আমার ছেলেবেলা থেকে। তুমি যদি আলাদা পথ বেছে নিয়ে সুখী হও আমার তাতে আপত্তি করবার কী আছে।'

অবনী বলল, 'তা হতে পারে। কিন্তু ছেলেবেলার দেখা আর পরিণত বয়সের দেখা কি এক? ছেলেবেলায় যা সইতে পেরেছেন, যে দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা গঞ্জনার ভিতর দিয়ে কাটিয়ে এসেছেন এই বয়সে কি তা পারবেন? সমাজের কাছে যে সম্মান শ্রদ্ধা এতদিন ধরে পেয়ে এসেছেন তা যদি একদিনে সব শেষ হয়ে যায় আপনি কি তা সইতে পারবেন?'

সুরপতি তেমনি শান্তভাবে বললেন, 'পারব। আমার সহ্য করবার শক্তি যথেষ্ট।' তিন ঘণ্টা ধরে তোমার বক্তৃতা শুনছি, এই কি তার বড় প্রমাণ নয়?'

অবনীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুরপতি ফের একটু হাসলেন, 'রাগ করো না। তুমি আমার জামাই হ'তে যাচ্ছ। তোমার সঙ্গে আমার হাসি ঠাট্টার সম্পর্ক নয়। কিন্তু কিছুকাল ধরে আমি কেমন নির্বান্ধব হয়ে পড়েছি দেখছ তো? যারা ছিল বন্ধু তারা হয়েছে স্তাবক, অনুগ্রহ প্রার্থী। আজ তুমিই আমার সব। জামাই বলতেও তুমি, বন্ধু বলতেও তুমি। পৃথিবীতে একমাত্র তোমার কাছেই সব খুলে বলেছি, কিছুই লুকোয়নি। কেন? চোখ বুজলে তোমারই তো সব হবে। আমি তো কিছু সঙ্গে করে নয়ে যাব না। তুমি শুধু আমার ভাবী জামাই নও, শুধু বন্ধু নও, তুমি আমার second self.'

অবনীর সর্বাঙ্গ শির শির করে উঠল। সুরপতি যেন সত্যিই সূক্ষ্মদেহী হয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করছেন, তার সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছেন! অবনী হঠাৎ কাতরভাবে বলে

উঠল, 'না—না। আপনার সঙ্গে অমন ক'রে একাত্ম হয়ে থাকতে আমি পারব না। তার চেয়ে আপনি আমাকে রেহাই দিন।'

সুরপতি অবনীর দিকে হাসিমুখে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, 'রেহাই দেব? বেশ তো, ইচ্ছা হয় তুমি চলে যাও অবনী। আমি কাউকে জোর করে আটকে রাখতে চাইনে। আমার জন্যে ভেব না, আমার জন্যে যা আছে তাই হবে।'

সুরপতির কথার ভঙ্গিতে ভিতরে ভিতরে আক্রোশ বোধ করল অবনী। তাকে শত পাকে জড়িয়ে এখন বলছেন, 'তুমি ইচ্ছে করলে চলে যেতে পার।' কিন্তু চলে যাবে না অবনী। সুরপতির সঙ্গে থেকেই সে এই ব্যবহারের শোধ নেবে। চোরের উপর বাটপাড়ি না করলে সুরপতির শঠতার যথার্থ প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।

সুরপতি স্মিত মুখে কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবনীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ছটফটানি দেখে সুখ আছে। সুরপতি জানেন অবনীর কোথাও আর নড়বার উপায় নেই। নিজের লোভের বাঁধনে সে বাঁধা পড়েছে। সে বাঁধন ছিন্ন করবে এমন শক্তি এখন আর নেই অবনীর। মনের জোর কমে গেছে বলেই মুখের বুলি তার জোরাল হয়েছে।

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর অবনী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এই ডামাডোলের মধ্যে অসিতকে discharge করা কি সঙ্গত হয়েছে?'

সুরপতি মৃদু হাসলেন, 'কিসের সঙ্গতির কথা বলছ। নীতির দিক থেকে না কুটনীতির দিক থেকে।'

অবনী বলল, 'নীতি সম্বন্ধে আপনার আমার কারোরই কোন মাথা ব্যথা নেই। আমি কূটনীতির কথাই বলছি। চালে বোধ হয় আপনার ভুল হয়ে গেল। অসিতকে discharge করায় ওদের ইউনিয়নে জোর আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনা ক্রমে আন্দোলনে দাঁড়াবে। ওদের ইউনিয়ন ব্যাপারটি সহজে ছেড়ে দেব না।'

সুরপতি ফের একটু হাসলেন, 'ছেড়ে দেবে না, ধরবেই বা কাকে। দু'দিন বাদে ওরা কি আমাদের নাগাল পাবে ভেবেছ?'

অবনী ফের একটুকাল চুপ করে রইল। মনে মনে ভাবল, তা ঠিক, নাগাল পাওয়ার আর যো থাকবে না বটে। কিছুক্ষণ বাদে ফের বলল, 'আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। অসিতের ওপর আপনার রাগটা কিসের? তার বিরুদ্ধে যে সব চার্জ আনা হয়েছে সেগুলি যে মিথ্যে আমরা সবাই জানি। সুজাতার কাছে ও চিঠিপত্র লিখত বলেই কি আপনি ওকে এভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন? ভিতরের কথাটা আপনি একেবারে গোপন রাখেন নি, ব্যাঙ্কের কাউকে কাউকে বুঝতেও দিয়েছেন।'

সুরপতি বললেন, 'ইচ্ছা করেই দিয়েছি। তাতে ওদের আন্দোলনের জোরটা কমবে। অসিত কারো কাছ থেকে ষোল আনা সহানুভূতি পাবে না, এমন কি শ্যামলেরও না।

আর সে সহানুভূতি চাইতে অসিতের নিজেরও লজ্জা হবে। কারণ ওর নিজের মনেই দুর্বলতা আছে। এবার তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব দিই। এই ডামাডোলের মধ্যে কেন অসিতকে তাড়িয়ে দিলাম। দিলাম এই জন্যে যে ওদের ইউনিয়নের দৃষ্টি এই ছোট ব্যাপারে আটকে থাক। এই নিয়ে ওরা সোরগোল করুক, হৈচৈ করুক। আসল ব্যাপারটা যেন ওরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টের না পায় এই আমার ইচ্ছে। বুঝতে পেরেছ? নিজের মনের কথা কারো কাছে এমন করে আর খুলে বলিনি অবনী। তোমার কাছে বললাম। কারণ তুমি আমার প্রিয় শিষ্য, প্রিয় বন্ধু।'

নিবে যাওয়া চুরুটের অবশিষ্টটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন চুরুট ধরালেন সুরপতি, তারপর ফের আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, 'এ ব্যাঙ্ক আমার নিজের হাতে গড়া অবনী। শুধু গড়েছি তাই নয়, তিলে তিলে একে বড়ও করে তুলেছি। লোকে যেমন নিজের ছেলেমেয়েকে মানুষ করে আমি তেমনি করে একে বড় করেছি। লোকে বলে আমার বুকের মধ্যে আস্ত একটি ইঁট আছে, হৃদপিণ্ড নেই। নিন্দুকদের কথাটা পুরোপুরি অসত্য নয়। আমার মনে মায়া-মমতার পরিমাণটা কিছু কম। কিন্তু এই ক'মাস ধরে আমার সেই বুকের ভিতরের ইঁটখানা কে যেন টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙ্গেছে। রাত্রে এক মিনিটও আমার ঘুম হয়নি। দেশলক্ষ্মীকে রক্ষা করবার জন্যে কত যে ছক কেটেছি, নক্সা এঁকেছি, কত যে পথ হাতড়ে মরেছি তার ঠিক নেই। কিন্তু তুমি জানো নৌকা যখন ডোবে তখন তার সঙ্গে সহমরণে যাওয়া কোন কাজের কথা নয়। তখন সাঁতরে পার হয়ে আসাটাই পৌরুষ। তুমি ভেব না আমি চুপ করে বসে থাকব, কি মনের দুঃখে বনে চলে যাব। সমস্ত ঝড়ঝাপটা সামলে নিয়ে আমি ফের উঠে দাঁড়াব, নতুন অর্গানিজেশন গড়ে তুলব। আবার তোলার কাজে তুমি হবে আমার সঙ্গী, সহকর্মী। কিন্তু সেই দুর্দমনীয় যৌবন তো আমার আর নেই। সেই নতুন এ্যাডভেঞ্চারে তুমি হবে আমার দ্বিতীয় যৌবন। চল এবার, রাত হয়েছে।'

নিজে দাঁড়িয়ে উঠে অবনীর কাঁধে সস্নেহে হাত রাখলেন সুরপতি।

অবনীও উঠে দাঁড়াল। সুরপতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাকে যা বলবার বলে দিয়েছেন তো?'

সুরপতি মৃদু হাসলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। ক্যাসিয়ার এ্যাকাউনট্যান্ট সবাই যে যার প্রাপ্যগণ্ডা বুঝে নিয়েছে। কেউ ছাড়েনি। ভাগের ভাগ যা পেয়েছে তাতে কারো জমি, কারো বা নতুন ব্যবসার মূলধন হবে। কি করব বল। ঘর গড়বার সময় যেমন ঘরামী লাগে, ভাঙবার সময়ও তেমনি কামলা কিষাণের দরকার হয়। তাদের মজুরী না দিলে চলে না।'

বলতে বলতে বড় দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন সুরপতি। অবনী চলল পিছনে পিছনে। বন্দুকধারী দারোয়ান অন্যদিনের মতই তাঁদের সেলাম করল। সুরপতি বললেন, 'সব ঠিক আছে তো ভজন সিং?'

ভজন সিং বলল, 'সব ঠিক হ্যায় বড়বাবু।'

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে সামনেই অপেক্ষা করছিল। সুরপতি তাতে উঠে বসলেন। অবনীকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বললেন, 'এসো হে এস।'

অবনী বলল, 'শরীরটা তেমন ভালো লাগছে না। ভাবছি আজ সোজা বাড়িতেই যাব।'

সুরপতি বললেন, 'বেশ তো, তোমার বাড়ির পথ আর আমার বাড়ির পথ তো আলাদা নয়। যাওয়ার সময় তোমাকে ভবানীপুরে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

গাড়ীর দরজা খুলে ধরলেন সুরপতি। অবনী আর দ্বিরুক্তি না করে ভিতরে পিছনের সীটে তাঁর পাশে গিয়ে বসল।

গাড়ীতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার। সুরপতি ঘাড় ফিরিয়ে একটুকাল ব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কি ? না কি এ নিছক অবনীরই কল্পনা ?

সুরপতিকে ভালো করে বুঝতে পারে না অবনী। মাঝে মাঝে মনে হয় লোকটির মধ্যে সত্যিই কর্মক্ষমতা আছে, দৃঢ়তা আছে, দুর্জয় শক্তি আছে মানুষটির মধ্যে। সেই শক্তির কাছে মাথা নিচু করতে ইচ্ছা করে অবনীর। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয় সুরপতির এই শক্তি জল্লাদের শক্তি, ঘাতকের শক্তি। স্বার্থে ঘা পড়লে সংসারে এমন কাজ নেই যা সুরপতি পারেন না। বিনা দ্বিধায় তিনি তখন প্রিয় বন্ধুর বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারেন! যেমন করেই হোক পথের বাধা সরিয়ে দেওয়া তাঁর চাইই। সে কিসের পথ ? নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথ। গোড়ার দিকে অবনীর ধারণা ছিল আর কিছু না হোক, আর কাউকে না হোক নিজের ব্যাঙ্ককে অন্তত সুরপতি ভালোবাসেন। মানুষ যেমন তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসে, শিল্পী যেমন তাঁর শিল্পের মাধ্যমকে ভালোবাসে তেমনি করে সুরপতি তাঁর ব্যাঙ্কের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করেন। কিন্তু সুরপতির সঙ্গে এই পাঁচ বছরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সাহচর্যে অবনীর সে ধারণা ভেঙে পড়েছে। সুরপতি ব্যাঙ্ককে ভালোবাসেন না, শুধু নিজেকেই ভালোবাসেন। আর স্বার্থ তাঁর কাছে শুধু অর্থময়, শুধু টাকার অঙ্ক দিয়ে গড়া। যেখানে ব্যাঙ্কের সঙ্গে অন্যের স্বার্থের প্রতিযোগিতা সেখানে সুরপতির ব্যাঙ্কের পক্ষ নিয়েছেন, কিন্তু যেখানে নিজের স্বার্থের সঙ্গে ব্যাঙ্কের স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে সেক্ষেত্রে আপন স্বার্থের এক চুলও সুরপতি ছেড়ে দেননি। আরো কয়েকটি বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত হলে দেশলক্ষ্মী রক্ষা পেত। তার স্বতন্ত্র সত্তা বলে কিছু থাকত না কিন্তু আর সবই থাকত। সাধারণের আমানতের টাকাগুলি থাকত, দরিদ্র কর্মচারীদের ভাত মারা যেত না। কিন্তু সুরপতি সময় থাকতে সেই এ্যামালগেমেশনের প্রস্তাবে রাজী হননি। কারণ তাতে তাঁর নিজের প্রতিপত্তির কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না, নিজের দুষ্কৃতি আরো বেশি করে ধরা পড়ে। এখন সব যখন ভরাডুবি হতে বসেছে তখনও সুরপতি প্রাণপণে লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তখনও যত পেরেছেন অপহরণ করেছেন পরের ধন। সব জেনে

শুনেও অবনী কেন এ সব সহ্য করছে? ব্যাপারটা নিজের কাছেই এক আশ্চর্য রহস্য হয়ে রয়েছে। একি শুধু অর্থের লোভ, শুধু ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রলোভন? অবনীর মন তাতে সায় দিতে চায় না। তা নয়। সুজাতা যদি তাকে সত্যই ভালোবাসত, বিশ্বাস করত তাহলে অবনী হয়ত শয়তানের সঙ্গে এভাবে সন্ধি করত না। শয়তানের ঘরে দেবকন্যা রয়েছে তার হাত ধরে পথে নামত, সৎপথে থাকত। কিন্তু সুজাতা তো তোকে স্বেচ্ছায় ধরা দেবে না। তাকে জোর করে কেড়ে নিতে হবে, ছিনিয়ে নিতে হবে। আর সেই কেড়ে নেওয়ার কৌশল শিখতে হবে সুরপতির কাছে। কী করে নিজের ইচ্ছা দিয়ে অন্যের ইচ্ছাকে চুরমার করা যায়, সেই নির্মম নির্লজ্জ শক্তির চর্চায় সুরপতি ছাড়া আর কে অবনীকে দীক্ষা দেবে? পৃথিবীতে একটি মাত্র নারীর হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়ার জন্যে সব কলুষতা কালিমা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে? মুক্তিস্নানের পর পুত পবিত্র হয়ে দেবী মন্দিরের দ্বারের কাছে এসে দাঁড়াবে? অবনী নিজের মনেই হাসল। এতকাল বাদে সে কি ফের আস্তিক হ'ল, পৌত্তলিক হয়ে পড়ল? পুরুষের চোখে নারী কখনো সুন্দর একটি পুতুল, কখনো সৌন্দর্যময়ী শক্তিময়ী দেবী। কিন্তু আসলে ওরা কী তা তো আর অবনীর জানতে বাকি নেই। আসলে ওরাও রক্ত মাংসে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ভরা জীব। সেই ক্ষুধা তৃষ্ণার টান পুরুষের চেয়ে ওদের বেশি ছাড়া কম নয়। তবু যে পুরুষ তাকে দেবীর আসনে বসায় সে তার নিজের জন্যেই নারীকে সম্মান দিয়ে নিজের সৃষ্টিশক্তি নিজের কল্পনাশক্তিকেই সম্মানিত করে। শুধু রক্তমাংসের পিণ্ড নিয়ে তার সুখ নেই। নিজের মানসীকে সে অতিমানবী করে তোলে। শুধু কি পুরুষ? মেয়েরাও তো তাই করে। প্রিয়তমের মধ্যে সে দেখতে চায় পরম পুরুষকে। সাধারণ পুরুষের স্ত্রী হয়ে তার তৃপ্তি নেই। অতিরঞ্জনের কবিত্ব পুরুষেরও যেমন আছে, নারীরও তেমনি। এ কবিত্ব কোত্থেকে আসে? নিশ্চয়ই পরস্পরের ভালোবাসা থেকে। তাতে আর কোন সন্দেহ নেই অবনীর। ভালোবাসা। শুধু ভালোবাসা। সুজাতার কথা মনে পড়ল অবনীর। মন ভরে গেল। তাকে একটি বার দেখবার জন্যে, তার একটুখানি স্পর্শ পাওয়ার জন্যে, তাকে একটুখানি স্পর্শ করার জন্যে অবনীর হৃদয় আগ্রহে উদ্বেল হয়ে উঠল।

সুরপতির গাড়ি কখন যে ভবানীপুর পার হয়ে গেল তা অবনী টেরও পেল না। আর একজনের হৃদয়পুরে প্রবেশের আশা তাকে সারাটা পথ আচ্ছন্ন করে রাখল। সুরপতিও সারাক্ষণ চুরুট মুখে চিন্তামগ্ন রইলেন। গাড়ীতে তিনি অবনীর সঙ্গে কোন কথাই বললেন না।

অবনী ভাবতে লাগল সুজাতার কথা। সুজাতার কাছ থেকে যদি ফের সাড়া পায় তাহলে আবার সে পথ বদলাবে। সুরপতি যদি তার কথায় রাজী হন ভালো, না হলে অবনী তার সংস্রব ছেড়ে দেবে। গড়ে তুলবে সংসার। সুখ শান্তিতে ভরা ছোট একটি নীড়। আশ্বাসে ভালোবাসায় ভরা। সমস্ত ক্লেদ কলঙ্ক মলিনতা থেকে

নিজেকে মুক্ত রাখবে অবনী। সুন্দর পবিত্র জীবনের সে অধিকারী হবে। আর তারই অর্ধাংশভাগিনী হবে সুজাতা। তার স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসিতে অবনীর সমস্ত সংসার উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সত্যি, সুজাতার মত অমন সুন্দর করে হাসতে অবনী আর কখন দেখেনি।

পথে যেমন ছিলেন ঘরেও তেমনি গম্ভীরভাবে ঢুকলেন স্বরপতি। একবার শুধু অবনীর দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'এসো।' তিনি আহ্বান জানালেও অবনী আজ স্বরপতির ঘরে গিয়ে ঢুকল না। নিচের ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করতে লাগল। মনে মনে ভাবল যার কাছে এসেছে আমন্ত্রণটা আগে তার কাছ থেকে আসুক।

বাড়ির পুরোণ চাকর অমূল্য এল চা নিয়ে। বলল, 'ভালো আছেন অবনীবাবু?'

অবনী বলল, 'হ্যাঁ ভালো। তোমার দিদিমণি কোথায়? তাকে দেখছিনে যে।'

অমূল্য একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, 'আজ্ঞে তাঁর শরীর খারাপ। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন। আপনি যেন কিছু মনে না করেন।'

মনে না করেন! এত অবজ্ঞা, এত অবহেলা অপমানের পরেও কেউ কিছু মনে না ক'রে পারে? রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল অবনীর। সুজাতা তাকে ভালো না বাসে না বাসুক কিন্তু ভদ্রসমাজে সাধারণ শিষ্টাচার বলে তো একটা কথা আছে। সেই সৌজন্যটুকু পাওয়ার আশাও কি অবনী করতে পারে না?

অবনী একবার ভাবল চাকরের হাতে পাঠানো চায়ের কাপ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে এক্ষুনি এবাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তে তার স্বরপতির কথা মনে পড়ল। সে চলে যেতে চাইলেই স্বরপতি তাকে ছাড়বেন কেন। শক্ত মুঠি দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরবেন। চলে যেতে চাইলেও সত্যি সত্যি কত দূরে আর যেতে পারবে অবনী। একই স্বার্থ আর লোভের শিকলে তারা দুজনেই বাঁধা পড়েছে। তাই যদি পড়ে থাকে তাহলে সুজাতাকেই বা কেন ছেড়ে দেবে অবনী। কেন তাকেও লোহার শিকল দিয়ে বাঁধবে না। যে সেচ্ছায় না দিল, তার কাছ থেকে কেন জোর করে কেড়ে নেবে না? কিসের খাতির? স্বরপতি কি তাকে খাতির করেছেন যে সে তার মেয়েকে খাতির করবে, রেহাই দেবে? না, অবনী ছাড়বে না, কিছুতেই ছাড়বে না। কেড়ে নেওয়াটাই পৌরুষ, ছেড়ে দেওয়া কাপুরুষতা।

বারকয়েক চুমুক দিয়ে গোল টিপয়টার ওপর কাপটি সশব্দে রেখে দিল অবনী। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখে আসি তোমার দিদিমণির অসুখটা কী।'

অমূল্য ভীত হয়ে বলল, 'আজ্ঞে, দিদিমণি বিরক্ত করতে বারণ করেছিলেন।'

অবনী একটু হাসল, 'আমি তাকে মোটেই বিরক্ত করব না অমূল্য, তোমার কোন ভয় নেই। তাছাড়া তুমি কর্তব্য করেছ, তুমি ঠিকই বাধা দিয়েছ এ কথাও আমি তাকে বলব। শুধু আমিই সে বাধা মানিনি। পৃথিবীতে কারো কোন বাধাই আমি আর মানব না।'

অবনী দ্রুত পায়ে ওপরে উঠে গেল। অমূল্য তার পছনে পিছনে আসছিল। অবনী ঘাড় ফিরিয়ে ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার এসে দরকার নেই। তুমি নিচে পাহারা দাও।'

অমূল্য আর কোন কথা না বলে নিচে নেমে গেল। অবনীর ভাবভঙ্গি দেখে মনে মনে হাসল অমূল্য। নিজের মনে বলল, 'চোখই রাঙাও আর যাই কর, তোমার দিন আর নেই। এ বাড়িতে তোমার আর কোন সুযোগ সুবিধে হবে না।'

সুজাতার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল না। আলগাভাবে ভেজানো ছিল। ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছিল বারান্দায়। অবনী অনুমতি না চেয়ে, অনুমতির অপেক্ষা মাত্র না করে দোর ঠেলে ঝড়ের মত ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সুজাতা সত্যিই শুয়ে ছিল। শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল কি ভাবছিল সেই জানে। অবনীকে ঘরে ঢুকতে দেখে তড়াতাড়ি ক'রে উঠে বসল। অস্ফুট স্বরে বলল, 'তুমি!'

অবনী বলল, 'হ্যাঁ আমি। আজ জোর করেই ঘরে ঢুকলাম তোমার। তুমি অবশ্য দোরগোড়ায় দরোয়ান বসিয়ে রেখেছিলে। কিন্তু আমি তার বাধা মানিনি। পাহারাদারই যদি বসাবে তাহলে ওসব অমূল্য-টমূল্যকে বসাতে গেলে কেন? বন্দুক হাতে ভোজপুরী গুটিকয়েক পালোয়ানকে বসিয়ে রাখলেই পারতে।'

সুজাতা অদ্ভুত একটু হাসল, 'তারা তোমাদের ব্যাঙ্কের দরজায় বসে। ভেবেছিলাম আমার দরজায় অমূল্যই যথেষ্ট হবে। কিন্তু তুমি যা ভেবেছ তা নয়। আমার শরীরটা সত্যিই খারাপ ছিল। তা ছাড়া ভেবেছিলাম বাবার সঙ্গে তুমি জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত আছ। তাই আমি গিয়ে কোন বাধা দিইনি।'

অবনীও হাসল একটু, 'এত মিথ্যে কথা বলতেও জানো। ভেবেছিলাম ও বিদ্যেটা তুমি অন্তত শেখনি। ওটা আমাদেরই একচেটে। কিন্তু দেখলাম তা নয়। দেখে আনন্দ পেলাম। অমরা সবাই একজাতের। বিয়েটা যদি হয় অসবর্ণ বিয়ে হবে না!'

সুজাতা এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কোন উত্তর না দিয়ে বলল, 'বাস! বাবার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে?'

অবনী বলল, 'সে কি আজ! অনেকদিন আগই শেষ হয়েছে। কিন্তু আলোচনাটা তোমার সঙ্গে কখন যে শেষ হয় তা বুঝতে পারিনে!'

সুজাতা বলল, 'ও সব কথা রাখ। আমি ব্যাঙ্কের কথা বলছিলাম!'

অবনী বলল, 'সে কথা তোমার বাবার সঙ্গে বল! আমি আমাদের কথাই বলতে এসেছি সুজাতা! আজ চূড়ান্ত বোঝাপড়ার দিন এসে পড়েছে!'

সুজাতা বলল, 'বোঝাপড়ার আর কিছু বাকি আছে বলে আমার জানা ছিল না! তোমার সঙ্গে যখন দেখা হয়েই গেল কথাটা জিজ্ঞেস করি।'

অবনী সুজাতার ঠিক সামনে চেয়ারটা টেনে নিয়ে সোজা হয়ে বলল, 'বেস তো কর, তোমার কথার জবাবগুলিই আগে দিই! আমার কথার জবাব পরে পেলেও চলবে!'

সুজাতা বলল, 'অসিতবাবুকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার মূলে যে তুমি তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই! কিন্তু কতকগুলি মিথ্যে অপবাদ দিয়ে ছাড়িয়ে দিতে গেলে কেন? সত্যি কথা বললেই পারতে!'

অবনী বলল, 'সত্যি কথা বললে চেয়ারম্যানের মেয়ের মর্যাদার হানি হত! তাই তিনি মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন!'

সুজাতা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'বাবাকে দোষ দিয়ো না! সব তোমার কাজ। সব আজকাল তোমার পরামর্শেই হচ্ছে! তুমি সব সর্বনাশের মূল! তুমি শনি হয়ে তাঁর ব্যাঙ্কে ঢুকেছ, শনি হয়ে এসেছ আমাদের সংসারে!'

অবনী বলল, 'অসিত বুঝি তোমাকে তাই বুঝিয়ে গেছে? কিন্তু সে বাইরের মানুষ, সে না হয় না চিনতে পারে, তোমার তো চেনার কথা ছিল সুজাতা। আমদের মধ্যে কে যে শনি, কে যে মঙ্গল তা তো তুমি আগেই বেছে বার করতে পারতে?'

সুজাতা বলল, 'আমি ঠিকই বেছে নিয়েছি। আমার একটুও ভুল হয়নি। কিন্তু তুমি কি ভেবেছ এই সব হীন ষড়যন্ত্রে অসিতবাবুর মত মানুষকে দমিয়ে রাখতে পারবে? এ কথা জেনে রেখ তাঁর মত মানুষকে মিথ্যে অজুহাতে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েই তাঁর মত আর পথ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি না খেতে পেয়ে মরবেন তবু লোভে পড়ে কোন হীন কাজ করবেন না। তিনি তোমাদের মত নন।'

অপমানে লাল হয়ে উঠলো অবনীর মুখ। অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়াল অবনী। সুজাতার আরো কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'ঢের হয়েছে সুজাতা, আর না। আর আমি এসব মোটেই সহ্য করব না।'

অবনীর ভঙ্গি দেখে সুজাতা ভিতরে ভিতরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু বাইরে যথাসাধ্য নির্ভীক থাকবার চেষ্টা করে জোর গলায় বলল, 'কি সহ্য করবে না তুমি। তোমার সহ্য করা না করার কথা এখানে উঠল কিসে?'

অবনী স্থির দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি সহ্য করব না তোমার বেয়ারাপনা। তুমি আমার বাগদত্তা স্ত্রী হয়ে আমাদেরই একজন সাধারণ কর্মচারীর সঙ্গে ঢলাঢলি করবে তা আমি কিছুতেই আর সইব না সুজাতা।'

সুজাতা শান্তস্বরে আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি তোমার অধিকার নিয়ে মিথ্যে বড়াই করছ! মনের দিক থেকে, হৃদয়ের দিক থেকে কোন বন্ধনই যেখানে নেই, বাক্যের বন্ধন কি সেখানে থাকে? সে বাঁধন অনেক দিন আগেই ছিঁড়ে পড়েছে।'

অবনী বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'তা তো পড়বেই। বাঁধবে আর ছিঁড়বে এই যখন নিত্য খেলা তোমাদের। কিন্তু সকলের সঙ্গে এক খেলা খেলতে যেয়ো না, সুজাতা, তাতে বিপদ আছে।'

হঠাৎ এগিয়ে এসে অবনী সুজাতার মুখখানা দুহাতে তুলে ধরল, তারপর তার সমস্ত বাধা আগ্রাহ্য ক'রে মত্তের মত, উন্মত্তের মত, ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া দুই ঠোঁটে চুম্বন

করল। হেসে বলল, 'কিছু মনে কোর না। ভেবেছিলাম স্ত্রীর সম্মানই তোমাকে দেব। কিন্তু তাতো তুমি নিলে না। তাই উপস্ত্রীর দক্ষিণাই তোমাকে দিয়ে রাখলাম। এখন অসিত আসুক কি না আসুক আমার কিছু এসে যায় না।'

সুজাতা শুধু পাথরের মত মুহূর্তকাল নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অনুচ্চ কিন্তু তীব্র ঘৃণার স্বরে বলল, 'বেরিয়ে যাও, এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও তুমি।'

কিন্তু অবনীর আগে নিজেই ঘর থেকে চলে এল সুজাতা, এগিয়ে চলল সুরপতির ঘরের দিকে। ভাবল তাঁকে গিয়ে বলবে সব কথা। বলবে অবনী যদি এ বাড়িতে আসে তাহলে আর সুজাতার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়। সুরপতি যেন তাদের মধ্যে একজনকে বেছে নেন।

কিন্তু লম্বা করিডর পার হয়ে সুরপতির ঘরের কাছে এসে সুজাতা দেখল ভিতর থেকে সে দরজা বন্ধ। অমূল্য সেই দরজার সামনে বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুজাতা বলল, 'বাবাকে ডেকে দাও অমূল্য, তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

অমূল্য বলল, 'কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা তো এখন বলবার যো নেই দিদিমণি।'

সুজাতা বলল, 'বলবার যো নেই?'

অমূল্য ইতস্তত করে বলল, 'তোমার কাছে সে কথা বলতে লজ্জা হচ্ছে দিদিমণি, সে কথা তোমার না শোনাই ভালো।'

সুজাতা অধীর হয়ে বলল, 'তোমার আর ভণিতা করে কাজ নেই অমূল্য। আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার জাবাব দাও। কি করছেন বাবা?'

অমূল্য চাপা গলায় বলল, 'মদ খাচ্ছেন। বদ অভ্যাসটা অনেক দিন হল ছেড়ে দিয়েছিলেন। তুমি বড় হয়ে উঠবার পর আর দেখিনি। ফের যে কোন্ বুদ্ধিতে ধরলেন উনিই জানেন। কি যে হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে দিদিমণি।'

সুজাতা তাকে বোঝাবার কোন চেষ্টা করল না। বাড়ির পুরোন, একান্ত বিশ্বাসী এই চাকরটির দিকে শুধু অসহায় আর বিমূঢ় দুটি চোখ তুলে তাকাল।

সেদিন বেলা দশটার সময় দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের চেক ভাঙাতে এবং টাকা জমা দিতে এসে লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের দরজায় বড় বড় তালা ঝুলছে। দারোয়ানরা আড়ালে পড়েছে, সামনে দেখা যাচ্ছে আধ ডজন লাল পাগড়ী বাঁধা বন্দুকধারী পুলিশ। কারোরই বুঝতে কিছু আর বাকি রইল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারা শহরে ব্যাঙ্ক ফেলের খবর ছড়িয়ে পড়ল।

ব্যাঙ্কের সামনে নানা রকম গোলমাল শোন যেতে লাগল, জনতার আক্রোশ ভাষার শ্লীলতা শালীনতা মানল না। সুরপতির উদ্দেশে গলিগালাজ উচ্চতর হয়ে উঠতে লাগল, 'কই সে বড় চোরটা কোথায়, সে শালাকে ধরে আন। তার টিকিটিরও কি এখন দেখবার যো আছে? সে এতক্ষণ পগার পার হয়ে গেছে।'

একটু দূরে সহকর্মী বন্ধুর দলের সঙ্গে অসিত আর শ্যামলও হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এত তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কটি যে লিকুইডেশনে যাবে তা তারা ধারণাও করতে পারেনি। তারা যখন ইউনিয়নের দাবি দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল, যখন অসিতকে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্যে তৈরী হচ্ছিল সে সময়ে ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চতুর সুরপতি সব বিক্ষোভ সব বিরোধের উপর যবনিকা টেনে দিলেন।

বিক্ষুব্ধ ভিড়ের ভিতর থেকে হঠাৎ একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরুণী বিধবা অসিতের সামনে এসে কেঁদে পড়ল, 'আমার সব গেল দাদা, সব গেলো।'

অসিতের মনে পড়ল মেয়েটি যখন এ্যাকাউন্ট খোলে অসিত নিজে তখন হেড অফিসে উপস্থিত ছিল। ফরম-টরম এনে সেই সব ব্যবস্থা করে দেয়। মেয়েটির নাম পর্যন্ত এখনো বেশ মনে আছে অসিতের। বনলতা দাস। সংসারে বিধবা শাশুড়ী একটি নাবালক ছেলে। কর্পোরেশনের প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করে বনলতা। স্বামী চাকরি করত রেলওয়েতে। মারা যাওয়ার পর তার লাইফ-ইনসিওরেন্সের হাজার দুই টাকা দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে রেখেছিল বনলতা। এ্যাকউন্ট খোলার সময় অসিতকে একান্তে ডেকে গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার টাকার কোন ভয় নেই তো অসিতবাবু?

অসিত হেসে আশ্বাস দিয়েছিল, 'না, না, কোন ভয় নেই আপনার। হাজার হাজার লাখ লাখ টাকার এ্যাকাউন্ট আছে এখানে।'

সেই আশ্বাসের কোন মূল্যই রইল না। দরিদ্র বিধবার সর্বস্ব নষ্ট হওয়ার জন্যে নিজেকেই দায়ী মনে হতে লাগল অসিতের। বনলতার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের বিধবা বোন উমার কথা মনে পড়তে লাগল। উমারও কিছু টাকা ছিল এই দেশলক্ষ্মীতে। এর আগে একবার যখন রান হয় সেই টাকা এখান থেকে তুলে নিয়ে যায় অসিত। অবশ্য উমার পীড়াপীড়িতেই তুলেছিল। কিন্তু সে সময় তো বনলতার মত আরো অনেক অনাথার কথা মনে পড়ে নি অসিতের, তাদের সাবধান করে দেওয়ার কথা ভাবে নি। অপরাধবোধ আর অনুশোচনায় বিদ্ধ হ'তে লাগল অসিত।

বনলতা আর একবার কাতরভাবে বলল, 'আমার টাকার কি হবে অসিতবাবু? আমার যে আর কোথাও কোন সঞ্চয় নেই। আপনাদের ব্যাঙ্কেই যে বিশ্বাস করে আমি সব রেখেছিলাম।'

শ্যামল তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আপনার ভয় নেই, যে ভাবেই পারি আমরা আপনাদের টাকা উদ্ধার করব। সুরপতিবাবুর হাতে এই ব্যাঙ্ক ডুবে গেলেও আমরা যারা এখানে চাকরি করি, যারা খেটে খাই তারাই ডুবন্ত ব্যাঙ্ককে ফের তুলে ধরব। তালা ভেঙে ফের ব্যাঙ্কের দরজা খুলে দেব আমরা।'

অন্তরের উদ্দাম বেগের সবখানি যেন শ্যামল তার ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চাইল।

বনলতা বিমূঢ় হয়ে একটুকাল সেদিকে তাকিয়ে রইল, তারপর অসিতের দিকে চেয়ে বলল, 'টাকাটা সত্যিই ফিরে পাওয়া যাবে অসিতবাবু?'

অসিত বলল, 'নিশ্চয়ই যাবে। যাতে সবাই অপেনারা টাকা পান তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করব আমরা। আপনি এখন বাড়ি যান বনতলা দেবী।'

আরো যে কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষ অসিতদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তাদের সবাইকে সাধ্যমত সান্ত্বনা আর আশ্বাস দিয়ে বিদায় করল অসিত।

তারপর তারা কয়েকজনে এসে বসল ব্যাঙ্কের সামনের রেস্টুরেণ্টটায়। এই রেস্টুরেণ্টের পর্দা ঘেরা ছোট্ট কেবিনে তাদের ইউনিয়নের উৎপত্তি। এখানেই বসে এক কাপ করে চা সামনে নিয়ে তারা ইউনিয়নের সংগঠনের খসড়া করেছে। আজও ইউনিয়নের চারজন বিশিষ্ট সদস্য এসে রেস্টরেণ্টের সেই কেবিনটিতে বসল। অসিত, শ্যামল, অনিমেষ আর অতুল।

এক কাপ করে চা সামনে নিয়ে একটুকাল তারা চুপ ক'রে রইল। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি যে দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে তা তারা কেউ আশঙ্কা করে নি।

চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে শ্যামলই প্রথম কথা বলল, 'এবার ইউনিয়নের একটা জেনারেল মিটিং কল করতে হয়।'

অতুল বলল, 'আর মিটিং-টিটিং ডেকে কী করবে শ্যামলদা? ব্যাঙ্কই গেল, আর ইউনিয়ন করে আমরা করব কী? লড়ব কার সঙ্গে?'

শ্যামল বলল, 'তোমার মাথায় পদার্থ বলে কিছু নেই অতুল, ব্যাঙ্ক জোর ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেই কি আমাদের ইউনিয়নকে ওরা বন্ধ ক'রে দিতে পারে? আর ব্যাঙ্ক লিকুউডেশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়নের কাজ সব ফুরিয়ে গেছে তাই বা তুমি ভাবছ কেন?'

অনিমেষ বলল, 'তবে?'

শ্যামল বলল, 'আমাদের এখনও ঢের কাজ রয়েছে। বলতে গেলে এখনই আমাদের কাজের শুরু। এতদিন আমরা কিছু করি নি। শুধু নিজেদের মাইনে আর বোনাস বৃদ্ধি নিয়ে হৈ-চৈ করেছি। কিন্তু এখনকার কাজের তুলনায় তা প্রায় কিছুই নয়। তা অনেক তুচ্ছ।'

অনিমেষ অসিতের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'আমাদের জননেতা শ্যামলবাবু সব সময় প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে ভালোবাসেন। আমাদের প্রোগ্রামটা এখন কী হ'তে পারে আপনি একটু ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বলুন তো।'

শ্যামল অনিমেষের দিকে একবার রুষ্ট ভঙ্গিতে তাকিয়ে রূঢ় স্বরে বলল, 'সময় নেই অসময় নেই অনিমেষবাবুর খোঁচা দেওয়ার অভ্যাসটা ঠিকই আছে। আরে মশাই হাতুড়ী পিটিয়ে পিটিয়ে পেরেক না ঢোকালে আপনাদের মাথায় কি কিছু ঢোকে? আস্তে বললে আপনাদের কি কিছু কানে যায়?'

অনিমেষ বলল, 'আপনি যে ভাবে আছেন তাতে শুধু আমাদের কেন রাস্তার লোকে পর্যন্ত সব কথা শুনতে পাবে।'

অসিত বাধা দিয়ে বলল, 'থাক থাক। নিজেদের মধ্যে আর ঝগড়া করবেন না। বরং এখন আমাদের কী করা দরকার তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক।'

অতুল বলল, 'আমরা তো তাই শুনতে চাইছি।'

অসিত তখন ধীরে ধীরে তাদের পরিকল্পনার কথা বলতে আরম্ভ করল। ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের কাজ শেষ হয় নি শ্যামল যে বলেছে সে কথা সত্যি। আজ না হোক দুদিন বাদে যে এ ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা কিছুদিন আগে থেকেই তাদের হয়েছিল। এখন একমাত্র উপায় তাদের হাতে আছে দেশলক্ষ্মীকে লিকুইডেশন থেকে রক্ষা করা। অন্য দু' একটি চালু স্বচ্ছল ব্যাঙ্কের সঙ্গে যদি দেশলক্ষ্মী সম্মিলিত হয় তাহলেই তা সম্ভব হতে পারে। তাতে দেশলক্ষ্মীর স্বতন্ত্র নাম থাকবে না, আলাদা অস্তিত্ব থাকবে না, কিন্তু ডিপজিটরদের টাকাগুলি রক্ষা পাবে, কর্মচারীদের চাকরি বজায় থাকবে, দলে দলে তাদের বেকার হয়ে রাস্তায় নামতে হবে না। ইউনিয়নের জেনারেল মিটিং-এ অসিতদের এই প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেবে, তারপর যাবে ডিপজিটরদের কাছে। বাড়িবাড়ি গিয়ে তাঁদের বুঝিয়ে বলবে। এ্যালমালগেমেশনের সমর্থনে তাঁদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করবে, তাঁদেরও যাতে একটা সমিতি গড়ে ওঠে তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে অসিতদের। খবরের কাগজগুলি যাতে তাদের এই উদ্যম আয়োজনে সাহায্য করে, অনুকূল মন্তব্য লিখে দেয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। কারণ কাগজ হ'ল আজ-কালকার এই প্রচারধর্মী যুগে বড় অস্ত্র, বলা যায় ব্রহ্মাস্ত্র। অসিত বলে যেতে লাগল। তাকে এমন অনুপ্রাণিত ভাবে কথা বলতে এর আগে কেউ দেখেনি। শুধু অতুল আর অনিমেষই নয়, শ্যামলও বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল এতদিনের স্বল্পবাক বন্ধুর দিকে। সে লক্ষ্য করল অসিতের মনে আর কোন দ্বিধা নেই। সব সঙ্কোচ সংশয় সে অতিক্রম করে এসেছে, নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে তার ধারণা এখন স্পষ্ট, সংকল্প সুদৃঢ়।

ইউনিয়নের জেনারেল মিটিং-এ এবারও অসিতই সভাপতি নির্বাচিত হল। অসিত আপত্তি করে বলেছিল, 'আমি তো আর ব্যাঙ্কের কর্মচারী নই। আমাকে তো আগেই ওঁরা discharge করেছিলেন। আপনারা বরং regular employeeদের ভিতর থেকে কাউকে প্রেসিডেন্ট করুন। শ্যামল আছে, না হয় অতুলবাবু কি অনিমেষবাবু।'

কিন্তু ইউনিয়নের সদস্যেরা কেউ সে কথায় কান দেয়নি, নেতৃত্বের ভার অসিতকেই নিতে হয়েছে।

শ্যামল বলেছে, 'তোমার ভয় কিসের অত। তোমার হাতে কলমে কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু হুকুম দেবে।'

কিন্তু শুধু হুকুম দেওয়া নয়, অসিত নিজেই কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়ল। ডিপজিটরদের বাড়িতে গিয়ে সই সংগ্রহ করতে লাগল। যে দু' একটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে দেশলক্ষ্মীর সম্মিলিত হবার কথা ছিল তাদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসিত সাক্ষাৎ করল। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিলেন দেশলক্ষ্মী যদি তাঁদের সঙ্গে মেশে তাঁরা বেশির ভাগ দায় স্বীকার করে নেবেন এবং কোন

কর্মচারীকেই কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবেন না। সহরের কয়েকটি বড় বড় সংবাদপত্রের সঙ্গেও যোগাযোগ করল অসিত। দু'একটা বিজ্ঞপ্তি বিবৃতি ছাপা হল কাগজে। কাজ এগিয়ে চলতে লাগল।

এর মধ্যে অসিত কয়েকবার সুরপতির সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের চেষ্টা করেছে। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হন নি। অসিত কিংবা ইউনিয়েনের প্রতিনিধি স্থানীয় কারো সঙ্গে তিনি কিছুতেই দেখা করতে চান না। ব্যাঙ্ক যখন গেছে তখন আবার ইউনিয়ন কি? কোন রকম ইউনিয়নের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না। তবে একথা তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন আর কোন ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁর ব্যাঙ্ককে মেশাবার তিনি মোটেই পক্ষপাতী নন। তা যদি চাইতেন অনেক আগেই তা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যা ভালো বুঝেছেন তাই আর সকলের ভালোর জন্যেই তা করা হয়েছে। সুরপতির বক্তব্য অবনীমোহনের মুখ থেকেই শুনতে পেল অসিতরা।

শ্যামল হেসে বলল, 'কি একখানা সর্বমঙ্গলময়ের অবতার। এতগুলি মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে, এতগুলি লোক বেকার হয়ে পড়ল তাও মঙ্গলের জন্যেই। চক্রবর্তী মশাইয়ের চক্ষুর লজ্জাও নেই, জিভের লজ্জাও নেই।'

অনিমেষ বলল, 'এ আর এমন নতুন কথা কি। মহাশয়দের ও সব সয় না। ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়।'

একটি সাধারণ সভায় ডিপজিটররা সম্মিলিত হবেন, এবং তাঁদের মতামত জানাবেন বলে স্থির হ'ল। সেই সভায় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অসিত আর শ্যামল উপস্থিত থাকবে এবং অসিত একটি লিখিত বিবৃতি পড়বে।

সভার আয়োজন চলেছে এবং যাতে সব কাজ পণ্ড না হয় তার জন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ চলছে অসিত আর শ্যামলের মধ্যে এই সময় সুরপতি খবর পাঠালেন ব্যাঙ্কের ভ.বষ্যৎ তিনি অসিতের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী আছেন। শনিবার সন্ধ্যার পর অসিত যেন সুরপতির বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। অসিত যেন আর কাউকে সঙ্গে না নেয়। সুরপতি শুধু তার সঙ্গেই একান্তে কথা বলতে চান।

মা আর ছোট বোন নীলাকে ব্যাপারটা জানাল অসিত। অবশ্য সে যে একাই যাচ্ছে সে কথা গোপন করল। বলল, 'দলবল নিয়ে আজ আবার বহুদিন পরে আমার পুরোন মাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি মা।'

অরুন্ধতী মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'কেন? আবার সেখানে কেন? শুনেছি সে নাকি কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবে না।'

অসিত মৃদু হেসে বলল, 'মত পাল্টেছেন। তিনিই ফের ডেকে পাঠিয়েছেন।'

নীলা বলল, 'হাসির কথা নয় দাদা। ডেকে পাঠালেও তোমাদের যাওয়াটা ঠিক হবে কি না ভালো ক'রে ভেবে দেখ।'

অসিত তেমনি হাসি মুখে বলল, 'ঠিক না হবার কী আছে ?'

অরুন্ধতী বললেন, 'তুই জানিস না অসিত। সে সাপের চেয়েও খল। তাছাড়া এখন যে অবস্থায় আছে তার অসাধ্য কোন কাজ নেই।'

অসিত বলল, 'সাপই হোক আর বাঘই হোক আমার কিছুতেই ভয় নেই মা। রক্ষা-কবচ আমার সঙ্গে আছে।'

অরুন্ধতী বললেন, 'সবটাতেই তোমার ঠাট্টা। তাবিজ কবজ তুমি কিছু বিশ্বাস কর কি না।'

অসিত বলল, 'কিন্তু তোমার আশীর্বাদে আমি ঠিকই বিশ্বাস করি। তার চেয়ে বড় কবচ আমার আর নেই।'

অরুন্ধতী ছদ্মকোপের ভান করে বললেন, 'যাক, তোমাকে আর মন ভোলানো কথা বলতে হবে না। তুমি আমার কত যেন বাধ্য। মাতৃভক্তি শুধু তোমার ওই মুখেই। হ্যাঁরে, আর সবাই সঙ্গে থাকবে তো ?'

অসিত বলল, 'থাকবে মা। তোমার কোন ভয় নেই। তাছাড়া আমি তো সুরপতিবাবুর সঙ্গে কোন চটাচটি কিছু করতে যাব না। তাঁর যা বক্তব্য শুনে আসব, আমার যদি কিছু বলবার থাকে ভদ্রভাবেই তা বলব। আমি কি শ্যামলের মত গোঁয়ার !'

অসিত আড়চোখে নীলার দিকে একটু তাকিয়ে হাসল। অরুন্ধতীও হেসে ফেললেন, বললেন, 'তোদের জ্বালায় আর পারি নে বাবু। যাই তবে রান্নাঘরে। উনুনে আঁচ দিই গিয়ে। চা-টা না খেয়ে বেরোস নে যেন।'

অরুন্ধতী সামনে থেকে চলে গেলে নীলা বলল, 'পতিনিন্দা বিনা প্রতিবাদে হজম করব সে কথা ভেব না। আমারও কিছু বলবার আছে।'

অসিত বলল, 'বল না।'

নীলা এবার আরো কাছে এগিয়ে এসে মৃদু হেসে বলল, 'সাপের গর্তে যখন হাত দিতেই যাচ্ছ দাদা, তার মণিকা কিন্তু তুলে আনা চাই।'

বুকের মধ্যে যেন তীর বিঁধল অসিতের। আহতস্বরে বলল, 'নীলা !'

নীলা বলল, 'কি দাদা !'

অসিত বলল, 'ওসব ঠাট্টা তামাসা আমি যে পছন্দ করিনে তাতো তুই জানিস।'

নীলা এবার সহানুভূতির স্বরে বলল, 'আমি মোটেই ঠাট্টা করছিনে দাদা। তোমার উচিত ছিল সুজাতাদির খোঁজ নেওয়া। এমন চুপচাপ থাকা তোমার পক্ষে মোটেই ঠিক হয় নি।'

অসিত একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু সে নিজেই তো আমাকে দেখা সাক্ষাৎ করতে কি চিঠিপত্র দিতে নিষেধ করেছে। তোকে তো সবই বলেছি নীলা।'

নীলা বলল, 'তা বলেছ। কিন্তু দাদা সে নিষেধ এমন কিছু গুরুবাক্য নয়, তার অর্থটাই তো আসল।'

অসিত কোন জবাব দিল না।

নীলা বলতে লাগল, 'আমি হলে কিন্তু স্বজাতাদির মত করতাম না। মন স্থির করে ফেলতে আমার মোটেই সময় লাগত না। তাতে বাপের সঙ্গে যদি না বনত বাপকে ছেড়ে আসতাম।'

অসিত বলল, 'সবাই কি সব কাজ পারে?'

নীলা বলল, 'পারে যে না তা তো চোখের ওপরই দেখতে পারছি। ইউনিয়নের সভাপতিই হও আর যাই হও তুমিও অকর্মণ্য পুরুষ। একেবারেই কোন কাজের নও।'

চা জলখাবার খেয়ে অসিত বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। নীলা আর একবার বলে দিল, 'তার সঙ্গে দেখা করে এসো দাদা। অভিমান করে দূরে সরে থেকো না।'

অসিত হেসে বলল, 'তোর যদি অত গরজ থাকে তুই যা। আমাকে কেন সাপের ছোবল খাওয়ার জন্যে পাঠাচ্ছিস, তোর প্রাণে কি দয়া মায়া নেই?'

মোড় থেকে শিয়ালদহগামী বাস ধরল অসিত। বেলা পড়ে এসেছে। জানালার ধারে এগিয়ে বসে বাইরের পড়ন্ত রোদ আর চলমান জনতার দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল। বার বার করে মনে পড়তে লাগল স্বজাতার কথা। এতদিন কাজের চাপে তার কথা মনে পড়বার সময় হয় নি। কিংবা মনে পড়লেও দূরে সেই স্মৃতিকে ঠেলে রেখেছে অসিত, ভাবতে চেষ্টা করেছে নিজের কর্মহীনতা এবং বেকার সহকর্মীদের কথা। দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত বহু ডিপজিটরের মুখও মনে পড়েছে। সর্বস্ব খোয়াবার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ ব্যাকুল সব মুখ। এতদিন এরা লেজারের খাতায় শুধু নামসর্বস্ব ছিল অসিতের কাছে। কিন্তু এই কয়েকদিনের মধ্যে তাদের সঙ্গে অসিতের আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। সুখ-দুঃখ ভাবনা-বেদনা নিয়ে তারাও এক একজন পুরোপুরি মানুষ। তারা শুধু নামে মাত্র নয়। তাদেরও নানারকমের সমস্যা আছে। স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের সমস্যা। দারিদ্র্য দুঃখ অনটনের সঙ্গে সংগ্রাম। আবার সেই সঙ্গে আছে স্নেহ মমতা কৃতজ্ঞতা। অসিত তাদের উপকারের চেষ্টা করছে একথা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে কতজন যে অসিতকে আশীর্বাদ করেছে, আত্মীয়-স্বজনের মত কাছে এসেছে, কাছে টেনেছে তার আর ঠিক নেই। এক একজন মানুষের সান্নিধ্যে যাওয়া এক একটি জগৎ আবিষ্কারের মত। হৃদয় আবিষ্করের চেয়ে বড় আবিষ্কার আর নেই। সেই নিত্য নূতন আবিষ্কারের আনন্দে ব্যক্তিগত অভাব অনটন শুষ্কতা শূন্যতার কথা এতদিন ভুলেছিল অসিত। নীলার পরিহাসের ভিতর দিয়ে আজ যেন ফের তা নতুন করে মনে পড়ল। নিজের বুভুক্ষু হৃদয়ের কথা, স্বজাতার বিমুখতা আর ঔদাসীন্যের কথা ফের মনে পড়ে গেল অসিতের। কে যেন বলছিল স্বজাতা শেষ পর্যন্ত অবনীকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। অবনীর হাতে নাকি তার বাবার জীবন মরণের কাঠি। অবনী সুরপতির ডান হাত, তাকে প্রত্যাখ্যান করবে স্বজাতার সাধ্য কি?

বাস স্টপের কাছে দলবল নিয়ে শ্যামল অপেক্ষা করছিল। অসিতকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল। বলল, 'এসো এসো, আমরা ভাবছিলাম তোমাকে হয়ত এগিয়ে আনতে যেতে হবে। যা দেরি করছিলে তুমি।' অসিত হেসে বলল, 'কি করব বল। আসবার মুখে তোমার স্ত্রী যা তর্ক শুরু করে দিল।'

শ্যামল বলল, 'স্বীকার কর তাহলে। তোমার সহোদরাটি পয়লা নম্বরের তার্কিক।'

ঠিক হল শ্যামলরা অসিতের সঙ্গে যাবে। সুরপতির বাড়িতে অবশ্য ঢুকবে না। দলবল নিয়ে মোড়ের মুখে অপেক্ষা করবে। অসিত চেঁচিয়ে ডাকলেই শ্যামলরা গিয়ে উপস্থিত হবে।

অসিত একটু হেসে বলল, 'তোমাদের অতখানি সতর্ক হবার কোন দরকার নেই। সুরপতিবাবু যাই বলুন আমার মেজাজ বিগড়াবে না। এটুকু ভরসা তোমাদের দিয়ে রাখতে পারি।'

শ্যামল জবাব দিল, 'ভয় তো তোমাকে নিয়ে নয়, ভয় আমাদের সেই সুরপতিবাবুকে নিয়েই। তোমার মেজাজ না বিগড়ালে কি হবে তাঁর মেজাজ নিশ্চয়ই বিগড়ে রয়েছে।'

বাসে চেপে সাদার্ণ এভেনিয়ুতে পৌছল শ্যামলরা। সুরপতিবাবুর বাড়ীর কাছাকাছি এসে তারা থেমে পড়ল। বলা যায় অসিতই থামিয়ে দিল তাদের। বলল, 'তোমাদের আর বেশি দূরে গিয়ে কাজ নেই। সুরপতিবাবু ভাববেন দলবল নিয়ে আমরা লাঠালাঠি করতে এসেছি।'

শ্যামল বলল, 'লাঠি একখানা কিন্তু সঙ্গে রাখলে পারতে অসিত। কখন কোন দরকারে লাগে বলা যায় না।'

বন্ধুদের অপেক্ষা করতে বলে অসিত এগিয়ে চলল। গেটের সামনে আসতে বন্দুকধারী দারোয়ান বাধা দিল। ভিতরে যাওয়ার হুকুম নেই। মোলাকাত হবে না বড়বাবুর সঙ্গে।

কিন্তু অসিত একটুকরো কাগজে নিজের নাম লিখে দিয়ে বলল, 'বড়বাবুকে দেখাও গিয়ে। তিনি যদি ভিতরে না যেতে বলেন যাব না। বাইরে থেকেই তার সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে যাব। তিনিই খবর দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন।'

একটু বাদেই সুরপতির পুরোন চাকর অমূল্য এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'আসুন, আসুন অসিতবাবু। আরে দারোয়ান, ওঁকে আটকে দিলে কেন? তুমি কি মানুষ-জন চেন না?'

দারোয়ান তার জবাবে বলল যে, মানুষ-জন সে খুব চেনে। কিন্তু চেনা মানুষদের ওপরই বেশি বিধি নিষেধ।

অসিত অমূল্যের পিছনে পিছনে বাড়ির ভিতর ঢুকল। সব চুপচাপ নিঃশব্দ। এরই মধ্যে কেমন যেন ছাড়াছাড়া মনে হচ্ছে। প্রথম দিন যখন এ বাড়িতে চাকরির

উমেদোর হয়ে আসে সেই দিনের কথা মনে পড়ল অসিতের। তখন অনেক কৌতূহল, অনেক ঔৎসুক্য ছিল মনে। কিন্তু আজ আর তার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। আজ অবস্থা একেবারে বদলে গিয়েছে। আজ ভাঙা হাটে প্রাক্তন শিক্ষক আর মনিবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছে অসিত। যদিও সুরপতিই তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তবু তাঁর কাছে কোন কিছু আশা করবার নেই অসিতের। মনের মধ্যে 'যুদ্ধংদেহি' ভাবটা ও আর রাখতে পারছে না। এক বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে অসিত এগুতে লাগল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সে হঠাৎ অমূল্যকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার দিদিমণি কোথায় ?'

অমূল্য বলল, 'তাঁর ঘরেই আছেন, শরীর ভালো না। কারো সামনে বেরোন না। কারো সঙ্গে কথাবার্তাও তেমন বলেন না।'

অসিত জিজ্ঞাসা করল, 'অবনীবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় নি ?'

অমূল্য মাথা নেড়ে বলল, 'না অসিতবাবু।'

একটু চুপ করে থেকে অসিত ফের জিজ্ঞাসা করল, 'কবে হবে ?'

অমূল্য বলল, 'তাও জানিনে। জন্ম মৃত্যু বিয়ে বিধাতাকে নিয়ে। দিন ক্ষণ কি কিছু আগে থেকে বলা যায় অসিতবাবু ?'

সুরপতি দোতলার কোণের ঘরখানিতে চুপ ক'রে বসেছিলেন। দোরের সামনে অসিতকে দেখে বললেন, 'এসো।'

অসিত ঘরে ঢুকতে সামনের সোফাটা দেখিয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'বোসো '

ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। আসবাবপত্রও সামান্য। দু'খানি ছোট ছোট সোফা আর দেয়াল ঘেঁষে বেঁটে একটি আয়রন-চেস্ট। অসিত লক্ষ্য করল যাওয়ার আগে অমূল্য দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে গেছে।

প্রথমে কিছুক্ষণ কুশল প্রশ্নের বিনিময় চলল। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভালো আছ ? বাড়ির সব ভালো তো ? তোমার মা'র শরীর কেমন ?'

অসিত বলল, 'তিনি ভালোই আছেন। আপনার শরীর—।'

সুরপতি বললেন, 'আমিও ভালোই আছি। তুমি একাই এসেছ ?'

অসিত বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি তো একাই আসতে বলেছিলেন।'

সুরপতি একটু হাসলেন, 'আমার অনুগত ছাত্রই বটে। কিন্তু তুমি একা আসনি আমি জানি। তোমার সেনাবাহিনী একটু দূরেই আছে। দরকার হ'লে যাতে তারা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করে এসেছ, কী বল ?'

অসিত সরাসরি কথার জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে কেউ আমরা আসিনি।'

সুরপতি বললেন 'তাহলে বোঝাপড়া করবার জন্যেই এসেছ ?'

অসিত চুপ ক'রে রইল।

সুরপতি বললেন, 'আমিও কয়েকটা কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলবার জন্যেই ডেকেছি। দু'একটা ব্যাপার তোমার কাছ থেকে বুঝে নেবার ইচ্ছাও আমার আছে।'

'বলুন।'

একটুকাল চুপ করে থেকে সুরপতি হঠাৎ স্নিগ্ধ কোমল গলায় বললেন, 'আচ্ছা অসিত, এই সব ব্যাপারের মধ্যে তুমি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছ কেন বল তো? এতে তোমার স্বার্থ কী।'

অসিত বলল, 'ব্যাক্তিগত স্বার্থের কথা আমি ভাবছি নে।'

সুরপতি বললেন, 'ও।'

তীক্ষ্ম পরিহাসের সুর সুরপতির গলায়। 'আচ্ছা, সমষ্টিগত স্বার্থের কথাই না হয় ধরছি। অনর্থক হৈ-চৈ করে কারোরই এ অবস্থায় কোন স্বার্থসিদ্ধি হবে না। মিছামিছি কতকগুলি ছেলের সময় আর সামর্থ্য নষ্ট করবে। ব্যাঙ্ককে বাঁচানো যদি সম্ভব হ'ত আমি নিশ্চয়ই বাঁচাতাম। আমার নিজের হাতে গড়া জিনিস। ব্যাঙ্কের ওপর দরদ আমার চেয়ে তোমাদের কারোরই বেশি নয়।

অসিত বলল, 'আমারাও তো সেই কথা ভেবেছিলাম।'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সুরপতি, 'ভেবেছিলে! বিশ্বাস করতে পারনি বুঝি! কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর আমার তাতে কিছু এসে যায় না। নৌকো ফুটো হলে আমি তা ডুবিয়ে দিই, এই আমার স্বভাব। আবার নতুন করে চলতে শুরু কর। ভাঙা নৌকা বেয়ে বেড়াবার মত মূর্খতা আমার নেই।'

অসিত বলল, 'তা না থাকতে পারে। কিন্তু এতো শুধু নিজের নৌকা ডোবানো নয়, বহুলোকের যথাসর্বস্ব ডুবিয়ে দেওয়া, সে অধিকার কি আপনার কাছে?'

সুরপতি তেমনি উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'অধিকার! তুমি আজকাল খুবই বড় বড় কথা বলতে শিখেছ অসিত। ভুলে যাচ্ছ আমি তোমাকে প্রথম লেখাপড়া শিখিয়েছি, একদিন অন্নও জুগিয়েছি।' একটু থামলেন সুরপতি, তারপর ফের নরম আর শান্ত গলায় শুরু করলেন, 'অধিকার অনধিকারের কথা নয়। সব ব্যবসাতেই ওঠাপড়া লাভ লোকসান আছে। ব্যবসায়ে লোকসান হলে তার সঙ্গে যারা জড়িয়ে রয়েছে তাদের সকলেরই লোকসান হয়। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা হবে না। সর্বস্ব কারোরই মারা যাবে না। ব্যাঙ্কের যা সম্পত্তি আছে তা বিক্রি করে লিকুইডেটারের মারফৎ প্রত্যেকেরই টাকা আমরা দিয়ে দিতে পারব। কিছু সময় লাগবে এই যা। কিন্তু তোমরা যে পথে চলছ সেটা ভুল পথ। অন্য কোন ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশে এ ব্যাঙ্ককে বাঁচানো যাবে না, বরং সবাইকে মারবে।'

অসিত বলল, 'আপনার কথা আমি মানতে পারলাম না।'

সুরপতি বললেন, 'তোমার বুদ্ধি-স্থানে শনি ঢুকেছে। তাই আমার কথা অমান্য করছ। শোন, তুমি এই আন্দোলন-টান্দোলন ছেড়ে দাও। চলে যাও ওদের সংস্রব ছেড়ে।'

অসিত বলল, 'আপনি অসঙ্গত অনুরোধ করছেন। আমি তা কিছুতেই পারব না।'

সুরপতি বললেন, 'তোমাকে পারতেই হবে। কী চাও তুমি? ভালো সরকারী চাকরি? বল আমি তার ব্যবস্থা করছি।'

অসিত বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি চাকরি চাইনে।'

সুরপতি ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন, 'তবে কী চাও? টাকা? কত? দু' হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার? বল, মুখ ফুটে বল, আমি চেক লিখে দিচ্ছি।'

অসিত শান্তভাবে বলল, 'আপনি আমাকে মিথ্যেই লোভ দেখাচ্ছেন।'

উত্তেজনায় ক্রোধে সুরপতির চোখ দুটো লাল হ'য়ে উঠল। ঠোঁটে একটু হাসি টেনে বিষাক্ত বিদ্রূপে বললেন, 'চাকরি নয়, টাকা নয়। তবে কী চাও তুমি? সুজাতাকে? আচ্ছা, তাই দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি!'

বলতে বলতে পাঞ্জাবির ঝুল-পকেট থেকে হঠাৎ একটি পিস্তল বার করলেন সুরপতি। বললেন, 'তুমি আজই কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে কিনা বল।'

মুহূর্তের জন্য বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল অসিতের। মুহূর্তকাল সে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'না।'

সুরপতি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না? এত সাহস তোমার? এত স্পর্ধা?'

অসিতের দিকে আরো দু'পা এগিয়ে গেলেন সুরপতি। হঠাৎ দোর ঠেলে সুজাতা প্রায় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল, তারপর কাতর ভয়ার্তস্বরে বলল, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে বাবা? তুমি কি খেপে গেলে? ফেলে দাও ওটা, ফেলে দাও।'

সুরপতি বললেন, 'না, তুমি এখান থেকে চলে যাও বুলু, তোমার তো এ ঘরে আসবার কথা নয়।'

সুজাতা বলল, 'এতদিন আসিনি বাবা। কিন্তু আজ আর না এসে পারলাম না। ফেলে দাও, ওই সর্বনাশা জিনিসটা তুমি ফেলে দাও বাবা। ফেলে দিয়ে তারপর কথা বল।'

সুরপতি আবার বললেন, 'তুমি এ ঘর থেকে চলে যাও বুলু।'

সুজাতা বলল, 'তুমি ওটা আমার হাতে দাও, তবেই।'

সুরপতি চীৎকার করে বললেন, 'অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে! বলছি যে যাও।'

সুজাতাকে ঠেলে ফেলে সুরপতি অসিতের দিকে আরও একটু এগিয়ে গেলেন।

সুজাতা হঠাৎ তার বাবার হাত চেপে ধরল, 'তুমি যদি নিজের থেকে না দাও বাবা, আমি তোমার হাত থেকে ওটা কেড়ে নেব। তুমি পারবে না, তুমি কিছুতেই এত বড় সর্বনাশ করতে পারবে না।'

অসিত বাধা দিতে না দিতে বাপ আর মেয়ের মধ্যে পিস্তল নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এক কর্ণভেদী শব্দে সব যেন স্তব্ধ হয়ে রইল। একবার বুঝি চোখ বুজেছিল অসিত। পরক্ষণেই চেয়ে দেখল দারোয়ান-

চাকরের দল ঘর ভরে ফেলেছে। আর মেঝের ওপর আহত রক্তাক্ত দেহে মূছিতা হয়ে পড়ে রয়েছে সুজাতা।

সব লজ্জা, সব সঙ্কোচ ত্যাগ করে 'ডাক্তার ডাক্তার' বলে চেঁচিয়ে উঠল অসিত, 'শিগগির ডাক্তার ডাকো অমূল্য।'

ডাক্তার আসবার আগেই অবশ্য পুলিশ এল। আর এল শ্যামলরা। তারা আগে থেকেই সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল।

সুরপতি পিস্তলটা ফের তুলে নিতে যাচ্ছিলেন একজন কনেস্টবল তাড়াতাড়ি সেটা কেড়ে নিল তাঁর হাত থেকে। সুরপতি একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁর অব্যবহৃত পিস্তলটা তো খালিই থাকে। নেশার ঝোঁকে কাল বুঝি রাত্রিতে কার্তুজ ভরে রেখেছিলেন, ভালো ক'রে মনে পড়ছে না।

খবর পেয়ে অবনীও এসে পৌঁছল মিনিট কয়েকের মধ্যে। ডাক্তারের পরামর্শে সেই সুজাতাকে প্রথমে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করল। নিজের গাড়িতে তুলে নিল তাকে।

অসিত বিমূঢ়ভাবে শেষবারের মত তাকাল সুজাতার দিকে। মেয়ে তো নয়, যেন একটি রক্তকমল।

পরমুহূর্তে অসিতের চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল। আশেপাশে পিছনে, সব শূন্য, সব শূন্য। সব সব ফাঁকা হয়ে গেছে।

হাসপাতালে দু'দিন বেঁচে ছিল সুজাতা। মরবার আগে পুলিশের কাছে পরিষ্কার জবানবন্দী দিয়ে গেছে—তার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

একথা শুনে অসিত শ্যামলের হাত চেপে ধরে বলল, 'যাওয়ার আগে সে এমন একটা কথা কেন বলে গেল শ্যামল। কেন সে আমাদের সবাইকেই দায়ী ক'রে গেল না।'

শ্যামল বন্ধুর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'সবাইকে নয়, একজনকে দায়ী করা উচিত ছিল। কিন্তু নিজের বাপ বলেই বোধ হয় তা পারেনি। তার এই দুর্বলতা আমরা ক্ষমা করব। কিন্তু আর কিছু ক্ষমা করবার মত দুর্বলতা যেন আমাদের না আসে। তাহলে তার এই আত্মদানের কোন মান থাকবে না।'

অসিত কোন জবাব দিল না। সেই মুহূর্তে শ্যামলের সব কথা হয়ত তার কানেও গেল না। বন্ধুর প্রিয় পরিচিত মুখের দিকে অসিত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

গোধূলি

শ্রীপারুলবালা ঘোষ
করকমলেষু

উত্তর-কলকাতার এই রাজপথটির সঙ্গে রাজা রাজবল্লভের নাম জড়িত। অবশ্য নামের মধ্যে যতখানি রাজক'য়তা ধ্বনিত হয়, রূপের আভিজাত্য ততটা চোখে পড়ে না। এই দীর্ঘ আঁকা-বাঁকা রাস্তাটির দুদিকে জীর্ণ বাড়ির নড়বড়ে রেলিঙে প্রায়ই রঙ-ওঠা ছেঁড়া শাড়ির পতাকা ওড়ে। খোলা গায়ে খালি পায়ে গলিময় ছুটোছুটি করে বেড়ায় রোগাটে ছেলেমেয়ের দল, যেখানে সেখানে ছেঁড়া কাগজ আর তরকারির খোসা স্তূপাকারে জমে ওঠে, মোড়ের চায়ের দোকানে সকাল-সন্ধ্যায় বেকার যুবকদের ভিড় জমে; বেলা পড়লে রোয়াকে রোয়াকে ফতুয়া গায়ে পাড়ার বুড়োরা এসে বসেন। হাল আমলের বউ-ঝিদের নির্লজ্জ চালচলনের নিন্দা তাঁদের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

অনুপম মজুমদারের লাল রঙের ছোট দোতলা বাড়িটির নম্বর এই রাস্তায় হলেও অবস্থানটি ঠিক রাস্তার ওপরে নয়, একটু ভিতরের দিকে, গ্যাস-পোস্টের ডান দিক দিয়ে যে একটু কানা গলির মত চলে গেছে তার মোড়ে। কর্পোরেশনের দেওয়া নীল রঙের চাকতিতে পুরো নম্বরের সঙ্গে কয়েকটি বাই নম্বর সদর দরজার চৌকাঠে আঁটা, কিন্তু তাই বলে বাড়িটি যে কেবল নম্বর-সর্বস্ব তা নয়। বাঁ দিকের দেয়ালের গায়ে শ্বেত পাথরের ফলকে অলঙ্কৃত অক্ষরে খোদাই করা একটি নামও রয়েছে—'ভূপতি-ভবন'।

কাঠাখানেক জায়গায় চোঙার মত লম্বা ধরনের পুরোন বাড়ি, ছাড়া ছাদ। অনুপমের বন্ধুদের কেউ কেউ এখনো এই বেমানান নামটি নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে। অনুপমের সহকর্মী পরেশ সরকার তো অনুপমের একটা নামই দিয়ে ফেলেছে,—'ভূপতি-ভবনের রাজচক্রবর্তী।'

এদের তামাসায় অনুপম ভারি চটে বলে, 'খুব তো ঠাট্টা করছ, কিন্তু চল্লিশ টাকায় এমন একটা বাড়ি আমাকে এই কলকাতা শহরে আর একখানি দাও তো যোগাড় করে। বুঝব কার কতখানি ক্ষমতা। ভাগ্যে তখন ধরেছিলুম। এখন যদি ছাড়ি এই মুহূর্তে আশি টাকা শ টাকা ভাড়া হয়ে যায় এ বাড়ির, সেই সঙ্গে শ পাঁচেক টাকা সেলামি তো আছেই।'

ভূপতি-ভবনের মালিক নয় অনুপম, লীজ-হোল্ডার, তবু এ বাড়ির সামান্য নিন্দাও তার সয় না, নিন্দাটা যেন তার নিজের গায়ে গিয়ে লাগে। কেউ এ বাড়ির বিরুদ্ধে কিছু বলতে শুরু করলেই অনুপম এ বাড়ির সুবিধাজনক অবস্থান, অফিস, স্কুল, বাজার, রেশনের দোকান, ট্রামলাইনের নৈকট্য আর সস্তা ভাড়ার কথা তুলে তার মুখ বন্ধ করে। ইদানীং বাড়ি যেমন দুর্লভ ও দুর্মূল্য হয়েছে শহরে, তাতে যুক্তিতর্কে অনুপমের সঙ্গে সহজে কেউ বড় একটা এঁটে উঠতে পারে না।

ভূপতি-ভবনের উপর যত্ন আর মমতার সীমা নেই অনুপমের। স্বত্ব নিজের না হোক, বাস তো নিজেদের। তা ছাড়া ভূপতি-ভবনের ভূপতি বলতে গেলে অনুপম নিজেই। মালিক শ্রীপতি মল্লিক মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রী যশোদাসুন্দরী থাকেন

কাশীতে। কোন বছর কলকাতায় আসেন, কোন বছর আসেন না। মাসে মাসে কেবল ভাড়ার টাকাটা তাঁকে পাঠিয়ে দিলেই হলো। বাড়ির সমস্ত ভারই অনুপমের উপর।

বছরখানেক আগে গাঁটের টাকা ব্যয় করে সমস্ত বাড়িটায় ফের কলি করিয়ে নিয়েছে অনুপম। আগে রঙ ছিল নীলচে। এখন গাঢ় মেজেণ্টা রঙ টুকটুক করে।

অনুপমের স্ত্রী ইন্দুলেখা অবশ্য আপত্তি করেছিল, 'অত চড়া রঙ কি ভালো, তার চেয়ে শাদা রঙ করাও, বেশ মানাবে।' অনুপম মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, 'হুঁ তোমার যেমন পছন্দ। শাদা রঙ আবার একটা রঙ নাকি।'

স্ত্রীর রুচি আর পছন্দের উপর কোনদিনই তেমন আস্থা নেই অনুপমের। ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ছেলেমেয়েদের জামাজুতোর প্যাটার্ন, রঙ পর্যন্ত অনুপম নিজে পছন্দ না করে দিলে চলে না, যেটা সে নিজে না দেখে সেটাই বেমানান হয়, আর তার মন খুঁতখুঁত করে।

আসবাবপত্রের দিকেও ভারি ঝোঁক অনুপমের। বৈঠকখানার বাজারে অনুপমের ছেলেবেলার সহপাঠী ভূপেন রক্ষিত ফার্নিচারের ব্যবসা করে। টেবিল, চেয়ার, আয়না, আলমারি বছর বছর কিছু না কিছু সওদা তার দোকানে বাঁধা। নগদ অবশ্য পুরো দামটি দেওয়া হয় না, কিছু বাকি থাকে, কিছু কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ হয়। কোন কোন কিস্তি খেলাপও যায়। ভূপেনের মুখের দিকে তখন তাকানো যায় না। কিন্তু অনুপমের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

ইন্দুর এতটা ভালো লাগে না, মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, 'কেবল যে জিনিসপত্র দিয়ে ঘর ভরছ, ঘরে কি কেবল তোমার জিনিসই থাকবে, আমরা থাকব না?'

অনুপমও বিরক্ত হয়, 'বেশ তো, না থেকে যদি পার না থাকলে, সংসারী লোক মাত্রেরই জিনিসপত্র দরকার হয়। সবাই তো আর তোমার মত সন্ন্যাসিনী হয়ে জন্মায় না।'

স্ত্রী'র সাদাসিধে অনাড়ম্বর ধরনটিকেই অনুপম বলে সন্ন্যাস।

আসবাবপত্রের মত ফুলের বেশ শখ আছে অনুপমের। দোতলার ওপর দক্ষিণখোলা ছাদ আছে একটু। অনুপম কার্নিশের ধার দিয়ে চারদিকে দেশী-বিদেশী ফুলের টব সাজিয়েছে। আরো কোথায় কি অঙ্গসজ্জা কম খরচে সম্ভব হয়, কোথায় কতটুকু অদল-বদল করলে বাড়িটির সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব আরও বাড়ে—অবসর পেলে স্ত্রীর সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করাটা অনুপমের আর-এক বিলাস।

ইন্দু বলে, 'কী যে শুরু করেছ তুমি। তবু যদি নিজের বাড়ি হত।'

অনুপম বলে, 'তাহলে মারবেল ফলকের অক্ষরগুলি মুছে ফেলে এ বাড়ির নাম রাখতুম "অনুপম-ধাম"। একটু থেমে চিন্তা করে বলে, কিংবা "ইন্দু-বিতান"।'

ইন্দু বাধা দিয়ে বলে, 'থাক থাক, ইন্দু-বিতানের আর কাজ নেই, অনুপম-ধামের চোটেই অস্থির।'

'ভূপতি-ভবনের' সবখানিই অবশ্য নিজের বসবাসের জন্য দখলে রাখে নি অনুপম। দোতলার দুখানা ঘর নিজের জন্য রেখে, একতলার দুখানায় ভাড়াটে বসিয়েছে। সংসারে এক ছেলে, একটি মেয়ে আর নিজেরা স্বামী-স্ত্রী। গোটা বাড়ি দিয়ে কী হবে। তাছাড়া গোটা বাড়ি রাখবার জোরই বা কই। পাঁচ বছর আগে এই বাড়ি যখন নেওয়া হয় তখন পুরো শ'খানেক টাকাও মাইনে ছিল না অনুপমের। এখন অবশ্য এ-অফিস ও-অফিস ঘুরে তার দুশোর উপরে উঠেছে। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম যা চড়েছে, তার কাছে এই আয়বৃদ্ধির অনুপাত কিছুই নয়। ফলে, ভাড়ার কুড়িটা টাকাও বেশ হিসেবের মধ্যে ধরতে হয়।

সপ্তাহখানেক হল একতলার ভাড়াটেরা উঠে গেছে। নতুন ভাড়াটে এখনো নেওয়া হয় নি। কিন্তু আসবার জন্য নতুন ভাড়াটেদের ব্যস্ততার সীমা নেই। এমন দিন যায় না যেদিন দুতিনজন করে লোক ঘরের খোঁজে না আসে। শুধু হাতে নয়, সুপারিশ চিঠি পর্যন্ত সংগ্রহ করে আনে। কেউ অনুপমের ভূতপূর্ব অফিসের সহকর্মীর ভাইপো, কেউ বা পাড়ার ডাক্তারবাবুর ভাগ্নে। কিন্তু অনুপমের আশা একটু বেশী। এবার শ দুই টাকা সে বাড়ি মেরামতের খরচ বাবদ চায়। সেলামি কথাটা ভাল না। সবাই যখন চায়, সবাই যখন পায় সেই বা বাদ যাবে কেন ?

চেহারা দেখে, দুচারটে কথাবার্তা বলে কাউকে বা আগেই বিদেয় করে অনুপম, সরাসরি বলে, 'ঘর খালি নেই, ভাড়া হয়ে গেছে।'

ইন্দুলেখা বলে, 'ছি-ছি-ছি, কেন মিছামিছি মিথ্যে কথাগুলি বল। তার চেয়ে বলে দিলেই হয় ঘর ভাড়া দেব না।'

অনুপম বলে, 'সেও তো মিথ্যা কথা। ঘর ভাড়া তো দেবই।'

ইন্দু বলে, 'তাহলে দিয়ে দাও বাপু, লেঠা চুকে যাক। রাজ্যের লোক সারা দিন এসে বিরক্ত করে। আর ভালো লাগে না।'

অনুপম বলে, 'হুঁ, এখন এই কথা বলছ। কিন্তু না দেখে না শুনে বেশি লোকজন-ওয়ালা কাউকে ভাড়া দিয়ে বসি তাও তখন খারাপ লাগবে। রাতদিন তখন ফের সেই প্যান-প্যান ঘ্যান-ঘ্যান শুরু হবে।'

কথাটা মিথ্যা নয়। এর আগের ভাড়াটে ছিল বিপিনবাবুরা। তাঁদের ছেলেপুলের সংখ্যা ছিল আট, স্বামী স্ত্রী দুজন ছাড়াও বিপিনবাবুর মা আর পিসিমা ছিলেন। লোক ধরত না বাড়িতে। এমন দিন যেত না, যেদিন কল, চৌবাচ্চা, ছাদে কাপড় শুকানো কি কিছু একটা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথান্তর, মতান্তর না হত। শেষ পর্যন্ত তাঁরাই সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে উঠে গেছেন।

কিন্তু তাই বলে কি যারা ঘর ভাড়া নিতে আসবে তাদের কাছে মিথ্যা কথা বলতে হবে। কী দরকার, নিজেদের বাড়ি নয়, কিছু নয়, অনর্থক ছলচাতুরীর দরকার কী লোকের সঙ্গে। আর একতলার এই ঘরের জন্য দেড়শ দুশ সেলামিই বা লোকে দেবে

কেন ? চাইতেই তো লজ্জা করা উচিত অনুপমের। এ-নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ইন্দুর প্রায়ই তর্কবিতর্ক হয়।

অনুপমেরও যুক্তির জোর কম নয়। সে বলে, 'ওই টাকা নিয়ে কি আমি দুধ-মাছ কিনে খাব, না জামা-জুতো কিনব। ও টাকা বাড়ি মেরামতেই লাগাব। টাকাটা পেলে বাড়ির আমি ভোল ফিরিয়ে দেব। আর-একটা বাথরুম, পায়খানা করাব। যারা আসবে তাদের সুবিধা হবে। আমার একার সুবিধার জন্য তো নয়। দেবে না কেন।'

ঘর ভাড়া দেওয়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জল্পনা-কল্পনা তর্কবিতর্ক চললেও, পুরোন ভাড়াটেরা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুপমের দুটি ছেলেমেয়ে দুখানা ঘরই দখল করেছে। ফের ঘর দুখানা অন্য কাউকে ভাড়া দেওয়া হয়, মোটেই ইচ্ছা নয় তাদের। তিলু তো ইন্দুকে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, 'ভাড়া দিলে ডান দিকের ঘরখানা দিয়ো, মিনু ও ঘরটাকে পুতুল খেলে নষ্ট করছে, কিন্তু আমার ঘর আমি ছাড়ছিনে, এটায় আমাদের ক্লাবের অফিস বসবে।'

তিলুর বয়স নয়, ফাইভে পড়ে। পাঁচ বছরের মিনুকে এখনো স্কুলে দেওয়া হয় নি, কিন্তু বেণী দুলিয়ে সে রোজ স্কুলে যাওয়ার বায়না ধরেছে। সেও তার নতুন-দখল-করা ঘর ছেড়ে দিতে রাজি নয়, তার ছেলেমেয়েগুলি থাকবে কোথায় তাহলে।

ইন্দু একবার বলেছিল, কেন, খাটের তলায় আর সিঁড়ির নিচে তো দিব্যি এতদিন তোমার ছেলেমেয়েরা খেয়েছে ঘুমিয়েছে।'

মিনু ঠোঁট উলটে জবাব দিয়েছিল, 'বা: রে, এখন ওরা বড় হয়েছে যে, বিয়ে করেছে। এখন বড় ঘর না হলে চলে ? তুমি কিচ্ছু বোঝ না মা।'

ইন্দু স্বামীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'তাই তো, তোমার নাতি-নাতবউ-কেই ঘরখানা তা হলে ছেড়ে দিতে হয়।'

ভাড়াটে নির্বাচন সম্বন্ধেও মিনু মাঝে মাঝে তার বাবাকে পরামর্শ দেয়। ঘর সম্পর্কে লোকে যখন তার বাবার সঙ্গে আলাপ করে, মিনু একপাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। কেউ কেউ ঘর দেখে, কেউ বা বাইরে থেকেই চলে যায়। মিনু তখন তার মতামত প্রকাশ করতে থাকে, 'ও-লোকটাকে দিয়ো না বাবা, ও তোতলা, তো-তো করে।' 'ও-লোকটা যেন না আসে বাবা। ভারি কালো, দেখতে কী বিশ্রী, মাগো !'

ইন্দু মেয়েকে শুধরে দেয়, 'লোকটা লোকটা কোরো না মিনু, ভদ্রলোক বলতে হয়।'

'হুঁ, ভদ্রলোক না আরো কিছু, দেখতে কালো, মুখটা বাঁকা—।'

অনুপম হাসে, 'আমি কি জামাই নিচ্ছি নাকি মা, যে সুন্দর দেখে বেছে বেছে নেব।'

জামাই কথাটার খানিকটা অর্থ মিনু আন্দাজ করতে পেরে বলে, 'যা:।'

ইন্দু তখন মেয়ের পক্ষ নেয়, 'মিনু কিন্তু একেবারে মিথ্যা বলে নি, সৎ-অসৎ ভালো মন্দ অনেক সময় লোকের চেহারা দেখেই বোঝা যায়।'

অনুপম বাধা দিয়ে বলে, 'থাক থাক, তোমার আর তত্ত্বকথা শুরু করে কাজ নেই। তুমি মুখ খুললেই আমার ভয় হয়, কখন ছাপার অক্ষর ঝরে পড়বে! রাজ্যের নাটক-নভেল পড়ে পড়ে মুখখানাকে ছাপাখানা বানিয়েছ। বেশ তো, ও সব তত্ত্বটত্ত্ব ছেড়ে সোজা কথায় বললেই তো হয়—কেবল মিনুরই নয় মিনুর মারও ইচ্ছা বেশ সুন্দর অল্পবয়সী ভাড়াটে একজন আসে বাড়িতে!'

ইন্দু অপ্রতিভ হয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলে, 'আহা-হা, নিজের চেহারাখানা খুব সুন্দর কি না, সেই গর্বে মাটিতে পা পড়তে চায় না। বিশ্ব-দুনিয়ায় এমন সুপুরুষ কি আর দুটি আছে?'

অনুপম সদম্ভে জবাব দেয়, 'নেই-ই তো, আমার চোখে তো পড়ে নি! তোমার চোখে পড়ে থাকলে সে কথা স্বতন্ত্র।'

অনুপম সত্যিই বেশ সুপুরুষ। বয়স চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই করছে, কিন্তু আকৃতি-প্রকৃতিতে তা মোটেই বোঝা যায় না। দীর্ঘ ছ ফুট দেহ। প্রৌঢ়ত্বের দুচারটে রেখা গালে-কপালে ফুটে উঠলেও শরীর অনুপমের যেমন ঋজু তেমনি মজবুত। কৃচ্ছ্রতা যথেষ্ট গেছে দেহের উপর দিয়ে। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত খেলায়, সাঁতারে সুগঠিত দেহের বাঁধুনি এখনো শিথিল হয় নি। মাথায় ঘন কালো মসৃণ চুল সযত্নে আচড়ানো, গায়ের রঙ সুগৌর, চওড়া কপাল। ঠোঁটটা একটু অবশ্য পুরু। সে ঠোঁটে মাঝে মাঝে গোঁফ থাকে, মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়। অনুপম গোঁফ সম্বন্ধে এখনো অস্থিরচিত্ত। ইন্দু বলে, 'গোঁফ না পাকা পর্যন্ত তোমার বুদ্ধি পাকবে না।'

অনুপমের তুলনায় ইন্দুর রঙ ময়লা, শ্যামবর্ণ-ঘেঁসা। নাকও অমন চোখা নয়। কিন্তু চোখ দুটি সুন্দর, যেমন বড় তেমনি কালো আর গভীর, কোমল চিবুক, হাসলে তার মাঝখানকার তিলটি যেন নড়তে থাকে। সব মিলে ভারি মিষ্টি আর মোলায়েম মুখের ডৌলটি। বয়স সবে ত্রিশ উত্তীর্ণ হয়েছে। মুখ দেখে হঠাৎ ধরা না পড়লেও একটু লক্ষ্য করলে গোপন থাকে না। গোপন করার জন্য ইন্দুর চেষ্টাও নেই, ইচ্ছাও নেই, বরং মনে হয় সখ্যে, বাৎসল্যে, গাম্ভীর্যে, মাধুর্যে এই একত্রিশ বছর বয়সটা ইন্দুলেখার আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে সবচেয়ে ভালো মানিয়েছে।

নিজের রূপ সম্বন্ধে অনুপম যেমন আত্মসচেতন, রূপচর্চা সম্বন্ধেও তেমনি। মাথার চুল থেকে জুতোর পালিশের মসৃণতা পর্যন্ত বেশে বাসে অনুপমের সমান লক্ষ্য আছে। আচ্ছাদনটা যাতে বেশ একটু মিহি, দামী ভদ্রজনের মত হয় সে সম্বন্ধে অনুপমের চেষ্টার ত্রুটি নেই। আয়-ব্যয়ের অনুপাত হয়তো এতখানি পারিপাট্যকে সমর্থন করতে চায় না। কিন্তু এ নিয়ে ইন্দু কোন মন্তব্য করলে অনুপম রেগে ওঠে, 'কেন, আমার বাবুগিরির জন্য তোমরা কি কেউ উপোস করে আছ? কী খাই না খাই তা পাঁচজনে দেখতে আসে না, কিন্তু কী পরে বেরোই তা সবাই লক্ষ্য করে। পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে হয়, ভদ্রতা বজায়

রাখতে হলে যেটুকু দরকার আমি কি তার এক চুলও বেশী করি ? অবশ্য যদি সাধ্য থাকত তাহলে করতামই তো, তোমার মত মিশনারী মেম সেজে থাকতম না।'

বেশভূষা সম্বন্ধে ইন্দুর ঔদাসীন্যকে সুবিধা পেলেই অনুপম খোঁচা দিতে ছাড়ে না। আগেকার দিনে খোঁচাগুলির তীব্রতা ছিল বেশী, ইন্দুর মন নরম থাকায় বিঁধতও সহজে। আজকাল এ সব মত-বৈষম্য, রুচি বৈষম্য লক্ষ্য করবার বড় সময় হয় না, সুযোগও আসে না। অন্ন-বস্ত্রের দাবি মেটাতে অনুপম সারাদিন ব্যস্ত থাকে। চাকরি ছাড়াও সুবিধা পেলেই এখানে ওখানে দুটো একটা পার্ট-টাইম করে, টাকাটা বেশির ভাগই পরের দেনা শোধ করতে যায়। চাল, ডাল, তেল, নুন, কাপড়, কয়লার কোথায় কতটুকু মিতব্যয়িতা সম্ভব ইন্দুলেখাকে সে সম্বন্ধে সদাসর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। অনুপম ইন্দুর গৃহিণী-পনার তারিফ করে, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণে তার অনলস পরিশ্রমের জন্য ইন্দুলেখাও কৃতজ্ঞ থাকে। অক্লান্ত শ্রমী অনুপমকে সেবা যত্ন পরিচর্যা দিয়ে সানুরাগ কৃতজ্ঞতা জানায় ইন্দুলেখা।

তবু মতভেদ, ব্যক্তিগত কর্তৃত্বরক্ষার জেদ যে তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে একেবারেই দেখা দেয় না, তা নয়। এই একতলার নতুন ভাড়াটে নির্বাচন নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সেদিন বেশ একচোট কথান্তর হয়ে গেল।

অফিস থেকে ফিরে এসে হাতমুখ ধুয়ে স্ত্রীর রান্নাঘরের সামনে ছোট জলচৌকিটায় বসে আলুর তরকারি দিয়ে পরোটা খেতে খেতে সেদিন অনুপম হঠাৎ বলল, 'দেখ, ও সব সেলামি টেলামি ছেড়েই দিলুম।'

কেটলি থেকে কাপে চা ঢালছিল ইন্দু, স্বামীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'মানে দ্রাক্ষাফল টক। সেলামি পাচ্ছ না, তাই ছেড়ে দিচ্ছ।'

অনুপম বলল, 'পাচ্ছিনে মানে ? ভজুবাবু বিধুবাবুকে মুখের কথাটি বললেই একশ টাকার দুখানা নোট এখনই পায়ের ওপর রেখে দেন। কিন্তু তাই বলে আত্মীয়-কুটুম্বের কাছে তো আর পীড়াপীড়ি করা যায় না। চিনুর কাছে কথাটা তুলতেই পারলাম না। বাইরের লোকে তো আর বুঝবে না যে, ও টাকা আমি বাড়িটা মেরামতের জন্যই নিচ্ছি, তারা মনে করবে এতে বউয়ের গয়না গড়াব।'

ইন্দু বলল, 'চিনু মানে ? কোন্ চিনু ?'

অনুপম একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আর কজন চিনুকে তুমি চেন শুনি ? চিনু, আমাদের চিন্ময় দত্ত, বিমলের খুড়তুতো ভাই।'

বিমল অনুপমের ভগ্নীপতি।

গাঁয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে দুই পরিবারেরই যাতায়াত ছিল। অনুপম বলল, 'তা ছাড়া, তোমার বাপের বাড়ির দিক থেকেও তো চিনুদের সঙ্গে কী এক কুটুম্বিতা রয়েছে ?'

ইন্দু বলল, 'হাঁ, তা আছে, চিনুর মা আমার পিসির জা। একবার আমাদের ওখানে মাসখানেক ছিলেন।'

অনুপম বলল, 'সেদিন প্রিমিয়াম জমা দিতে এসেছিল আমাদের অফিসে। কথায় কথায় বলল, 'অনুপমদা, দুখানা ঘর দিতে পারেন ? শুনলুম মহা মুশকিলে পড়েছে। পাকিস্তানের হুজুকে খবরবার্তা না দিয়ে কোন এক প্রতিবেশীর সঙ্গে চিনুর মা এসে পড়েছেন কলকাতায়। থাকবার জায়গা নেই। প্রথম উঠেছিলেন সেই প্রতিবেশীর ওখানে। সেখানে কদিন আর থাকতে পারেন। চিনু তো রাগারাগি করেছে মাকে। তারপর বেরিয়েছে ঘর খুঁজতে। কিন্তু খুঁজলেই তো আর কলকাতা শহরে ঘর মেলে না আজকাল।'

ইন্দু বলল, 'সে তো ঠিকই, তারপর ?'

অনুপম বলল, 'তারপর ভেবেচিন্তে দিয়েই ফেললাম কথাটা। কুটুম্ব মানুষ তো, ভারি কষ্ট হল শুনে। অবশ্য কিছু টাকা লোকসান হল। কিন্তু টাকাটাই সংসারের সব নয়, আত্মীয়-স্বজনের কাছে মান-মর্যাদাও তো রাখতে হয়। বুলিকে বলতে পারব,—দেখ, তোর মাসিশাশুড়িকে আমি স্থান দিলুম বলেই ঠাঁই পেলে। না হলে যা দিনকাল আজকাল, গঙ্গায় সাঁতার কেটে বেড়ানো ছাড়া আর উপায় ছিল না।'

ইন্দু শঙ্কিতভাবে বলল, 'কথা একেবারে পাকাপাকি করে এসেছ নাকি ?'

অনুপম বলল, 'তবে কি। আমি যা করি তা পাকাপাকি করেই করি। তোমাদের মত একবার এগোই একবার পেছোই না। চিন্ময় আমাকে পঁচিশ টাকা অ্যাডভান্সও করেছে। ওর বুদ্ধিতে অবশ্য কুলোয় নি ! আমিই ইঙ্গিত দিলুম। বললুম, কথাটা তা হলে একেবারে পাকা করেই নাও ভায়া। কখন আবার কে এসে ধরে পড়বে, আমার এড়াবার জো থাকবে না।'

ইন্দু গম্ভীরভাবে বলল, 'এড়াবার জো আমারও নেই। আজ বিকালে আমিও চক্রবর্তীদের মাসিমাকে কথা দিয়ে ফেলেছি।'

অনুপম বলল, 'কথা দিয়ে ফেলেছ ? তার মানে ?'

ইন্দু বলল. 'না দিয়ে করি কি, বামুনের মেয়ে দুখানা হাত ধরে পড়লেন, প্রায় পায়ে ধরবার যোগাড়। তাঁর এক ভাইপো বরিশাল থেকে স্ত্রী, ছেলেপুলে, মা-বোন নিয়ে তাঁর বাড়িতে এসে উঠেছেন। অথচ বাড়িতে তিল ধারণের জায়গা নেই। ছাদে শুয়ে শুয়ে দুটি ছেলের নাকি এরই মধ্যে নিমনিয়া হয়েছে। মাসিমা বললেন, যেভাবে পারো ঘর দুখানা আমাকে দিতেই হবে বৌমা।'

অনুপম বলল, 'তবে আর কি। দিতে হবে বললেই একেবারে দিয়ে দিলে ? টাকা ঠাকা কিছু নিয়েছ ?'

ইন্দু একটু লজ্জিত স্বরে বলল, 'না, তা নিই নি, টাকা কাল তিনি সকালে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু টাকাটাই তো সংসারে সব নয়। পাড়াপড়শীকে মুখের কথা যখন দিয়ে

ফেলেছি, আমি আর তা ফেরাতে পারব না। চিন্ময়কে তার টাকা তুমি বরং কাল ফেরত দিয়ে এস। আত্মীয়স্বজন মানুষ, বুঝিয়ে একটু বললেই হবে। তা ছাড়া মাসিমার ভাইপো রমেনবাবু যেমন বিপদগ্রস্ত, চিন্ময় দত্তের তো তত অসুবিধা নেই। তার এক মা। একখানা ঘর তাকে খুজে দেওয়া যাবেই।'

অনুপম ততক্ষণে গরম হয়ে উঠেছে, 'তার মানে তোমার মুখটাই মুখ, আর আমার মুখটা তো মুখ নয়—আচ্ছা, তোমার সাহসটা কি শুনি?'

ইন্দুরও জেদ কম নয়, বলল, 'কেন ভয়ের এমন কি হয়েছে? কি এমন অন্যায় বলেছি আমি?'

অনুপম বলল, 'না অন্যায় কেন, তুমি একেবারে ন্যায়ের শিরোমণি। নিজের আত্মীয়-কুটুম্বকে ঘর ভাড়া দেব না, তাদের বিপদে-আপদে দেখব না, যত কুটুম্বিতা তোমার পাতানো মাসিমার সঙ্গে, আর বাইরে বেরিয়ে রোজ হাজার জনকে যাকে মুখ দেখাতে হয় তার মুখের কথার দাম নেই, ঘরের কোণের মেয়েমানুষের মুখের কথার দামই বেশি।'

ইন্দু বলল, 'তার তুমি বুঝবে কি? যার যার কথার দাম তার তার কাছে।'

অনুপম মাথা নেড়ে বলল, 'না, তা নয়, স্ত্রীর কাছে স্বামীর কথার দাম নিজের কথার চেয়ে বড়। চিন্ময়কে টাকা ফেরত দিলে তার কাছে ফের আমি মুখ দেখাব কি করে? তা ছাড়া কেবল সেই তো নয়, তার কে একজন বন্ধু ছিল সঙ্গে, আমার কলিগ্‌রা ছিল, সবাইর সামনে আমি বেল্লিক বনি এই তোমার ইচ্ছা, না?'

চায়ের কাপটা স্বামীর হাতে তুলে দিতে দিতে ইন্দু গম্ভীরভাবে বলল, 'বেশ, তাহলে তোমার কথাই থাকবে।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে এবার অনুপম একটু হাসল, 'বাঃ, ভারি চমৎকার হয়েছে তো আজকের চা-টা।'

কিন্তু ইন্দুর মুখে হাসির প্রতিবিম্ব পড়ল না দেখে অনুপম আবার বিরক্ত হয়ে উঠল, 'কী হল, তাই বলে হাঁড়ির মত করে রাখলে কেন মুখখানাকে। ভয় নেই, কেবল আমার মুখই নয়, তোমার মুখরক্ষার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করব। তোমার কিছু বলতে হবে না, চক্রবর্তীদের মাসিমাকে আমিই সব বুঝিয়ে বলে দেব। তাঁর ভাইপোর ছেলেদের নিমনিয়া হয়েছে, আমার কুটুম্বের ছেলে-মেয়েদের টাইফয়েড, কালাজ্বরের এমন গল্প ফাঁদব যে, তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরোবে, মুখ দিয়ে কথা সরবে না। তোমার কোন চিন্তা নেই।'

ইন্দু বলল, 'না, আমার কোন চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। যা বলবার আমিই তাঁকে বলব, তুমি ভাব দুনিয়াসুদ্ধ লোক সব তোমার মত।'

অনুপম বলল, 'কিন্তু দুনিয়াসুদ্ধ লোক যে তোমার মত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সে কথাও ভেব না। আরে সেই যুধিষ্ঠিরকেও তো দায়ে পড়ে মিথ্যে কথা বলতে হয়েছিল, আমার জানা আছে।'

ইন্দু কোন কথা না বলে বঁটিতে বেগুন কুটতে শুরু করল।

অনুপম বলল, 'তা ছাড়া দুশ টাকার সেলামি কি আমি না ভেবে-চিন্তে সহজে ছেড়ে দিয়েছি মনে করো? কথা দেওয়ার আগে দুতিন মিনিটের মধ্যে সব হিসেব করে দেখেছি। হিসাব ছাড়া কোন কাজ করবার মানুষ আমি নই। চিন্ময়রা এলে সুবিধা হবে কত, প্রথম তো ওই মা আর ছেলে, ভিড় নেই, ঝামেলা নেই। ভাড়াটে এলেও মনে হবে না যে ভাড়াটে এসেছে। তারপর নিজে কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি, ছেলেমেয়েগুলির পড়াশুনাটা কিছুই দেখতে পারিনে, চিন্ময়কে দিয়ে সে কাজও হবে। সকালে বিকালে—'

অনুপম একটু থামল, আর একবার তাকিয়ে দেখল স্ত্রীর নির্বিকার শান্ত গম্ভীর মুখের দিক, তারপর বলল, 'আর এক কথা শুনলুম, চিন্ময়ও নাকি তোমার মত বইয়ের পোকা, সে তো তুমিও জানো, প্রফেসর মানুষ, বইপত্র নিয়েই তো কারবার। যখন আসবে, গোটা দুয়েক বইয়ের আলমারি কেননা সঙ্গে আনবে। তা ছাড়া সন্ধ্যা বেলা পাড়ার লাইব্রেরি থেকে তোমার বই আনা-নেওয়া কাজটাও বেশ চলবে চিন্নুকে দিয়ে।'

ইন্দু একটু হাসল এবার, 'কেবল কি তাই? তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের টবে জল দেবে, বাজারের থলে নিয়ে যাবে পিছনে পিছনে, ছুটির দিনে দুচার হাত দাবাও খেলতে পারবে তার সঙ্গে; আরও কী করবে না করবে ভেবে-চিন্তে হিসেব করে রাখো।'

একটু চুপ করে থেকে বেগুন কোটা শেষ করে ইন্দু আবার তাকাল স্বামীর দিকে, 'কিন্তু না দেখেশুনেই চিন্ময় যে ঘরভাড়া নিয়ে টাকা আগাম দিল তোমাকে, শেষে এই নিয়ে একটা কেলেঙ্কারি-টারি হবে না তো? একতলার ঘর, তেমন আলো-হাওয়া খেলে না, সব তাকে বুঝিয়ে বলেছো তো? এ সব ঘর তো প্রফেসরদের থাকবার মত নয়।'

অনুপম বলল, 'তুমিও যেমন, ওই নামেই প্রফেসর। এতদিন তো বেকারই ছিল, মাস কয়েক হল কোন্ এক নতুন কলেজে কমার্স সেক্শনের লেকচারার হয়েছে। মাইনে কত? বড় জোর একশ' সোয়া শ'? অতও বোধ হয় হয়নি এখনো। ঘর পছন্দ হবে না! অনেক বাড়ির দোতলাতেও এমন ঘর নেই। তা ছাড়া ভিক্ষার চাল আবার কাঁড়া আর আকাঁড়া, পেয়েছে এই যথেষ্ট।'

ইন্দু বলল, 'তবু তোমার একবার বলা উচিত ছিল। ঘর-টর আগে দেখে যদি পছন্দ হয় তাহলে ভাড়ার কথা পরে হবে। নিজেদের দোষ আগে থাকতে কাটিয়ে রাখা ভালো ছিল।'

অনুপম বলল, 'আহা তা কি আমি বলিনি ভেবেছ? কিন্তু চিন্ময় বলল, ওসব ঝামেলায় আর দরকার নেই অনুপমদা, পছন্দ যখন করতেই হবে তখন না দেখে করাই

নিরাপদ। এ হল কি, অভিভাবকেরা আগে মেয়ে দেখে পছন্দ করে, কথা পাকাপাকি করে, তারপর ভদ্রতার জন্য ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন, দেখে এসো। আমি বলি কি তার চেয়ে চোখ বুজে থেকে একেবারে শুভদৃষ্টির সময় চোখ খোলাই ভালো। যাই বলো, ছেলেটি বলে কিন্তু বেশ।'

ইন্দু বলল, 'খুব বুঝি মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছ।'

অনুপম বলল, 'হুঁ, মায়েমা তো ছেলের বিয়ে দেবার জন্য পাগল। আচ্ছা আমাদের টুলির সঙ্গে—! এসে তো উঠুক, তারপর সে সব দেখা যাবে।'

টুলি অনুপমের মামাশ্বশুরের মেয়ে। কলেজী নাম সুজাতা বোস।

ইন্দু বলল, 'না বাপু, আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে ও সব ঘটকালির মধ্যে আগে থেকে যাওয়ার কি দরকার। ভালোর বেলায় ভগবান, মন্দের বেলায় মানুষ। ঘটকালি তো দূরের কথা, আমার ইচ্ছে নয় আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকি, বিশেষ করে ভাড়াটে বাড়িতে!'

অনুপম বলল, 'কেন, থাকলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয় শুনি?'

ইন্দু বলল, 'হয়ই তো, কুটুম্ব-স্বজন যত দূরে দূরে থাকে ততই ভালো। কাছাকাছি থাকলেই দুদিন পরে সেই জল তোলা কাপড় মেলা নিয়ে ঝগড়া, আরো পাঁচ রকমের খুঁটিনাটি নিয়ে কথান্তর মনান্তর। ফলে কুটুম্বিতার সেই মাধুর্যটুকু আর থাকে না। দূরে থাকলে সেটুকু রক্ষা হয়।'

অনুপম চটে গিয়ে বলল, 'এসব তোমার শহুরে সাহেবিপনা। বিলেতি বইয়ের বাংলা ট্রানস্লেশন থেকে শেখা। আমরা পাড়াগাঁয়ে একান্নবর্তী সংসারের মানুষ। আত্মীয়তা কুটুম্বিতার ধারণা আমাদের আলাদা। ছেলেবেলায় আপন জ্যেঠা খুড়ো থেকে শুরু করে কত দূর-সম্পর্কের মাসতুতো পিসতুতো ভাইবোন নিয়ে রয়েছি আমরা, রান্না ঘরে ধরেনি দালানের বারান্দায় সারে সারে পাত পেতে বসে খেয়েছি। কখনো ডাল ভাত জুটেছে, কখনো পোলাও কালিয়া। তাতে আমাদের প্রাইভেসি প্রেস্টিজও যায় নি, কুটুম্বিতার মাধুর্যও নষ্ট হয় নি।'

অনুপম একটু থামল। ইন্দুলেখা আগেকার দিনের মত প্রতিবাদ করল না, রান্নার আয়োজন নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইল।

অনুপম বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, যত মাধুর্যের স্বাদ পেলাম এসে তোমাদের শহরে। পাশাপাশি ঘরে বাস করে এখানে একজনের খবর আর একজন রাখে না, একজন মরলে আর একজনের খোঁজ নেওয়ার ফুরসুত হয় না। অমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে, আত্মীয়তা কুটুম্বিতার ধারণা আমাদের অন্য রকম। উৎসবে ব্যসনে—কি যেন শ্লোকটা ছেলেবেলায় মুখস্থ করেছিলাম—সবটা মনে নেই; ভুলে গেছি, তোমার তো খুব মুখস্থ থাকে, বল দেখি পুরো শ্লোকটা—।'

ইন্দু বলল, 'থাক, আর শ্লোকে কাজ নেই। দেখ গিয়ে আজ বুঝি কয়লা

এসেছে দোকানে। আনাও গিয়ে, না হলে কাল স্কুল-অফিসের ভাত নামবে না।'
ইন্দু একটু হাসল, 'ছেলেবেলায় অমন কত শ্লোক মানুষ মুখস্থ করে কত শ্লোক ভোলে।
যাও, এবার ওঠো, আর দেরি কোরো না।'

স্বামীর পল্লীপ্রীতি, একান্নবর্তী পরিবারের ঔদার্যের কথা উঠলে ইন্দুলেখা আজকাল আর বড় একটা তর্ক করে না। ইন্দু জানে অনুপমদের সেই একান্নবর্তী পরিবারের আজ আর চিহ্নটুকুও নেই। গ্রামের বাস অনুপমেরা বহুদিন প্রায় তুলে দিয়েছে। এক জ্ঞাতি খুড়ো বাড়িঘর আর অবশিষ্ট সামান্য জমি-জোত দেখাশোনা করেন। বছরে একবার অনুপম দেশে খোঁজখবর নিতে যায়। গাঁয়ের সঙ্গে সম্পর্ক এখন শুধু তার এইটুকু। আজ পঁচিশ বছর ধরে পড়াশুনা চাকরি-বাকরি সব অনুপমের কলকাতায়, তবু আজ পর্যন্ত মনে-প্রাণে সে কলকাতার মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। এখনো গাঁয়ের প্রসঙ্গে সে মুখর হয়ে ওঠে, তাদের বিগত দিনের তালুকদারির বড়াই করে, তখনকার দিনের মানুষ, আচার, রীতিনীতির প্রশংসা এখনো অনুপমের মুখে ধরে না। এখনো গাছের কুল, খেজুরের রস, মাঠের মটর-কলাইয়ের জন্য অনুপমের মুখ চুলবুল করতে থাকে। বাল্যের কৈশোরের সেই বাঁশের ঝাড় আর গাবের বন ঘেরা সাগরপুর গ্রামখানিকে সে যেন স্মৃতির সঙ্গে, স্বভাবের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে।

এ-সব মুহূর্তে স্বামীকে দশ-বার বছরের গ্রাম্য বালক বলেই মনে হয় ইন্দুলেখার। তাই সে যখন শহরের নিন্দা করে, এক-কথায় সমস্ত কলকাতা শহর আর বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোটা পঞ্চাশেক বছরকে ধূলিসাৎ করে দেয় ইন্দু তখন মুখ টিপে হাসে, হয়তো কোন কোন সময় বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা, আমার শ্বশুরবাড়ি সাগরপুরের মত আর জায়গা নেই পৃথিবীতে। এবার হল তো?'

দু পুরুষ ধরে ইন্দুরা কলকাতায় বাস করছে, অনুপমের কলকাতা বিদ্বেষের সেটাও যে অন্যতম কারণ, ইন্দু তা মনে মনে জানে।

কিন্তু কয়লা নেই শুনে অনুপম ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, ধমকের সুরে বলতে শুরু করেছে, 'কয়লা নেই, একদিন আগে বলতে পার না? কি যে স্বভাব তোমাদের। কোন জিনিস একেবারে না ফুরোলে কিছুতেই হুঁশ হতে চায় না।'

মিনিট কয়েক বাদে কয়লার দোকানের উদ্দেশে অনুপম বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়েছে। এবার পার্ক থেকে ছেলেমেয়েরা ফিরে আসবে। রান্না শেষ করতে হবে তাড়াতাড়ি। তিলু বেশ রাত জাগতে পারে। কিন্তু মুসকিল মিনুকে নিয়ে। খেতে বসবার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ বুজে আসে। চোখ-বোজা মেয়ের চেহারা মনে পড়ায় কড়ায় খুন্তি চালাতে চালাতে ইন্দু একটু হাসল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ছাদে শুয়ে চক্রবর্তী-বাড়ির মাসিমার নাতি দুটির অসুখ হয়েছে। তাঁকে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারল না ইন্দু। মুখ দেখাবার আর জো রইল না তাঁর কাছে।

দিন দুই বাদে বেলা গোটা নয়েকের সময় একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে 'ভূপতি-ভবনের' লাগা গ্যাসপোস্টটার ধারে থামল। গাড়ির মাথায় ট্রাঙ্ক, বাক্স, পুঁটলি, বিছানার বাণ্ডিল। পিছনে পিছনে ঠেলাগাড়িতে বাজে কাঠের খানদুই তক্তোপোশ, একজোড়া ছোট টেবিল-চেয়ার, আরো সব টুকিটাকি গৃহস্থালির আসবাব।

পাড়ার গুটি তিন-চার ছেলে ছুটে এল পিছনে পিছনে, 'ও তিলু, দেখ এসে তোদের নতুন ভাড়াটে এসেছে।'

তিলু মিনু সিঁড়ি বেয়ে ছুটে নামল নীচে। ইন্দুলেখা রান্নাঘরে ছিল। সেখানে থেকে বেরুল না। কিন্তু শোয়ার-ঘর থেকে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল অনুপম। সারামুখ সাবান মাখা। ক্ষৌরী হতে বসেছিল। ইন্দুকে ডেকে বলল, 'চিনুরা বোধহয় এল। শুনছ নাকি? রান্না তো তোমার সারা সকালই আছে। এবার একটু নীচে যাও। মাসিমা এসেছেন। গিয়ে এগিয়ে নিয়ে এস।'

ইন্দু ঘরের ভিতর থেকে বলল, 'আমার হাত আটকা, তুমি গেলেই চলবে।'

অনুপম বলল, 'না-না-না', তাই কি হয়, তুমিও এস, কুটুম্বমানুষ। ভদ্রতা বলে একটা জিনিসও তো আছে।'

ইন্দু বলল, 'আচ্ছা যাচ্ছি—হাতের কাজ সেরে! আমাকে অত করে ভদ্রতার পাঠ তোমাকে শেখাতে হবে না। বরং তুমি একটু ভদ্র হও তো, সাবান-মাখা মুখটা ভালো করে ধুয়ে যাও। ওঁরা যখন এসেছেন, তখন বাড়িতেও ঢুকবেন, ব্যস্ত হয়ো না।'

অনুপম গালে হাত বুলিয়ে একটু হেসে বলল, 'ও, এতে আর কি হয়েছে।'

তারপর তিলু, মিনুর মতই অনুপম দ্রুতপায়ে সিঁড়িগুলি ডিঙেয়ে গেল।

ইন্দু এসে এবার দোতলার বারান্দায় রেলিং ধরে একটু দাঁড়াল। গ্যাসপোস্টের নিচের খানিকটা জায়গা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। গাড়ি থেকে কালো ছিপছিপে চেহারার পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক আর একটি প্রৌঢ় মহিলাকে নামিয়ে নিচ্ছে। ইন্দু চিনতে পারল, চিন্ময় আর তার মা।

পরনের শাড়িটা ময়লা হয়ে গেছে। এ শাড়িতে বাইরের কারো সামনে বেরোনো যায় না, ইন্দু ঘরে গিয়ে চওড়া কালোপেড়ে ফরসা আর একখানা শাড়ি পরে নিল। কুটুম্বেরা আসায় অনুপম উল্লসিত হয়ে উঠতে পার, কিন্তু ইন্দুর মোটেই ভালো লাগছে না। তার মন ফের খুঁতখুঁত করতে শুরু করেছে। অবশ্য বিষয়টা সামান্যই। ঘরভাড়া সম্বন্ধে এমন কতজনকে কথা দিতে হয়, কতজনকে ফেরাতে হয়, এটা এমন নতুন কিছু নয়। কিন্তু চক্রবর্তী-গৃহিণী কাল এসে ইন্দুকে একেবারে পাকড়াও করে ধরেছিলেন, 'সে কি বউমা, আমাকে কথা দিয়ে ঘর নাকি তুমি আর কাউকে দিয়ে দিচ্ছ?'

ইন্দুলেখা মৃদুস্বরে জবাব দিয়েছিল, 'দিয়ে দিচ্ছি ঠিক নয় মাসিমা, তারাই জোর

করে নিচ্ছে। আত্মীয়-কুটুম্ব মানুষ, কিছু বলাও যায় না।' কত্যায়নী রুষ্ট-স্বরে বলেছিলেন, 'কিন্তু সেদিন আমি তোমার হাত ধরে কত করে বলে গেলুম, তুমিও কথা দিলে, তবু তারা জোর করে কি করে? মিছে কথা বলে লাভ কি বাছা? নিজের জিনিস নিজে না দিলে কেউ কি নিতে পারে, তা মহা আত্মীয় হোক না। কিন্তু কথা যখন তুমি দিয়েছ ঘরও আমাকে দিতেই হবে, সবই তো বলেছি তোমাকে। ভাড়া না হয় আরো পাঁচ টাকা তুমি বেশি নিয়ো—।'

ইন্দু ম্লান মুখে বলেছিল, 'না মাসিমা মাফ করবেন। তা হবার জো নেই। পারলে আমি আপনাকেই দিতুম।'

কাত্যায়নী বিরস মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'বেশ, কিন্তু তোমার কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করিনি বউমা।'

ইন্দু সদর অবধি পিছনে পিছনে গিয়েছিল কাত্যায়নীর। 'কিছু মনে করবেন না, আমি ভারি লজ্জা পেয়েছি। জানেন তো এসব ব্যাপারে ওঁরই সব হাত। আমি একরকম কেউ নই।'

'কেউ নও?' কাত্যায়নী ইন্দুর মুখের দিয়ে তাকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসেছিলেন। 'কথার দাম যাদের কাছে নেই, তাদের মুখে কিছুই আটকায় না বউমা।'

ইন্দু এবার রেগে উঠে কঠিন জবাব দিতে যাচ্ছিল কিন্তু নিজেকে শেষ পর্যন্ত সংযত করে নিয়ে শান্তভাবে বলেছিল, 'আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না মাসিমা।'

কাত্যায়নী যেতে যেতে বলেছিলেন, 'থাক থাক বাছা, আর কথা কাটাকাটি করে লাভ কি। আমার বুঝতে কিছুই বাকি নেই। কিন্তু তোমাদের দোষ কি। আজকাল দিনকালই এই রকম। শুধু গুরুজন আর বামুন পণ্ডিতের সঙ্গে ছল-চাতুরী কোরো না বউমা, তাতে ভালো হয় না।'

ইন্দুর বুকটা কেঁপে উঠেছিল। ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার। অযথা এমন একটা গাল দিলেন মাসিমা। কিন্তু এ নিয়ে ফের কোন কথা বলতে আত্ম-সম্মানে বেধেছিল ইন্দুর।

চিন্ময়দের দেখে কাল সকালের সেই ঘটনাটুকু ইন্দুলেখার ফের মনে পড়ল।

নিচ থেকে অনুপমের এক বিরক্তিভরা গলা শোনা গেল, 'কই এলে না তুমি? মাঐমা আর চিন্ময় খুঁজছে তোমাকে।'

আয়নার সামনে একবার দাঁড়াল ইন্দুলেখা। রান্নার ভাপ লেগেছে মুখে, একটু ঘেমেও উঠেছে, আঁচল দিয়ে মুছে নিল মুখখানা, তারপর ধীর-পায়ে নিচে নেমে এল।

ততক্ষণে অনুপম চিন্ময়ের মা হৈমবতীকে সদর থেকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এসেছে। প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা। বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, পরনে শাদা থান। মাথায় আধা-পাকা চুল ছোট করে ছাঁটা। যৌবনে বেশ সুন্দরী ছিলেন, এখনো তার ছাপ কিছু কিছু আছে। রোগাটে চেহারা। শরীর ভালো যাচ্ছে না হৈমবতীর।

'চিনতে পাচ্ছেন মাঐমা ?' নিচু হয়ে হৈমবতীর পায়ের ধুলো নিল ইন্দুলেখা।

হৈমবতী মৃদু স্বরে বললেন, 'থাক মা থাক। অমনিতেই আশীর্বাদ করছি, সতী-সাধ্বী হও, চিরায়ুষ্মতী হও।'

ইন্দু মনে মনে একটু হাসল। এ ধরনের পুরোন আশীর্বচন অনেকদিন কানে যায় নি। আজকাল এসব প্রায় উঠেই গেছে।

বলতে বলতে হৈমবতী একবার পিছনে সদরের দিকে তাকালেন, 'দেখিস চিনু, কিছু যেন খোয়া না যায়। বাসনের দুটো বাক্স—'

অনুপম হেসে বলল, 'ব্যস্ত হবেন না মাঐমা, সবই আসবে। এখান থেকে কিছুই হারাবে না।'

ইন্দুও তাকাল সদরের দিকে। চিন্ময়ের পিছনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। গায়ে আধময়লা একটি পাঞ্জাবি। কালো ছিপছিপে শরীর। মালপত্র নিয়ে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে চিন্ময়। গাড়োয়ান আর ঠেলাওয়ালাকে সে ভাঙা হিন্দীতে কি সব নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু আসলে নিজে চলছে তাদের নির্দেশেই। হৈমবতী বললেন, 'না অনুপম, ছেলে আমার কি গুণধর তুমি তো জানা না। জিনিস-পত্রের ওপর কোন মমতা নেই, কিছু আনতে কি চায়, আমি জোর করে সব এনেছি। ওর অসাধ্য কিছু নেই। ও ইচ্ছা করলে সব খোয়াতে পারে।'

ঠেলাওয়ালার সঙ্গে বড় একটা ট্রাঙ্ক ধরাধরি করে দরজায় চৌকাঠের কাছে নামাল চিন্ময়। সারা মুখটা বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে উঠেছে। দেখতে সত্যিই ভারি কালো চিন্ময়। কিন্তু নাকচোখ যেন কালো পাথর থেকে কুঁদে বের করা। মুখখানা পাথরের মতই গম্ভীর, মনে হয় একটু যেন নিষ্ঠুরও। ইন্দু চোখ ফিরিয়ে নিয়ে হৈমবতীকে বলল, 'চিনু তো বেশ বড় হয়েছে।'

হৈমবতী একটু হাসলেন, 'ও তুমি বুঝি তোমার ছেলের সেই অন্নপ্রাশনের সময় দেখেছিলে, তারপরে আর দেখ নি ?'

ইন্দু বলল, 'না, তারপরও দু-তিনবার দেখেছি। ভবানীপুরের বাসায় গিয়েছিল। কিন্তু তিন-চার বছরের মধ্যে আর খোঁজ-খবর নেই।'

হৈমবতী বললেন, 'ওর স্বভাবের কথা আর বোলো না। আত্মীয়-কুটুম্ব তো একেবারে কম নেই কলকাতায়, কিন্তু ও না চেনে শোনে কাকে, না রাখে কারো কোন খোঁজ।'

আত্মীয়স্বজনের খোঁজ খবর নিল ইন্দু, 'ঠাকুরঝি, বিমলবাবু, ওঁদের ছেলে-মেয়েরা সব ভালো আছে ? ওঁরা বুঝি পাকিস্তান থেকে আর নড়বেন না ?'

'হ্যাঁ, ভালোই আছে তারা।' হৈমবতী বললেন, 'না নড়াই ভালো, নড়ে কি সুখ তা এ কদিনেই বেশ টের পেয়েছি। জানি না আরো কত ভোগ আছে কপালে।'

ইন্দু হৈমবতীকে তাঁদের ঘর দেখাতে লাগল। অনুপম গেল চিন্ময়কে সাহায্য করতে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মোটামুটি সাধারণভাবে দুখানা ঘরে সব জিনিসপত্র একরকম করে জড়ো করে রাখা হল।

অনুপম বলল, 'এখন এই পর্যন্ত থাক। আজ তো সারাদিন ছুটি। ধীরে-সুস্থে পরে সব গুছিয়ে নেওয়া যাবে। উপরে চল চিন্ময়, একটু চা-টা খেয়ে নাও। চলুন মাঐমা।'

দোতালায় নিজেদের শোবার ঘরে কুটুম্বদের নিয়ে গেল অনুপম। খাট, আলমারি, আয়না, ড্রেসিং টেবিলে ঘর প্রায় ভরা। ঘরের অনুপাতে জিনিসপত্রের বাহুল্যটা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে চিন্ময়ের চোখে পড়ল সব জিনিসই প্রায় যথাস্থানে পরিপাটি করে সাজানো-গুছানো, বেশ একখানি নিপুণ হাতের ছাপ যেন সর্বত্র প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। কেবল চারিদিকের দেয়ালে ফটোর বহর দেখে একটু বিস্ময় লাগল চিন্ময়ের। দেয়ালের কোথাও কোন ফাঁক নেই। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নেতাজী ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর সঙ্গে দু-তিনটি বিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রীর ছবি দেয়ালে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। সেই সঙ্গে মেয়েলী হাতের চারু-শিল্প, মাছের আঁশে তৈরী 'স্বাগতম' 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'। তার পাশে অনুপম আর ইন্দুলেখার প্রথম যৌবনের যুগল প্রতিকৃতি।

প্লেটে করে খাবার আর ধবধবে শাদা দামী কাপে তামাটে রঙের চা ভরতি করে ইন্দুলেখা সামনে এসে দাঁড়াল 'তারপর স্মিতমুখে বলল, নাও।'

অনুপমের দিকে তাকিয়ে চিন্ময় একটু হেসে বলল, 'আপনি দেখছি খুব ছবির ভক্ত।'

আত্মপ্রসাদে অনুপমও হাসল। 'ফটোগুলি আমি নিজে বেছে এনেছি, আর ঠিক যে জায়গায় যেটি মানায় আমি নিজের হাতে তেমনি করে সাজিয়েছি। ভালো হয় নি চিন্ময়?'

চিন্ময় চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তেমনি হেসে বলল 'ভালোই তো'

কিন্তু হাসি পরিমিত হলেও তার ভিতরে প্রচ্ছন্ন কৌতুকটুকু ইন্দুর চোখ এড়াল না —তার মুখও সামান্য আরক্ত হয়ে উঠল। অনুপমের এই শিল্পানুরাগ তার একান্তই নিজের। ইন্দুর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কিছুমাত্র প্রভাব এর মধ্যে নেই। দুচারখানা ফটো বাদ দিয়ে, সাজাবার ধরনটা একটু অন্যরকম করতে চেষ্টা করেছিল ইন্দু, কিন্তু অনুপম তাতে কিছুতেই রাজী হয় নি। অথচ চিন্ময় হয়তো ভাবল অনুপমের এই গৃহ-সজ্জায় ইন্দুরও সমর্থন আর সহযোগিতা রয়েছে।

ভাবে ভাবুক। চিন্তাটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ইন্দু স্নিগ্ধ একটু পরিহাসের সুরে বলল, 'খাবারটা নাও, হাত থেকে নিতে লজ্জা করছে না কি?'

চিন্ময় চোখ নামিয়ে লজ্জিত স্বরে প্রতিবাদ করল, 'বাঃ, লজ্জা করবে কেন।'

ইন্দুর স্মিত সুন্দর মুখের দিকে ফের একটু তাকিয়ে নিয়ে খাবার-ভরতি চীনামাটির সুন্দর সাদা ডিসটি হাতে তুলে নিল চিন্ময়। কেবল জল-খাবার নয়, মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণটাও সেদিন অনুপমের ঘরেই মা আর ছেলেকে গ্রহণ করতে হল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে আধ ঘণ্টাখানেক মাত্র বিশ্রাম করে নতুন ভাড়াটেদের গৃহস্থ করবার জন্য অনুপম ফের ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গৃহস্থালি যেন চিন্ময়ের নয়, অনুপমের নিজেরই। এ যেন অনুপমের আর এক মূর্তি। পরনে নীল-রঙের লুঙ্গি, সারা গা খোলা। হাতে হাতুড়ি। তার সেই বিলাতি বাবুগিরির চিহ্ন মাত্র নেই। কিন্তু এ বেশেও অনুপমকে বেশ মানিয়েছে। কোন ঘরের জানালার একটা পাল্লা আগের ভাড়াটের দুরন্ত ছেলেরা ভেঙ্গে দিয়ে গেছে, সুইচ বোর্ডের কোন সুইচটায় গোলমাল আছে, অনুপম নিজেই লেগে গেল মেরামতের কাজে। কিছুতেই সে পিছপাও নয়, মোটামুটি রকমের হাতেখড়ি আছে সব বিদ্যায়।

কিন্তু এসব ব্যাপারে চিন্ময় একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ। কিছুতেই সে হাত ছোঁয়াতে জানে না। তার ঘর দুখানা নিয়ে অনুপমের ব্যস্ততা দেখে সে যেমন বিব্রত হল তেমনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। দু-একবার অনুপমকে সে বলল, 'অনুপমদা, এবার আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন। সব আমি ধীরে ধীরে ঠিক করে নেব।'

অনুপম বলল, 'ঠিক করবার দায়িত্ব যে আমার চিন্ময়, অবশ্য এ সব আমার আগেই করে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু সময় পাই নি। হাফইয়ারলি ক্লোজিং শুরু হয়েছে। পরশু ছুটির দিন ছিল। তবু বেরোতে হল। নিজে না গেলে সাব-অর্ডিনেটরা কাজ করতে চায় না। এই আজ একটু সময় পেয়েছি। সব ঠিক করে দিচ্ছি, তুমি ভেবো না।'

চিন্ময় বলল, 'একজন মিস্ত্রী-টিস্ত্রী—'

অনুপম বাধা দিয়ে বলল, 'কেন, কোন মিস্ত্রীর চাইতে আমার কাজ খারাপ হবে ভেবেছ? মোটেই না। আর এই সামান্য কাজের জন্য একটা মিস্ত্রীই বা ডাকতে যাব কেন? মিছিমিছি পয়সা নষ্ট। তাছাড়া নিজের ঘরের কাজ নিজের হাতে করে যে সুখ তা তো তোমরা শহুরে বাবুরা বুঝতে পারবে না। কিন্তু একবার যখন আমার আওতায় এসে পড়েছে ভায়া, বাবুগিরি বেশিদিন রাখতে পারবে না। এবার ধরো দেখি এই তারটা—'

ইলেকট্রিকের তারের একটি প্রান্ত চিন্ময়ের হাতে তুলে দিল অনুপম।

বিব্রত চিন্ময় মিনিট কয়েক অনুপমের একটু সাকরেদি করল, তারপর খানিক বাদে কি একটা ছলে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে, সারাদিন পারতপক্ষে অনুপমের কাছে আর ঘেঁষল না।

বিকালের দিকে অনুপম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মাঐমা, চিন্ময়কে অনেকক্ষণ দেখছি নে, গেল কোথায় ও ?'

হৈমবতী হেসে বললেন, 'আর বলো না অনুপম, তোমার ভয়েই ও পালিয়েছে।'

'আমার ভয়ে ?'

হৈমবতী বললেন, 'তাই মনে হচ্ছে। কাছে থাকলেই তুমি এ-কাজ ও-কাজ বলবে, তাই সরে পড়েছে।'

অনুপম বলল, 'কাজকে বুঝি চিনু খুব ভয় করে ?'

হৈমবতী বললেন, 'এমন ভয় ও কোন কিছুকে করে না, সংসারের কোন জিনিস হাত দিয়ে ছোঁবে না। চোখের সামনে নিজের জিনিস নষ্ট হয়ে গেলেও ফিরে তাকাবে না একবার। দুঃখের কথা আর কাউকে বলি নে বাবা। নিজের ছেলে হলে হবে কি, এমন কুঁড়ের বাদশা আমি বাপের জন্মেও দেখি নি।'

অনুপম উদ্বিগ্ন অভিভাবকের স্বরে বলল, 'কথাটা তো ভালো নয়, মাঐমা। গৃহস্থের ছেলের সব কাজ-কর্মই শিখতে হয়, করতে হয়, নাহলে কি সংসারে চলে ? যাক আপনি ভাববেন না। আমার হাতে পড়লে দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কত অকর্মাকে কাজ শেখালুম—।'

হৈমবতী একটু হেসে বললেন, 'আমি তো পারলুম না। তোমরা পাঁচজনে একবার দেখ চেষ্টা করে।'

কাছে বসে রেশনের চাল থেকে কাঁকর বেছে ফেলতে ফেলতে ইন্দুলেখা অনুপম-হৈমবতীর আলাপ শুনছিল, ছেলের বিরুদ্ধে হৈমবতীর নালিশের মধ্যে গোপন প্রশ্রয়ের স্বর শুনে সে মৃদু হাসল।

হৈমবতী সেটুকু লক্ষ্য করে বললেন, 'হাসছ যে ইন্দু ?'

ইন্দু বলল, 'এমনই। স্বভাব কি কারো আর পাঁচজনের চেষ্টায় বদলায় ?'

হৈমবতী বললেন, 'অবশ্য নিজেরও চেষ্টা করা দরকার। কেবল যে নিজে কাজ করবে না তাই নয়, আর কাউকেও করতে দেবে না। এমন এলোমেলো, অগোছাল নোংরা স্বভাব যে কি আর বলব। অথচ আমি যে একটু গুছিয়ে-টুছিয়ে রাখব তাও হবার নয়। আসলে এই রকম ভূত হয়ে না থাকলে ওর পেটের ভাত হজম হয় না, ঘুম হয় না রাত্রে। তুমি হাসছ, কিন্তু ওর ধরন-ধারন দেখলে আমার সত্যিই গায়ে রাগ ধরে বাছা। হোটেলে-মেসে যেভাবে থাকত থাকত, কিন্তু ঘর-সংসারে কি ও-সব চলে। তোমরা দেখ দেখি বলে-টলে চালচলনটা ফেরাতে পার কি না।'

ইন্দু মৃদু হেসে বলল, 'যার বলায় কাজ হবে তাকে আনছেন না কেন, ঘরে এবার বউ আনলেই পারেন।'

হৈমবতী বললেন, 'আনতে কি আমার অসাধ মা, কিন্তু আমি আনতে চাইলে হবে কি, ছেলে মাথা পাতে না। এলাম তো সেই জন্যই। ভেবে দেখলাম একেবারে

ঘাড়ের ওপর এসে না পড়লে দূর থেকে কিছু হবে না। মতিগতিও বদলাবে না, বাউণ্ডুলে ভাবও ঘুচবে না। এবার কাছে থেকে দেখি চেষ্টা করে। তোমরাও একটু সাহায্য টাহায্য কোরো।'

ইন্দু তেমনি মৃদু হেসে বলল, 'সাহয্য করব বইকি মায়েমা।'

নতুন ভাড়াটে এনে যে চতুর্বর্গ ফল লাভের আশা করেছিল অনুপম তা সফল হবার সমূহ কোন লক্ষণই দেখা গেল না। চিন্ময় যেমন অমিশুক তেমনি অসামাজিক। দিন-কয়েকের মধ্যে অনুপম যেচে বহুবার তার সঙ্গে আলাপ করতে গেছে, নিজের সুখ-দুঃখের সুবিধে-অসুবিধার খবর বলেছে। জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা নিয়ে আলোচনা করেছে, স্বাধীনতা পেয়েও যে লোকজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তেমন বাড়ে নি তা নিয়ে অভিযোগ করেছে। কিন্তু চিন্ময়ের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পায় নি। আলাপ-আলোচনায় যে সে খুব উৎসাহী নয়, এমন কি অনিচ্ছুক, সেটা দু তিনদিনের মধ্যেই বুঝতে বাকি থাকে নি অনুপমের এবং বুঝতে পেরে রীতিমত ক্ষুণ্ণও হয়েছে।

অবশ্য সকালে বিকালে যখনই অনুপম ঘরে ঢুকেছে চিন্ময়ের, সে হাতের কাজ রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে, বসবার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সৌজন্যের সুরে বলেছে, 'আসুন অনুপমদা।' তারপর যতক্ষণ অনুপম নিজে থেকে না উঠে এসেছে, চিন্ময় একবারও বলে নি যে, হাতে তার কাজ আছে কিংবা কোন কারণে ব্যস্ত রয়েছে সে। যতক্ষণ অনুপম কথা বলেছে, চিন্ময় শুনে গেছে, না-হাঁ করে জবাবও দিয়েছে কিন্তু নিজে থেকে কোন প্রসঙ্গই তোলে নি চিন্ময়। অবশেষে দশ পনের মিনিট কথা বলে অনুপম নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছে, 'যাই, বাজারের বেলা হল,' কি 'টাইম হোল অফিসের'।

আলাপ করতে এসে নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে ফিরে গেছে অনুপম। চিন্ময়ের ভিতরকার অনিচ্ছা, আর অসামাজিকতা টের পেতে তার দেরি হয় নি। অনুপম বিস্মিত হয়ে ভাবে—এমন লোকদেখানো ভদ্রতা কেন এরা মিছামিছি করতে যায়। তার চেয়ে বলে দিলেও তো হয়, 'না-অনুপমদা, কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত আছি এখন, সন্ধ্যা-বেলায় আসবেন, কথাবার্তা বলা যাবে।'

এমন কথা চিন্ময় কোনদিনই বলে না। অবশ্য সন্ধ্যাবেলায় তার অবসর নেই। সে তখন কলেজে পড়াতে যায়। ছুটির দিনেও চিন্ময় হয় ও-সময়টায় বাসায় থাকে না, না হয় লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

তার ফুলের চারা দেখবার জন্য চিন্ময়কে একদিন ছুটির দিনে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল অনুপম। দুতিন রকমের গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ক্রিসেন্থেমাম অনুপম নতুন সংগ্রহ করেছে। দুএকটি ফুল সে নিজে থেকে চিন্ময়কে উপহারও দিয়েছিল, কিন্তু চিন্ময় তেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে নি। অনুপম বুঝতে পেরেছে ফুল সম্বন্ধেও চিন্ময় আনাড়ি।

গরমের দিন। ছুটির সন্ধ্যায় চিন্ময়কে খানিকক্ষণ ছাদে এসে গল্প করবার নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও সে আসে নি।

এরপর ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোটা দেখিয়ে দেওয়ার কথা পাড়তে অনুপমের ভরসা হয় নি। অবশ্য অনুপম জানে যে জোর করে যদি বলে, চিন্ময় কিছুতেই না করতে পারবে না। তবু অনুরোধ করতে ইচ্ছা হয় নি। এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তার একটু আলাপও হল রাত্রে। খেয়ে-দেয়ে অনুপম শুয়ে পড়েছে ফ্যান খুলে দিয়ে। ছেলে মেয়ে দুটি পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। ইন্দু রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে দিয়ে একখানা বই পড়ছিল।

অনুপম কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে বলল, 'আঃ আবার বুঝি নতুন নভেল শুরু করলে!'

নভেল নয়, একখানা ভ্রমণ কাহিনী। কিন্তু স্কুল-কলেজের পাঠ্য-বহির্ভূত সব বইই অপুপমের কাছে নভেল। ইন্দু বইখানার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করে সংক্ষেপে বলল, 'হু।'

দুচার মিনিট চুপ করে অনুপম আবার বলল, 'সারাদিন খেটেছ, এবার একটু বিশ্রাম করো এসে। রোজ রোজ কী যে এত পড়। সারাজীবন ধরে বই পড়লে তবু শখ মিটল না। অথচ সব নভেলেই তো প্রায় একই লেখা থাকে। নায়কের সঙ্গে নায়িকার মিল না হয় বিচ্ছেদ, নতুন কী আছে বল তো?'

এ অভিযোগ অনুপমের আজ এই প্রথম নয়। ইন্দু তর্ক করবার চেষ্টা না করে মৃদু হেসে বলল, 'তা তো ঠিকই।'

অনুপম বলল, 'তা-ছাড়া কেবল এক রাজ্যের বই পড়লেই লোকে যে মানুষ হয় তা নয়, তার একটা দৃষ্টান্তও দেখলুম এবার।'

ইন্দু বুঝতে পারছিল অনুপম কার কথা বলছে। তবু বলল, 'কি রকম?'

অনুপম বলল, 'এই ধরো নিচের চিন্ময়। দিন-রাত দোরে খিল দিয়ে বই নিয়েই আছে। কিন্তু –। না, যেমন ভেবেছিলুম তেমন নয়।'

ইন্দু খোঁচা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি তো তখনই বলেছিলুম, নিজের কুটুম্ব, নিজে দেখেশুনে এনেছ—। আমার কথা তো শুনলে না তখন।'

অনুপম নিজের নির্বাচনের যোগ্যতা সম্বন্ধে ফের সচেতন হয়ে উঠল, 'হাঁ, তোমার কথা শুনলেই হয়েছিল আর কি। একপাল লোক এসে একতলাটা একেবারে বাজার করে ছাড়ত। তার চেয়ে এই বেশ হয়েছে। সাড়া-শব্দটি পর্যন্ত নেই, কত শান্তি। অবশ্য ছেলেটি তেমন মিশুক নয়, তা ছাড়া আর তো কোন দোষ নেই, কি বল। হাঁ, বই-টই তো তুমি দু চারখানা পড়তে পারছ এই বা কম লাভ কি।'

ইন্দু কোন কথা না বলে বইয়ের একটি পাতা উল্টাল। ভ্রমণকাহিনীটি মন্দ না, একটু নভেলী ঢঙে লেখা।

অনুপম বলল, 'ইচ্ছা করলে আরো একটা কাজও তুমি ওকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারো।'

'কি?'

'কথায় কথায় তিলু মিনুকে পড়াবার কথাটা বল না।'

ইন্দু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'না। ওদের যা পড়া তা নিজেরাই ইচ্ছা করলে বেশ দেখিয়ে দেওয়া যায়, তার জন্য পরের সাহায্য নিতে যাব কেন!'

অনুপম বলল, 'আহা, একেবারে পরও তো না।'

ইন্দু বলল, 'তোমার কুটুম্ব হতে পারে, কিন্তু—। তাছাড়া যতটা মনে হয় ছেলে-পুলে ও পছন্দ করো না।'

অনুপমেরও অবশ্য তাই মনে হয়েছিল, কিন্তু নিজের কুটুম্বের নিন্দায় নিজেরই পরাজয়। চিন্ময়ের হয়ে একটু কৈফিয়তের সুরে অনুপম বলল, 'যারা মিশুক নয় তারা ছেলেবুড়ো কারো সঙ্গেই মিশতে পারে না। একেক জনের স্বভাব এই রকম থাকে। মাসিমা কিন্তু তিলু মিনুকে খুব ভালোবাসেন।'

ইন্দু অস্বীকার করল না, বরং একটু হেসেই বলল, 'তিলু আর মিনু তো তাঁর রীতিমত ভক্ত হয়ে গেছে। গল্প শোনে, সঙ্গে করে গঙ্গা স্নানে নিয়ে যায়। বেশির ভাগ সময় তো তাঁর কাছেই আজকাল থাকে ওরা।'

হৈমবতীর সম্বন্ধে কোন অভিযোগ অনুপমেরও নেই। ছেলের অসামাজিক ব্যবহার তিনি সুদে-আসলে পুষিয়ে দিয়েছেন। অবসর পেলেই অনুপমদের খোঁজ-খবর নিতে আসেন। তিলু মিনুদের আদর করেন, তাদের দুএকটা আবদার মেটান। এর আগে নিরামিষ তরকারি অনুপমের মুখে রুচত না, কিন্তু হৈমবতী নিজের রাঁধা দু-একটি তরকারি বাটিতে করে প্রায়ই পাঠিয়ে দিতে থাকায় অনুপমের প্রায় রুচি ফিরে আসবার জো হয়েছে। প্রথম প্রথম ভয়ে ভয়ে ভদ্রতা করে একটু একটু মুখে দিত অনুপম। কিন্তু মুখে দিয়ে আজকাল বেশ ভালোই লাগে।

'নিরামিষ সত্যি ভারি চমৎকার রাঁধেন আপনি, মাছ ছাড়া যে কোন খাদ্য আছে এ আমি আগে বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু এ তো ভারি অন্যায়, আপনি রোজ রোজ এসব কেন পাঠান?'

হৈমবতী বলেন, 'তাতে কি হয়েছে, কিইবা এমন দিতে পারি তোমাদের।'

বারণ করলেও শোনেন না হৈমবতী, অনুপমদের সঙ্কোচের জন্য অসন্তুষ্ট হন। ফলে ইন্দুলেখাও চিন্ময়ের খাওয়ার সময় একদিন একটু মাছের তরকারি নিয়ে এল। চিন্ময় তো খাবেই না। অনেক অনুরোধের পর খানিকটা তুলে নিয়ে ভাতে মেখে নিল। বেশির ভাগ পড়ে রইল বাটিতে। ইন্দু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, অপেক্ষা করল ভালো কি মন্দ চিন্ময় কিছু বলে কি না, কিন্তু সে কোন মন্তব্যই করল না। অথচ রান্নার হাত ইন্দুরও বেশ পাকা। যে খায় সেই প্রশংসা করে। মনে মনে রাগই

হল ইন্দুর। ঠিক করল আর সে কোনদিন চিন্ময়কে কোন তরকারি-টরকারি পাঠাবে না।

এমনি ছোট ছোট দু-একটা ঘটনায় ইন্দুর মন চিন্ময়ের উপর বেশ একটু বিরূপ আর অপ্রসন্নই হয়েছিল। এ পর্যন্ত সামান্য দু-একটি কথাবার্তা ছাড়া তেমন আলাপও হয় নি তার সঙ্গে। বেশি কথা বলবার অভ্যাস ইন্দুর নেই, নিষ্প্রয়োজনে কারো সঙ্গে আলাপ করতে সে ভালোও বাসে না।

কিন্তু সেদিন গেল একটু আলাপ করত। ঠিক একেবারে নিষ্প্রয়োজনে নয়, বইয়ের প্রয়োজনে। ইন্দুর ধারণা এই জিনিসটা ছলে বলে শত্রু-মিত্র সকলের কাছ থেকেই সংগ্রহ করে পড়া চলে। চুরি না করলেই হল। 'আংটি তুমি কার?' 'যার হাতে আছি।' বইও তেমনই। যে পড়ে তখনকার মত বই তো তারই। বই পড়বার সময় মালিকের কথাও মনে থাকে না, লেখকের কথাও নয়। যে পড়ে আর যাদের কথা পড়ে বইতে তারাই তো সব।

দিন দুই হল পড়বার মত বই নেই হাতে। দুপুরে ঘুমোবার অভ্যাস নেই ইন্দুর। সেলাই-টেলাইর কাজগুলি এই সময় সেরে রাখবে সে। সবদিন ভালো লাগে না, মন বসে না, ইচ্ছা হয় বই নিয়ে বসতে। অনুপম অফিসে বেরিয়েছে সেই পৌনে দশটায়, একটু বাদে খেয়েদেয়ে তিলু গেছে স্কুল। মিনু অনেকক্ষণ দুরন্তপনা করে সবে ঘুমিয়েছে। নিচের ঘরে দোর ভেজিয়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছেন হৈমবতী। এ সময় চিন্ময় কোনদিন বেরিয়ে যায়, কোনদিন বা ঘরেই থাকে। আজ যে বেরোয় নি ইন্দু তা লক্ষ্য করেছে। ভাবল বই যদি কিছু থাকে একখানা চেয়ে নিয়ে চলে আসবে।

ভিতর থেকে দোর বন্ধ। রুদ্ধ দরজার সামান দাঁড়িয়ে ইন্দু একটু ইতস্তত করল। একবার ভাবল ফিরে যায়। চিন্ময় হয়তো কোন কাজকর্ম করছে, ডাকলে নিশ্চয় ভ্রূ কোঁচকাবে। কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবল কোঁচকায় তো কোঁচকাক। কে ধার ধারে তার অত ভ্রূ-কোঁচকানির। একখানা বই নিয়েই ইন্দু ফিরে আসবে। শত হলেও চিন্ময় তাদের একতলার ভাড়াটে।

আসলে চিন্ময়ের ঔদাসীন্যে ইন্দুর আত্মাভিমান, আর অহংবোধ পীড়িত হচ্ছিল; একতলায় এ পর্যন্ত যত ভাড়াটে এসেছে প্রত্যেকেই ইন্দুর শিষ্টাচার শিষ্টালাপের প্রশংসা করেছে। স্বামীর যত আত্মীয়-কুটুম্ব-স্বজন, বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ইন্দুর, তাদের সকলেই কেউ তার রান্নার, কেউ গৃহিণীপনার, কেউ সেলাইর কাজের, কেউ বা পাঠানুরাগের প্রশংসা করেছে। যারা তা করে নি তারাও তিলু-মিনুকে ডেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করেছে, নাম ধাম জিজ্ঞাসা করেছে, বলেছে, 'চমৎকার ছেলে-মেয়ে আপনার।'

কেবল তাই নয়, ইন্দু তাদের কবিতা মুখস্থ করতে শিখিয়েছে, গান শিখিয়েছে, মিনু এরই মধ্যে একটু-আধটু নাচতেও পারে। ইন্দুর ছেলেমেয়েদের সেই মিষ্টি কবিতা, আর

গান শুনে সকলে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছে। আর সেই খ্যাতি-প্রশংসা, সেই আদর-যত্ন সব তো ইন্দুর প্রাপ্য। তারা তো ইন্দুরই নিজের হাতে গড়া ঐশ্বর্য। কেবল নিজের রক্ত-মাংসের নয়, তার নিজের শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি-প্রবৃত্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গড়া, তাদের স্বীকৃতিতে ইন্দুর স্বীকৃতি।

কিন্তু কুটুম্বের ছেলে হয়েও চিন্ময় তিলু-মিনুকে পর্যন্ত একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করে নি, 'তোমাদের নাম কি, কোন ক্লাসে পড় ?'

একদিন বুঝি ওরা চিন্ময়ের ঘরে ঢুকেছিল, চিন্ময় বলে দিয়েছে, 'বাইরে যাও, এ-ঘরে গোলমাল কোরো না।'

অথচ অযথা গোলমাল করবার মত ছেলে-মেয়ে ইন্দুর নয়।

তিলু এসে নালিশ করেছিল মার কাছে, 'একটু কেবল গিয়ে দাঁড়িয়েছি মা, কোন জিনিস আমরা ধরিও নি, বলে কিনা এ ঘর থেকে যাও। ভারি তো ঘরওয়ালা হয়েছেন। ঘর তো আমাদের। দয়া করে আমরা ভাড়া দিয়েছি তবে এসে রয়েছে।'

ইন্দু গম্ভীর মুখে বলেছিল, 'ছিঃ ওসব বলে কাজ নেই। তবে তোমরা ও ঘরে আর যেয়ো না।'

তিলু বলেছিল, 'আমি তো যাব না। মিনুকেও তুমি বারণ করে দাও মা।'

বারণ করবার আগেই মিনু দাদার কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছিল, 'আমিও যাব না মা।'

ইন্দু একটু হেসে বলেছিল, 'হাঁ, যতক্ষণ সেধে ডেকে আদর করে না নেবে ততক্ষণ কেউ তোমরা যাবে না।'

তিলু বলেছিল, 'সাধলেও যাব না, বয়ে গেছে আমোদের যেতে।'

তখনকার মত ইন্দুও সেই প্রতিজ্ঞাই করেছিল। কিন্তু আজ দুপুরে তার মনে হল একখানা বইয়ের খোঁজে মিনিট খানেকের জন্য গেলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে না।

খানিক ইতস্তত করেই ইন্দু একটু উঁচু গলায় বলল, 'চিন্ময় বুঝি আজ বেরোও নি ?'

ঘরের ভিতর থেকে চিন্ময়ের গলা শোনা গেল, 'আসুন, দোর খোলাই আছে।'

দোরের একটি পাল্লা ফাঁক করে ইন্দু গিয়ে ঘরে ঢুকল, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'কী করছিলে ?'

একখানা ইংরাজী কাগজের জন্য প্রবন্ধ লিখতে বসেছিল চিন্ময়, ইন্দুলেখা এসে পড়ায় খাতাকলম সরিয়ে রেখে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে বসল। একটু দূরের আর-একটা চেয়ার ইন্দুকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ও কিছু না, বসুন।'

ইন্দু বসল না, দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, 'একখানা বই নিতে এলাম।'

চিন্ময় বলল, 'বই!'

টেবিলে তক্তাপোশে কেবল বইই ছড়ানো! তবু চিন্ময় বেশ একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'কী বই চান বলুন ?'

ইন্দু চেয়ারটায় না বসে, তার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে চিন্ময়ের ঘরের চারিদিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিল। এ ঘর থেকে কিছু বের করতে হলে খুঁজে দেখবার মত অবস্থাই বটে। পুব দিকে একটি তক্তাপোশ। তার উপর বিছানা বইপত্র একসঙ্গে জড়ো করা রয়েছে। আধ-খোলা একটি স্যুটকেশও তার উপর স্থান পেয়েছে। তার ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ঠেসে-রাখা জামাকাপড়। দক্ষিণ দিকে একটি ট্রাঙ্ক। জানালার ধারে ছোট্ট টেবিল। তার একদিকে কতকগুলি বইয়ের ওপর ক্ষৌরী হওয়ার সরঞ্জাম, আয়না-চিরুনি আর একদিকে ভাজ করা শাদা কাগজ, ফাউণ্টেনপেন, কালির দোয়াত, অ্যাশট্রে।

কেবল চারিদিকের দেয়ালগুলি সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন। দিন কয়েক আগে চুনকাম করানো হয়েছে। সেই শাদা ঘর এখনো ধবধব করছে। ক্যালেণ্ডারের পাতা মৃদু বাতাসে সামান্য উড়ছে। তা ছাড়া কোন দেয়ালে আর কিছু নেই। নিজেদের ঘরের ছবি-ঠাসা দেয়াল দেখে দেখে ইন্দুর অভ্যস্ত চোখ দুটি এ ঘরের দেয়ালগুলির এই শুভ্র শূন্যতায় যেন বেশ একটু তৃপ্তি বোধ করল। কিন্তু ঘরটা এমন নোংরা করে রেখেছে কেন চিন্ময়।

প্রশ্নটা অনিচ্ছায় অসাবধানে মুখেও এসে পড়ল ইন্দুর, 'ঘরের এ কী চেহারা করেছ ?'

চিন্ময় চারিদিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে মৃদু হাসল, 'ঠিকই বলেছেন, চেহারাটা ভালো দেখাচ্ছে না।'

ইন্দু বলল, 'আমার তো মনে হয় তোমরা ঘর-দোরের এই চেহারাই ভালো দেখ।'

'ভালো দেখি ?'

ইন্দু একটু শ্লেষের ভঙ্গিতে হাসল, 'তা ছাড়া কি ? ইংরাজীতে একেই বোধ হয় বলে কেয়ারফুল কেয়ারলেস্‌নেস্‌। ইচ্ছা করে ঘর অগোছালো আর নোংরা না করলে তোমাদের যে কাব্য হয় না।'

বলেই ইন্দু হঠাৎ থেমে গেল। চিন্ময়ের ঘরদোরের সমালোচনা করতে সে এখানে আসে নি। একখানা বই চেয়ে নিতে যতটুকু সময় লাগে, যেটুকু কথার দরকার হয়, তার বেশি সময় নিতে কি কথা বলতে ইন্দুর মোটেই ইচ্ছা ছিল না। আলাপ মেলামেশা যে ভালেবাসে না, যে নিজে থেকে যেচে কথা বলতে আসে না, তার স্বভাবের ভালোমন্দের আলোচনাই বা তার সঙ্গে করবার কি প্রয়োজন ? কিন্তু স্বামী আর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে চিন্ময় তেমন ভদ্র ব্যবহার করে নি শুনে ভিতরে ভিতরে ইন্দুর মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। চিন্ময়ের অপরিচ্ছন্ন অভ্যাসকে এই উপলক্ষ্যে একটু খোঁচা দিতে পেরে তার মনটা একটু প্রসন্নই হল।

চিন্ময় একমুহূর্ত ইন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখল, তারপর বলল, 'না ইন্দুদি, আপনি যা ভেবেছেন তা নয়। বাইরের ভিতরের কোন রকম নোংরা অভ্যাসকেও আমি

কাব্য বলিনে, তাকে কুশ্রীতাই বলি। কিন্তু গাল দিলেই কি স্বভাব বদলায়? জীবন থেকে সব অকাব্য দূর হয়?'

চিন্ময়ের গলার স্বরে বেদনার আভাস ছিল।

ইন্দু অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'তুমি রাগ করলে! আমি কিন্তু সত্যিই গাল দিই নি। ঠাট্টা করেছিলাম। পুরুষ মানুষ এমন একটু অগোছালো-টোছালো ভাবে থাকলে বরং ভালোই দেখায়, যাই বলো। আর আমাদের উনি। সব সময় একেবারে ধোপ-দুরস্ত ফিটফাট বাবু সেজে থাকতে চান। কেবল কি নিজে। ঘরদোরও সাজানো-গুছানো চাই। একটি সুঁচও এদিক ওদিক হবার জো নেই। বাড়ি তো নয় যেন অফিস-বাড়ি। সব সময় অত আটসাঁট ভাব ভালো লাগে না বাপু।'

চিন্ময় একটু হাসলো, 'আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে পতিনিন্দা করে বসলেন যে ইন্দুদি। নাকি, এ নিন্দা নয়, বন্দনাই। অন্নপূর্ণার ব্যাজস্তুতি।'

ইন্দু হেসে বলল, 'আহা, জায়গাটুকু কিন্তু ভারতচন্দ্র বড় চমৎকার লিখেছিলেন, না?'

'কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।

ভারি সুন্দর সুরেলা গলা ইন্দুর। বলবার ভঙ্গিতে তার কাব্যপ্রীতিরও পরিচয় মিলল।

চিন্ময় বলল, 'আপনি তো বেশ সুন্দর আবৃত্তি করেন।'

ইন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'তুমিও যেমন। সুন্দর না ছাই। জীবনে ভালো করে লেখাপড়াই শিখতে পারলাম না।'

ইন্দুর স্মিত মুখে ম্লান ছায়া পড়ল।

চিন্ময় বলল, 'শিখলেন না কেন, এখনো তো শিখতে পারেন।'

ইন্দু বলল, 'তবেই হয়েছে। এই বয়সে কার কাছে পড়া শিখতে যাব? তোমার কাছে? যা ধৈর্য তোমার, আর যা মানুষ-জন পছন্দ কর তুমি! একবারের বেশি দু-বার এলেই বলবে আমার কাজ আছে, বেরোন ঘর থেকে। কি বল, তাই না?'

চিন্ময় বলল, 'সবাইকেই কি সেই কথা বলি?'

ইন্দু হেসে বলল, 'ও সবাইকে নয়, মানুষ বেছে বেছে বল বুঝি? আচ্ছা জানা রইল' বলে ইন্দু দোরের দিকে এগিয়ে চলল।

চিন্ময় বলল, 'বই নিলেন না?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ইন্দু বলল, 'দিলে কই যে নেব? কলে জল এসে গেছে। এখন আর দাঁড়াবার সময় নেই, বই আমার জন্যে খুঁজে রেখ। পরে এসে নেব।'

চিন্ময় বলল, 'আচ্ছা।'

বই আদান-প্রদানের সূত্রে আলাপটা ক্রমে জমে উঠল। অবশ্য আলাপ করবার

সময় ইন্দুর কম। সকালের রান্না-খাওয়া শেষ করতে করতে দুপুর গড়িয়ে যায়। দুপুর বেলায় দুরন্ত মেয়েকে ঘুম পাড়াতে নিয়ে নিজেও গড়িয়ে নেয় একটু। নইলে শরীরের ক্লান্তি যেন যেতে চায় না। তারপরেও খুঁটিনাটি কাজের অভাব নেই। অনুপম আর ছেলে-মেয়েদের আটপৌরে শার্ট, পাঞ্জাবি, প্যাণ্ট, ফ্রক ইন্দু নিজের মেশিনেই করে। তাছাড়া পাড়া-পড়শীর দু-একটা ফরমায়েশও মাঝে মাঝে সরবরাহ করতে হয়, সংখ্যায় কম হলেও নিজের সায়া শেমিজ ব্লাউজও লাগে কিছু। তার ফলে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই মেশিনটা চালু রাখতে হয়। এ সব কাজ করে সাধারণত দুপুর বেলায়। কেবল দিনদুপুরে নয়, রাত দুপুরেও। বিকাল বেলায় কলে জল আসার সঙ্গে সঙ্গে বৈকালিক পর্ব শুরু করতে হয়। ঠিকে ঝি বাসন্তী অবশ্য বাসন মাজে, জল তোলে, কয়লা ভাঙে। তবু ইন্দুর থাকতে হয় সঙ্গে সঙ্গে। ইন্দুর হাত কম তাড়াতাড়ি চলে না। কিন্তু দিনের পর দিন কাজও যেন পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলে।

তবু এরই ফাঁকে দুপুরের পরে প্রায় রোজেই কিছুক্ষণের জন্য আলাপ আলোচনার সময় হয়ে উঠতে লাগল। বহুদিন ধরে স্বামী আর ছেলে-মেয়ের খাওয়া-পরা, শোওয়া-ঘুমানোর স্বাচ্ছন্দ্যদান ছাড়া ইন্দুর আর কোন কাজ নেই, চিন্তা নেই। অনুপমের সঙ্গে যে সব আলাপ-আলোচনা হয় ঘুরে ঘুরে তাও ঐসব বিষয়ের এলাকায় এসে পড়ে। তিলু আর মিনু বেশি মিষ্টি খায়। অনুপম নিজেও বড় কম খায় না। তবু চিনি ফুরোবার দিন যে দাম্পত্যালাপ শুরু হয় তার মধ্যে শর্করার ভাগ খুব বেশি থাকে না।

কিন্তু হঠাৎ একতলার ঘরে চিন্ময়ের মধ্যে এমন একটি লোকের সাক্ষাৎ পেল ইন্দু যার সঙ্গে চাল ডাল তেল কয়লার আলোচনা করবার জো নেই। ওসব স্থূল বস্তুতে চিন্ময়ের ভারি অনাসক্তি। কিন্তু তাই বলে ইন্দুর যে তেমন আক্ষেপ দেখা গেল তা নয়, বরং মুখ বদলাতে পেরে মনে মনে সে খুশীই হল আর সেই খুশীর আভাসটা মুখেও একেবারে অপ্রকাশিত রইল না।

চিন্ময়ের দোষের অভাব নেই, ইন্দু সে কথা মনে মনে স্বীকার করল। চিন্ময় অসামাজিক, কারো সুখ-দুঃখ অসুখ-বিসুখের খবর রাখে না। তিলু যে দুদিন জ্বরে ভুগল একবারও তার খোঁজ নেয়নি চিন্ময়। তাছাড়া ভিতরে ভিতরে চিন্ময় অহঙ্কারী, এমন কি নিজের দোষ-ত্রুটি-অক্ষমতাগুলিকেও যেন পঙ্গু সন্তানের মত চিন্ময় গোপনে লালন করে, প্রশ্রয় দেয়। দোষের সীমা নেই চিন্ময়ের। এসব কারণে ইন্দুর মন ওর উপরে ভারি বিমুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু চিন্ময়ের এই ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুর সে কথা যেন মনে থাকে না। চিন্ময়ের কাছে যেন সত্যি ওসব কিছু আশা করবার নেই।

অবশ্য চিন্ময়ের মতামত, ভাবনা-ধারণার সঙ্গে ইন্দুর যে সব সময় মিল হয় তা

নয়। বরং বেশির ভাগ সময়েই হয় না। কিন্তু তাতে কি। তর্ক করবার জন্যও তো একজন লোকের দরকার।

দু-তিনখানা বাংলা ছোটগল্পের বই জমেছিল ইন্দুর কাছে। চিন্ময়কে বইগুলি সেদিন ইন্দু দুপুর বেলায় ফেরত দিতে এল নিচের ঘরে।

ঘরখানা ঠিক আগের মত অগোছালো নেই। টেবিলে র‍্যাকে বইগুলি মোটামুটি গুছানো। বাক্স-তোরঙ্গগুলি তক্তাপোশের তলায় স্থান পেয়েছে। ওপরে ধবধব করছে ফর্সা চাদর। ইন্দু অবশ্য তক্তাপোশের দিকে গেল না, চেয়ারটা টেনে তাতে বসে পড়ে বলল, 'বাঃ ঘরদোরের চেহারা এরই মধ্যে বেশ ফিরেছে দেখছি।'

চিন্ময় বলল, 'ও, কেবল ঘরদোরের চেহারার দিকেই লক্ষ্য বুঝি আপনার?'

ইন্দু বলল, 'তা ছাড়া কি। ঘর-সংসারের চাইতে আর কি বড় জিনিস আছে আমাদের?' কথাটায় কেমন একটু যেন শ্লেষ আর বিষাদের সুর এসে লাগল। যেন বৃহত্তর কিছু থাকলেই ভালো হত।

চিন্ময় প্রসঙ্গান্তরে যেতে চেষ্টা করে বলল, 'যাকৃগে। গল্পের বইগুলি কেমন লাগল বলুন।'

ইন্দু বলল, 'লাগল এক রকম। ভালো উপন্যাস-টাস যদি কিছু থাকে এবার তাই একখানা দাও।'

চিন্ময় হেসে বলল, 'মানে অনেকগুলি গল্প নয়, তিন-চারশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটা প্রকাণ্ড গল্প। ছোট গল্পের তুলনায় যে কোন প্রকাণ্ড গল্পই বোধ হয় আপনার বেশি ভাল লাগে।'

ইন্দু খোঁচাটা হজম করে স্বাভাবিক ভাবে বলল, 'হ্যাঁ, ছোট ছোট গল্পের চাইতে উপন্যাসই বেশি ভালো লাগে আমার। তা অস্বীকার করব কেন।'

চিন্ময় বলল, 'এ স্বীকৃতি অবশ্য পাঠিকাসুলভ, পাঠিকামাত্রেই লম্বা গল্পের ভক্ত।'

ইন্দু বলল, 'কেবল পাঠিকা কেন, সেদিন তো বলছিলে সাধারণ পাঠকেও গল্পের চাইতে উপন্যাস বেশি পছন্দ করে, বিক্রিও উপন্যাসই বেশি হয়।'

চিন্ময় বলল, 'ওই একই কথা। রুচি-প্রবৃত্তির দিক থেকে প্রকৃতি আর প্রাকৃতজনে কোন ভেদ নেই। আচ্ছা বলুন তো, ছোট গল্প কেন খারাপ লাগে আপনাদের?'

ইন্দু হেসে বলল, 'তুমি গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চাইছ। ছোটগল্প মাত্রেই যে খারাপ লাগে তা তো বলিনে। কেবল বলতে চাই ছোট বড়র চাইতে সব সময়েই ছোট।'

চিন্ময় বলল, 'কিন্তু আমি যদি বলি ব্যাপার আলাদা। আপনি যাকে ছোট বলছেন তা ছোট নয়, সূক্ষ্ম। তা বুঝতে হলে—'

ইন্দু হেসে বলল, 'সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। তাও না হয় মানলুম। সূক্ষ্ম গল্পের প্যাঁচ বুঝতে হলে ছুঁচলো বুদ্ধি চাই। কিন্তু ছোটই বল আর সূক্ষ্মই বল বড় গল্পে

আমাদের ঘর-সংসার আর তোমাদের সমাজ সংসারের যত কথা ধরে, ছোট গল্পে কি তা ধরে ?'

চিন্ময় বলল, 'ছোট গল্প তো আর একটি নয়। হাজার পাখি হাজার হাজার ফুল। একেক ফুলের একেক রকম গন্ধ, একেক পাখির একেক রকমের ডাক। সব নিয়ে বন, সব নিয়ে জীবন।'

চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে ইন্দু মুহূর্তকাল চুপ করে রইল। কি করে অত সুন্দর করে আর অত আবেগ দিয়ে কথা বলতে পারে চিন্ময় ? তার কথা শুনে মনে হয় যেন সত্যিই এক ঝাঁক নানা রঙের পাখি ছোট ঘরের মধ্যে উড়ে এসেছে। কেমন যেন গাটা শিরশির করে উঠল ইন্দুলেখার। খানিক বাদে একটু ভেবে নিয়ে ইন্দু বলল, 'তোমার মত অত গুছিয়ে বলি এমন সাধ্য নেই, কিন্তু তোমার কথাই না হয় ধরলুম, তাতেই বা কি। গুণতিতে হলই বা ফুল আর পাখি হাজার হাজার, লাখ লাখ, তবু প্রকৃতিতে পাখি তো পাখিই, ফুল তো আর ফুল ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু প্রকাণ্ড একটা বন কি কেবল ফুল আর পাখিতেই ভরে ?'

চিন্ময় একটুকাল চুপ করে চেয়ে রইল ইন্দুর দিকে, তারপর বলল, 'ভরে কিনা জানিনে, কিন্তু এবার আপনিও ভারি সুন্দর কথা বলছেন।'

প্রশংসাটা কেবল মুখের কথা নয়, চোখের দৃষ্টিতেও যেন ফুটে উঠতে চাইল চিন্ময়ের।

ইন্দুর সারা মুখে মুহূর্তের জন্য লজ্জার আভা ছড়িয়ে পড়ল। চোখটা একটু নামিয়ে নিয়ে বলল, 'সুন্দর না ছাই।' তারপর ইচ্ছা করেই হঠাৎ স্বামীর প্রসঙ্গে এনে বলল, 'তোমাদের ডেফিনিশনে তোমার অনুপমদাও বোধ হয় প্রাকৃতজন। কিন্তু একটা দিক থেকে তোমার সঙ্গে তার মিল আছে। তিনিও বড় উপন্যাস পছন্দ করেন না।'

কৌতুক আর কৌতূহলে মেশানো স্বরে চিন্ময় বলল, 'তাই নাকি ? কেন ?'

ইন্দু মুখ টিপে হাসল, 'আমার শেষ করতে দেরি হয় বলে।'

চিন্ময় হাসল, 'ও তাই বলুন।'

ইন্দু বলল, 'কেবল তাই নয়, বড় উপন্যাসকে কি করে ছোট গল্পের মত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় সে সম্বন্ধেও তিনি মাঝে মাঝে আমাকে উপদেশ দেন।'

চিন্ময় বলল, 'তাই নাকি ! উপদেশটা বলুন তো। হয়তো আমারও কাজে লাগবে।'

স্বামীর কথা মনে পড়ায় ইন্দু একটু সস্নেহ কৌতুক বোধ করল, স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি তার পাতলা রক্তাভ ঠোঁটেও ফুটে উঠল একটু।

ইন্দু বলল, 'উপদেশ হচ্ছে এই—বই আগাগোড়া পড়বার দরকার কি ? গোড়ার খানিকটা পড় আর শেষের খানিকটা—তাহলেই তো ব্যাপারটা সব বোঝা যাবে।'

চিন্ময় কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলল, 'কৌশলটা বোধ হয় তিনি সাময়িক পত্রের সমালোচক-দের কাছ থেকে শিখেছেন।'

ইন্দু বলল, 'উঁহু, কোন সমালোচকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব আছে বলে তো জানিনে। কৌশলটা তাঁর নিজেরই বের করা। নিজেই অনেকদিন গল্প করেছেন। কলেজে যখন পড়তেন তখন কোন এক প্রফেসার নাকি বাইরের বই পড়বার জন্য খুব চাপ দিয়েছিলেন। ক্লাসের মধ্যে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, অমুক বই পড়েছ? তমুক বই পড়েছ?'

চিন্ময় বলল, 'তারপর?'

ইন্দু মুখ মুচকে হাসল, 'তারপর আর কি। উনিও বই পড়া শুরু করলেন। সপ্তাহে তিনখানা চারখানা, লাইব্রেরিয়ান অবাক, ছেলেরা অবাক, প্রফেস্যার অবাক। একদিন সেই প্রফেসার মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি, তুমি এমন বইয়ের ভক্ত হলে কবে থেকে? তোমার অনুপমদা ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিলেন, কেন স্যার, স্পোর্টস-এর ছেলেদের কি বই পড়তে নেই? তারা কি চাঁদা দেয় না লাইব্রেরি ফাণ্ডে? প্রফেসার আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না।

চিন্ময় হাসতে লাগল। একটু বাদে বলল, 'অনুপমদা কিন্তু আপনার বিদ্যানুরাগের খুব প্রশংসা করেন।'

ইন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'সেদিনের কথা বলছ বুঝি তুমি?'

সেদিন ছিল অনুপমের ছুটির দিন। আসবার সময়ে ইন্দু স্বামীকে নিজেই সঙ্গে করে ডেকে এনেছিল, 'দেখবে চল তোমার একতলার গৃহবাসী ভাড়াটেকে, মেজেঘষে কি রকম দেতলার সামাজিক মানুষ করে তুলেছি।'

অনুপম বলেছিল, 'তাই নাকি? তোমার কীর্তিটা তো দেখতেই হয় তাহলে।'

বিকেলের দিকে চিন্ময়ের ঘরেই সে দিন চায়ের আসর বসেছিল। হৈমবতী চা খান না। খাওয়াতেও তেমন ভালোবাসেন না। মিষ্টান্ন রেঁধেছিলেন কুটুম্বের জন্য।

টেবিল র‍্যাকে চিন্ময়ের বইপত্র দেখে অনুপম সেদিন বলেছিল, 'যা হোক, তোমাদের মিলেছে ভালো। তুমিও যেমন বইয়ের ভক্ত, তোমার ইন্দুদিও তেমনি।'

চিন্ময় বলেছিল, 'ইন্দুদি বুঝি খুব পড়তে ভালবাসেন?'

অনুপম বলেছিল, 'ভালোবাসেন মানে, যদি বইয়ের মধ্যে পোকা হয়ে ঢুকে থাকতে পারত তাহলে ওর আরো স্থবিধে হত।'

চিন্ময় নিঃশব্দে হেসেছিল।

অনুপম বলেছিল, 'বাংলা ভাষায় এমন কোন বই নেই যা ও না পড়েছে। ধারে কাছে যত লাইব্রেরি আছে সব শেষ করে তবে শান্তি।'

স্বামীর অতিশয়োক্তিতে ইন্দু লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'কি যে বল, সব বই কেউ পড়তে

পারে! আর আজকাল কত বই যে এনে দাও তুমি, বই পড়বার কত সময় যেন আজকাল আমার হয়।'

অভিযোগের সুরটা অনুপমের ভালো লাগে নি, তবু চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে হেসেই বলেছিল, 'আপশোষটা শোন একবার। যদি হাতের কাছে বই থাকত আর সংসারের কাজকর্ম না থাকত তাহলে পৃথিবীতে যত বই বেরিয়েছে তার একটা হিসাব-নিকাশ না করে তোমার ইন্দুদি কিছুতেই ছাড়ত না। বেশ, এখন আর কি এখন তো সুবিধাই হল। একদিক থেকে তুমি বই জোগাও আর একদিক থেকে আমি সময় জোগাই। রান্না-বান্নাটা না হয় আমি নিজেই সারব।'

চিন্ময় ইন্দুর দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে হেসেছিল, 'আপনি যদি আমার সঙ্গে প্যাক্ট করেন অনুপমদা তাহলে অত কষ্ট আপনাকে করতে হবে না।'

অনুপম বলেছিল, 'মানে তুমি রেঁধে দেবে?'

চিন্ময়ের মুখটা একটু আরক্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পর মুহূর্তে সামলে নিয়ে বলেছিল, 'তা নয়, ইন্দুদিকে আর বই দেব না। কেবল আমি নয়, কারো কাছ থেকেই যাতে উনি আর বই না পান লাঠি হাতে তার পাহারা দেব।'

অনুপম এবার খুশী হয়ে হেসে উঠেছিল, 'না না অতটা নয়। কিছু কিছু বই দিয়ো। সত্যি এমন বইয়ের ভক্ত আর দুটি নেই। আমার আরো জন দুই বন্ধুর বউয়েরও বই পড়বার অভ্যাস আছে। কিন্তু পাল্লায় এর সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারবে না।'

অনুপমের কথার ভঙ্গিতে গর্বের সুরটা বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

চিন্ময় সেই কথার উল্লেখ করে বলল, 'সেদিন দেখলেন তো, বিদুষী স্ত্রীর জন্য অনুপমদা কেমন বুক ফুলিয়ে গর্ব করে গেলেন?'

ইন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'ওঁর ওই স্বভাব। বাইরের লোকের কাছে যখন তখন আমাকে এমন অপ্রস্তুত করেন যে, বলবার নয়।'

'বাইরের লোক' কথাটা চিন্ময়ের কানে ভালো লাগল না। পালটা খোঁচা দেওয়ার চেষ্টায় একটু শ্লেষের সুরে বলল, 'সারা গায়ে গয়না পরে আপনারা সেজেগুজে বেরোবেন আর গাঁটের টাকা খরচ করে আমরা একটু অহঙ্কারও করতে পারব না?'

ইন্দু বলল, 'তা আর পারবে না কেন? আমাদের অলঙ্কার তো তোমাদের অহংকারের জন্যেই। গাঁটের টাকা কি সাধে খরচ করো তোমরা?'

ইন্দুর দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে চিন্ময় বলল, 'কিন্তু টাকা খরচ করেও অনুপমদা যে প্রাণ ভরে অহংকার করবেন তার আপনি জো রাখেন নি। বিদ্যা ছাড়া কোন ভূষণই বোধ হয় আপনার পছন্দ নয়।'

ইন্দুর অলঙ্কারের বিরলতা লক্ষ্য করেই কথাগুলি বলল চিন্ময়। সাজ-সজ্জায় ইন্দু একটু বেশি রকম আটপৌরে। সাধারণ একখানা চওড়া খয়েরী-পেড়ে সাদা খোলের শাড়ি ইন্দুর পরনে। হাতে শাঁখের সঙ্গে দুগাছা করে চুড়ি। গলায় সরু একটু হার

চিকচিক করেছে। আর কানে লাল-পাথর বসানো ফুল। কেবল ঘরেই নয়, বাইরে বেরুবার সময়ও ইন্দুর বেশ বাশের বিশেষ পরিবর্তন হয় না—তাও চিন্ময় লক্ষ্য করেছে। সেদিন কোন এক আত্মীয়-বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়ার সময় দুজনের দাম্পত্যালাপ সামান্য একটু কানে এসেছিল চিন্ময়ের।

অনুপমের বিরক্ত ক্রুদ্ধ স্বর শোনা যাচ্ছিল। 'যদি গয়না নাই পরো, ওগুলি বাক্সবন্দী করে রেখেছ কেন? মরবার সময়ে কি সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

সিঁড়ি থেকে ইন্দুর হাস্যমধুর গলা ভেসে এসেছিল, 'না, সে ভয় কোরো না। ওগুলি তোমার নতুন বউয়ের জন্য তোলা থাকবে।'

ইন্দু বুঝতে পারল সে দিনের কথাগুলি চিন্ময় শুনেছে। চিন্ময়ের কথার জবাবে কৃত্রিম কোপে বলল, 'তোমার স্বভাব তো ভালো নয়, মেয়েদের মত আড়ি পাততে শিখেছ।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ওঁর বাড়াবাড়ি আর জীবনে যাবে না। শাড়ির চড়া রং আর গায়ের ভারি গয়না আমি মোটেই ভালোবাসিনে। কিন্তু আমি ভালো না বাসলে কি হবে—আচ্ছা তুমিই বল, এই বয়সে কি ওসব আমাকে মানায়?'

চিন্ময় বলল, 'বয়সের কথা তুলবেন না। আমার তো মনে হয় যে-কোন বয়সেই এই বেশ আপনাকে সবচেয়ে ভালো মানাতো।'

ইন্দু কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হল, কিন্তু মনে মনে খুশীও কম হল না, তার রুচির সঙ্গে এই ছেলেটির ভারি মিল আছে। একটু বাদে ইন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'তোমার যেমন কথা। অন্য বয়সে তুমি আমাকে দেখছ নাকি? অবশ্য কোন দিনই সাজ-সজ্জার পরিপাট্য আমি তেমন পছন্দ করতুম না।' র‍্যাক থেকে মোটা একখানা উপন্যাস ইন্দু নিজেই হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে উটে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার যাই। গল্পে গল্পে তোমার কত ক্ষতি করে গেলাম।'

চিন্ময় হেসে বলল, 'কত ক্ষতি যে করলেন তার এখনো হিসেব নিই নি। তবে কিছু করেছেন বলেই মনে হচ্ছে। দাঁড়ান, কিছু ক্ষতিপূরণ করে দিয়ে যাবেন।'

বই হাতে ইন্দু ফিরে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে বলল, 'ক্ষতিপূরণটা কি ভাবে হবে শুনি?'

চিন্ময় বলল, 'ষ্টোভ আছে, তক্তাপোশের তলায় চা-চিনিও আছে কেবল দুধ আনতে হবে মার ঘর থেকে। আর হাত থাকতেও আমার হাত নেই।'

ইন্দু বলল, 'কেন হাতের কি হল?'

চিন্ময় একটু হাসল, 'কি জানি কি হয়েছে। এ হাতে কিছুতেই চা হয় না। তবু একবার চেষ্টা করে দেখেছি। ভাবছি আর-একবার—'

ইন্দু হেসে বলল, 'দরকার নেই আর-একবারে। মাসিমা সেদিন বলছিলেন কবে

নাকি তুমি একবার স্টোভ জ্বালতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছিলে। ফের যদি পোড়ে নিশ্চয়ই আমার দোষ দেবেন।'

চা তৈরির আয়োজনে লেগে গেল ইন্দুলেখা। পাশের ঘরে হৈমবতী ঘুমোচ্ছিলেন। স্টোভের শব্দে জেগে উঠে বিরক্তির সুরে বললেন, 'এই ভর-দুপুরে স্টোভ জ্বালাতে বসল কে। চিনু বুঝি?'

ইন্দু সাড়া দিয়ে বলল, 'না মাঐমা, চিনু নয় আমি। ভয় নেই আপনার।'

হৈমবতী ওঘর থেকে বললেন, 'এই অসময়ে আবার বুঝি চায়ের বায়না ধরেছে? চা খেয়ে মিছিমিছি শরীর নষ্ট। ইচ্ছায় কি পেটভরে ভাত খেতে পারে না? বেশি আশকারা দিয়ো না ইন্দু।'

দোতলার ঘরে মিনুরও দিবানিদ্রা ভেঙে গিয়েছিল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে চিন্ময়ের ঘরের সামনে দাঁড়াল, কী করছ মা? কী হবে?'

ইন্দু হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল মেয়েকে, 'আঃ, তুমি আবার এখানে এলে কেন? যাও, ঘরে যাও শিগগির।'

আকস্মিক ধমকে মিনুর ঠোঁট ফুলে উঠল, 'বেশ যাচ্ছি। আর কিন্তু ডাকলেও আসব না তা বলে দিলাম।'

বলে মিনু একছুটে চলে গেল সেখান থেকে।

চিন্ময় বলল, 'কেন মিছিমিছি ধমক দিলেন। এখানে ডাকলেই হত।'

ধমক দিয়ে ইন্দুও কম অপ্রস্তুত হয় নি। সত্যি মিনু কেবল দোরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। আর তো কোন দুষ্টুমি করে নি। ওকে অমন করে না তাড়ালেও হত। ইন্দু অমনিতেই একটু লজ্জিত আর ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু চিন্ময়ের লোক-দেখানো ভালোমানুষিতে এবার তার রীতিমত রাগ হল, বলল, 'না ডাকাই ভালো হয়েছে। ছেলেমেয়ে তো তুমি ভালবাসো না।'

এমনি সরাসরি আক্রমণে চিন্ময় মুহূর্তকাল হতবাক হয়ে রইল। ইন্দু নিজেও লজ্জিত হল। ছি ছি, আজ তার হয়েছে কি! চিন্ময়কে এমন খোলাখুলিভাবে কেন বলতে গেল কথাটা। চিন্ময় তার ছেলেমেয়েদের না ভালোবাসে তো কি হয়েছে। ছেলে মেয়েদের আদর করবার লোকের অভাব আছে না কি তার?

কাপে চা ঢেলে চিন্ময়ের দিকে এগিয়ে দিল ইন্দু।

চিন্ময় বলল, 'ওকি, আপনি নিলেন না?'

ইন্দু বলল, 'আমার লাগবে না।'

চিন্ময় বলল, 'না না, সে কি হয়, তাহলে আমার কাপও রইল।' চিন্ময়ের জবর-দস্তিতে বিরক্ত হয়ে ইন্দু নিজের কাপেও খানিকটা চা ঢেলে নিল।

চিন্ময় চায়ে একটু চুমুক দিয়ে বলল, 'কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন।'

ইন্দু গম্ভীরভাবে বলল, 'কিছু মনে তুমি কোরো না। আমার মন ঠিক ছিল না।'

চিন্ময় একটু হাসল, 'অনেক সময় বেঠিক মন থেকেই ঠিক কথা বেরোয়। সত্যিই ছেলেমেয়েদের আমি ভালোবাসতে পারিনে। পরিণত বয়সের পরিণত মনের মানুষ ছাড়া আমি মিশতে পারিনে কারো সঙ্গে।'

তর্কের অবকাশে ইন্দু এবার সোজা হয়ে বসল, নিজেও চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নিল একটু, তারপর বলল, 'তুমি এমন করে বলছ যেন ছেলেমেয়েদের না ভালোবাসতে পারাটা অহংকারের কথা। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা নয়। বয়স যতটা হয়েছে তার তুলনায় তোমার নিজের মনও কম অপরিণত নয়।'

চিন্ময় বিস্মিত হয়ে বলল, 'অপরিণত?'

ইন্দু বলল, 'তা ছাড়া কি। ছেলেদের যারা ভালোবাসতে পারে না তারা নিজেরাই ছেলেমানুষ। বড়দের কাছে ছেলেরা চিরকাল স্নেহ পায় আদর-যত্ন পায়। আর বয়সে বড় হয়েও ভিতরে যারা ছোট থেকে যায় তারাই ছোট ছেলেদের হিংসে করে।' বেশ একটু ঝাঁজ ফুটে উঠল ইন্দুর কথায়। চায়ের কাপ রেখে সে এবার উঠে দাঁড়াল। চিন্ময়কে আঘাত দিতে পেরে এতক্ষণে মন তার প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। এতদিন ছেলেমেয়েদের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পেরেছে ইন্দু।

নিজের ঘরে এসে মেয়েকে ইন্দু জোর করে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'কুলের আচার রেখেছি তোর জন্য, খাবি?'

কলেজ মধ্য-কলকাতায়। চিন্ময়ের অধ্যাপনার সময় অবশ্য মধ্যাহ্নে নয়, সায়াহ্নের কমার্স বিভাগে। প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের বাংলা-সাহিত্যে অবহিত করে তুলবার ভার তার ওপর। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে পুরো তিনটি বছর বেকার কিংবা টিউশনি-সম্বল হয়ে থাকবার পর বহু কষ্টে আশিস্ সুপারিশ নিয়ে ঘোরাঘুরি করবার পর চিন্ময় এই মাস্টারিটি সংগ্রহ করতে পেরেছে। অবশ্য এর আগে মফঃস্বল শহরের কলেজগুলিতে চাকরির সম্ভাবনা মাঝে মাঝে যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু যাই যাই করেও চিন্ময় মফঃস্বলে যায় নি। মাঝখানে দু-একটি মাসিক সাপ্তাহিকে কাজ করেছে, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখেছে, সস্তা মেসে-হোটেলে অল্পব্যয়ে দিন কাটিয়েছে, তবু চিন্ময় কলকাতা থেকে নড়ে নি।

বন্ধুরা তার এই অবিমৃষ্যকারিতার নিন্দা করেছে, 'বাইরের কোন কলেজ থেকে অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট নিয়ে এলে এতদিন যে এখানে বেশ ভাল চান্স পেয়ে যেতে হে।'

চিন্ময় মাথা নেড়েছে, 'একে মাস্টারি, তারপর মফঃস্বল, একবার স্থায়ী হয়ে বসলে ফের আর নড়বার-চড়বার ইচ্ছা থাকবে না। তার চেয়ে এই পাষাণপুরীর বেকার-জীবন অনেক ভালো। আর কিছু না থাক, এখানকার জীবনে ধার আছে, স্রোত আছে। দিনগুলি এখানে ভারমন্থর নয়।'

সাংবাদিক বন্ধু নীলাম্বর সেন হেসে জবাব দিয়েছিল, 'তার মানে গুটি দুই ট্যুইশনি থাকায় এখনো তোমার বাক্সে কবিতার খাতা আছে। কিন্তু আমি ভেবে পাইনে চিন্ময়, কলকাতার ওপর কেন তোমার এই মোহ। কলকাতা বলতে আমরা যা বুঝি আমরা যা খুঁজি তার কোনটির ওপর তোমার কোন আগ্রহ দেখা যায় না। তোমার খেলবার কি খেলা দেখবার মাঠ নেই, সভাসমিতি নেই, সিনেমা থিয়েটার একজিবিশন, কোন কিছুর বালাই নেই তোমার। ভাল চাকরিবাকরি সংগ্রহ করে ক্যারিয়ার গড়ে তোলবার ঝোঁকও তোমার দেখা যায় না।'

চিন্ময় সায় দিয়ে বলেছিল, 'তা ঠিক।'

নীলাম্বর বলেছিল, 'ঠিক ছাড়া কি, তোমার কলকাতা তো মেসের একটি ঘরের একখানা তক্তাপোশে, আর বড় জোর দু-একখানা বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তা তো যে কোন মফঃস্বল শহরে এমন কি কোন গ্রামে গেলেই পেতে।'

তা অবশ্য পাওয়া যেত। কিন্তু কলকাতা শহরের সস্তা কোন মেস-হোটেলের ঘরে ছারপোকাসঙ্কুল তক্তাপোশে বসে শহরের যে ইসারা-আভাসটুকু মেলে তা তো অন্য কোথাও সম্ভব নয়। এখানে আর কিছু না থাক অজস্র সম্ভাবনা রয়েছে। যে কোন দিন যে কোন মুহূর্তে যে কোন কিছু ঘটতে পারে। কোন বই পড়তে, কোন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে, শহরের অখ্যাত গলির অখ্যাততম এক চায়ের দোকানে হাতল ভাঙা কাপে চা খেতে খেতে, হঠাৎ অদ্ভুৎ ভালো লেগে যেতে পারে, আর সেই ভালো লাগার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে সমস্ত শহর আর পৃথিবী। সাংবাদিক নীলাম্বর কেবল সংবাদ চায়, হৈ চৈ চায়, ঘটনা ঘটাতে চায়, চিন্ময়ের ওসব কিছুতে দরকার নেই। নীলাম্বরের এই চাওয়া দেখে দেখেই তার অনেক সময় কাটে, বাকি সময়টুকু নিজের দিকে চেয়ে দেখতে মন্দ লাগে না।

কলেজের চাকরি নিয়েও চিন্ময়ের অভ্যাস ফেরে নি। ছাত্রদের সঙ্গে তার আলাপ কম, সহকর্মী অধ্যাপকদের দু-চারজন ছাড়া কারো সঙ্গে তার পরিচয় নেই।

বিকালের দিকে কলেজ যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিল চিন্ময়। আলনা থেকে ফর্সা ধুতি-পাঞ্জাবি পেড়ে নিচ্ছিল, হৈমবতী এসে ঘরে ঢুকলেন।

'বেরোচ্ছ বুঝি চিনু?'

'হ্যাঁ মা।'

হৈমবতী বললেন, 'আজ এত সকাল সকাল যে? একটু দাঁড়া, উনুন ধরিয়ে চা আর খাবার করে দিই।'

চিন্ময় বলল, 'দরকার নেই মা। এই তো খানিক আগে চা খেলাম।'

হৈমবতী একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। দুপুরের পরে এসে ইন্দু স্টোভ ধরিয়েছিল কথাটা তাঁর আর-একবার মনে পড়ল। স্টোভের শব্দ থামবার পর অনেকক্ষণ ধরে

এদের কথাবার্তার শব্দ কানে গেছে। কেবল আজই নয়, কদিন ধরেই চলেছে এদের আলাপ-আলোচনা।

একটু চুপ করে থেকে হৈমবতী বললেন, 'কেবল চায়ে তো আর পেট ভরে না। খাবারটাবার কিছু খেয়ে যা!'

'কিন্তু খিদে যে নেই মা', চিন্ময় মৃদু হেসে আপত্তি করল।

হৈমবতী বললেন, 'এখন নেই, পরে খিদে পাবে। বেশ, খাবার করে দিচ্ছি, সঙ্গে নিয়ে যাও।'

চিন্ময় বলল, 'না মা, কৌটোয় করে খাবার বয়ে নেওয়া আমার দ্বারা হবে না।'

হৈমবতী রুক্ষস্বরে বললেন, 'তা হবে কেন। বাইরের যত বাজে জিনিস খেয়ে শরীর আর পয়সা নষ্ট করবি।'

মায়ের এই তিরস্কারের কোন জবাব না দিয়ে চিন্ময় স্মিতমুখে বেরুতে উদ্যত হল।

কিন্তু হৈমবতী ফের বাধা দিলেন, 'আর শোন। আমার কথা তোর গ্রাহ্যই হয় না, না?'

চিন্ময় থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী কথা মা?'

হৈমবতী বললেন, 'কদিন ধরে আবার সেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। রাত্রে দুচোখের পাতা এক করতে পারিনে। সারা রাত কেবল এপাশ আর ওপাশ। কি ভাবে যে কাটাই তা আমিই জানি।'

চিন্ময় একটু লজ্জিত বোধ করল। সত্যিই মার অসুস্থতা সে খেয়াল করে নি। অথচ সমান্য একটু মাথা ধরলে হৈমবতী কত উদ্বিগ্ন, কত ব্যস্ত হয়ে উঠেন।

চিন্ময় কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলল, 'ফেরার পথে, আজই ওষুধ নিয়ে আসব মা। কল দিয়ে আসব ডাক্তারকে।'

হৈমবতী প্রসন্ন হলেন না, বরং আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দরকার নেই আমার ডাক্তার-টাক্তারের, ডাক্তার এসে কী করবে শুনি।'

চিন্ময় বলল, 'ডাক্তাররা যা করে তাই করবে। ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে যাবে।'

হৈমবতী আরও যেন উত্ত্যক্ত হলেন, 'আহাহা, কেবল ওষুধ-পথ্যেই রোগ সারে! বিশ্রাম চাই না, সেবা-শুশ্রূষা চাই না, না? আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি কিন্তু, আমি নিজে কিছুতেই আর তোমার সংসারে হেঁসেল ঠেলতে পারব না। তুমি অন্য ব্যবস্থা যা করবার কর।'

হৈমবতীর বক্তব্যটা এবার আর আন্দাজ করা শক্ত নয়। তবু চিন্ময় শান্তভাবে বলল, 'তাই করব মা, এবার একটা বয়-টয় গোছের রেখে নেব। রান্নাবান্না, বাজার তাকে দিয়ে সবই চলবে, কলেজের বেয়ারা তারাপদর সঙ্গে কথা একরকম বলেও রেখেছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে তোমাকে নিয়ে, তোমার জাতবিচারটা তো এখনো যায় নি। যার-তার হাতে তো আর খেতে পারবে না তুমি!'

হৈমবতী বললেন, 'তাও পারব, কিন্তু ও সব বয়-টয়ের হাতে না। একটি মেয়ে তুই আমাকে এনে দে—হিন্দু হোক, খ্রীষ্টান হোক, মেথর হোক, মুদ্দফরাস হোক আমার কিছুতে আপত্তি নেই। সকলের হাতেই খাব আমি। কিন্তু আর তুই দেরি করিসনে চিনু, আর দেরি করলে তোর বউ দেখে যাওয়া আমার কপালে আর হবে না। একদিন না একদিন সেই বিয়ে করবি, ছেলেপুলে ঘরসংসার সবই হবে, শুধু আমার ভাগ্যে—'

চিন্ময় ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা মা এবার যাই, সময় হয়ে গেল, রাত্রে ফিরে এসে তোমার ভাগ্যের কথা পরে আবার শুনব।'

হৈমবতী রাগ করে বললেন, 'কেবল পরে আর পরে! দু তিন বছর ধরে এই তো করছিস। বিয়ে করবি কি আর বুড়ো হয়ে গেলে?'

একথার কোন জবাব না দিয়ে মার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল চিন্ময়। তারপর হাত তুলে চিৎপুরের একটা বাস থামিয়ে তাতে উঠে পড়ল।

বুড়ো মাও আজ তার বয়োবৃদ্ধির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। আর খানিকক্ষণ আগে ইন্দুদি বলছিলেন ছেলেমানুষ। কিন্তু এর আগে চিন্ময়কে কেউ কোনদিন ছেলেমানুষ বলে নি। বরং ছেলেবেলা থেকে উলটোটাই সে এতদিন শুনে এসেছে। তার স্বভাবমন্থরতা, শান্ত গাম্ভীর্য দেখে আত্মীয়স্বজনেরা বলাবলি করেছে, 'চিনুর কথা বোলো না, ছেলেটা জন্মবুড়ো। ধরনধারন চালচলন সব বুড়ো মানুষের, কেবল চুলের রঙটাই যা কাঁচা।

গোটা তিনেক ক্লাস সেরে কলেজ থেকে বেরুতে বেরুতে রাত হল সাড়ে আটটা। ন-টার পরে ব্যোমকেশবাবু ডিসপেন্সারিতে আর থাকেন না। চিন্ময় তাঁকে ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রাম ধরল।'

ডাঃ ব্যোমকেশ চৌধুরীর ডিসপেন্সারি শ্যামবাজার স্ট্রিটে। এ অঞ্চলের নাম-করা প্রবীণ ডাক্তার ব্যোমেশবাবু। এম-এ পরীক্ষার মাস কয়েক আগে চিন্ময়ের সঙ্গে তার পরিচয়। মেসের ঘরে জ্বরে ভুগছিল কদিন ধরে। রুমমেট ব্যোকেশবাবুকে ডেকে এনে চিকিৎসার ভার দিলেন।

চিন্ময় উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'পরীক্ষাটা দিতে পারব তো?'

ব্যোমকেশবাবু হেসে বলেছিলেন, 'আগে সুস্থ হয়ে নিন, তারপর পরীক্ষা।' তারপর হেসে বলেছিলেন, 'পারবেন বই কি, নিশ্চয়ই পারবেন।'

সেই থেকে পরিচয়ের ধারাটা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ আছে। এই যাতায়াতে আর যোগাযোগ রাখায় ব্যোমকেশবাবুও ভারি খুশী হতেন, 'সুস্থ হবার পরেও ডাক্তারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে আজকাল এমন রোগী পাওয়া যায় না, আপনি শুধু ব্যতিক্রম।'

ব্যোমকেশবাবুকে দেখে কৈশোরের সেই শ্যামা ঠাকুরদাকে মনে পড়ে চিন্ময়ের।

কিন্তু শ্যামাদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে ব্যোমকেশ ডাক্তারের অনেক প্রভেদ। শ্যামাদাস ছিলেন শুকনো ন্যাড়া খেজুর গাছ, আর ব্যোমকেশ শাখাপ্রশাখাপত্রবহুল অশ্বত্থ। গাড়ি বাড়ি ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীর অরণ্যে বনস্পতি! তবু কোথায় যেন মিল আছে দুজনের মধ্যে। আর সে মিল কেবল পাকা চুলের মিল নয়।

চিন্ময়কে দেখে ডাক্তারবাবু উল্লসিত হয়ে উঠলেন, 'আসুন, আসুন। এই মুহূর্তে আপনার কথাই ভাবছিলাম। অনেক কাল বাঁচবেন।'

চিন্ময় সামনের চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'আপনার ওষুধ আর আশীর্বাদের জোরে তা হয়তো বাঁচব, কিন্তু আপনার কথা শুনে তো টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করতে হয়। যখনই এখানে আসি শুনি একটু আগে আমার কথাই ভাবছিলেন।'

ব্যোমকেশবাবু এ কথার কোন জবাব না দিয়ে একটু হাসলেন। সরু একটা টুলের ওপর জন দুই রোগী তখনো বসে ছিল। তাদের অসুখ সম্বন্ধে কয়েকটা বাঁধা প্রশ্ন করে কম্পাউণ্ডার অমূল্যকে ডেকে মুখে মুখে ওষুধের নাম বলে দিলেন।

তারপর রোগীরা বিদায় নিয়ে গেলে বললেন, 'ওসব বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা রাখুন মশাই। তর্কে তর্কে রাত ভোর হবে, কোন মীমাংসা হবে না। তার চেয়ে বলুন হঠাৎ এমন গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন কেন? অনেকদিন আসেন না এদিকে।'

চিন্ময় বলল, 'এবার আসব। আসতে আসতে প্রায় একেবারে আপনাদের পাড়ার মধ্যে এসে পড়েছি। শেষ পর্যন্ত দুখানা ঘর মিলেছে রাজবল্লব ষ্ট্রীটে।'

ব্যোমকেশবাবু হেসে বললেন, 'তাই বলুন। কিন্তু কেবল তো ঘর মিলেছে তাতেই আপনার পাত্তা পাওয়া যায় না। এর পর ঘরণী মিললে কি আর বাইরে বেরোবেন আপনি?'

চিন্ময়ের সঙ্গে বন্ধুর মতই আলাপ করেন ব্যোমকেশবাবু। যেন চিন্ময়ের তিনি সমবয়সী. বার্ধক্যটা নেহাতই মেক-আপ মাত্র। পাকা চুলটা পরচুলা।

চিন্ময় হেসে বলল, 'আপনার ভয় নাই। ঘরণী মিলবার তেমন কোন সম্ভাবনা দেখছিনে।'

হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল চিন্ময়ের, বলল, 'ভালো কথা, আমাকে কি খুব ছেলেমানুষ বলে মনে হয় আপনার?'

ব্যোমকেশবাবু হাসলেন, 'কেন বলুন তো? এমন একটা বাজে কথা কে বলল আপনাকে?'

চিন্ময় মৃদুকণ্ঠে বলল, 'একজন মহিলা বলেছিলেন।'

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'ও মহিলা, তাই বলুন। এবার বুঝতে পেরেছি।'

চিন্ময় একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী বুঝতে পেরেছেন?'

ব্যোমকেশবাবু হাসলেন, 'কেন, আপনিও কি পারেন নি? মেয়েরা ছেলেদের কখন ছেলেমানুষ বলে জানেন না?'

'না।'

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'যখন ছেলেদের কাছ থেকে তারা যথেষ্ট পরিমাণে পুরুষ-মানুষের মত ব্যবহার চায় অথচ পায় না।'

চিন্ময় একটুকাল আরক্ত আর নির্বাক হয়ে থেকে তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল, 'না না না, তিনি মোটেই ও অর্থে কথাটা বলেন নি। জানেন, ছেলেমানুষ বলে তিনি আমাকে গাল দিয়েছেন। বলেছেন, আমি মেয়েমানুষের মতই আত্মপরায়ণ অনুদার অপরিণত মনের মানুষ।' তারপর একটু হেসে বলল, 'আপনার কি মনে হয় ডাক্তারবাবু? আমি সত্যিই কি তাই?'

ব্যোমকেশবাবু খানিকটা কৌতূহল-মেশানো চোখে চিন্ময়ের মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে কী যেন বুঝে নিতে চাইলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'কেন হঠাৎ গায়ে পড়ে আপনাকে এমন কতকগুলি গালাগালি দিতে গেলেন বলুন তো?'

চিন্ময় বলল, 'কি জানি। তাঁর ছেলেমেয়েদের আমি তেমন ভালোবাসতে পারি নি বলেই বোধহয়।'

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'ও, তাঁর ছেলেমেয়েও আছে? কিন্তু যাঁর ছেলেমেয়ে থাকে তাঁর তো ছেলেমানুষ সম্বন্ধে এমন খারাপ ধারণা থাকবার কথা নয়। গালাগালগুলি আপনার বানিয়ে বলা।'

দেয়ালঘড়িতে ঢং করে একটা শব্দ হল। সাড়ে নটা। ব্যোমকেশবাবু একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন, বললেন 'এবার উঠতে হয়। আপনি এত দেরি করে আসেন যে, সে আসার কোন মানেই হয় না। বেটার লেট্ দ্যান্ নেভার কথাটা সব জায়গায় খাটে না। অন্তত ডাক্তারখানায় তো নয়ই। রোগের গোড়াতেই ডাক্তার ডাকতে হয়।'

এতক্ষণে খেয়াল হল চিন্ময়ের, মার অসুখের কথা ডাক্তারবাবুর কাছে মোটে তোলাই হয় নি। মনে মনে ভারি লজ্জিত হল। ছিঃ, সবচেয়ে আগেই তো তাঁর অসুখের কথাটা বলা উচিত ছিল। তা না করে কেবল বাজে গল্পে সময় কাটিয়েছে।

সেই অনৌচিত্যের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই যেন একটু বেশি ব্যাকুলতার ভঙ্গিতে চিন্ময় বলে উঠল, 'আর-একটু দেরি করতে হবে ডাক্তরবাবু। মার বড় অসুখ।'

ব্যোমকেশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'অসুখ? সে কি! এতক্ষণ সে কথা বলেন নি তো? আপনার মা এসেছেন বুঝি এখানে? কী অসুখ তাঁর?'

চিন্ময় সবিস্তারে তার মার কথা বলল। ব্যোমকেশবাবু শুনে বললেন, 'ও, ক্রনিক হার্ট ডিজিজ, তা ঘাবড়াবার কি আছে। কিছু ভাববেন না। আজ তো ডিসপেন্সারি বন্ধ হয়ে গেল। কাল-পরশু একদিন এসে ওষুধ নিয়ে যাবেন। চলুন।'

ব্যোমকেশবাবুর ঔদাসীন্যে একটু যেন আহত হল চিন্ময়। নিজের মার ওপর নিজের উদাসীনতা সয়, কিন্তু অন্যের ঔদাসীন্য সহ্য হয় না।

ব্যোমকেশবাবুর দিকে তাকিয়ে একটু কঠিন স্বরেই চিন্ময় বলল, 'না ডাক্তারবাবু, পরশু নয়, কাল সকালেই আপনি যাবেন আমাদের ওখানে। গিয়ে দেখেশুনে ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করবেন। অন্য কোথাও যাওয়ার আগে—'

ব্যোমকেশবাবু আর-একবার তাকালেন চিন্ময়ের দিকে, তারপর শান্তভাবে বললেন, 'বেশ তো, সবচেয়ে আগেই আপনার ওখানে যাওয়া যাবে। তাতে কী হয়েছে। ঠিকানাটা দিয়ে যান।'

চিন্ময়ের সঙ্গেই বেরুলেন ব্যোমকেশবাবু। ষাটের উপরে হবে বয়স। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারা। পরনে মিহি ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে। বেশ মানিয়েছে শুভ্র পরিচ্ছদে। গলায় শুধু কালো একটা স্টেথিসস্কোপ ঝোলানো, যেন সত্যিই সর্পভূষণ মহেশ্বরের মূর্তি।

পুব মুখে একটু এগিয়ে ব্যোমকেশবাবু মোড় ঘুরলেন। চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আসুন। কাল দেখা হবে।'

সামনের একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন ব্যোমকেশবাবু। চিন্ময় একটু কাল দাঁড়িয়ে কি দেখল। গলিটা বাড়ির পথ নয় ব্যোমকেশবাবুর। হয়তো কোন রোগীর বাড়ি হবে।

হেঁটে হেঁটে চিন্ময়ও খানিক বাদে নিজের বাসার সামনে এসে পৌছল। রাত ন'টা বাজতে না বাজতেই ভূপতি ভবনের সদর বন্ধ হয়ে যায়। কলেজ থেকে ফিরে আসতে আসতে রোজই চিন্ময়ের একটু রাত হয়। কিন্তু তাই বলে সদর তার জন্য খোলা থাকে না, এদিক থেকে ভারি কড়া বিধিনিষেধ আছে অনুপমের। সন্ধ্যার পরে অন্য কেউ না দিল অনুপম নিজে এসে দোর বন্ধ করে দিয়ে যায়। আর রোজ এসে কড়া নাড়তে হয় চিন্ময়কে। হৈমবতী এসে দোর খুলে দেন।

আজও বার দুই-তিন আস্তে আস্তে কড়া নাড়ল চিন্ময়। একটু বাদে সদরের প্যাসেজে আলো জ্বলে উঠল। শব্দ হল দোর খোলার। হৈমবতী নয়, ইন্দুলেখা। সদরের খিল খুলে দিয়ে একপাশে একটু সরে দাঁড়াল ইন্দু। চিন্ময় একবার না তাকিয়ে পারল না। রাত্রির কি আলাদা রূপ আছে? নইলে চওড়া কালোপেড়ে সাধারণ আটপৌরে একখানা শাড়িতে ইন্দুকে এমন সুন্দর দেখাচ্ছে কেন? মাথায় আধখানা আঁচল। মুখের নিখুঁত ডৌলটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কানের লাল পাথর-বসানো ফুলে বিদ্যুতের দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে। তাতে সমস্ত মুখখানাই যেন এক নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পানের রসে কোমল পাতলা ঠোঁট দুটি আরক্ত। সারাদিনের পরিশ্রম আর রাত্রের খাওয়ার পরে একটু যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে ইন্দুকে। কিন্তু সে ক্লান্তি যেন প্রসাধনের মতই ইন্দুর মুখখানাকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে।

মাথার আঁচলটা আর একটু টেনে দিয়ে ইন্দু বলল, 'চাকরি হল এতক্ষণে?'

চিন্ময় বলল, 'হল। কিন্তু আপনি কেন কষ্ট করে উঠে এলেন।'

ইন্দু মৃদু হাসল, 'আমি কষ্ট করে না এলে তোমাকে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। মাঐমা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

চিন্ময় বলল, 'কেবল মারই তো দোষ নয়। অনুপমদার নাক ডাকার শব্দ আসছে। দোর খুলে দেওয়ার জন্য তাঁরই কিন্তু জেগে থাকা উচিত।'

ইন্দু বলল, 'ভারি দায় পড়েছে। তুমি দেরী করে ফিরবে, আর তোমার জন্য আর একজন বুঝি রাত জেগে বসে থাকবে রোজ? সরো, খিলটা দিয়ে আসি।'

চিন্ময় বলল, 'কিন্তু একজনকে না একজনকে তো শেষ পর্যন্ত জাগতেই হয়। তার চেয়ে দোরটা ভেজিয়ে রাখাই তো ভালো।'

ইন্দু মুখ টিপে হাসল, 'তোমার তো ভারি সর্বনেযে পরামর্শ। রাত দুপুর পর্যন্ত তিনি বাড়ির দোর খোলা রাখুন, আর এদিকে চোর ঢুকে সব চুরি করে নিয়ে যাক, না?'

চোর ঠেকাবার জন্য সদরের ভারি হুড়কোটা সন্তর্পণে এঁটে দিল ইন্দু। আর দেওয়াল ঘেষে চিন্ময় আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকল।

পরদিন বেলা বারটার সময় গলির মুখে ব্যোকেশবাবুর গাড়ি এসে দাঁড়াল। খবর পেয়ে চিন্ময় গিয়ে তাঁকে নিয়ে এল এগিয়ে। ওষুধের ছোট একটা হ্যাণ্ডব্যাগ ব্যোকেশবাবুই বয়ে নিচ্ছিলেন, চিন্ময় তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ওটা আমাকে দিন।'

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'না, না।'

কিন্তু চিন্ময় তাঁর হাত থেকে ব্যাগটাকে ততক্ষণে নিয়ে নিয়েছে।

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'একটু দেরী হয়ে গেল। রোগীরা ডাক্তারদের সময়ানুবর্তী হতে দেয় না, জানেনই তো। খানিক আগে একটা কার্বাঙ্কল কেস এসেছিল, অস্ত্রাঘাত করতে হল।'

ব্যোমকেশবাবু একটু হাসলেন।

চিন্ময় ডাক্তারবাবুকে নিজের ঘরে এনে প্রথমে বসাল। তারপর হৈমবতীকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিল তাঁর সঙ্গে, বলল, 'ডাক্তারবাবু। তোমাকে এঁর কথা অনেক বলেছি মা। আমার বিশেষ বন্ধু।'

হৈমবতী বললেন, 'ছিঃ, বন্ধু বলছ কেন চিনু, বয়সে কত বড়। বল গুরুজন, অভিভাবক।'

চিন্ময় আর ব্যোমকেশবাবু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

চিন্ময় বলল, 'গুরুজন অভিভাবকেরা কি বন্ধু নয় মা?'

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'আমাদের দেশে বন্ধুর কেবল একটি অর্থই আছে চিন্ময়বাবু— বয়স্য।' তারপর হৈমবতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কি কষ্ট বলুন তো মা ?'

হৈমবতী বললেন, 'কষ্ট ? আমার অন্য কোন কষ্ট নেই ডাক্তারবাবু, সমস্ত কষ্টের মূল এই ছেলে। কথার একেবারে অবাধ্য।'

ব্যোমকেশবাবু একটু হাসলেন, 'এ তো ভালো কথা নয়, চিন্ময়বাবু।'

এরপর রোগের কথা উঠল। অনেক দিন ধরেই শ্বাসকষ্টে ভুগছেন হৈমবতী। ব্লাড প্রেসারের দোষও আছে।

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'আপনাকে একটু শুতে হবে যে মা। আর কোন মেয়েছেলে নেই বুঝি ?'

হৈমবতী বললেন, 'না।'

চিন্ময় হঠাৎ বলল, 'একটু বসুন ডাক্তারবাবু। আমি ইন্দুদিকে ডেকে নিয়ে আসছি।

দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল চিন্ময়। তারপর দোতলায় ইন্দুদের ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। সদ্য স্নান সেরে এসেছে ইন্দু। পিঠময় ভিজে চুলের রাশ ছড়ানো। দোরের দিকে পিছন ফিরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ইন্দু সযত্নে সিঁথিতে সিঁদুর পরছিল। আয়নায় চিন্ময়ের মুগ্ধ চোখের ছায়া পড়তেই মুহূর্তকাল সিঁদুরের কৌটোর মধ্যে আঙুল দুটি ইন্দুর অনড় হয়ে রইল। চিন্ময় ফিরে যাচ্ছিল, ইন্দু মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকে ডাকল, 'ব্যাপার কি, এসেই চলে যাচ্ছ যে ?'

চিন্ময় আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'ডাক্তারবাবু এসেছেন মাকে দেখতে। কাছে একজন মেয়েছেলে থাকলে ভাল হয় তাই এসেছিলাম—'

ইন্দু মুখ টিপে হাসল, 'ও, তাই বল। কিন্তু সময় নেই, অসময় নেই পরের ঘরের মেয়েছেলেকে কতদিন আর এমন ডাকাডাকি করে ফিরবে ? তার চেয়ে—।'

তারপর স্বর বদলে শঙ্কিত উদ্বেগের সুরে বলল, 'কিন্তু হঠাৎ ডাক্তার যে ? কি হল মাসিমার ? এই খানিকক্ষণ আগেও না তাঁকে দেখলাম সন্ধ্যা করছেন বসে বসে।'

চিন্ময় বলল, 'বিশেষ কিছু নয়। সেই পুরোন অসুখই। আচ্ছা আপনি আপনার কাজ করুন।'

কিন্তু ইন্দু প্রায় চিন্ময়ের পায়ে পায়েই নেমে এল নিচে, তারপর যে ঘরে রোগিণীর স্বাস্থ্যপরীক্ষা চলছিল সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে এল চিন্ময়।

দশ-বার মিনিট বাদে ব্যোমকেশবাবুও বেরিয়ে এলেন, বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা করলে সেরে যাবে। একটা টনিক লিখে দিচ্ছি—।'

চিন্ময় তাঁকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। স্টার্ট দেওয়ার আগে ব্যোমকেশবাবু চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসবেন নাকি এখন ?'

চিন্ময় বলল, 'না, এখন থাক। কলেজ থেকে ফেরার পথেই যাব।'

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'বেশ, তখনই নিয়ে আসবেন ওষুধটা।'

চিন্ময় এবার পকেট থেকে টাকা বের করল।

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'ও আবার কি ?'

চিন্ময় বলল, 'আপনার—।'

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'উঁহু ওটা আমার নয়। ওটা আপনার পকেটেই রেখে দিন।'

চিন্ময় ফের আর একবার অনুরোধ করায় ব্যোমকেশবাবু বিরক্তির ভঙ্গিতে বললেন, 'আঃ, বলছি রাখুন।'

চিন্ময় পাঁচ টাকার নোট দুখানা পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'ধমকটা কিন্তু গুরুজনের মতই গুরুগম্ভীর হয়ে পড়ল। বয়স্যোচিত হল না।'

ব্যোমকেশবাবু একটু হাসলেন, 'ও। কিন্তু বয়স্য হিসেবেও যে কিছু বলবার নেই তা নয়।'

চিন্ময় বলল. 'আছে নাকি ? বলুন না।'

ব্যোমকেশবাবু বললেন. 'আরো এগিয়ে আসুন তাহলে। বক্তব্যটা বড়ই গোপনীয়।'

তারপর চিন্ময়ের পিঠে হাত রেখে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আপনাকে কে ছেলেমানুষ বলেছিলেন আজ টের পেলাম। অপনি অবশ্য পরিচয় করিয়ে দেন নি। কিন্তু আমি পরিচয় পেয়ে গেছি।'

চিন্ময় লজ্জিত হয়ে বলল, 'কী যা তা বলছেন।'

দিন কতক বাদে হৈমবতী ছেলেকে বললেন. 'কাল তো রবিবার। কলেজ-টলেজ সব বন্ধ।'

চিন্ময় বই থেকে মুখ তুলে বলল, 'হ্যাঁ, তাই কি ?'

হৈমবতী বললেন, 'কাল যেন কোন বন্ধু-টন্ধুর সঙ্গে আবার চলে যেও না কোথাও। আমি তোমাকে আগেই বলে রাখছি বাপু।'

চিন্ময় হেসে বলল, 'বেশ তো, না গেলাম। বন্ধুবান্ধব আমার তো খুব বেশি নয় মা। আর তাদের সঙ্গে বেরোইও কম। কিন্তু তোমার বোধ হয় ধারণা আমি খুব আড্ডাবাজ।'

হৈমবতী মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'আগে ছিলিনে। আজকাল হয়েছিস।'

চিন্ময় বলল, 'তাই নাকি ? আমার স্বভাবের এতবড় একটা মৌলিক পরিবর্তন হল

অথচ আমি তো কই কিছু টের পেলাম না। যতদূর মনে হয় আমি আগের মত ঘরেই থাকি।'

হৈমবতী বললেন, 'তা থাক। কিন্তু আড্ডা দেওয়ার যদি ইচ্ছা থাকে তা ঘরে বসেও দেওয়া যায়, বাইরে গিয়েও দেওয়া যায়।'

চিন্ময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মার দিকে তাকাল, 'তার মানে?'

কিন্তু মানেটা হৈমবতী আর খুলে বললেন না, অন্য কথা পাড়লেন, 'যা বলছিলাম, কাল বিকালে আর অন্য কোন কাজকর্ম হাতে রেখ না। অনুপমের সঙ্গে কাল তোমাকে গড়পার যেতে হবে।'

চিন্ময় ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, 'গড়পার কেন?'

হৈমবতী এবার একটু হাসলেন, 'বাঃ গড়পারেই তো অনুপমের মামাশ্বশুর থাকেন। কাল এসেছিলেন ভদ্রলোক। কথায় বার্তায় আলাপে ব্যবহারে বেশ মানুষটি। তোর জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে উঠে গেলেন। আমি কথা দিয়েছি কাল তুই আর অনুপম গিয়ে দেখে আসবি মেয়েটিকে, পছন্দ হলে তখন কথাবার্তা বলা যাবে। অনুপম বলে, তার জন্য আটকাবে না।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'তা ছাড়া ছেলের বিয়ে দিয়ে বড়লোক হওয়ার সাধ তো আমার নেই। বংশ যদি ভাল হয়, দেখতে শুনতে মেয়েটি যদি মোটামুটি সুন্দরী হয় তাহলেই হল। এই বাজারে কোন ভদ্রলোককে পণ-যৌতুকের জন্য পীড়াপীড়ি আমি কিছুতেই করতে যাব না বাপু। তাতে যে যা খুশি বলুক। আহা, ভদ্রলোকের এর আগে দু-দুটি মেয়েকে পার করতে হয়েছে। সোজা কথা? তাদের দিকটাও তো ভাবতে হবে। তবে লোকে যাতে নিন্দা করতে না পারে—'

হৈমবতী আর কি বলতে যাচ্ছিলেন, চিন্ময় বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস না করে তুমি আগেই ওদের কথা দিতে গেলে কেন?'

হৈমবতী ছেলের দিকে একটু কাল চুপ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, কী কথা দিয়েছি? কাল তোরা দেখতে যাবি সেই কথা? কী দোষ হয়েছে তাতে? আমি কি সেটুকু কথাবার্তাও কারো সঙ্গে বলতে পারিনে?'

চিন্ময় বিরক্ত হয়ে বলল, 'পারো, কিন্তু অনর্থক ওসব কথার মধ্যে গিয়ে লাভ কি মা। আমি তো গোড়া থেকেই বলছি বিয়ে আমি করব না। অন্তত এখন তো নয়ই।'

হৈমবতী চটে উঠলেন, 'এখন নয় কখন? আমি মরলে? বেশ কর না কর ভদ্রলোককে আমি যখন বলেছি, তুমি না যাও ইন্দুকে সঙ্গে নিয়ে আমি গিয়ে দেখে আসব।'

চিন্ময় বলল, 'সেই ভালো।'

কিন্তু পরদিন অনুপম চিন্ময়কে হাত ধরে টেনে তুলল, 'ঈস্, যাব না বললেই হল! আমাদের মুখের কথার বুঝি একটা দাম নেই!'

চিন্ময় বলল, 'দাম নেই তা তো আমি বলছিনে। নিজেরা কথা দিয়েছেন, নিজেরা গিয়ে দেখে আসুন, তাহলেই হবে।'

অনুপম বলল, 'তা কি করে হয় ভায়া। আজকাল আর সেদিন নেই, নিজেদের জিনিস নিজেরা বেছে-টেছে আনাই ভালো, না হলে ঠকতে হয়, দেখ না আমার দশা?'

ইন্দু কাছেই ছিল, হেসে বলল, 'কেন, তুমি কি ঠকেছ না কি?'

অনুপম চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে হাসি চেপে বলল 'অহংকারখানা একবার দেখলে? উনি যার স্কন্ধগত হয়েছেন সে কি আর ঠকতে পারে? সে একেবারে বর্তে গেছে। তা এক হিসাবে ঠকেছি ছাড়া কি।'

চিন্ময় বলল, 'কোন্ হিসাবে ঠকেছেন বলে মনে হয়?'

অনুপম আড়চোখে একবার ইন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের মত নিজে দেখেশুনে যাচাই বাছাই করবার চান্স পেলে কি এমন কালো মেয়ে আনতাম ভেবেছ? কুঁচবরণ কন্যা আর মেঘবরন চুল ঠিক খুঁজে খুঁজে বের করতাম। তাছাড়া মেয়ের খুব নভেল-নাটক পড়া অভ্যাস আছে শুনলে গোড়াতেই একেবারে রিজেক্ট করে দিতাম। মেয়েদের মনে একেই তো ঘোরপ্যাচের অন্ত নেই। তারপর যদি একরাশ ছাপার অক্ষর সেখানে গিয়ে ঢোকে তাহলে আর রক্ষা নেই, সংসার ধর্ম সব গেল।'

ইন্দু কোন কথা বলল না। পরিহাসের ভঙ্গিতে বললেও স্বামীর এ সব অভিযোগের সবটুকুই যে পরিহাস নয়, তার সত্য বিশ্বাস, তা ইন্দুর জানতে বাকি নেই। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর একসঙ্গে বাস করেও স্বামীর সঙ্গে নিজের জীবনকে যে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিতে পারে নি, স্বামীর রুচি-বুদ্ধির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারে নি, এ খোঁটা সুযোগ পেলেই অনুপম তাকে দিতে ছাড়ে না। কিন্তু নালিশ কি কেবল অনুপমেরই আছে? ইন্দুর নেই?

চিন্ময় ইন্দুর ভাবান্তর লক্ষ্য করে অনুপমকে বলল, 'দিলেন তো ওঁকে চটিয়ে? আপনি একেবারে ঠাকুরদার আমলের লোক। মেয়েদের লেখাপড়া দুচোখে দেখতে পারেন না।'

চিন্ময়ের বলবার ভঙ্গিতে কোথায় যেন একটু খোঁচা ছিল। ভিতরে ভিতরে অনুপম খুব চটল। কিন্তু রাগ চেপে বলল, 'না দেখতে পেরে কি আর জো আছে ভায়া। দেখতে দেখতে ক্রমে সবই অভ্যাস হয়ে যায়। এখন আমি মেয়েদের লেখা-পড়ার ভারি পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। আজকাল বরং ঠিক উলটো মনে হয়; লেখাপড়া মেয়েদের মানায়, পুরুষদের মানায় না।'

চিন্ময় কৌতুকের স্বরে বলল, 'তাই নাকি?'

অনুপম বলল, 'নিশ্চয়ই। যত নরম হাতের নরম মনের কাজ সব মেয়েদের দিয়ে করানোই ভালো। ঘরের কোণে মেয়েরা বই পড়ুক, বই লিখুক, ছবি আঁকুক কিন্তু

পুরুষে যেন ওসবের ধার দিয়েও না যায়। তাদের কাজ আলাদা, তাদের ফীল্ড আলাদা।'

ইন্দু বলল, 'সত্যিই ?'

অনুপম বলল, 'তা ছাড়া কি। তারা খেলার মাঠে খেলবে, যুদ্ধের মাঠে সুখে প্রাণ দেবে প্রাণ নেবে। পুরুষ মানুষের তাই কাজ। পৌরুষ বলতে আমি তাই বুঝি। এ ছাড়া আর-এক জাতের পুরুষও আছে। তারা সংসারের একটা কোণ নিয়ে থাকে। আমার মতে তারা মেয়েলী পুরুষ, আসল পুরুষ নয়।'

ইন্দু পিছন থেকে বলল, 'আঃ, কী যা তা বলছ। তোমার মতই পৃথিবীর সকলের মত নয়।'

অনুপম মুখ ফিরিয়ে বলল, 'অন্তত তোমার মত নয় তা জানি।

অনুপমের আক্রমণের লক্ষ্য যে সারাসরি চিন্ময় তা কারো বুঝতে বাকি ছিল না। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে চিন্ময় বলল, 'কেবল ইন্দুদি কেন, আমিও ঠিক আপনার মতে সায় দিতে পারছি না।'

অনুপম বলল, 'তা তো পারবেই না। আচ্ছা, তোমার নিজের পক্ষের ওকালতিটা এবার শুনি।'

চিন্ময় তর্কটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'সেটা ভাল দেখাবে না। তার চেয়ে একজন উকিল বরং আপনাকে আমি পাঠাব। সময়মত আমার হয়ে তিনিই সব বলবেন।'

পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর এবার অনুকম্পা হল অনুপমের। অটুট আত্মপ্রত্যয়ে সে হো হো করে হেসে উঠল, তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'মুরোদ দেখলে একবার ? নিজের কথাটুকু পর্যন্ত নিজের মুখে বলতে পারে না। আসলে বলবার কিছু থাকলে তো বলবে। চিনু ঠিকই বলেছে। ওর জন্য একজন উকিলই ঠিক করে আনা দরকার। তা বাসবী বেশ বলতে কইতে পারে। তার হাতে পড়লে শ্রীমান এক সঙ্গে মক্কেল আর মুহুরী বনে থাকবেন, কি বল ?'

অনুপম হাসতে লাগল।

ইন্দুও সামান্য হাসল। কিন্তু সে-হাসিতে যেন অন্তরের সায় নেই। চিন্ময়ের ওপর কেমন যেন একটা আক্রোশে মন ভরে উঠল ইন্দুর। বাকযুদ্ধে কেন চিন্ময় এমন নিঃশব্দে পরাজয় মানল। এ যেন কেবল চিন্ময়ের পরাজয় নয়, তাতে ইন্দুরও লজ্জা আছে। কেন, চিন্ময়েরও কি কিছু বলবার ছিল না ? সে কি বলতে পারত না—কেবল হাতের কাজই পুরুষের নয়, মাথার কাজও তার ? সে কেবল ক্ষত্রিয় নয়, সে ব্রাহ্মণও ?

চিন্ময়ের কোন আপত্তিই টিঁকল না। নাছোড়বান্দা অনুপম জোর করে তাকে বাসে টেনে তুলল, 'দেখ, শত হলেও আমি ল্যাণ্ডলর্ড, তুমি টেন্যাণ্ট। তা ছাড়া যথার্থ পুরুষের আর-একটা লক্ষণ তখন তোমাকে বলা হয় নি। তারা মেয়ে দেখবার নিমন্ত্রণ পেলে

সঙ্গে সঙ্গে সেটা গ্রহণ করে। মেয়ে দেখে পছন্দ হোক আর না হোক, বিয়ে করুক আর না করুক, মেয়েওয়ালার বাড়ি থেকে বেশ এক পেট খেয়েও আসে!'

গড়পারে অনুপমের সম্পর্কিত মামাশ্বশুর ক্ষীরোদচন্দ্র বসু গলির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে এসে চিন্ময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাদের দেখে পরম আপ্যায়নে বাড়ির ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বেঁটেখাট মানুষটি। অর্ধেক মাথায় টাক। খুব ভদ্রলোক বলেই মনে হল চিন্ময়ের।

কাস্টমস্‌এ কাজ করেন। শ-তিনেক টাকা মাইনে পান। কিন্তু ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ভদ্রলোক এঁটে উঠতে পারছেন না। তবে লোক ভারি বৈষয়িক আর বুদ্ধিমান। এর আগে দুটি মেয়েকে মোটামুটি ভালো ভাবেই পাত্রস্থ করেছেন। কিন্তু সকলের চেয়ে এই মেয়েটিই ভালো। আই-এ পড়ছে! গানবাজনাও জানে। বাসে আসতে আসতে শ্যালিকার প্রশংসায় অনুপম প্রায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে।

জলখাবারের পর্ব শেষ হওয়ার পর কনে দেখাবার পালা আরম্ভ হল। বাসবীর মা সুহাসিনী রুগ্ন শরীর নিয়ে মেয়েকে যথাসাধ্য সাজিয়েগুজিয়ে দিলেন। অনুপমকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ইন্দুকে যদি নিয়ে আসতে সঙ্গে করে আমার ভারি উপকার হত। সে-ই করতে পারত এসব।'

অনুপম বলল, 'ভাববেন না মামীমা। আজকাল ছেলেছেয়েদের জন্য কারো কিছু করতে হয় না, কি বল টুলু?'

বাসবী বলল, 'সে কথা বুঝেও করবার গরজ কমে কই আপনাদের?'

অনুপম হেসে বলল, 'বাপরে, এ যে একেবারে মিলিটারি মেজাজ। যিনি দেখতে এসেছেন তাঁকেও সারাটা পথ টেনে হিঁচড়ে আনতে হয়েছে। আবার যিনি দেখা দেবেন তাঁরও দেখছি সেই অবস্থা। ছিঃ, অমন করে না। ঠাণ্ডা মেজাজে, লক্ষ্মী মেয়ের মত এস আমার সঙ্গে।'

অনুপমের পিছনে পিছনে বাসবী এসে ঘরে ঢুকল। ক্ষীরোদবাবু তক্তাপোশে বসে ছিলেন, অনুপম তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কাজ থাকলে আপনি বরং তা সেরে আসুন। ওদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তো আমিই আছি। আর সবই তো একরকম নিজেদের মধ্যে। চিন্ময় আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তা তো জানেনই।'

ক্ষীরোদবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই, সেদিন গিয়ে সবই শুনেছি ইন্দুর কাছে। তোমরা এর মধ্যে আছ বলেই তো—।'

বাবার এই নম্রতা, অতিরিক্ত সৌজন্যের ভঙ্গি বাসবীর চোখে ভারি বিসদৃশ লাগল। যাঁর হাঁকডাকে মা আর ভাইবোনেরা সবাই অস্থির তাঁর কেন এই বৈষ্ণব দীনতা? হলই বা কলেজের একজন প্রফেসার, তার জন্য এত কৃত-কৃতার্থ হওয়ার কি আছে? অঞ্জু-মঞ্জুরা এমন অনেক সদ্যপাশকরা ছোকরা প্রফেসারকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে।

ক্ষীরোদবাবু বেরিয়ে গেলে অনুপম বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাসবী, বোসো।'

বাসবী অনুপমের সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। চিন্ময় লক্ষ্য করল মেয়েটি মুখখানা নিচু করে রাখলেও তার ভঙ্গিতে নম্রতা নেই, বরং কেমন যেন একটু অহংকার আর ঔদ্ধত্যের ভাবই সমস্ত চেহারায়, বসবার ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। উনিশ বছরের নিতান্ত সাধারণদর্শনা এই মেয়েটির মনে এত গর্ব কি করে জমল তা ভেবে চিন্ময় বিস্মিত না হয়ে পারল না। একটু ফ্যাকাশে রঙ ছাড়া আর কোন কিছুই মেয়েটির তেমন সুন্দর বলা চলে না। মুখের গড়ন চ্যাপ্টা ধরনের, নাকটিও তাই, চোখ দুটিও একটু ছোট-ছোটই। একহারা দীর্ঘ চেহারায় নারীসুলভ কমনীয়তার একটু অভাব আছে বলেই মনে হল। প্রথম দৃষ্টিতেই মেয়েটির প্রতি কেমন একটু বিরূপতা অনুভব করল চিন্ময়।

অনুপম একটি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'বাঃ, এমন চুপচাপ রইলে কেন চিন্ময়! কিছু জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস কর।'

চিন্ময় বলল, 'জিজ্ঞাসা? জিজ্ঞাসা আবার কি করব? আপনিই করুন না।'

অনুপম বলল, 'বাঃ, আচ্ছা মানুষ যা হোক। দেখতে এলে তুমি, আর জিজ্ঞাসাবাদ বুঝি আমি করব?'

চিন্ময় এবার একটু হাসল, 'করলেনই না হয়। এ সব ব্যাপারে কতকগুলি বাঁধাধরা কোশ্চেন তো আছেই, সেগুলি আপনার মুখেও যেমন শোনাবে আমার মুখেও তেমনি।'

অনুপম বলল, 'বাঁধাধরা প্রশ্নই যে করতে হবে তার কি মানে আছে? ইচ্ছা করলে ঘোরানো জড়ানো নতুন ধরনের পেপারও সেট্ করতে পার। আমাদের ক্যাণ্ডিডেট্ খুব ওয়েল-প্রিপেয়ার্ড।'

চিন্ময় হেসে বলল, 'তা হোক, আমার তেমন কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই।'

অপমানে সর্বাঙ্গ যেন জলে গেল বাসবীর। একটু চুপ করে থেকে চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অনুপমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তাহলে এবার যাই জামাইবাবু।'

অনুপম বাধা দিয়ে বলল, 'সেকি হে, কোন আলাপ-পরিচয়ই যে হল না এখনো, বোসো বোসো।'

বাসবী তেমনি উদ্ধত ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'না, বসে তো অনেকক্ষণ রইলাম। আমার কাজ আছে।' বলে বাসবী দোরের দিকে এগুতে শুরু করল।

এবার একটু যেন লজ্জা বোধ করল চিন্ময়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি বোধ করল কৌতুক। না, সে যা ভেবেছিল তা নয়, অহংকার টহংকার কিছু নয়, মেয়েটি আসলে ভারি সরল। এ ধরনের অভিমানিনী দু-চারটি ছাত্রীকে তার এর আগে পড়াতে হয়েছে।

অনুপম এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে ফিরিয়ে নিয়ে এল বাসবীকে। বলল, 'ছিঃ টুলু, অমন করে না। ভালো হয়ে বোসো। একজন ভদ্রলোক আলাপ করতে এসেছেন তোমার সঙ্গে, আর তুমি কি—।'

বাসবী বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল দোরের আড়ালে মা এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখের ইসারায় অভদ্রতা করতে নিষেধ করছে তাকে। একটু বাদে ক্ষীরোদবাবুও এসে ঢুকলেন। মেয়ের আচরণের কৈফিয়ত হিসাবে বললেন, 'বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে আদুরে মেয়ে হল ও। ভালো হয়ে বোসো বাসবী। ওঁরা যা জিজ্ঞেস করছেন জবাব দাও।'

বাসবী রীতিমত অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে শক্ত হয়ে চেয়ারে বসে রইল।

ক্ষীরোদবাবু স্নেহার্দ্র স্বরে বলেলেন, 'আমার সব কটি ছেলেমেয়ের মধ্যে এইটিই হল সবচেয়ে ইনটেলিজেণ্ট। ক্লাসেও বেশ ভাল রেজাল্ট করে। ম্যাট্রিকুলেশনে দশ নম্বরের জন্য ফাস্ট ডিভিশনটা পায় নি। মার্ক শীট আনিয়ে দেখেছিলাম। ফাস্ট ইয়ার থেকে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠবার সময় লজিকে ফাস্ট হয়েছে। অন্যান্য সাবজেক্টেও অ্যাভারেজ সিক্‌স্টি পার্সেণ্ট ছিল, তাই না বাসবী? আমার মেয়ে লজিকে ফাস্ট হয় আর লজিককে আমি যমের মত ভয় করেছি।'

ক্ষীরোদবাবু হাসলেন।

চিন্ময়ও মৃদু হাসল। এরপর বাসবীর সঙ্গে আলাপ না করাটা অভদ্রতা হবে। কিন্তু এই ফরমায়েশ-মাফিক আলাপটা কেমন যেন তার কাছে হাস্যকর লাগতে লাগল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'কি সাবজেক্ট আপনার?'

বাসবী জবাব দিল, 'হিষ্ট্রী, লজিক আর সিভিকস্।'

চিন্ময় বলল, 'কি পড়তে আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে?'

'সবই ভালো লাগে।'

চিন্ময় একটু হাসল, 'সবই ভালো লাগে? কথাটা বোধ হয় ভেবে বলেন নি।'

বাসবী অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, 'অত ভাবতে আমার ভালো লাগে না।'

কথার চেয়ে ভঙ্গিটুকুতে যেন আরও বেশি ছেলেমানুষি ফুটে উঠল বাসবীর।

চিন্ময় হাসল 'বেশ তো, ভালো না লাগে ভাববেন না। এমন একটা বয়স আসবে যখন ভাবতে ভালই লাগবে, কিংবা না ভালো লাগলেও ভাবতে হবে।'

বাসবী এবার অবাক হয়ে চিন্ময়ের মুখের দিকে তাকাল। কে এই লোকটি। বয়স তো খুব বেশি বলে মনে হয় না। অথচ বয়স্ক লোকের মত উপদেশ দেয়। কিন্তু কমবয়সী পুরুষের মুখে বয়স্ক লোকের উপদেশও যেন অন্য রকম শোনায়। তা শুনে রাগ হয় না, বিরক্তি হয় না, বরং কৌতুক আর মজা লাগে। উপদেশই দিক আর যাই দিক, হাসিটুকু ভারি মিষ্টি। আর ভদ্রলোকের চোখ দুটিও ভারি সুন্দর। খানিক আগে যে বিদ্বেষ জমেছিল বাসবীর মনে, তার চিহ্নমাত্রও রইল। মৃদু হেসে মুখ নিচু করে রইল বাসবী।

এরপর চিন্ময় অনুপমের দিকে চেয়ে বলল, 'এবার ওঠা যাক অনুপমদা। ওঁকে আর আটবে রাখব না।'

অনুপম বলল, 'সেকি, এরই মধ্যে সব হয়ে গেল? আর কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করবে না?'

চিন্ময় হেসে উঠে দাঁড়াল, 'এই তো করলুম। পেপার লেংথী করবার অভ্যাস আমার নেই। তাছাড়া প্রশ্নপত্র দীর্ঘই হোক আর দুরূহই হোক শতকরা ষাট নম্বর তো ওর বাঁধাই আছে।'

বাসবীর ইচ্ছা হল আর-একবার চোখ তোলে, কিন্তু পারল না।

যাওয়ার সময় অনুপমকে একান্তে ডেকে ক্ষীরোদবাবু আর সুহাসিনী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম বুঝলে?'

অনুপম বলল, 'এর আর বোঝাবুঝির কি আছে? চিন্ময়ের নিজের মুখেই তো শুনলেন। যেমন তেমন পাশ নয়, একশর মধ্যে ষাট নম্বর পেয়ে পাশ।'

নিশ্চিত এবং আশ্বস্ত হয়ে ক্ষীরোদবাবু আর সুহাসিনী দুজনেই হাসলেন।

ফেরার পথে অনুপম বলল, 'কি রকম, আমি তোমাকে আগেই বলি নি? এক অক্ষরও কি বাড়িয়ে বলেছি? তুমি এবার বাসায় ফিরবে তো?'

চিন্ময় বলল, 'হ্যাঁ।'

অনুপম বলল, 'আচ্ছা তুমি এগোও, আমি একটু বৈঠকখানা হয়ে যাব।'

বাসায় আসার সঙ্গে সঙ্গে হৈমবতী জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলি?'

চিন্ময় বলল, 'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সবই বলব।'

বলল ইন্দুর কাছে। ইন্দুরও কৌতূহল কম নয়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও নিচে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম, পছন্দ হল তো আমাদের টুলুকে—বাসবী দেবীকে?'

চিন্ময় বলল, 'বাসবী দেবী নয়, টুলুই বলুন। বড্ড ছেলেমানুষ।'

ইন্দু একটু অবাক হয়ে বলল 'সে কি বলছ? আমার যখন বিয়ে হয় টুলুর বয়স তখন পাঁচ-ছয় বছরের কম হবে না। মামীমারা যত কমিয়েই বলুন, উনিশ পেরিয়ে গেছে ও মেয়ের বয়স।'

চিন্ময় বলল, 'তাহলেই বা কি, উনিশই বলুন আর উনত্রিশই বলুন, ত্রিশ পেরিয়ে না আসা পর্যন্ত মেয়েদের বুদ্ধিশুদ্ধি হয় না!'

বারান্দায় বসে সুপুরি কাটছিলেন হৈমবতী, ছেলের কথা শুনে বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'যত সব সৃষ্টিছাড়া কথা ওর মুখে। আমরা তো জানি যার হয় না নয়তে, তার হয় না নব্বুইতে। বুদ্ধি যাদের হয় তাদের অল্প বয়সেই হয়। উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে ওর কাছে ছেলে মানুষ হল। বিয়ে হলে এতদিন তিন ছেলের মা হয়ে যেত না?'

ইন্দু হেসে বলল, 'নাও, এবার জবাব দাও।'

চিন্ময় বলল, 'জবাব আবার কি দেব। ছেলের মা হলেই যেন তার ছেলেমানুষি ঘোচে। তাহলে তো আমার মারও ঘুচত।'

ইন্দু এবার হেসে উঠল, 'শুনুন মাঐমা, কথা শুনুন আপনার ছেলের। ওর কাছে কেবল টুলুই নয়, আপনিও নাকি ছেলেমানুষ।'

হৈমবতী কিন্তু হাসিতে যোগ দিলেন না, বললেন, 'তোমরাই শোন বাছা, আমার ওসব ভালো লাগে না।'

ইন্দুর মুখে কিসের যেন একটা ছায়া পড়ল। একটু চুপ করে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে বলল, 'ওসব বাজে কথা রাখ। টুলুকে অপছন্দ হওয়ার তোমার কোন কারণই নেই। দেখতে শুনতে গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে যেমন হয় তেমনি। ছাত্রী হিসাবেও শুনেছি বেশ ভালো।'

চিন্ময় বলল, 'তা তো আমি অস্বীকার করছিনে। আপত্তি কেবল পাত্রী হিসেবেই।'

বাসবীর রূপ গুণ যোগ্যতার পক্ষ নিয়ে আরো খানিকক্ষণ তর্ক করে ইন্দু উঠে গেল। তাদের চেষ্টা সফল হয় নি। মামা মামীমার কাছে অপ্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু এর জন্য যতখানি দুঃখ বোধ করার কথা ছিল, মনে মনে ইন্দু যেন ততটা দুঃখিত হল না। বরং একটা অকারণ প্রসন্নতায় মন যেন ভরে রইল। চিন্ময়ের কথা মনে পড়ায় হাসি পেল তার। মাঐমা ঠিকই বলেছেন, যত সব সৃষ্টিছাড়া কথা ওর। ত্রিশের নীচে নাকি মেয়েদের মন ঠিকমত পরিণতি পায় না। চিন্ময়কে জিজ্ঞেস করতে হবে ছেলেদের মনের পরিণতি কোন্ বয়সে হয়।

মনে মনে হাসল ইন্দু।

মিনুর কাণ্ড দেখ। আয়নাটার ওপর কি রকম নোংরা হাতের ছাপ দিয়েছে। উনি এসে দেখলে আর বাঁচাবেন না। আঁচল দিয়ে ইন্দু আয়নাটি মুছে পরিষ্কার করে ফেলল। এবার ঠিক হয়েছে। তারপর কি ভেবে, আঁচল দিয়ে নিজের মুখখানাও ইন্দু একটু মুছে নিল। চিন্ময় সেদিন বলছিল ইন্দুর মুখ দেখলে নাকি বোঝা যায় না যে তার বয়স ত্রিশ হয়েছে। শুধু মুখের কথা শুনলে টের পাওয়া যায়। বানিয়ে বানিয়ে এত বাজে আজগুবি কথাও বলতে পারে চিন্ময়।

ড্রেসিং টেবিলের বড় দেরাজটির চাবি নষ্ট হয়ে গেছে। আর সেই সুযোগে ওটাকে নিজের দেরাজ বানিয়েছে তিলু। একটা ঘুড়ির লাটাই পর্যন্ত ওর ভিতরে ঢুকিয়ে রেখেছে। উনি দেখলে রাগ করবেন। উনানে রান্না। দ্রুত হাতে দেরাজটা একটু গুছোবার চেষ্টা করল ইন্দু। সে-ও নোংরামি দেখতে পারে না।

পা টিপে টিপে কে যেন দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। কে আবার। ইন্দু মুখ টিপে হাসল, কিন্তু মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'কে, অধ্যাপক মশাই নাকি? এই অসময়ে হঠাৎ পাড়া-পড়শীর খোঁজ নেওয়ার কথা মনে পড়ল যে? আজ বুঝি কলেজ নেই? লজ্জা করে ওখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, আসুন, ভিতরে আসুন।'

বলে ঘাড় ফিরিয়ে স্মিতমুখে বাইরের দিকে তাকাল ইন্দু। কিন্তু তাকিয়েই অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে জিভ কেটে বলল, 'ও তুমি!'

অনুপম বলল, 'হ্যাঁ বড়ই আফশোসের কথা। অধ্যাপক মশাই নই।'

ইন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি যে বল। তুমি না বলে গিয়েছিলে, আর একটু রাত হবে ফিরতে। ক্লোজিং-এর সময়—'

অনুপম বলল, 'না, আজ একটু সকাল সকালই চলে এলাম। শরীর ভালো লাগছিল না।'

ইন্দু বলল, 'তা বেশ করেছ। পরের চাকরির জন্য তুমি যেমন খাট পৃথিবীতে বোধ হয় আর কেউ তেমন খাটে না। ওকি, ভেতরে এস। ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে যে?'

অনুপম একটু হাসল, 'আমাকে তো আর ঘরে যাওয়ার জন্য ডাক ছলে না।'

ইন্দুর হাসিমুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। স্বামীর দিকে একটুকাল চুপ করে তাকিয়ে থেকে ফের মুখে হাসি টেনে বলল, 'ঘরের লোককে বুঝি আবার ঘটা করে ডেকে আনবার দরকার হয়?'

আর কোন কথা না বলে জুতোর ফিতে খুলে অনুপম ঠিক নির্দিষ্ট জায়গাটিতে পেরেকের সঙ্গে জুতোজোড়া সযত্নে ঝুলিয়ে রেখে ঘরে ঢুকল। ইন্দু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে বলল, 'না জরটর কিছু নয়।'

অনুপমের বুকপকেটে পকেট-ডায়েরি আর দুটো ঝুলপকেটে ছোটবড় কাগজের মোড়ক। ইন্দুর সব গৃহস্থালীর ফরমায়েশ। স্বামীর গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে ইন্দু সেগুলিকে একটি একটি করে বার করতে লাগল। ছেলেমেয়েরা পাশের ঘরে পড়তে বসেছে। না ডাকলে ওরা এখন আর কেউ এঘরে ঢুকবে না। তিলু মিনু দুজনেই বাপকে খুব ভয় করে।

সবচেয়ে শেষে চায়ের প্যাকেট। পকেট থেকে সেটাকে আর বের করা যায় না। অনেক কসরত করে সেটিকে বাইরে আনল ইন্দু, তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, একটা কথা বলবে? অমন করে বাইরে দাঁড়িয়েছিলে কেন? তুমি তো কোনদিন অমন কর না।'

অনুপম বলল, 'অনেককাল বাদে তোমাকে অতক্ষণ ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বড় ভালো লাগল। ভাবলাম ধার করে ড্রেসিং টেবিলটা কেনা এতদিনে সার্থক হয়েছে। আগে তো বেশভূষা আর বিলাসিতার জিনিস মোটেই দুচোখে দেখতে পারতে না।'

ইন্দু বাধা দিয়ে প্রতিবাদ করল, 'আর এখন বুঝি খুব পারি? সেজে-গুজে পটের বিবি সেজে দিনরাত বসে থাকি আজকাল, তাই বুঝি তোমার ধারণা?'

অনুপম বলল, 'তা নয়। তবু একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে তোমার আজকাল বেশ নজর এসেছে, বললে হবে কি! আর একটা জিনিস আমার মনে হয়। এই কমাসের মধ্যে তোমার বয়সটাও যেন হঠাৎ বেশ কবছর কমে গেছে।'

অনুপমের কথার ভঙ্গিতে হঠাৎ ধক করে উঠল ইন্দুর বুকের মধ্যে। তারপর নিজেকে

সামলে নিয়ে হেসে বলল, 'কি যে বল! তোমার গায়েও চিন্ময়ের হাওয়া লাগল নাকি?'

অনুপম সোজা স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'কেন চিন্ময়ও ওই কথা বলে বুঝি?'

অদ্ভুত একটু হাসল অনুপম।

খোঁচা খেয়ে ইন্দুও তাকাল স্বামীর দিকে, তারপর জেদী মেয়ের মত ঘাড় বাঁকাল, 'বলেই তো। পাগলে কি না বলে। কিন্তু মেয়েদের বয়স একবার বাড়লে তো কোনদিন কমে না। তবে কোন কোন বয়সে দু-একজন পুরুষের দৃষ্টিশক্তি কমে, আর না হয় তাদের আক্কেল বুদ্ধির তহবিলে কমতি পড়ে।'

অনুপম আর কোন কথা না বলে অফিসের জামা-কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরল। তারপর গামছা নিয়ে নিচের বাথরুমে গেল হাতমুখ ধুতে।

'কি মাঐমা, রান্নাবাড়া সব শেষ হয়ে গেছে?'

ওপর থেকেই আলাপের সূচনাটা কানে গেল ইন্দুর। তারপর আর কোন কথা শুনবার চেষ্টা না করে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

স্বামীকে আর ছেলেমেয়েদের খাইয়ে, নিজের খাওয়া শেষ করে ঘরে আসতে রাত গোটা দশেক বেজে গেল। অন্যদিন অনুপম এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ ঘুমোয় নি। চুলের কাঁটায় আধাআধি চিহ্ন দেওয়া বালিসের তলা থেকে মোটা নভেলখানা হাতে নিয়ে শুয়ে শুয়ে তার পাতা ওলটাচ্ছে। পান মুখে দিয়ে পা ঝুলিয়ে ইন্দু তক্তাপোশে স্বামীর গা-ঘেঁষে বসল। তারপর হেসে বলল, 'ব্যাপার কি আজ? আজ কি পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠল নাকি, তুমি নভেল পড়ছ!'

অনুপম বলল, 'দেখছিলাম উলটে-পালটে, কি তোমরা পাও বইয়ের মধ্যে। বইয়ের নাম 'শাখা-প্রশাখা'। মানে কি হল? এতে কি গাছ-গাছালির কথা আছে নাকি?'

হাসি চেপে ইন্দু বলল, 'কি জানি কিসের কথা আছে। প্রায় আধাআধি পড়লাম, বই ভরে কেবল কিলকিল করে মানুষ আর তাদের মুখভরা কেবল কথা আর কথা। মাথামুণ্ডু কি যে বলতে চায় বোঝা শক্ত। যাই বল, শরৎ চাটুয্যের পরে আর বাংলা নভেল পড়ে তেমন জুত পেলাম না। চিন্ময় অবশ্য তর্ক করে, এ নাকি আমার বুঝবার দোষ, রসবোধ বৃদ্ধি না পাওয়ার লক্ষণ।—শরৎবাবু যে সমাজ, যে সময় নিয়ে লিখেছেন—'

অনুপম বাধা দিয়ে বলল, 'শরৎবাবু খুব ভালো লিখতেন নাকি?'

ইন্দু এরপর প্রসঙ্গ বদলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মাঐমা তখন কি বলছিলেন তোমাকে, কি যেন শুনলাম একটু—তাদের নিষেধ করে দিও, তাদের জানিয়ে দিও—কাদের কি জানাবার কথা বললেন?'

অনুপম বইখানা সশব্দে বন্ধ করে দূরে সরিয়ে রেখে উঠে বসে উত্তেজিতভাবে বলল, 'কাদের আবার? তোমার মামাকে নিষেধ করে দিতে বললেন। বাসবীকে নাকি চিন্ময়ের পছন্দ হয় নি। ও নাকি স্পষ্টই ওর মাকে সেকথা বলে দিয়েছে। অথচ সেখানে

এমন ভাব করল, এমন হেসে হেসে কথা বলল, যেন দেখামাত্র সে প্রেমে পড়ে গেছে বাসবীর। এখন বলে কিনা পছন্দ হয় নি ; রাস্কেল কোথাকার। আমি আরো ওঁদের জোর ভরসা দিয়েছি, এ সম্বন্ধ করে দেবই। এখন আমার মুখ থাকে কোথায় ?'

ইন্দু বলতে যাচ্ছিল, কেন তুমি তাঁদের অমন ভরসা দিতে গেলে ? কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা আর বলল না। মুখ রাখবার ভাবনায় অনুপমের মুখ তখন ক্রোধে বিদ্বেষে নানাভাবে আচ্ছন্ন।

ইন্দু একটুকাল কি চিন্তা করে বলল, 'যদি আমার ওপর ভার দাও, যদি আমার ওপর নির্ভর করতে পার, আমি তোমার মুখ রাখবার ব্যবস্থা করি। দেখ, আজকালকার দিনের ঘটকালি অত সোজা নয়, তার জন্য অনেক কল-কারসাজির দরকার।'

অনুপম বলল, 'কি রকম ?'

ইন্দু বলল, 'তিলু-মিনুদের মশারিটা ফেলে দিয়ে আসি, তারপর বলব। তুমি যেন এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড় না।'

পাশের ঘরে তিলক আর মিনু ঘুমায়। কোন কোন দিন মিনু মার কাছেও শোয়। কোন কোন দিন বা ভোরের দিকে ছেলেমেয়েদের ওপর থেকে তুলে আনে অনুপম। মুখে মুখে ইংরেজী কবিতা মুখস্থ করায়, নিজের ছেলেবেলায় শেখা সংস্কৃত প্রবচনগুলি ওদের শিখে নিতে বলে।

ছেলেমেয়েদের মশারি টাঙিয়ে দিতে এসে ইন্দু বলল 'দেখ কাণ্ড! ভারি বিশ্রী শোয়ার অভ্যাস তিলুর। ছোট বোনকে পা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে তক্তাপোশের এক কিনারে নিয়ে এসেছে। নিজেও শুয়ে আছে আড়াআড়িভাবে। 'এই তিলু, ভালো হয়ে শো, ভালো হয়ে শো শিগগির।'

টেনে টেনে ছেলেমেয়েকে ভালো করে শুইয়ে দিল ইন্দু। ছেলের মাথায় কপালে একটু হাত বুলাল। তিলক ভিতরে ভিতরে বড় হিংসুটে। প্রায়ই বলে, 'তুমি কেবল মিনুকেই বেশি ভালবাস। আমাকে দেখতে পারনা।'

মিনু হওয়ার পর ইন্দুকে ডাকত, 'বোনের মা!'

'আর তোর ?'

'আমার কিছু না।'

আর একদিন। তখন মিনু হয় নি। এখন মিনুর যে-বয়স তিলুর বয়স তখন তাই। ছেলেকে নিয়ে নিজের মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে ইন্দু। ছেলেমেয়ে নিয়ে মামাতো বোন সুলতাও এসেছে বাপের বাড়ি। তিলু যেবার হয়, তার পরের বছর হয়েছে সুলতার ছেলে টাট্টু। সুলতা যেই বলেছে, তোমার মাসিমা, অমনি টাট্টু কাছে এসে কোল-ঘেষে দাঁড়াল। ইন্দু তাকে কোলে তুলে নিতেই টাট্টু তার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'মাসিমা ? তুমি আমাল মাসিমা ? আমাল ?'

ইন্দু হেসে বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর ছেলে তো ভারি মায়াবী হয়েছে লতা।'

তারপর বোনপোকে আশ্বাস দিল ইন্দু, 'হ্যাগো হ্যাঁ তোমাল, তোমাল।'

তিলু একটু দূরে আর সব মাসতুতো ভাইবোনেদের সঙ্গে খেলছিল, ক্ষ্যাপার মত ছুটে এল, 'নামাও, নামাও, কোল থেকে নামাও ওকে।'

প্রথমে ধমক দিল ইন্দু, 'ছিঃ, অমন করে নাকি!'

কিন্তু কে শোনে কার ধমক? তিলক তখন তার মাকে আঁচড়াতে কামড়াতে শুরু করেছে।

স্নলতা বলল, 'দিদি, তোমার শাড়িখানা তো গেল। শিগগির টাট্টুকে নামিয়ে দাও, তিলুকে শান্ত কর।'

ইন্দু ছেলেকে বুঝাবার চেষ্টা করেছিল, 'ছি, এমন করে নাকি, লোকে কি বলে। আচ্ছা, তুমিও না হয় এই কোলে এস! আমি তোমার মা আর টাট্টুর মাসিমা। কেমন?'

কিন্তু তিলু তাতে রাজী হল না। সে তার মাকে অন্য কারো মাসিমা হতেও দেবে না। শেষ পর্যন্ত টাট্টুকে নামিয়ে দিয়ে তবে শান্তি। হিংসুটে ছেলের জন্য বোনের কাছে সেদিন ভারি লজ্জিত হয়েছিল ইন্দু।

মশারিটা ফেলে দেওয়ার আগে ইন্দু সস্নেহে আর-একবার ছেলের মুখের দিকে তাকাল। ঠিক অনুপমের মত মুখের আদল হয়েছে ওর, তার মতই সুন্দর ফর্সা রঙ; স্বভাবও অনেকটা বাপেরই পাচ্ছে। বড় হয়ে ওকি অনুপমের মতই হবে? ভারি মিল আছে কিন্তু দুজনের মধ্যে। আচ্ছা, অনুপম বড় হয়েও অনেক ব্যাপারে তিলুর মত রয়ে গেছে। মনে মনে একটু হাসল ইন্দু। হিংসার বেলায় পুরুষ মানুষ বোধহয় একটু ছেলেমানুষই থাকে। নইলে চিন্ময়কে অনুপম হিংসা করবে কেন। অনুপম বা কি আর চিন্ময় বা কি।

ছেলেমেয়েদের মশারি ফেলে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল ইন্দু। যা ভেবেছে তাই। অনুপম ঘুমিয়ে পড়েছে। খেয়ে উঠে বেশিক্ষণ আর সে জেগে থাকতে পারে না। কিন্তু নিজে জেগে থেকে ইন্দু বহুক্ষণ ধরে মতলবটা ঠিক করল। যেমন করে পারুক, বাসবীর সঙ্গে চিন্ময়ের বিয়ে সে দেবেই। তাহলে সব সন্দেহের নিরসন হবে, সব সমস্যার সমাধান হবে। যদি অল্প ব্যয়ে সম্বন্ধটা করে দিতে পারে তাহলে মামা-মামীমাও খুব উপকৃত হবেন, খুশী হবেন ইন্দুর ওপর। অল্প বয়সে বাপ-মা মারা গেছেন। বাপ-মার কর্তব্য মামা-মামীই তো করেছেন। যেটুকুই হোক লেখাপড়া শিখিয়েছেন, ভালো ঘর-বর দেখে বিয়ে দিয়েছেন। এখন ইন্দুরও তো একটা কর্তব্য বলে জিনিস আছে। কিন্তু অনুপমের মত সেকেলে ঘটকঠাকুর সাজলে চলবে না ইন্দুর। এ বড় শক্ত ঠাঁই। বিয়ের আগে দুজনকে প্রেমে পড়াতে হবে। বারবার দেখাশোনা মেলামেশার পর চিন্ময়ের মনের ওই খুঁত-খুঁত ভাবটুকু আর থাকবে না। ভালোবাসায় সব খুঁত তলিয়ে যাবে। চিন্ময় সেদিন বলেছিল সিনেমায় যাবার কথা। ইন্দুর তো সময় নেই, তেমন

ইচ্ছাও করে না। কিন্তু বাসবী আর চিন্ময়ের জন্য ওকে যেতেই হবে। সিনেমা-ঘরে কোন প্রণয়মূলক নাটক দেখবে চিন্ময় আর বাসবী পাশাপাশি বসে। ইন্দু একপাশে সরে থাকবে, আর না হয় মাঝখানে থাকবে হাইফেন হয়ে। কিংবা ভূগোলের সেই দুই ভূভাগের সংযোগকারী যোজকের মত। এমনি করেই আলাপ জমবে। ছবি দেখা শেষ হলে দুজনকে নিয়ে ইন্দু ঢুকবে কোন রেস্টুরেন্টে। সেখানে চা খেতে খেতে আর এক দফা আলাপে ওদের সাহায্য করবে ইন্দু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাসবীকে নিজের বাসায় কদিনের জন্য নিমন্ত্রণ করে আনবে। তারপর নানা ছলে বই দেওয়া-নেওয়া উপলক্ষ করে বার বার ওকে পাঠাবে চিন্ময়ের ঘরে। দোরের কাছে নিজে থাকবে আড়ি পেতে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে মামা-মামীকে বলবে, 'দিন-ক্ষণ ঠিক করুন, ছাপাতে দিন বিয়ের চিঠি।'

ছাপার অক্ষরে লেখা না হলে কি হবে, ইন্দুর এই সত্যি ঘটনামূলক নভেলটি চিন্ময়ের বন্ধুর লেখা ওই 'শাখা-প্রশাখা'-খানার চাইতে নিশ্চয়ই অনেক ভালো উতরাবে। শরৎবাবুর কাছাকাছি গিয়ে পৌছবে হয়তো। মনে মনে হাসল ইন্দু।

ভোরের দিকে নিজের পরিকল্পনা ইন্দু স্বামীকে শোনাল।

অনুপম বলল, 'সব তো বুঝলাম, কিন্তু ম্যাও ধরবে কে। সিনেমার টিকিটের খরচটা কে দেবে।'

হঠাৎ যেন ঘা খেল ইন্দু। উড়ন্ত পাখির একটা ডানা কাটা পড়েছে।

যত্র আয়, তত্র ব্যয়। ভারি হিসাব করে চালাতে হয় সংসার। একটা পয়সা যাতে এদিক-ওদিক না হয় তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তবু দিনের পর দিন খরচ বাড়ে ছাড়া কমে না। জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই আক্রা হয়। যুদ্ধ থামল, দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু সব যেন শুধু খবরের কাগজের খবর। মানুষের অবস্থা আর বদলাল না। তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে।

কিন্তু তবু নিজের জন্য আলাদাভাবে কি খরচ করে ইন্দু! আগে বছরে ছখানা শাড়ি পরত, এখন চারখানায় চালায়। অনর্থক ট্রাম-বাসে পয়সা খরচ হবে বলে কোথাও বড় একটা বেরোয় না। কোন জিনিস শখ করে কেনে তাও তো সংসারের জন্যই। তবু তা নিয়ে অনুপম রাগ করে, 'এই জিনিসই বড়বাজার থেকে কিনলে অনেক সস্তায় হত। কিন্তু নিজে সর্দারি না করলে তো তোমার চলে না।' আসলে সবটুকু সর্দারি যে অনুপমের নিজে না করলে চলে না, সেকথা কে বলবে।

একটু চুপ করে থেকে ইন্দু বলল, 'টিকিটের খরচ তুমি না দাও চিন্ময় দেবে। ওর কাছ থেকেই আদায় করব। ওর জন্যই তো এত সব হাঙ্গামা। লক্ষ্মী ছেলের মত বিয়েটি করে ফেললে তো আর এসবের দরকার হত না।'

অনুপম বলল, 'না না, সে ভালো দেখায় না! ওর পয়সায় তুমি কেন সিনেমা দেখতে যাবে।'

ইন্দু হেসে বলল, 'ভালো জ্বালা। ওর পয়সায়ও দেখব না—তোমার পয়সায়ও দেখব না, আমি পয়সা পাব কোত্থেকে শুনি? আমি নিজে কি রোজগার করি? না কি রোজগারে না নামা পর্যন্ত সব বন্ধ থাকবে?'

সমস্যার সমাধান ইন্দুই করল। কারো পয়সাই তার নেওয়ার দরকার হবে না। চালের খুদ, আটার ভুষি, পুরোন খবরের কাগজ আর ওষুধের শিশি-বোতল বিক্রি করে গোপনে বার্লির কৌটোটায় যা জমে তাকে ইন্দুরই রোজগার বলা যেতে পারে। নানা সাংসারিক কাজে কৌটায় সঞ্চয় ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তবু যা আছে তাতে একদিনের সিনেমার খরচাটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। তারপর ওদের বিয়ে হয়ে গেলে মামীমার কাছ থেকে টাকাটা সুদে-আসলে আদায় করে নেবে ইন্দু।

খানিক ভেবে অনুপম মত দিল। তারপরে ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে মেয়েকে হৈমবতীর হেপাজতে রেখে খেয়েদেয়ে স্বামীর অফিসের সময় ইন্দু তার সঙ্গী হল। যাওয়ার পথে অনুপম তাকে গড়পারে মামাবাড়ির পথে নামিয়ে রেখে যাবে। প্ল্যানটা মামা-মামী আর বাসবীকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া দরকার। একটু ঘুরতে হবে অবশ্য অনুপমকে। তা হলই বা। এখনকার দিনে নিজের মানসম্মান কি সহজপথে রাখা যায়।

মামা অফিসে বেরিয়ে গেছেন। বাসবী কলেজে। একপাল ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে মামীমা ব্যতিব্যস্ত। একটির পিঠে সশব্দে চড় মারছেন, আর একটির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড়াচ্ছেন ঘুম পাড়াবার জন্য।

ইন্দুকে দেখে ভারি খুশী হলেন তিনি। 'এই যে, আয়। কতকাল আসিসনে। একেবারেই পর হয়ে গেছিস।'

ইন্দু বলল, 'পর করে দিয়েছ, হব না?'

মামীমা বললেন, 'এলি যদি বাচ্চাদের নিয়ে এলিনে কেন? কতকাল ওদের দেখিনে।'

ইন্দু বলল, 'পরে একদিন দেখো, আগে একটা কথা শুনে নাও!'

একটা নয়, অনেক কথাই বলল ইন্দু, ঘরসংসারের অনেক কথাই শুনাল। উঠে পড়ল দূর আর নিকট সম্পর্কের অনেক আত্মীয়-কুটুম্বের কথা। অভাব অনটন অসুখ বিসুখ, সংসারে অশান্তি লেগেই আছে। মামীমার মাসতুতো ভাইয়ের বউয়ের শরীর ভালো নয়।

ইন্দু বলল, 'কেন তার আবার কি হল?'

মামীমা বললেন, 'কি আবার। এই ন-মাস। তুই শুনিস নি বুঝি? এই তো বছর খানেক আগেও একটি হয়েছে।'

ইন্দু মুখটিপে একটু হাসল, 'মামীমা, তোমার শরীরটাও খারাপ নাকি?'

মামীমা শাসনের ভঙ্গিতে বললেন, 'ফাজিল কোথাকার।'

তারপর তিনি নিজেও হাসলেন একটু, 'আর বলিস কেন, শত্তুরদের জ্বালায় আর পারিনে। আবার আসছে।'

সন্তানকে 'শত্তুর' অবশ্য সোহাগ করেই বললেন মামীমা। কিন্তু ইন্দু দেখল, মামীমার শরীরে সত্যিই আর কিছু নেই। ভারি পরিশ্রান্তও দেখাচ্ছে তাঁকে। এই চেহারা, এই স্বাস্থ্য নিয়ে বছর বছর শত্রুদের পাল্লায় পড়লে কদিনই বা বাঁচবেন মামীমা। ইন্দুর ভারি মায়া হল ওঁর উপর। রাগ হল, সত্যিই শত্রু মনে হল পেটেরটিকে, কিন্তু যে আসছে তার দোষ কি। নিজেদের শত্রু তো নিজেরাই। মামীমা অবশ্য একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন—জনবলও বল। এই নিয়ে চিন্ময়ের সঙ্গে একদিন আলোচনা হয়েছিল। সে কথা ইন্দুর মনে পড়ে গেল। চিন্ময় বলেছিল দায়ী বাপ-মা। সাধ্যের অতিরিক্ত হলে সন্তানও বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। মুখে অবশ্য চিন্ময়ের কথা ইন্দু স্বীকার করে নি, কিন্তু মামীমার দশা দেখে মনে মনে তার যুক্তি আজ ইন্দু না মেনে পারল না।

সিনেমার কথা তোলায় মামীমা বললেন, 'অবশ্য তুই সঙ্গে থাকলে আমার আর আপত্তি কি, কিন্তু ছেলের যদি তেমন পছন্দ না হয়ে থাকে জোর-জবরদস্তি করে কাজ নেই বাপু।'

ইন্দু অবাক হয়ে বলল, 'ওকথা তুমি আবার কার কাছে শুনলে ?'

মামীমা বললেন, 'অনুপমের কথার ধরনে সেই রকমই যেন একটু মনে হল।'

ইন্দু প্রতিবাদ করে বলল, 'না না, ও তোমাদের ভুল ধারণা। পছন্দ হয় নি কে বললে, পছন্দ ঠিকই হয়েছে। ভয় কেবল বিয়ের নামে। আজকালকার ছেলেদের ধরণই ওই। বিয়ে তো নয়, জলাতঙ্ক। তা চিন্ময়ের আতঙ্ক ঘোচাবার ভার আমি নিচ্ছি, তুমি ভেবো না। আমার কথা চিন্ময় ফেলতে পারবে না।'

মামীমা ইন্দুর দিকে তাকালেন, 'কেন, চিন্ময় কি তোর খুবই বাধ্য নাকি ?'

ইন্দুও তাকাল মামীর দিকে। কথাটা কেমন যেন একটু বেসুরো আর ভঙ্গিটা বিসদৃশ লাগল ইন্দুর। তারপর একটু চুপ করে থেকে মামীমার ইঙ্গিতটা গায়ে না মেখে বেশ জোর আর জেদের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, বাধ্যই তো। বাধ্য না হলে কি এতখানি সাহস পাই !'

মামীমা বললেন, 'তোমার বেশি সাহসের দরকার নেই বাপু, যা রয় সয় তাই করো।'

শনিবার। কলেজ থেকে সকাল সকালই ফিরে এল বাসবী। বেণী দুলছে পিঠের উপর। হাতে বাঁধানো কখানা বই আর খাতা। স্বাস্থ্য তো বেশ ভালো হয়েছে ওর। বেশ দৃপ্ত, আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব। এ বয়সে অহংকার একটু থাকেই, দেখতে ভালোও লাগে। এ বাড়ির মেয়েদের মধ্যে বাসবীই এই প্রথম ঢুকল কলেজে। একটু অহংকার

ওর হবে না কেন। ইন্দুর আর স্কুলের গণ্ডি ডিঙানো হল না। তার আগেই বিয়ে হয়ে গেল। এতদিন বাদেও পুরোন দুঃখটা মনে পড়ল ইন্দুর। বাসবীকে দেখে হিংসা হল।

সিনেমার কথায় বাসবী বলল, 'তা বেশ তো, সিনেমা যদি কেউ দেখাতে চায় তবে না দেখে কে। কিন্তু বাংলা ছবি-টবি নয়, রোমিও-জুলিয়েট হচ্ছে ছায়াতে। দেখান তো ওটা দেখতে পারি, সেবার মেট্রোতে এসে ঘুরে গেল, অঞ্জু মঞ্জুরা দেখে এসেছিল দুবোন। বড়লোকের মেয়ে। ভালো বই ওদের কোনটাই বাদ যায় না। দেখব দেখব করে আমার আর সেবার দেখা হল না।'

ইন্দুর পক্ষপাত ছিল বাংলা ছবির উপর। কিন্তু বাসবীর মতেই মত দিতে হল। ওর জন্যেই তো সব। ম্যাটিনি শোয়ে যেতেও বাসবী রাজী হল না। ঠোঁট উলটিয়ে বলল, 'দূর দূর। দিনের বেলায় আবার কেউ ছবি দেখে নাকি—রাত না হলে কি নাটক জমে?'

ইন্দু ঠোঁট টিপে হাসল, 'তা তো ঠিকই।'

তাই সময়ের ব্যাপারেও ওর সঙ্গে সায় দিল ইন্দু।

অফিস থেকে ফেরার পথে অনুপম স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

জামাকাপড় পরে চিন্ময় তখন বেরুবার উদ্যোগ করছে, ইন্দু ঢুকল ঘরে, 'শোন, একটা কাজ করতে হবে।'

চিন্ময় বলল, 'বলুন। কিন্তু আমাকে তো কোন কাজের মানুষ বলে মনে করেন না আপনি।'

ইন্দু গম্ভীর হয়ে বলল, 'ভারি আফশোস না? কিন্তু আজকে হঠাৎ মনে হল, তোমার মত কাজের মানুষ আর দুটি নেই। শোন, তিন মণ চাল যোগাড় করে দাও দেখি আমাকে ব্ল্যাক মার্কেট থেকে।'

চিন্ময় বিস্মিত হয়ে বলল, 'বলেন কি, অত চাল দিয়ে কি হবে, এই রেশনের দিনে অত চাল পাবই বা কোথায়?'

ইন্দু হেসে উঠল, 'যারা সত্যি সত্যি কাজের মানুষ তারা জানে কোন্ জিনিস কোথায় পাওয়া যায়। চালের কথায় তারা ঘাবড়ে যায় না। শোন, চাল না, তিনখানা সিনেমার টিকিট। ছায়াতে রোমিও-জুলিয়েট হচ্ছে তার টিকিট। হদিশ দিয়ে দিচ্ছি, কাউণ্টারের সামনে দাঁড়ালেই পাওয়া যাবে।'

চিন্ময় বলল, 'বাঁচলুম, চালের কথাটা তা হলে চাল?'

ইন্দু বলল, 'এবার আর তোমাকে পায় কে? নিজের রাজ্য ফিরে পেয়েছ। কাজ নয় কেবল কথা। এরপর আধঘণ্টা ধরে অনুপ্রাসে অনুপ্রাসে ত্রাস ধরিয়ে ছাড়বে। শোন, তিনখানা টিকিট কিন্তু আমার আজই চাই।'

চিন্ময় বলল, 'গরজটা খুব বেশি বলে মনে হচ্ছে যেন। তিন জন কে কে ?'

ইন্দু মুখ টিপে হাসল, 'অনুমান কর।'

'অনুপমদা তো নিশ্চয়ই যাবেন।'

ইন্দু বলল, 'না গো না, অত ভয় নেই তোমার। তিনি যাবেন না! শুধু আমরা দুজন আর সঙ্গে একজন অনুপমাকে ধরে নিয়ে যাব।' ইন্দু মিটিমিটি হাসতে লাগল।

চিন্ময় তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটু কাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি কেবল একজন অনুপমাকেই জানি।'

সেই দৃষ্টির সামনে হঠাৎ ইন্দুর মুখের হাসি নিভে গেল। ঢিপঢিপ করতে লাগল বুকের মধ্যে। একটু বাদে বলল, 'ওমা, টাকা আনতে তো ভুলে গেছি। ওপর থেকে টাকা নিয়ে আসি, দাঁড়াও।'

টাকা নিয়ে নেমে এসে ইন্দু দেখল চিন্ময় ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে।

পর দিন ব্যাপারটা টের পেয়ে তিলু আর মিনু বায়না ধরল তারাও যাবে সিনেমায়। কিন্তু ওদের আর কি করে নিয়ে যাওয়া যায়। তিনখানা তো মাত্র টিকিট। তাছাড়া ওরা ও ছবি বুঝবেই বা কি।

ইন্দু তাদের বলল, 'তোমরা আর-এক দিন যেয়ো। ভালো ছবি দেখাবো তোমাদের।'

কিন্তু দুজনেই নাছোড়বান্দা।

ইন্দু তখন স্বামীকে বলল, 'এক কাজ কর, ওদের তুমি আর-একটা বাংলা ছবি-টবি দেখিয়ে নিয়ে এসো।'

হৈমবতী বললেন, 'কেন, ওদের সঙ্গেই নিয়ে যাও না ইন্দু। ওদেরও তো দেখতে ইচ্ছা করে। যাই কর আজ কিন্তু আর আমার কাছে গছিয়ে যেও না বাপু। মিনু তো কাল কেঁদেই অস্থির।'

অনুপম বলল, 'আচ্ছা আমি ওদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি।'

কিন্তু বেশিক্ষণ অনুপম বাইরে রইল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ইন্দুদের বেরুবার অনেক আগেই এসে হাজির হল। আউটরাম ঘাট থেকে তাদের স্টীমার দেখিয়ে এনেছে অনুপম, খেলনা কিনে দিয়েছে, মিষ্টি খাইয়েছে দোকানে। কথা দিয়েছে পরের রবিবারে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আনবে। দুজনেই খুব খুশী। কেবল অনুপমকেই একটু ভার-ভার দেখাল।

ইন্দু স্বামীর মনের ভাব বুঝে বলল, 'এক কাজ কর! চিন্ময় আর বাসবীকে নিয়ে তুমিই দেখে এস সিনেমা।'

অনুপম চটে উঠে বলল, 'সিনেমা আমি কোনদিন দেখি নাকি যে দেখব? ওসব ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না।'

সময় বেশি নাই। গড়পারে আবার খানিকটা দেরি হবে। ইন্দু তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিল। চওড়া কালো-পেড়ে শাদা খোলের তাঁতের শাড়ি পরল। হাতে শাঁখার সঙ্গে শুধু দুটি চুড়ি। গলায় সরু হার। কানে স্বর্ণাধারে গাঢ় রক্তবর্ণের দুল, ফুল বসানো। কপালের মাঝখানে মাঝারি আকারের সিঁদুরের ফোঁটা। সিঁথি সিঁদুরের রক্তরাগে রঞ্জিত। শাদা ব্লাউজের হাতায় শুধু একটুখানি সরু সবুজের ঘের। আর কোন রঙ নেই। আর রঙ আছে চুলে। গভীর কালো রঙ। সে রঙ জমাট বেঁধে আছে ঘনবদ্ধ কবরীতে।

জানালার শিকের ফাঁকে চিন্ময়ের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় তাড়াতাড়ি মাথার আঁচল তুলে দিল ইন্দু, তারপর দোরের কাছ থেকে বলল, 'কি, হলো তোমার ?'

চিন্ময় বলল, 'আমার হতে আর কতক্ষণ লাগবে। গেঞ্জির ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে নিলেই হয়। আপনার 'হওয়ার' জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। চমৎকার হয়েছে কিন্তু।'

শেষ কথাটা একটু নিচু গলাতেই বলল চিন্ময়।

ইন্দু লজ্জিত ভঙ্গিতে মৃদু হাসল, 'কি যে বল।'

কিন্তু অনুপম কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে দুজনের কেউ লক্ষ্য করে নি।

গম্ভীর গলায় স্ত্রীকে সে ডকেল 'শোন।'

ইন্দু একটু চমকে উঠে মুখ ফেরাল, 'কি বলছ ?'

অনুপম বলল 'তোমার আক্কেলখানা কি। এই বেশে কেউ আত্মীয়কুটুম্বের বাড়িতে যায়। কেন আমি কি ফকির হয়ে গেছি, না তুমি বিধবা হয়েছ। ওপরে চল, শাড়ি বদলে নেবে।'

ইন্দু দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা একটু চেপে ধরে নিজেকে সামলে নিল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'কেন এ শাড়িতে দোষ করল কি ? আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়িতে বিয়ে-অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ রাখতে তো আর যাচ্ছি না, যাচ্ছি সিনেমায়। যা পরেছি এতেই চলবে।'

অনুপম বলল, 'না চলবে না, আমি বলছি চলবে না। ওপরে চল শিগগির।'

বাদ-প্রতিবাদ করে লাভ নেই। চিন্ময় দাঁড়িয়ে সব শুনছে। ইন্দু স্বামীর পিছনে নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

চাবি নিয়ে অনুপম নিজের হাতে ট্রাঙ্ক খুলল। বেছে বেছে বার করল গোলাপী রঙের জর্জেট। গতবছর পুজোর সময় কিনে দিয়েছিল। স্ত্রীকে বলল, 'এইখানা পর।'

ইন্দু বলল, 'নিজের পছন্দমত শাড়িখানাও পরতে পারব না ?'

অনুপম বলল, 'তোমার পছন্দমতই তো আজকাল সব হচ্ছে। আমার পছন্দমত দু-একটা জিনিস হোক না, তাতে ক্ষতি কি।'

কথার জবাব দিতে গেলে ঝগড়া বাধবে। পাশের ঘরে গিয়ে শাড়ি ব্লাউজ বদলে এল ইন্দু।

কিন্তু কেবল শাড়ি বদলেই রেহাই নেই। অনুপম বলল, 'হার আর আর্মলেটটা পরে নাও।'

ইন্দু বলল, 'হার তো পরেই আছি।'

অনুপম বলল, 'না, নেকলেশটাই পর, বেশ মানাবে। ওগুলি তো পরবার জন্যই করা হয়েছে, না-কি ?'

একে একে সবই পরে নিল ইন্দু, তারপর বলল, 'এবার হয়েছে তো ?'

অনুপম স্ত্রীকে টেনে এনে আয়নার কাছে দাঁড় করিয়ে দিল, 'নিজেই দেখ হয়েছে কি-না ? আগের চেয়ে ঢের চমৎকার দেখাচ্ছে, তা তুমি স্বীকার কর আর নাই কর।'

ইন্দু একটু হাসল, 'অস্বীকার করবার কি আর জো আছে !'

'জো নেই, তা জানো ?'

বলেই হঠাৎ স্ত্রীকে জোর করে বুকে চেপে ধরল অনুপম। তারপর ডানদিকের গালে গভীর চুম্বনের চিহ্ন একে দিল।

একটুকাল স্তব্ধ রুদ্ধশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দু। আয়নায় চেয়ে দেখল গালে রীতিমত দাগ ফুটে উঠেছে। তারপর অনুপমের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ছি ছি, কি করলে বল দেখি, আমি এবার বেরোই কি করে। আমি আর যাব না, তুমি চিন্ময়কে না করে দাও।'

অনুপম অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'তাই কি হয়, বেচারা কত শখ করে টিকিট কেটে এনেছে, যাও ঘুরে এসো গিয়ে। তা ছাড়া বাসবীও তো বসে থাকবে।'

যাওয়ার জন্য অনুপম এবার বারবার তাড়া লাগাতে লাগল।

ইন্দু আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে স্নো-পাউডারের প্রলেপে গালের দাগ ঢাকতে চেষ্টা করল। মাথার ঘোমটাটা আর-একটু টেনে দিল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে নেমে গেল নিচে। অনুপম নিজে ওদের ট্রাম লাইন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। চিন্ময়ের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসল অনুপম। ঠিক হয়েছে. এবার ঠিক হয়েছে। চিন্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনুপমের স্ত্রীই যে যাচ্ছে এখন আর তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। অনুপমের আর সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই। তার রুচি ইন্দুর সর্বাঙ্গ ঘিরে রেখে তাকে আগলে নিয়ে চলেছে। তা ছাড়া অনুপমের সালঙ্কারা স্ত্রী রাজেন্দ্রাণী ইন্দুর কাছে চিন্ময়কে কেউ গোমস্তা কি বাজার-সরকারের বেশি ভাবতে পারবে না।

ট্রামে পাশাপাশিই বসল দুজনে। অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর চিন্ময় বলল, 'বেশটা জমকালো করেই এলেন শেষ পর্যন্ত।'

ইন্দু বলল, 'এলামই বা। ওপরের বেশটাই কি সব ?'

চিন্ময় আর কিছু বলল না।

দোরের কাছে বাসবী দাঁড়িয়ে ছিল। চিন্ময় আর ইন্দুকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি

ভিতরে সরে গেল। চিন্ময়কে বাইরের ঘরে মামার কাছে বসিয়ে রেখে ইন্দু বাসবীর পিছনে পিছনে এসে বলল, 'ব্যাপার কি, এখনো তৈরী হয়ে নিস নি যে!'

বাসবী বলল, 'আমি তো ভাবলাম, আপনারা আজ আর আসবেনই না। এখানে এসে চা খাবেন তাই তো কথা ছিল।'

ইন্দু বলল, 'চা একবার বাড়ি থেকেই খেয়ে এসেছি। আর দেরি করিসনে।'

বাসবী একটু হাসল, 'তোমরা যত খুশি দেরি করতে পার, কেবল আমি দেরি করলেই দোষ।'

তক্তাপোশের ওপর দু-তিনখানা শাড়ি ছড়ানো। একখানা কমদামী তাঁতের, আর একখানা নকশীপাড় কিন্তু সাদা খোলের মিলের শাড়ি। তৃতীয়খানা পুরোন জর্জেট। একটা জায়গায় একটু দাগ ধরেছে।

ইন্দু বলল, 'কি টুলু বুঝি শাড়ি সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারছে না?'

মামীমা বললেন, 'আর বোলো না মা। ওর যে-কোন একখানাই তো পরে বেরোনো চলে। সিনেমা দেখতেই তো যাচ্ছিস, আর কোথাও তো যাচ্ছিস নে। কিন্তু মেয়ের মনই ওঠে না। ভালো শাড়িখানা পরশুদিন লণ্ড্রীতে আর্জেন্ট ধুতে দিয়েছিল। বৃষ্টির জন্য আসে নি। উনি বলেছেন সামনের মাসে আবার একখানা এনে দেবেন। একটা লোকের উপর অত চাপ দিলে কি আর চলে ইন্দু। মুখ তো আর একটি দুটি নয়। সবাইকে দানাপানি যুগিয়ে তবে তো বাবুগিরি বিলাসিতা।'

বাসবী বলে উঠল, 'কে করতে চাইছে বিলাসিতা। বাবুগিরির খোঁটা দিচ্ছ! বাবুগিরির মধ্যে তো হেঁটে কলেজে যাই, আর হেঁটে আসি। সব বই কিনতে পারিনে, পরের বই ধার করে এনে পড়ি, পড়া টুকে নিই। এমন বাবু-গিরির পড়া ছেড়েদিয়ে কালই আমি চাকরি খুঁজব। তুমি ভেব না, আমার জন্য আর কোন খরচ হবে না তোমাদের।'

ইন্দু বলল, 'ছিঃ, অমন করে বলে নাকি মাকে। কি লেখাপড়া শিখছিস তোরা কলেজে!'

বাসবী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'চুপ করুন ইন্দুদি। কলেজে লেখাপড়া না শিখেও আপনি অনেক কিছু শিখেছেন তা দেখতে পাচ্ছি।'

ইন্দু মামীমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আপনি একটু বাইরে যান মামীমা, আমি ওকে শান্ত করে নিয়ে যাচ্ছি।'

ছোট ছেলে-মেয়েরা দোরের কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। মামীমা তাদের তাড়া দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

দেয়ালে বড় একখানা আয়না ঝুলানো। হঠাৎ তার দিকে চোখ পড়ায় বাসবীর ক্ষোভের কারণ এতক্ষণে যেন বুঝতে পারল ইন্দু। সত্যি, নিজের এই চটকদার বেশবাসের কথা এতক্ষণ তার মনেই ছিল না। এ সজ্জা তো তার নিজের নয়, আর-একজনের।

কী করে খেয়াল থাকবে।' একটু চুপ করে থেকে ইন্দু বলল, 'তোর জামাইবাবুর যত সব কাণ্ড! জানিসই তো, সাজ-সজ্জার ঘটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। তবু তিনি জোর করে—। আমি কেবল কেলেঙ্কারির ভয়ে—। তা এক কাজ কর। আমার এই শাড়ি আর হার তুই পর, এইমাত্র পাট ভেঙে পরে এসেছি। তোর ওই সাদা খোলের মিলের শাড়িখানা আমাকে দে, ওতেই হয়ে যাবে আমার।'

মাথার আঁচল পড়ে গিয়েছিল ইন্দুর। বাসবী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিল। ইন্দুর কথার জবাবে সে অল্প একটু হাসল, 'থাক ইন্দুদি, থাক। আর ভদ্রতা করে কাজ নেই আপনার। খুব হয়েছে।'

বাসবী এবার যেন বুঝতে পারছে তাকে সেদিন দেখতে এসে চিন্ময় কেন অত উদাসীন হয়ে রয়েছিল। অবজ্ঞা দিয়ে কেন অমন করে অপমান করেছিল তাকে।

ইন্দু বলল, 'কেন তুই অমন করছিস টুলু, হয়েছে কি? তুই আমার বোন না? আমার শাড়ি-গয়না পরলে তোর অপমান হয়?'

বাসবী বলল, 'মান-অপমানের কথা নয় ইন্দুদি, প্রবৃত্তি-অপ্রবৃত্তির কথা। আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু অন্যের ব্যবহার করা কোন জিনিস নিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। সাত জন্ম শাড়ি-গয়না না পরলেও নয়, সাত জন্ম বিয়ে না হলেও নয় ইন্দুদি।'

বাসবী ফের একটু হাসল। আর সে হাসি দেখে শিউরে উঠল ইন্দু। এ হাসি সে আরো একজনের মুখে দেখেছে।

ইন্দু বলল, 'কি, কি বললি!' সঙ্গে সঙ্গে আয়নার ডানদিকের গালে রক্তাভ চিহ্নটি চোখে পড়ল ইন্দুর।

বাসবী বলল, 'কিছু বলি নি ইন্দুদি। আমার খুব মাথা ধরেছে; আপনারা যান, দেখে আসুন গিয়ে সিনেমা। আমি আজ আর যাব না', বলে বাসবী তক্তাপোশের ওপর বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল।

ইন্দু মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। বাসবীকে কিছু বলতে পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি হল না।

মামীমা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছিলেন। তিনি এবার বললেন, 'ওকে আর সাধাসাধি করে লাভ নেই ইন্দু। বড় একগুঁয়ে মেয়ে। একবার যখন না বলেছে, তখন আর হাঁ করাবে এমন কারো সাধ্য নেই। তোমরাই যাও। ও না যেতে চায় না গেল!'

ইন্দু বলল, 'আচ্ছা।'

বাইরের ঘরে এসে ঢুকতেই মামা বললেন, 'কি-রে, টুলু এল না?'

ইন্দু মাথা নেড়ে বলল, 'সোনামামা, ওর নাকি মাথা ধরেছে। চল চিন্ময়।'

মামা বললেন, 'সে কি, এক ভদ্রলোককে নিয়ে এলি, চা-টা কিছু খেলিনে।'

ইন্দু একটু ম্লান হাসল, 'চা আর-একদিন এসে খাব সোনামামা। আজ আর সময় নেই।'

বাইরে এসে খানিকটা পথ এগিয়ে ইন্দু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা হিংসা দ্বেষটা কাদের বেশি, পুরুষদের ?'

চিন্ময় বলল, 'এ কথা বলছেন যে !'

ইন্দু বলল, 'ইচ্ছা হল তাই বললাম। আমার কথার জবাব দাও।'

চিন্ময় একটু হাসল, 'আমার জবাবটা আপনাদের অনুকূলে হবে না। মেয়েদের হিংসা অনেক গুণে বেশি। সেই তুলনায় পুরুষরা রীতিমত অহিংস পরমহংস।'

ইন্দু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দেখ, সিনেমা দেখতে আর ইচ্ছা করছে না। কেন যেন ভারি খারাপ লাগছে অথচ অতগুলি টাকা দিয়ে কেনা টিকিট—'

চিন্ময় বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে। সিনেমা হাউসটা খুব বেশি দূরে নয় এখান থেকে। যাওয়ার পথে হয়ে যাব। কেউ টিকিটগুলি নেয় তো নিল। না নেয় কটা টাকা লোকসানই যাবে না হয়। আপনার লোকসানের চেয়ে তো আর তার পরিমাণ বেশি নয়।'

ইন্দু চমকে উঠল, 'আমার আবার কী লোকসান হতে যাবে ?'

চিন্ময় বলল, 'না হলেই ভালো। একটা রিকসা নিই, না ট্রামে যাবেন ?'

ইন্দু বলল, 'না না হেঁটেই চল, বেশ লাগছে হাঁটতে। ছবি দেখবার তো আর গরজ নেই আমাদের। তার চেয়ে শহর দেখতে দেখতে যাই। অনেকদিন এমন করে হাঁটিনি রাস্তায়। বেশ লাগে হাঁটতে।'

দেরি হয়ে গেলে টিকিটগুলি আর বিক্রি হবে না সে কথাটা আর বলল না চিন্ময়।

হাঁটতে ভালোই লাগছিল। রোদ নেই। গাঢ় কালো নয়নাভিরাম মেঘে আকাশ ঢেকেছে। দুপুরে খুব গরম পড়েছিল। এবার খুব ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সে হাওয়ায় কেবল দেহ নয়, ইন্দুর মনটাও জুড়িয়ে গেল।

অনেক দিন—অনেকদিন যেন এমন খোলা আকাশের নীচে শহরের মাঝখানে দাঁড়ায় নি ইন্দু। শহর মানে ছিল চার-দেয়াল-ঘেরা ঘর, ঘরের বাইরে যে পৃথিবীর আরো অস্তিত্ব আছে তা যেন এতদিন মনেই পড়ে নি। আজ পড়ল। মনে পড়ল, চোখে পড়ল। এই মেঘ আর মেঘবতী নগরী দেখে ইন্দুর মনে রইল না আজ কি উদ্দেশ্যে সে বেরিয়েছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কি হয় নি, কে তাকে অপমান করেছে কি করে নি।

যেতে যেতে ইন্দু বলল, 'ছেলেবেলায়—ঠিক ছেলেবেলায় নয়, তের-চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত কলকাতার রাস্তায় এমন অনেক বেড়াতাম। মাঝে মাঝে গাড়িতে, মাঝে মাঝে হেঁটে। সার্কাস দেখেছি আর সিনেমা। বাবা ভারি ঘুরতে ভালোবাসতেন আমাকে

নিয়ে। মা মারা যাওয়ার পর থেকে আমিই ছিলাম তাঁর একমাত্র সঙ্গী। কোন সুখ দুঃখের কথাই তিনি আমার কাছে গোপন করতেন না। ঠিক বন্ধুর মত। তেমন আর পেলাম না।'

চিন্ময় বলল, 'বন্ধুর মত আর কাউকেই পান নি তারপর ?'

ইন্দু চিন্ময়ের দিকে তাকাল, তারপর একটু হেসে বলল, 'তুমি কি অন্য জবাব আশা করছিলে ? কিন্তু বন্ধু কি অত ঘন ঘন পাওয়া যায়, না-কি বন্ধু হওয়াই খুব সহজ ?'

একটু বাদে দুজনে সিনেমা হাউসের সামনে এসে দাঁড়াল। একখানা টিকিট প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে গেল। আর দুখানার ক্রেতা মিলল না।

চিন্ময় বলল, 'চলুন ফিরি।'

ইন্দু বলল, 'আর টিকিট দুটো ?'

চিন্ময় বলল, 'ও দুটো অক্ষত আর আর অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার স্যুটকেসে। দেখুন, টাকা দিয়ে আর যে-কোন জিনিসই কিনি, অক্ষত ভাবে ঘরে নিয়ে যাওয়া যায়। শুধু সিনেমার টিকিটের বেলায় এই ব্যতিক্রম। পুরো টাকা দিয়ে ছেঁড়া টিকিট পকেটে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। আমরা আজ আস্ত টিকিট নিয়েই ফিরে যেতে পারব, এটা কম ভাগ্যের কথা নয়।'

ইন্দু হেসে বলল, 'থাক, আর ভাগ্য নিয়ে হায়-আফসোস করতে হবে না, তার চেয়ে চল ভিতরেই যাই। ছবি দেখি। বোধ হয় এতক্ষণে আরম্ভ হয়ে গেছে।'

কাউণ্টারের ভদ্রলোক বললেন, 'না না, আসল বই আরম্ভ হতে দেরি আছে এখনো, সবে নিউজ রীল চলছে। যান না, ভিতরে গিয়ে বসুন না আপনারা।'

ঘণ্টা দুই বাদে দুজনে বেরিয়ে এল। অশান্ত বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। সন্ধ্যার শোতে যারা এসেছিল তারা অনেকেই দোরের সামনে এসে ভিড় করে রয়েছে। ট্রাম-বাস সব বন্ধ। কেবল দু-একটা ঘোড়ার গাড়ি আছে, আর ট্যাক্সি।

চিন্ময় বলল, 'একটা ট্যাক্সিই ডাকি।'

ইন্দু বলল, 'না না, অত খরচ করে কী হবে, তার চেয়ে বরং বৃষ্টিটা থামুক।'

চিন্ময় বলল, 'তা হলে চলুন, একটু চা খেয়ে নিই।'

ইন্দু একটু ইতস্তত করে বলল, 'চল'।

কাটা দরজা ঠেলে ছোট কেবিনে গিয়ে বসল দুজনে। এতক্ষণ পাশাপাশি ছিল। এবার মুখোমুখি।

চায়ের কাপের মধ্যে চামচ নাড়তে নাড়তে ইন্দু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা তুমি এতে বিশ্বাস কর ?'

চিন্ময় বলল, 'কিসে ?'

'এই প্রেমে ? একজন আর-একজনকে কি এমন ভালোবাসতে পারে যে তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দেয় ?'

চিন্ময় বলল, 'করি।'

ইন্দু একটু হাসল, 'কর ? আশ্চর্য !'

চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছেন যে ?'

ইন্দু বলল, 'হাসছি এই ভেবে যে প্রেমের ওপর এত বিশ্বাস তোমার এল কোত্থেকে। সংসারের অনেক জিনিসই তো তুমি বিশ্বাস কর না, অনেক ব্যাপারেই তো তোমার আস্থা নেই।'

চিন্ময় কথাটির সোজা জবাব না দিয়ে বলল, 'দেখুন আমি যে কী, আর কী না, তা আপনি যত সহজে বলতে পারেন, আমি তত সহজে বুঝতে পারিনি। যখন কোন একটি মেয়ের ভালোবাসায় আমি গভীর ভাবে বিশ্বাস করি, তখন সেই বিশ্বাসের অতলতায় আমার সব সংশয় তলিয়ে যায়। তখন এক হিসাবে আমি পরম আস্তিক। যখন তুমি আমি আছি তখন সব আছে।'

ইন্দুর গা শিরিশির করে উঠল। কিন্তু কৌতুকের হাসিতে চিন্ময়ের ভাবাবেগ উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলল, যাক। আস্তিক কথাটার একটা নূতন মানে শেখা গেল তোমার কাছে। তারপর যখন দেখলে যাকে তুমি ভালোবাসো, সে তোমাকে মোটেই ভালোবাসে না, তখন বুঝি মনের দুঃখে ব্যর্থ প্রেমে ফের নাস্তিক হয়ে পড়বে ?'

চিন্ময় ইন্দুর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে দেখল, তারপর বলল, 'তা না-ও হতে পারি। প্রেম ব্যর্থ হলেই তো আর প্রেমের অনুভূতি ব্যর্থ হয় না। প্রেম ব্যর্থ হলেই তো আর প্রেমের গল্প ব্যর্থ হয় না।'

ইন্দু এ-কথার কোন জবাব দিল না। হয়তো কী জবাব দেবে ভেবে পেল না। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, 'থাক এখন ওসব। তোমার কাপে আর একটু চিনি দেব ?'

চিন্ময় ঘাড় নেড়ে বলল, 'দিন। কিন্তু আপনি বোধহয় জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলেন রোমিও-জুলিয়েট আজকালকার দিনে সত্যি কিনা। বাস্তব জীবনে ওদের আজকাল পাওয়া যায় কি না। কেবল আজকের নয়, ওরা চিরকালই দুর্লভ। অমন সর্বাত্মক প্রেমের স্বাদ আমাদের জীবনে খুব কমই মেলে। তবু যেটুকু পাই তাতেই বুঝি ওরা আছে ; যতটুকু পাই, আর যতখানি না পাওয়ার দুঃখ পাই, সব কিছু মিলিয়ে টের পাই ওরা আছে আর ওদের মধ্যে আমরা আছি।'

আমরা। ছি-ছি-ছি। কাদের কথা বলছে চিন্ময়। নিশ্চয়ই তাদের কথা নয়। ওর কাণ্ডজ্ঞান কি অমন লোপ পেতে পারে!

তবু ফের এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করল ইন্দু। ভাবল চিন্ময়কে বাধা দেয়। এসব কথা চিন্ময় কেন আর কাছে বলছে। সে এসব শুনে কী করবে। তা ছাড়া ইন্দুর এসব শোনাই কি উচিত ? কিন্তু ওকে বাধা দিতেও যেন ইন্দুর লজ্জা করতে লাগল। তার চেয়ে নির্বাক থেকে নিজের অস্তিত্ব গোপন রাখা ভালো, ও নিজের মনে যা বলছে

বলে যাক। ওর কোন কথা কানে না তুললেই হল। কিন্তু আশ্চর্য্য কানে না তুলেও পারা যায় না। সব কানে যায়।

চিন্ময়কে অবশ্য বাধা দিতে হল না। সে আপনিই হঠাৎ থেমে গেল। চা শেষ করে চুপচাপ বসে রইল—চেয়ে রইল।

ইন্দুর মনে হল এর চেয়ে ও যে এতক্ষণ কথা বলছিল তাই যেন ভালো ছিল।

খানিক পরে ইন্দু বলল, চল এবার উঠি। বৃষ্টি এতক্ষণে থামল বুঝি। তিলু আর মিনু বোধ হয় না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।'

চিন্ময় হঠাৎ ভারি বিদ্বেষ বোধ করল। তিলু আর মিনু। কে তারা! কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জিত হল।

এবার একটি দুটি বাস চলাচল করছে। তাতে অত্যন্ত ভিড়। শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সিতেই ফিরতে হল।

দোরের সামনেই দেখা হল অনুপমের সঙ্গে। সে আজ আর ঘুমায়নি। সদরে পায়চারি করছে।

হঠাৎ এই বিনিদ্র অস্থির আর-একটি পুরুষের দিকে তাকিয়ে চিন্ময় থমকে গেল। শুধু ভয়ে নয়, লজ্জায়। ইন্দুর স্বামী অনুপম বলে যে কেউ একজন আছে, এতক্ষণ তা যেন চিন্ময়ের খেয়ালই ছিল না। অনুপমের উদ্বেগ, তার দুশ্চিন্তা, তার ঈর্ষা, চিন্ময় নিজের ভিতরে অনুভব করল, করবার চেষ্টা করল। এতক্ষণ ইন্দু যেন তার কাছে ছিল, 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ—।' কিন্তু তা তো নয়। ইন্দু সবই, ইন্দুর সব আছে। সব ইন্দুকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে, সকলের কাছে ওকে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। কিন্তু চিন্ময় কেন ফিরে আসতে পারছে না। তার একি দুর্বলতা, আত্মপরতা। ওকে যদি ভালোবাসতে হয়, ওর সব ভালোবাসতে হবে। কিন্তু তা শক্ত, বড় শক্ত।

অনুপম বলল, 'কি হে, সিনেমা দেখা হল তোমাদের?'

চিন্ময় বলল, 'হ্যাঁ।' তারপর একটু কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল, 'বৃষ্টির জন্য এতক্ষণ আটকা পড়ে গেলাম।'

অনুপম বলল, 'বৃষ্টি তো অনেকক্ষণ থেমেছে।'

আর কিছু না বলে চিন্ময় সোজা তার ঘরে চলে গেল।

অনুপম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে স্ত্রীর দিকে ফিরে চেয়ে বলল, 'চল। না কি, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রাতটা কাটিয়ে দেবে। বাকি রাতটুকু বাইরে কাটিয়ে এলেও তো হত।'

ইন্দু বলল, 'কী যে বল। এই তো সবে সাড়ে দশটা। আর কী বৃষ্টি এতক্ষণ!'

রাত্রে স্ত্রীর পাশে শুয়ে অনুপম জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর, চিন্ময় আর টুলুর কি রকম আলাপ-টালাপ হল? বিয়ে করতে রাজী হল চিন্ময়?'

ইন্দু বলল, 'টুলু গেলই না।'

অনুপম বলল 'গেল না মানে?'

ইন্দু তখন সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলল স্বামীকে, তার শাড়ি-গয়না দেখে বাসবীর হিংসার কথা অনেকখানি করে বলল কিন্তু আর-এক হিংসার কথা একটুও উল্লেখ করল না।

অনুপম বলল, 'ও, তাহলে শুধু তোমরা দুজনেই গিয়েছিল সিনেমায়। গোড়া থেকেই আমার যেন সেই রকম একটা ধারণা হচ্ছিল। তাহলে যা ভেবেছিলাম তাই। বাসবী-টাসবী সব বাজে।'

ইন্দু বলল, 'কী যা-তা বলছ। টুলু যদি না যায় আমি কী করতে পারি!'

অনুপম বলল, 'টুলু যে কেন যায়নি, এবার তা বুঝতে পারছি।'

ইন্দু এবার এগিয়ে এসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল, 'শোন, তুমি অমন করে বোলো না। তোমার ভাবভঙ্গি দেখে আমার ভয় হচ্ছে।'

স্ত্রীর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল অনুপম, বলল, 'থাক থাক, তোমার আবার ভয়! ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। ঠানদি বলতেন কথাটা। তুমি ও তিনটেই ছাড়িয়ে গেছ।'

পাশের ঘরে মিনু চেঁচিয়ে উঠল। ইন্দু উঠে গিয়ে মেয়েকে কোলে করে নিয়ে এসে দুজনের মাঝখানে শুইয়ে দিল।

দু-তিন দিনের মধ্যে ইন্দু আর চিন্ময়ের ঘরের দিকে গেল না। চোখে চোখে পড়লেও কথা বলল না তার সঙ্গে। নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। কিন্তু তবু অনুপম প্রায় উঠতে বসতে প্রত্যেক কথায় চিন্ময়ের ইঙ্গিত দিতে লাগল। একবার বলল, 'কি, আবার কবে যাওয়া হচ্ছে সিনেমায়? এবার যেদিন যাবে সেদিন বোধ হয় আর কাক-পক্ষী জানতে পারবে না।'

ইন্দু বলল, 'আচ্ছা, তুমি কী শুরু করেছ বল তো। জানো, এ রোগে মানুষ পাগল পর্যন্ত হয়ে যায়।'

অনুপম স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'হ্যাঁ, তাই তো এখন বাকি। আমাকে পাগল বলে রটিয়ে দিয়ে যদি একবার গারদে পাঠাতে পার তাহলে আর কোন অসুবিধে থাকে না। নিচের মানুষকে একেবারে অনায়াসে ওপরে তুলে নিতে পার।'

ইন্দু বলল, 'ছি ছি, তোমার সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হয়।'

অনুপম বলল, 'তা তো এখন হবেই।'

ইন্দু ভেবে পেল না কেন এই রোগ অনুপমের মাথার ভিতরে ঢুকেছে। এ ধরনের সন্দেহ প্রবণতা তো তার কোনদিনই ছিল না। প্রথম যৌবনে নিজের বন্ধুবান্ধব দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে অনুপম নিজে যেচে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে ভালো করে আলাপ না করলে, ঠাট্টা-তামাশায় যোগ না দিলে অনুপম রাগ

করেছে। আর আজ তিরিশ বছর বয়স হয়ে গেছে ইন্দুর, দু-দুটি সন্তানের সে মা হয়েছে, এখন কি না এই বিশ্রী সন্দেহ। অনুপমের পছন্দমত লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না করে আলাপ-আলোচনার মানুষ ইন্দু নিজে বেছে নিয়েছে বলেই কি তার এই আপত্তি। অতি দুঃখে হাসি পেল ইন্দুর। সব থাকতে ওরকম প্রবৃত্তি কেন তার হতে যাবে। বয়স হয়েছে, সংসারের রীতিনীতি ভালোমন্দ সে জেনেছে, মেনেছে, তবু অনুপম তাকে বিশ্বাস করতে পারে না? একজন অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গে দুটো হেসে কথা বললে, কি একা একা একদিন তার সঙ্গে সিনেমা দেখে এলে এতদিনের দাম্পত্য জীবনে এমনি ফাটল ধরবে! বিশ্বাস ভাঙবার দায় পড়বে তার ওপর!

সেদিন থালায় করে মাছ ভেজে রেখেছে। একটু অসাবধান হওয়ায় একখানা মাছ নিয়ে গেছে বিড়ালে। একখানা মাছ কম পড়ল ভাগে। খেতে বসে অনুপম ছেলে মেয়েদের ঠাট্টা করে বলেছিল, 'বিড়াল নয়রে, তোদের মা-ই চুরি করে খেয়েছে মাছখানা! এখন লজ্জায় বলতে পারছে না, বিড়ালের নাম ছিচ্ছে।'

মিনু কিন্তু বিশ্বাস করেছিল কথাটা, বলেছিল, 'তুমি চুরি করে মাছ খেয়েছ মা। তুমি আর পাবে না।'

অনুপম হেসে উঠেছিল, 'নাও হল তো?'

আজও কি অনুপম সেই সরল প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠতে পারে না? বুঝতে পারে না নিজের হেঁসেল থেকে মাছ চুরি করে খাওয়ার মত নিজের এই স্বামীসন্তানের সংসারে চুরি করে আর কাউকে ভালো বাসতে যাওয়াও তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। বাইরের একটা বিড়াল কোন ফাঁকে যদি হেঁসেলে ঢুকেই থাকে তাকে তাড়িয়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু বিড়াল তাড়াবার ভার অনুপম না নিক, ইন্দু নিজেই নেবে। সে নিজেই আজ বলবে গিয়ে চিন্ময়কে, 'তুমি চলে যাও। কলকাতা শহরে আরো অনেক ভাড়াটে বাড়ি আছে, তার একটা খুঁজেপেতে জোগাড় করে নাও তুমি। এখানে আর নয়।'

মনস্থির করে কয়েকদিন বাদে দুপুরের পর ইন্দু আজ আবার ফের চিন্ময়ের ঘরের দিকে গেল। পাশের ঘরে আজও হৈমবতী ঘুমিয়ে রয়েছেন। ইন্দু পা টিপেটিপে দোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল। কিন্তু অবাক কাণ্ড। চিন্ময় তো ঘরে নেই। এসময়ে সাধারণত সে ঘরেই থাকে। আজ গেল কোথায়, ঘর ঠিক আগের মতই এলোমেলো হয়ে রয়েছে। এখানে কতগুলি বই, ওখানে একরাশ পুরান কাগজ। স্যুটকেসের ডালাটা খোলা। তার পাশে অর্ধেক-খাওয়া চায়ের কাপের মধ্যে সিগারেটের ছাই ভাসছে। দেখ দেখি, দামী কলমটি পর্যন্ত বাইরে রেখে গেছে! ছেলেপুলের বাড়ি। এমন অসাবধানে কেউ কোন দামী জিনিস রাখে। কলমের নিচে এক শীট লেখা কাগজ। ইন্দুর বুকের ভিতরটা হঠাৎ ছাঁত করে উঠল। মনে পড়ল তার দূর সম্পর্কের এক খুড়তুতো ভাই পরীক্ষায় ফেল করে এমনি ভাবে চিঠির টুকরো রেখে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল।

আর কিছুতেই তার খোঁজ মেলে নি। এও কি তাই নাকি! বলা যায় না, চিন্ময়ের অসাধ্য কোন কাজ নেই। ইন্দু তাড়াতাড়ি লেখা কাগজখানা হাতে তুলে নিল, তারপর মৃদু হেসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। না, সে ধরনের নিরুদ্দেশ যাত্রার কোন চিঠি নয়। অনেক আকি-জুকি, অনেক কাটাকুটির পর হতাশ প্রেমিক এক টুকরো কবিতা লিখতে পেরেছেন। ইন্দু স্মিতমুখে পড়তে লাগল—

আমার কথার রঙ
কামনার রঙ যদি ঝরে
তার দুটি পাণ্ডু শীর্ণ কপোলে অধরে ;
তবু কি হবে না রাঙা তারা—
এড়াবে না বিধি বাধা, নিষেধ পাহারা।
আমার কথার রঙ
কামনার রঙ যদি ঝরে
পৃথিবীর ফুলে ঘাসে, শিখরে কন্দরে ;
তবু কি হবে না রাঙা তারা—
তার মন, তার মুখ, মুখের কথারা।

কিন্তু ফের পড়তে গিয়ে ইন্দুর মুখের হাসি নিভে গেল। ঢিপঢিপ করতে লাগল বুকের মধ্যে। ছি-ছি-ছি। এসব কী লিখেছে চিন্ময়! কেন লিখেছে। টুকরো টুকরো করে কবিতাটি ছিঁড়ে ফেলল ইন্দু। ছিঃ! মেঝের ওপর ছড়িয়ে দিল টুকরোগুলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ ইন্দু থেমে দাঁড়াল। এই বা সে কী করল। পরের জিনিস নষ্ট করতে গেল ইন্দু কোন্ অধিকারে? এ কবিতা যে তার জন্যই লিখেছে চিন্ময়, তার প্রমাণ কি। হয়তো আর কারো জন্যে, হয়তো কোন কাগজের জন্য লিখে থাকবে। ইন্দু কেন তা নষ্ট করে ফেলল। কারো জিনিস নষ্ট করা মানেই তাকে স্বীকার করা, তার কাছে ঋণী হওয়া। ইন্দু আর কারো কাছে ঋণী হতে চায় না।

মেঝের ওপর উপুড় হয়ে বসে টুকরোগুলি এক জায়গায় জড়ো করল ইন্দু, অনেক কষ্টে মিলাল। নিচে এক শীট সাদা কাগজ ছিল। সুন্দর ছোট ছোট অক্ষরে কবিতাটি চিন্ময়ের কলম দিয়েই তাতে টুকে রাখল ইন্দু। তারপর ঠিক আগের মতই তার ওপর কলমটি চাপা দিয়ে রাখল।

ছেঁড়া টুকরোগুলি এখন কি করা যায়? ফেলে দেবে জানালা দিয়ে? হয়তো কেউ দেখে ফেলতে পারে। পথ থেকে কেউ কুড়িয়ে পড়তে পারে। একটু সাবধান হওয়া ভাল। তার যা কপাল। কবিতার টুকরোগুলো নিজের আঁচলেই গিট দিয়ে নিল ইন্দু। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু আশ্চর্য, মনের মধ্যে গুনগুন করছে একটি লাইন। আমার কথার রঙ, কামনার রঙ যদি ঝরে। কেবল একটি না, তার পরের লাইনগুলিও একটির পর একটি করে আসছে। কী আপদ! বোধহয় সমস্ত কবিতাটা ইন্দুকে ফের

লিখতে হয়েছে বলেই এমন হচ্ছে। ছেলেবেলায় পণ্ডিতমশাই বলতেন—একবার লেখা পাঁচবার পড়ার সমান। লিখলে অনেক বেশি মনে থাকে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ইন্দু। ভারি অদ্ভুত দেখতে ছিলেন পণ্ডিতমশাই, মাথাভরা টাক। মুখখানা যেমন গোল তেমনি বড়। প্রকাণ্ড ভুঁড়িটি আগে আগে চলত। কতদিন যে পিছনের বেঞ্চে বসে ওঁকে দেখে মুখে আঁচল চেপে হেসেছে ইন্দু তার ঠিক নেই। সে কথা মনে পড়ায় ইন্দুর আজও হাসি পেল।

অফিস থেকে ফিরে এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে জামার বোতাম খুলছিল অনুপম। স্ত্রীকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি, এত হাসি কিসের?'

'ইচ্ছা হল হাসলাম। তোমার সংসারে লোকের হাসতে মানা নাকি?'

অনুপম স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হু, কত মানাই তুমি মানো! কোত্থেকে আসা হল? নিচের ঘরে গিয়েছিলে বুঝি? চিন্ময়কে তো দেখলাম মোড়ের চায়ের দোকানটায় বসে চা খাচ্ছে। তবু ঘরখানা দেখে এলে বুঝি? ওর খালি ঘর থেকে একটু ঘুরে এলেও শান্তি, তাই না?'

ইন্দু বলল, 'তোমার মুখে কি আজকাল আর ওসব ছাড়া কোন কথা নেই?' বলে রাগ করে স্বামীর দিকে পিছন ফিরে তাকের উপর থেকে চিনির কৌটাটা নামাতে গেল ইন্দু।

অনুপম বলল, বাঃ বাঃ বেশ বড় একটা পুটুলি বেঁধেছ তো আঁচলে, কি প্রেজেণ্ট পেলে, দেখি দেখি আংটি না হার?'

এগিয়ে এসে অনুপম স্ত্রীর আঁচল চেপে ধরল।

আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে মুখ ফেরাল ইন্দু। সে মুখে রক্ত নেই। কে যেন ছাইয়ের রঙ তাতে মাখিয়ে দিয়েছে।

অনুপম বলল, 'কি আছে এতে?'

ইন্দু ক্ষীণ, শুকনো কণ্ঠে বলল, 'দেখ খুলে।'

অনুপম বলল, 'সে তুমি বললেও দেখব, না বললেও দেখব। হাতে হাতে যখন আজ ধরতে পেরেছি তখন কি আর ছেড়ে দেব?'

গিঁট খুলে কাগজের ছেঁড়া টুকরোগুলি হাতের তালুতে নিয়ে একটু তাকিয়ে দেখল অনুপম, তারপর বলল, 'ও প্রেমপত্তর! তাই বল। আমি ভাবলাম কী না কী। হীরের আংটি না মুক্তোর মালা।'

ইন্দু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল, কোন কথা বলল না।

পরের দিন অফিস থেকে তাড়াতাড়িই ফিরে এল অনুপম। ইন্দু ঘরের মেঝেতে বসে হ্যাণ্ডমেশিনে স্বামীরই একটি শার্ট সেলাই করতে বসেছিল, কিন্তু কিছুতেই মন লাগছিল না, বার বার ছিঁড়ে যাচ্ছিলো সুতো।

অনুপম তা লক্ষ্য করে বলল, আমার জামা আর তোমার মেশিনে উঠতে চাইছে না। কেন মিছিমিছি সুতো নষ্ট করছ।'

ইন্দু একথার কোন জবাব না দিয়ে মেশিন চালিয়ে যেতে লাগল।

অনুপম বলল, 'কলটা থামাও, একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'বল।'

অনুপম বুকপকেট থেকে একখানা খাম বার করে স্ত্রীর হাতে দিল। তাতে চিন্ময়ের নাম-ঠিকানা টাইপ করা।

ইন্দু বলল, 'কী এটা।'

অনুপম বলল, পড়েই দেখ না। মুখ তো আটকানো নয়। এও একরমের প্রেমপত্র বলতে পার।'

'মানে?'

'পড়ে দেখ।'

ইন্দু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমার পড়বার সময় নেই। বলতে হয় বল। তাছাড়া পরের চিঠি আমি কেন পড়তে যাব?'

অনুপম বলল, 'পর! তাই তো? কথাটা বলতে বুক ফেটে গেল না তোমার? কিন্তু বুক ফাটুক আর যাই করুক, ব্যবস্থাটা আমি না করে পারলাম না ইন্দু। চিঠিটা চিন্ময়কে ঘর ছেড়ে দেওয়ার নোটিস। তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে উঠে যেতে হবে। আমি ঘর রিপেয়ার করাব। সে আমার ঘর ভেঙেচুরে নষ্ট করে ফেলছে। উঠে এখান থেকে তাকে যেতেই হবে।'

ইন্দু বলল. 'বেশ তো।'

অনুপম বলল, 'চিঠিটা তুমিই হাতে করে দিয়ে এসো। এ-খামটা পছন্দ না হয় একটা নীল খামের মধ্যে ভরে দাও। বেশ প্রেমপত্র-প্রেমপত্র দেখাবে।'

ইন্দু রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'তোমার ভাড়াটে। নোটিস দিতে হয় তুমি দাও গিয়ে। আমি দিতে পারব না।'

অনুপম বলল, 'তুমি যে দিতে পারবে না তা আমি জানি। চিঠিটা রেজিস্ট্রি করে ডাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। কাল দশটার মধ্যেই ও চিঠি পাবে, এটা তার কপি। যদি ভালোয় ভালোয় এক সপ্তাহের মধ্যে ঘর ছেড়ে দেয় তো মঙ্গল, না হলে ওর কপালে অশেষ দুঃখ আছে। আমি পাড়ার লোকের সামনে ওকে ঘাড় ধরে বের করে দেব।'

অনুপম মুখের ভাষাকে হাতের ভঙ্গিতেও রূপ দিল।

কিন্তু ব্যবস্থাটা তার ভালো লাগল না। নোটিস দিতে গেল কেন অনুপম? তার চেয়ে মায়েমাকে অন্তভাবে বলে দিলেই তো হত? ঢাকঢোল পিটিয়ে লাভ কি!

কিন্তু পিওন এসে চিঠি বিলি করে যাওয়ার দু-তিন দিন পরেও চিন্ময়ের কি হৈমবতীর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, তারা কোন রকম ভয় পেয়েছে বলে মনে হল না। তখন অনুপম গিয়ে দাঁড়াল হৈমবতীর রান্নাঘরের সামনে, 'গাট্টি-বোঁচকা বাঁধছেন তো মায়িমা, আর কিন্তু মাত্র চারদিন মধ্যে আছে।'

হৈমবতী নোটিসের কথা ছেলের কাছে শুনেছিলেন। অনুপমের কথার জবাবে বিরস মুখে বললেন, 'মধ্যে চার দিনই থাকুক, আর চার ঘণ্টাই থাকুক, বাড়িঘর না পেলে তো আর উঠতে পারব না অনুপম।'

অনুপম তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু উঠতে আপনাদের হবেই। বাড়িঘর না পান পথে গিয়ে দাঁড়াবেন। নোটিস দেওয়ার পর থেকে এক সপ্তাহের বেশি একদিনও আমি আপনাদের সময় দেব না। কোথাও না জোটে ফুটপাতে থাকবেন, গাছতলায় থাকবেন। আর সেই হল আপনাদের ঠিক উপযুক্ত জায়গা। কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকবার যোগ্য আপনার ছেলে নয়।'

ইন্দুর সঙ্গে বেশি মেশামেশি করছে বলে গোড়া থেকেই হৈমবতী ছেলের ওপর অপ্রসন্ন ছিলেন। এ সব ব্যাপার নিয়ে বয়স্ক ছেলেকে যতদূর শাসন করা যায় চিন্ময়কে তা তিনি করেছেনও। কিন্তু অনুপমের মুখে ছেলের নিন্দা শুনে তাঁর আর সহ্য হল না, তিনি সম্পূর্ণ ধৈর্য হারালেন, গলা ছেড়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'কি, কি বললে অনুপম! চিন্ময় ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকবার যোগ্য না! কিন্তু পরের ছেলের ঘাড়ে দোষ চাপাবার আগে নিজের পরিবারকে সামলাও অনুপম, নিজের ঘর আগলাও আগে। এতবড় আস্পর্ধা তোমার, আমাকে গাছতলা দেখাতে আস তুমি! কিন্তু তুমি তো তুমি, তোমার মরা বাপ চিতা থেকে উঠে এলেও আমাকে এ ঘর থেকে তুলতে পারবে না। কেন উঠব, মাসে মাসে ভাড়া গুনছি, কেন উঠব?'

চেঁচামেচি শুনে ইন্দুই নিচে নেমে এল, 'মায়িমা থামুন, চুপ করুন।'

বিকৃত মুখভঙ্গী করে হৈমবতী তেড়ে এগিয়ে এলেন, 'চুপ করব! কেন রে, কার ভয়ে? নষ্ট, নচ্ছার! ছেলেটার মাথা খেয়ে, এখন নিজে সতীসাধ্বী সেজে বসেছেন।'

ঠিকে ঝি কলতলায় বাসন মাজছিল। ঝগড়া শুনে সে মুখ মুচকে হাসতে লাগল। ইন্দু তাকে চলে যাওয়ার ইসারা করল। কিন্তু ঝি'র তখন কাজে খুব মন।

ইন্দু হৈমবতীকে বলল, 'আর কেলেঙ্কারি বাড়াবেন না, ঘর ছেড়ে দিয়ে আজই চলে যান আপনারা।'

হৈমবতী বললেন, 'ছেড়ে যাব? তুই আমাকে ঘর ছাড়তে বলবার কে শুনি? আমি আমার ঘরের মধ্যে মরে পড়ে থাকব, তবু ঘর ছাড়ব না। দেখি কার বাপের সাধ্য আমাকে ঘর থেকে তোলে।'

ইন্দুরও আর সহ্য হল না, সেও এবার চড়া গলায় বলল, 'তুই-তোকারি করবেন না মায়িমা। ভদ্রলোকের মত কথা বলুন।'

হৈমবতী বললেন, 'তোরা যে কত ভদ্দর তা আমার জানা আছে।'

এর পর ইন্দুরও মুখ ছুটে গেল। সেও হৈমবতীর অভদ্রতা, সঙ্কীর্ণতার খোঁটা বার বার দিতে লাগল, শেষে বলল, 'তোমাকেও আমার আর চিনতে বাকি নেই, তুমি যে কি রকম ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী, তা আমি তোমার বচন শুনেই বুঝতে পারছি।'

চিন্ময় কাছেই এক বন্ধুর বাসায় গিয়েছিল। ফিরে এসে দুজনের ঝগড়া দেখে, ঝগড়ার ভাষা শুনে মুহূর্তকাল অবাক হয়ে রইল। অনেক কষ্টে মাকে হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে এল চিন্ময়। কিন্তু ইন্দুর মূর্তি দেখে মনে মনে ভারি পীড়া বোধ করল। ভাবতে কষ্ট হল এই মেয়েকে সে ভালোবেসেছে, কবিতা লিখেছে একে নিয়ে, তার দিনের ভাবনা আর রাত্রির স্বপ্নকে ঘিরে রেখেছে এই মেয়ে!

অনুপম কিন্তু মনে মনে খুশী হল। চিন্ময়ের মাকে যে চিন্ময়ের মা বলে মোটেই খাতির করে নি, ছেড়ে কথা বলে নি ইন্দু, তার জন্য বহুদিন বাদে খানিকটা তৃপ্তি পেল অনুপম।

কিন্তু একটু পরেই ইন্দু বলল, 'কাজটা ভালো হল না। ছিঃ।'

ইন্দুর মুখে লজ্জা আর অনুশোচনার ছাপ দেখে ফের ভ্রূ কুঁচকাল অনুপম, বলল, 'ভালো না হবার কি হল। বেশ হয়েছে। ফের যদি চেঁচামেচি করে আর ওসব কথা বলে, আমি পুলিশে খবর দেব।'

ইন্দু বলল, 'ছিঃ। নোটিস দিয়েছিলে দিয়েছিলে, তুমি ফের আবার ও কথা বলতে গেলে কেন?'

অনুপম স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুঁ, দোষটা তো আমারই।'

ইন্দু বলল, 'না, দোষ তোমার নয়, দোষ আমার ভাগ্যের।'

অনুপম বলল, 'ভাগ্য-ভাগ্য কোরো না, দোষ তোমার প্রবৃত্তির।'

ইন্দু নিশ্বাস ছেড়ে চুপ করে রইল। আর বাদানুবাদে যোগ দিল না। মনে মনে ভাবল প্রবৃত্তির দোষ কি তার একার?

মাকে কোন বন্ধুবান্ধবের বাসায় তুলবে বলে ঠিক করল চিন্ময়। নিজে আপাতত একটা মেস-টেস ঠিক করে নেবে। সেই চেষ্টায় বিকেলের দিকে বেরোবার উদ্যোগ করছিল, হৈমবতী ক্লান্ত স্বরে তাকে ডাকলেন, 'আজ আর কোথাও যাসনে চিনু, আয় এখানে বোস এসে আমার কাছে।'

চিন্ময় মার ঘরে এসে দেখল তিনি বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। আজ আবার ফের তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। মার চেহারা দেখে চিন্ময় চমকে উঠল।

সকালের ঝগড়ার ফলটা হৈমবতীর শরীরের পক্ষে মোটেই ভালো হয়নি। সমস্ত দুপুর আর বিকালটা তিনি অশ্রান্ত কেঁদেছেন, নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়েছেন, চিন্ময়কে গালমন্দ করেছেন, অনুপমকেও শাপমন্যি দিতে বাকি রাখেন নি। চিন্ময় কখনো

অনুরোধ করেছে, কখনো ধমক দিয়েছে, কিন্তু কিছুতেই হৈমবতী ক্ষান্ত হন নি।

চিন্ময় মার মাথার কাছে বসে খানিকক্ষণ তার কপালে হাত বুলাল। তারপর এক সময় উঠে পড়ে বলল, 'তুমি একটু চুপ করে থাক মা, আমি এক্ষুনি ডাক্তারবাবুকে একটা খবর দিয়ে আনছি।'

হৈমবতী বাধা দিয়ে বললেন 'না, না, ডাক্তারের দরকার নেই আমার। তুই স্থির হয়ে আমার এখানে বোস তো।'

চিন্ময় বলল, 'আমি তো বসবই মা, সারারাত তোমার কাছে বসে থাকব। তুমি ভেব না আমি এলাম বলে।'

চিন্ময় বেরিয়ে গেল।

আধঘণ্টাখানেক বাদে ব্যোমকেশবাবুর গাড়ি এসে দাঁড়াল 'ভূপতি-ভবনের' সামনে।

ব্যোমকেশবাবু ভিতরে এসে রোগিণীকে পরীক্ষা করে মুখ গম্ভীর করলেন। হৈমবতীর অসুখ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রশ্ন করে মা কি ছেলে কারো কাছ থেকেই যথাযথ সদুত্তর না পেয়ে বিরক্ত হলেন। তারপর বেশ একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতেই বললেন, 'না মশাই, আপনি কোন কাজের নন। সেই মহিলাটি গেলেন কোথায়? আপনার বান্ধবী?' মৃদু হাসলেন ব্যোমকেশবাবু, 'তাঁকে ডাকুন, তাঁকেই সব বুঝিয়ে শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।'

চিন্ময় বলল, 'তিনি আসবেন না।'

ব্যোমকেশবাবু সাদা কাগজে দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে প্রেসক্রিপশন লিখতে লাগলেন। তারপর চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসবেন না? কেন?'

চিন্ময় বলল, 'চলুন ও ঘরে গিয়ে বলব।'

হাতঘড়ির দিকে একটু তাকিয়ে ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'চলুন।'

চিন্ময়ের ঘরে এসে জানালার ধারঘেঁষা চেয়ারটায় বসলেন ব্যোমকেশবাবু। অগোছাল ঘরের অবস্থা দেখে বললেন, 'ঈশ, একেবারে জড়িয়ে ছড়িয়ে রয়েছেন দেখছি! হ্যাঁ, কী বলবেন বলছিলেন? বেশি সময় নেই আমার, আর একটা কেস আছে। এক্ষুনি ছুটতে হবে।'

চিন্ময় বলল, 'তাহলে আজ থাক।'

ব্যোমকেশবাবু একটু হাসলেন, 'অমনি রাগ হয়ে গেল? নাঃ আপনাকে নিয়ে পারা গেল না। বলুন না কি ব্যাপার, ওঁর আসবার বাধাটা কি?'

চিন্ময় সংক্ষেপে বলল, 'ওঁদের সঙ্গে আজ ঝগড়া হয়ে গেছে।'

ব্যোমকেশবাবু হেসে বললেন, 'ঝগড়া? মানে দ্বন্দ্ব? দ্বন্দ্বের আবার দুটো মানে, তাই না?'

হঠাৎ টেবিলের ওপর দোয়াত-চেপে-রাখা একখানা লেখা কাগজের উপর দৃষ্টি পড়ল ব্যোমকেশবাবুর। কবিতাটি তুলে নিয়ে পড়ে বললেন, 'বেশ। হাতের লেখাটা তো কোন মেয়ের বলে মনে হচ্ছে।'

চিন্ময় বলল, 'কিন্তু রচনাটা পুরুষের।'

ব্যোমকেশবাবু চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে ফের একটু হাসলেন, 'সেটা বোঝা শক্ত নয়।'

তারপর কবিতাটি আর-একবার পড়লেন ব্যোমকেশবাবু, আর একবার তাকালেন চিন্ময়ের দিকে, বললেন, 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'করুন না।

ব্যোমকেশবাবু স্থিরদৃষ্টিতে চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সত্যি করে বলুন তো, আপনার কথা আর কামনাই কলহের মূল কারণ কিনা?'

চিন্ময় কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

ব্যোমকেশবাবু হঠাৎ বললে, 'ছিঃ, আপনার কাছ থেকে এটা আশা করি নি চিন্ময়বাবু।'

চিন্ময় একটু শ্লেষের স্বরে বলল, 'আপনার মুখে ও কথা সাজে না।'

ব্যোমকেশবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চিন্ময়ের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন, তারপর মৃদু মোলায়েম স্বরে বললেন, 'সাজে না, কারণ আমার যৌবনের কিছু কিছু ঘটনা আপনাকে বলেছি। কিন্তু বার্ধক্যের একটা গল্প আপনাকে আজ শোনাব।'

চিন্ময় বলল, 'কিন্তু আমি তো বৃদ্ধ নই ডাক্তারবাবু, বার্ধক্যের গল্প শুনতে আমার স্পৃহা নেই।'

চিন্ময়ের উত্তেজনা দেখে ব্যোমকেশবাবু হাসলেন, 'এ জিনিস কিন্তু চিন্ময়বাবু বৃদ্ধদের জন্যই, আর রসে যারা সমৃদ্ধ তাদের জন্য। আপনাদের মত কাঁচা বয়সের কাঁচা প্যাশনের জিনিস এ নয়। যখন কামনার নব রঙ দুজনের চুলের শাদা রঙে একেবারে পাকা হয়ে লাগে এ শুধু তখনকার বস্তু। তখন আর আলাদা করে কবিতা লিখে রঙ লাগাবার দরকার হয় না, কোন সংসারে আগুন জ্বালাবার দরকার হয় না।'

চিন্ময় আগের মত দীপ্ত কণ্ঠে বলল, 'সব দরকার হয়, ডাক্তারবাবু, সব দরকার হয়। ছাব্বিশ বছরের দরকারকে কি ছেষট্টি বছর বয়সে এসে বোঝা যায়, না স্বীকার করা যায়? কবিতা লিখে আগুন জ্বালানো যায় না, যে আগুন জ্বলে তাতে কেবল নিজেকেই পুড়তে হয়, আমি তা জানি। কিন্তু আমি কেবল কবিতাই লিখব, এ কথা ভাবছেন কেন? আমি কি আর কিছু করতে পারিনে?'

ব্যোমকেশবাবু হেসে মাথা নাড়লেন, 'আর কিছু করাটা আরো নির্বোধের কাজ হবে।'

একটু থেমে ব্যোমকেশবাবু ফের বললেন, 'চলুন, ওষুধ নিয়ে আসবেন ডিসপেনসারি থেকে, আর ওঁর নার্সিং-এর ব্যবস্থা কালই করবেন। যদি আত্মীয়স্বজন কাউকে না পান, নার্স রাখুন, না হয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন।'

চিন্ময় বলল, 'কিন্তু মা কখনও হাসপাতালে যেতে চান না।'

ব্যোমকেশবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, 'দেখা যাক দু-একদিন।'

মাকে বলে চিন্ময় ওষুধ আনবার জন্য ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

অফিসে যাওয়ার সময় অনুপম হৈমবতীর ঘরে একবার উঁকি দিয়ে গেল, কেমন আছেন মাঐমা? ডাক্তার এসেছিলেন? ওষুধ-পথ্য খাচ্ছেন তো?'

হৈমবতী ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হুঁ।'

এর আগেও সকাল সন্ধ্যায় অনুপম দু-তিনবার করে হৈমবতীকে মাঐমা বলে ডেকেছে। কিন্তু তখনকার সুর এখনকার ডাকের মধ্যে বাজল না। তা যে ডাকল সেও টের পেল, যিনি শুনলেন তিনিও বুঝলেন।

অনুপম আর কোন কথা না বলে সদরের দিকে এগিয়ে গেল। পিছন থেকে মিনু ডাকল, 'বাবা।'

অনুপম ফিরে তাকাল, 'কিরে?'

মিনু মুখ ভার করে বলল, 'আমার জন্যে পুতুল আনবে না বাবা! আমার সবগুলি পুতুল যে ভেঙে গেছে।'

অনুপম বলল, 'ভেঙে গেছে? কেবল কি তোর পুতুল? সবই ভেঙে যাচ্ছে রে মিনু।'

হঠাৎ অনুপমের চোখে পড়ল ইন্দু দোতলা থেকে নেমে এসেছে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হৈমবতীর ঘরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চিন্ময়কেও দেখা যাচ্ছে সে ঘরে।

মিনুকে কোলের কাছে টেনে নিল অনুপম, তারপর কী ভেবে পকেট থেকে একটা টাকা মেয়ের হাতে তুলে দিল।

মিনু খুশী হয়ে বলল, 'পুরো একটা টাকা বাবা? পুতুল কিনতে দিচ্ছ? আমার অনেকগুলি পুতুল হবে, না বাবা?'

অনুপম ওপরের দিকে চোখ তুলে আর-একবার অন্যমনা স্ত্রীর দিকে তাকাল। একটু কাল কী ভাবল, তারপর মিনুকে সদরের কাছে ডেকে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'শোন্, তোর মা নিচের ঘরে যায় কিনা, কবার যায়, কতক্ষণ থাকে, কার সঙ্গে বসে গল্প করে লক্ষ্য রাখবি। বাড়ি এলে আমাকে বলবি। তাহলে তোকে পুতুল কেনার জন্যে আরো টাকা দেব। পারবি বলতে?'

মিনু হেসে ছোট ছোট দাঁতগুলি বের করল, 'খুব পারব বাবা। এ তো বেশ মজার খেলা।'

অনুপম বলল, 'হ্যাঁ, মজার খেলাই তো।

ইন্দু এদিকে আসছে দেখে অনুপম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। তার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

একটু বাদেই মেয়ের হাতের টাকাটা চোখে পড়ে গেল ইন্দুর।

'এ টাকা পেলি কোথায় ?'

মিন্নু দু পা পিছিয়ে গিয়ে দুষ্টু হেসে বলল, 'বলব কেন। বাবা দিয়ে গেছে আমাকে। আমার টাকা।'

ইন্দু বলল. 'একটা টাকাই দিয়ে গেলেন ? হারিয়ে ফেলবি। দে আমাকে রেখে দিচ্ছি। বিকালে যা কিনবার কিনিস।'

মিন্নু ছোট্ট মুঠির মধ্যে এক টাকার নোটটা চেপে ধরল, 'উঁহু এ টাকা দেব না, এ টাকা আমার।'

'দে বলছি, বেয়াড়া মেয়ে।'

জোর করে মিন্নুর হাত থেকে টাকাটা কেড়ে নিল ইন্দু।

আর সঙ্গে সঙ্গে মিন্নু চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, 'আমি সব বলে দেব, সব বলে দেব।'

ইন্দু হেসে বলল, 'কী বলবি তুই ?'

মিন্নু তেমনি সরোদনে বলতে লাগল 'আমি সব জানি, সব বলব। তুমি ওদের ঘরে যাও, ওদের সঙ্গে কথা বল। আরো বেশি করে বলব, বানিয়ে বলব। আমি বলব বলেই তো বাবা টাকা দিয়ে গেছে। আমার বাবার টাকা তুমি কেন নিলে, কেন কেড়ে নিলে ?'

ইন্দু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে পরম ঘৃণায় টাকাটা মেয়ের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অনুপম ঠিকই বলেছে। টাকার জোরে অনুপম সব কিনে নিতে পারে, সব তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে। সেই মুহূর্তে ইন্দুর মনে হল তার কেউ নেই, এ সংসারে তার কেউ নেই। স্বামী নেই সন্তান নেই কিছু নেই তার। সে কারো স্ত্রী নয়, মা নয়, কন্যা নয়—তবে সে কী, তবে সে কে ?

বিকাল থেকেই রান্নার আয়োজন শুরু করতে হয়। কিন্তু রান্নাঘরে যেতে আজ আর কিছুতেই ইচ্ছা করছিল না ইন্দুর। নিতান্ত অনিচ্ছায় অতিকষ্টে নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে চলল ইন্দু। কিন্তু ঘরের সামনে গিয়ে বঁটি পেতে বসতে না বসতে তিলক হাঁপাতে হাঁপাতে নিচে থেকে ওপরে উঠে এল, 'মা, মা, দেখবে এস নিচের ঘরের বুড়ীটা জল-জল করে মরছে।'

তিলু আর মিন্নু এতদিন হৈমবতীকে ঠাকুরমা বলে ডাকত। কিন্তু কিছুদিন ধরে ওরাও টের পেয়েছে চিন্ময়দের সঙ্গে তাদের বাবা-মার খুব ঝগড়া হয়েছে। কালকের ঘটনার পর সে কথা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তিলু-মিন্নুর কাছে। তা ছাড়া নিচের ভাড়াটেদের দু-চার দিনের মধ্যে জোর করে তুলে দেওয়া হবে, একথাও তিলকের বুঝতে বাকি নেই। তাই ঠাকুরমা এখন বুড়ী ছাড়া কেউ নয়।

ইন্দু ধমক দিয়ে বলল, 'ছিঃ বুড়ী বলে নাকি। ঠাকুরমা বল তিলু।'

তিলক অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'ঠাকুরমা জল চাইছে মা, আমার ভয় করছে যেতে।'

ইন্দু বলল, 'জল চাইছেন। কেন চিন্ময় ও ঘরে নেই ?'

তিলক বলল, 'না, বোধ হয় ডাক্তারখানায় গেছেন।'

তা হতে পারে। কিন্তু ওর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এমন একজন রোগীকে একা একা ঘরে ফেলে রেখে কেউ কি বেরোয় ?

বেরোবেই যদি ইন্দুকে একথা বলে গেলেই হত।

ছেলেকে সহবত শেখানো বন্ধ রেখে ইন্দু ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল।

তিলু ঠিকই বলেছে। সত্যিই জল চাইছেন হৈমবতী।

একটু ইতস্তত করে ইন্দু ঘরে ঢুকল। দিনের বেলায়ও ঘরখানা কেমন অন্ধকার অন্ধকার। তক্তাপোশের একধারে কাত হয়ে হৈমবতী পড়ে রয়েছেন। শিয়রে থুথু ফেলবার পিকদানি, গোটা দুই অনাবশ্যক কৌটো, আধখানা বেদানা। বিছানাটাও ময়লা। কেবল ছেলেকে দোষ দিলে কী হবে তার মা'টিও তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নন ঘরদোর তেমন সাজাতে গুছাতে জানেন না। আজই না হয় অসুস্থ হয়েছেন, কিন্তু যখন সুস্থ থাকেন পরিপাটিভাবে থাকতে পারেন না। ইন্দু আলগোছে পিকদানি আর কৌটা দুটো সরিয়ে ফেলল।

মানুষের সাড়া পেয়ে হৈমবতী এবার পাশ ফিরলেন। ইন্দুকে ভালো করে দেখতে না পেয়ে বললেন, 'কে।'

ইন্দু বলল, 'আমি মায়েমা। আপনি জল চাইছিলেন, জল দেব ?'

হৈমবতী রুক্ষস্বরে বলে উঠলেন, 'না, আমার জলটল কিছু চাইনে। তোমাকে কে এখানে আসতে বলল, তুমি যাও বাছা, তুমি যাও এখান থেকে। গাছের গোড়া কেটে আর আগায় জল ঢালতে হবে না তোমাদের।'

ইন্দু মৃদু হাসল, একটু সস্নেহ ধমকের সুরে বলল, 'অমন করে নাকি মায়েমা। আমি জল এনে দিচ্ছি খান।'

হৈমবতী যেন ষাট বছরের বৃদ্ধা নন ছোট একটি মেয়ে। অবুঝ রাগ আর অভিমানের জন্যে তাকে সস্নেহে শাসন করছে ইন্দু।

ঘটিতে কি কুঁজোয় কোথাও একফোঁটা জল নেই। তাড়াতাড়ি কুঁজোটা ধুয়ে তাতে জল ভরে নিয়ে এল ইন্দু। হৈমবতীর ঘটিতে খানিকটা জল ঢেলে তাঁর কাছে নিয়ে এসে বলল, 'আপনি নিজে খেতে পারবেন, না আমি ঢেলে দেব ?'

হৈমবতী তবু জেদ ছাড়েন না, 'ও জল আমি খাব না।'

ইন্দু তেমনি হেসে বলল, 'ছিঃ অমন করে না মায়েমা, জলটুকু খান। মানুষে মানুষে ঝগড়া বিবাদ বুঝি হয় না, তাই বলে অসুখ বিসুখের সময় অমন করে নাকি ? আপনিও দেখি মিণুর মত হলেন।'

হৈমবতী এবার আর আপত্তি করলেন না। ঘটি উঁচু করে ইন্দু তাঁর মুখে জল ঢেলে দিল।

একটু বাদে ইন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'পথ্য-টথ্য কিছু খেয়েছেন ?'

হৈমবতী বললেন, 'না, কী আর খাব। কিছু খেতে ভালো লাগে না।'

ইন্দু বলল, 'অসুখ হলে খেতে কি আর ভালো লাগে মায়েমা। জোর করে খেতে হয়। নইলে অসুখ যে আরো পেয়ে বসে। আচ্ছা, পথ্য আমি তৈরী করে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বিছানাটা যে ঝেড়ে দিতে হবে। আর ধোয়া চাদর আছে ?'

হৈমবতী বললেন, 'আর ধোয়া চাদর নষ্ট করে কী হবে।'

ইন্দু হেসে বলল, 'আচ্ছা কৃপণ মানুষের মেয়ে তো আপনি। চাদর নষ্ট হবে বলে এই ময়লা বিছানায় পড়ে থাকবেন। কোথায় ধোয়া চাদর আছে বলুন।'

হৈমবতী বললেন, 'তোমার জ্বালায় আর পারলুম না। ওই বাক্সের মধ্যে চাদর আছে দেখ। এই নাও চাবি।'

শুধু বিছানার চাদর বদলাল না ইন্দু, ঘরখানাও ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করল। হৈমবতীর জিনিসপত্রগুলি গুছিয়ে রাখল একধারে। মনে হল ঘরখানাই যেন বদলে গেছে। এরপর নিজের রান্নাঘরে গিয়ে উনুন ধরিয়ে হৈমবতীর জন্যে একটু দুধ গরম করে নিয়ে এল ইন্দু। তিনি আবার ওজর-আপত্তি শুরু করলেন। অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর তিনি খেতে রাজী হলেন। ইন্দু দুধের বাটিটা সবে তাঁর মুখের কাছে নিয়ে ধরেছে, চিন্ময় এসে উপস্থিত হল। তার হাতে ওষুধের শিশি আর একটা ফলের ঠোঙা। ইন্দুকে তাদের ঘরে এমন অবস্থায় দেখে একটু বিস্মিত হল চিন্ময়। একটু কাল দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। তারপর জুতো ছেড়ে নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকল।

পায়ের শব্দে ইন্দুও মুখ তুলে তাকিয়েছিল। চিন্ময়কে দেখেই তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল, আরক্ত হয়ে উঠল মুখ, হাতের বাটিটাও একটু কেঁপে গেল যেন।

ইন্দু হৈমবতীকে মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি খেয়ে নিন মায়েমা। আমি একটু পরে এসে বাটিটা নিয়ে যাবো।'

চিন্ময়ের দিকে আর না তাকিয়ে তার সঙ্গে কোন কথা না বলে ইন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চিন্ময় একটু কাল মুগ্ধদৃষ্টিতে ইন্দুর সেই দ্রুত গতিভঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইল। এমন লজ্জা ইন্দু তাকে দেখে আর কোনদিন পায় নি। ও কি ভেবেছিল লুকিয়ে লুকিয়ে সেদিন যেমন এসে চিন্ময়ের কবিতার কপি করে রেখে গেছে তার মায়ের সেবাও তেমনি অলক্ষিত ভাবেই কার যাবে ? ধরা দেবে না, ধরা পড়বে না ? চিন্ময় মনে মনে একটু হাসল।

ঘরের দিকে তাকিয়ে মন ভারি প্রসন্ন হয়ে উঠল চিন্ময়ের। লক্ষ্মীর হাতের ছোঁয়া যে লেগেছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এগিয়ে এসে হৈমবতীর মাথার কাছে বসল চিন্ময়, জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ মা ?'

হৈমবতী একটু বিরক্তির ভঙ্গিতে বললে, 'সে খবরে তোমার কাজ কি বাপু।

সারাদিন তুমি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ালে। তেষ্টায় মরে গেলেও তোমার কাছ থেকে একটু জলের প্রত্যাশা নেই, শেষে পরের মেয়ের হাতে—।' মার রাগ আর অভিযোগের মধ্যে অনেকখানি যে ভান আছে তা টের পেয়ে চিন্ময় মৃদু হাসল, তারপর একটু তরল স্বরে বলল, 'তাতে আর এমন দোষ কি হয়েছে মা। তোমার নিজের ঘরের বউ হলে সেও পরের মেয়েই হত।'

বলে নিজেই ভারি লজ্জা পেল চিন্ময়। ছি ছি মা কী ভাবলেন। কিন্তু হৈমবতী অত তলিয়ে দেখলেন না।

তিনি বললেন, 'সে ভাগ্য কি তুমি আমার হতে দিলে বাছা! অমন একটি লক্ষ্মীর মত বউ ঘরে আনতে পারলে আমার আর দুঃখ ছিল কিসের। আহা কি যত্নটাই না করলে!'

চিন্ময় স্মিতমুখে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে সিগারেট ধরাল।

তারপর থেকে হৈমবতী কেমন আছেন দেখবার জন্যে রোজই একবার করে আসতে লাগল ইন্দু। চিন্ময় যখন ঘরে থাকে তখন আসে না, সে যখন বাইরে চলে যায় কি নিজের ঘরে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে তখন এসে ইন্দু রোগিণীর সেবা পরিচর্যা করে যায়। চিন্ময়ের সঙ্গে যেন তার কোন সম্পর্ক নেই। তার মার সঙ্গেই যেন ইন্দুর শুধু আত্মীয়তা।

চিন্ময় মনে মনে হাসে, এ এক রকম মন্দ নয়। এতদিন তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার অন্ত ছিল না। কত কথা আর কত কথা-কাটাকাটি যে তাদের হয়েছে তার ঠিক নেই। আজ চলেছে বিনা কথার পালা। কিন্তু এ আলাপও একেবারে নীরব নয়. এরও ধ্বনি আছে, তা কান পেতে শোনা যায় না, মন দিয়ে অনুভব করতে হয়। ইন্দু যে তার সামনে পড়লে আজকাল বিব্রত হয়, লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি সরে যেতে বাধ্য হয়, চিন্ময়ের চোখে তা বড়ই মনোরম লাগে। এ যেন কিশোরী বধূর লজ্জার অবগুণ্ঠন, এ আড়াল দূরত্ব সৃষ্টি করে না, মধুরত্ব বাড়ায়। এই লজ্জার মধ্যে, বারবার এমন করে এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে চিন্ময়কে স্বীকৃতি দিয়েছে ইন্দু। আর চিন্ময়ের মনে কোন ক্ষোভ নেই।

চিন্ময় সম্বন্ধে নিজের এই নতুন ধরনের সংকোচ দেখে ইন্দু নিজে বড় অস্বস্তি বোধ করে। তার এই লজ্জাকে সে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। লজ্জা আবার কিসের। লজ্জা সে চিন্ময়কে করে না, ওর সঙ্গে যে কথা বন্ধ করেছে তা জেদ করে। অনুপম দেখুক, সমস্ত জগৎ সংসার দেখুক ইন্দুকে, তারা যা ভাবছে তা সে নয়! চিন্ময়ের ঘরে না গিয়ে চিন্ময়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করে সে জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়ে দিতে পারে। চিন্ময়েরও শিক্ষা হোক, ইন্দুকে লক্ষ্য করে যে তার মোটেই ভালো হয় নি, ইন্দু তা একটুও পছন্দ করে নি আর সেই জন্যেই তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছে সেকথা বুঝতে পারুক চিন্ময়। কিন্তু ওকে দোষ দেবে কি, ইন্দুর নিজের হৃদয়ই বড় অবুঝ।

হৃদয় নয়, হৃৎপিণ্ড। চিন্ময় কাছাকাছি এলে তার স্পন্দন এত দ্রুত হয়, এত ধ্বনিময় হয়ে ওঠে যে ইন্দুর আশঙ্কা হয় বুঝি তা চিন্ময়েরও কানে গেল। আশঙ্কা হয় বুঝি চিন্ময় তাকে কিছু বলে ফেলবে। যদি এতদিন বাদে ও মৌন ভাঙে তাহলে কি ইন্দু সঙ্গে সঙ্গে কথা বলবে, নাকি নিঃশব্দে ও চলে আসবে? কোন্‌টা শোভন আর সঙ্গত হবে, ভেবে যেন ঠিক করে উঠতে পারে না ইন্দু।

অনুপমের অমোঘ এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল কিন্তু চিন্ময়রা নড়বার নাম করল না। ভারি অসুবিধেয় পড়ল অনুপম। সুবিধেমত বুড়ীটা অসুখ বানিয়ে নিয়েছে। এ অবস্থায় বার বার উঠে যাওয়ার তাগিদ দেওয়াও ভালো দেখায় না। কিন্তু অনুপমই বা আর কতদিন অপেক্ষা করবে। তার আর ইচ্ছা নয় ওরা এক মুহূর্ত এ বাড়িতে থাকে, সে এরই মধ্যে অন্য লোকজনের সঙ্গে ঘর ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে। একজনের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় ঠিকই করে ফেলেছে। তারই অফিসের কলিগ, প্রোপোজাল ডিপার্টমেণ্টের নিরঞ্জন বোস। সে অবিবাহিত নয়, স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে আছে। বই পড়ার বাতিক নেই। অনুপমের মতই কাঠখোট্টা বস্তুজগতের মানুষ। তাকে বিশ্বাস করা যায়, তার ওপর নির্ভর করা যায়। সে চিন্ময়ের মত মিটমিটে শয়তান নয়। কিন্তু বুড়ী যে মরেও না, নড়েও না তার কি করা যাবে।

ইন্দুকে ডেকেই জিজ্ঞাসা করল অনুপম, 'চিনুর মা কি অনন্তশয্যা বিছাল নাকি? তার অসুখ সারল না?'

ইন্দু বলল, 'ব্লাডপ্রেসারটা কমেছে। কিন্তু কাল দেখে এলুম রক্তআমাশা শুরু হয়েছে। রোগের পর রোগ; বুড়ো মানুষ বড় কষ্ট পাচ্ছেন।'

অনুপম বলল, 'কাল দেখে এলুম মানে? তুমি কি ওদের ঘরে গিয়েছিলে নাকি?'

ইন্দু একটু থমকে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গিয়েছিলাম।'

অনুপম স্থিরদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'আমি যখন বাড়ি থাকিনে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে রোজই তাহলে যাও? আর এদিকে তিলু মিতুকে বেশ মিথ্যে কথা শিখিয়ে রেখেছ। তারা জিজ্ঞেস করলে বলে 'না, মা তো যায় না।'

স্বামীর অভিযোগের ধরন দেখে ইন্দুর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। ইন্দু তীব্রস্বরে বলল, 'তোমার মত অমন হীন প্রবৃত্তি আমার হয় নি যে ছেলেমেয়েকে মিথ্যে শেখাব। তারা যদি মিথ্যে বলে থাকে তোমার ভয়েই বলেছে।'

অনুপম অদ্ভুত একটু হাসল, 'আর আমার ভয়ে তুমিও বুঝি সত্য গোপন করেছ। কি সতী-সাধ্বী সীতা-সাবিত্রী রে। রোজ আমাকে লুকিয়ে ওদের ঘরে যাও। সত্যি কথা বল।'

ইন্দু বলল, 'মিথ্যে কথা আমি কোনদিন বলিনে। বুড়ো মানুষ রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। ঘরে আর কোন মেয়েছেলে নেই, যতটুকু পারি ওঁর সেবা করি, ওষুধটুকু পথ্যটুকু

দরকারমত দিই, এতে লুকোবার কী আছে, অন্যায়েরই বা কী আছে। আমি তো আর চিন্ময়ের সঙ্গে কথা বলিনে, কি তার ঘরেও যাইনে।'

অনুপম শ্লেষ করে বলল, 'সেই দুঃখে বুক ফেটে যায়, না? কিন্তু তার মার কাছে গেলেও তো তোমার আনন্দ, নতুন শাশুড়ীর সেবা করায়ও তো তোমার সুখ।'

ইন্দু মুহূর্তকাল কোন কথা বলতে পারল না, চেঁচিয়ে উঠে তারপর বলল, 'খবরদার, তুমি কি ভেবেছ তোমার যা মুখে আসে তাই বলবে?'

অনুপম ফের একটু হাসল, 'তুমি যদি তোমার যা মনে আসে তাই বলতে পার আমার বেলায় মুখে বললেই দোষ? এমন কি আর অন্যায় বলেছি। শাশুড়ী না হোক শাশুড়ীর মতই তো।'

ইন্দু বলল, 'হাজার বার। তোমার মা বেঁচে থাকলে ওঁর চেয়েও বুড়ো হতেন। আমি ওর সেবা করে তাঁর সেবা করছি।'

অনুপম ব্যঙ্গ করে বলল, 'ঈস্, কি একখানা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল রে! অতই যদি সেবাধর্মের শখ, কোন আশ্রম-টাশ্রমে চলে গেলেই পার। ঘরে থেকে আমাকে জ্বালিয়ে মারছ কেন।'

স্ত্রীর আরো কাছে এগিয়ে এল অনুপম। তারপর হুকুমের ভঙ্গিতে বলল, 'শোন, ওসব নার্সগিরি এখানে থেকে চলবে না। তুমি মেয়েমানুষ, তুমি আমার স্ত্রী, তোমাকে আমার কথা শুনে চলতে হবে।'

ইন্দু একটুকাল স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত স্থির স্বরে বলল, 'আমি আগে মানুষ তারপর আমি তোমার স্ত্রী। তোমার সব অন্যায় আবদার আমি মেনে নিতে পারব না। তুমি আমার কাছে অন্য সব পুরুষের চেয়ে বড় কিন্তু আমার বিবেকের চেয়ে বড় নও।'

অনুপম স্ত্রীর এই দৃঢ়তা দেখে একটুকাল বিস্মিত হয়ে রইল। তারপর তেমনি শ্লেষভরা গলায় বলল, 'বটে! এই বিবেকটি কে শুনি? চিন্ময় নাকি? সেই বোধহয় তোমাকে এসব স্বাধীন জেনানার বুলি শিখিয়েছে? আমার সামনে দাঁড়িয়ে, আমাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলবার সাহস আগে তো তোমার ছিল না!'

'অন্যায়কে অন্যায় বলবার সাহস আমার চিরকালই ছিল, চিরকালই থাকবে।' বলে ইন্দু পাশের ঘরে চলে গেল।

জেদী স্ত্রীর এই দৃপ্ত ভঙ্গি দেখে ভারি রাগ হল অনুপমের। কিন্তু সবটুকুই যেন রাগ নয়। ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন একটু আশ্বাসও ওর ভঙ্গির মধ্যে আছে। তাহলে হয়তো তেমন কোন মারাত্মক অপরাধ ইন্দু করে নি। যে স্ত্রী অসতী হয়, অপরাধিনী হয়, সে কি এমন তেজের সঙ্গে কথা বলতে পারে, এমন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে স্বামীর সামনে। লোকের অসুখ বিসুখে ইন্দুর সেবা করবার প্রবৃত্তিটা অনুপম আগেও লক্ষ্য করেছে। গাঁয়েই হোক আর শহরেই হোক পাড়াপড়শীর কারো অসুখ হয়েছে শুনলে ইন্দু তার খোঁজখবর নিতে যায়। সে রোগী যদি শিশু হয়, বুড়ো

হয় কি স্ত্রীলোক হয় সাধ্যমত ইন্দু গিয়ে তার শুশ্রূষাও করে। হয়তো হৈমবতীর ওপর ওর বিশেষ তেমন পক্ষপাত নেই। কিন্তু অনুপমের নিষেধ সত্ত্বেও কেন সে যাবে।

রাগ করে কয়েকদিন হৈমবতীর খোঁজখবর নেওয়া বন্ধ রাখল ইন্দু। শুধু রাগ নয়, কেমন একটা লজ্জাও যেন তাকে বাধা দিচ্ছে। অনুপম যে সব খোঁটা দিয়েছে, যে সব বিশ্রী কথা বলেছে তাতে যেন ও ঘরে আর যাওয়া যায় না। একপা এগিয়ে ইন্দু দুপা পিছিয়ে আসে। সত্যিই কি অমন আত্মীয়ের মত, একান্ত আপন জনের মত হৈমবতীর সেবা করা ইন্দুর মনের দুর্বলতা, চিন্ময়ের ওপর তার অনুরাগের নামান্তর? মাথা নেড়ে জোর করে অস্বীকার করে ইন্দু, কিন্তু যাওয়ার সময় পায়ে যেন তেমন জোর পায় না। এদিকে সেবা-শুশ্রূষায় অপটু একজন পুরুষের হাতে অসুস্থ বুড়ো মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন দেখে ইন্দুর বিবেক পীড়িত হতে থাকে।

এমনি করে দিন তিনেক কাটল। সেদিন বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীর আসনের কাছে ধূপ-দীপ জেলে পুরোন লালপেড়ে গরদের শাড়িখানা পরে পুঁথি নিয়ে বসেছে, চিন্ময় প্রায় ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল, 'ইন্দুদি শিগগির আসুন, মা যেন কেমন করছেন।'

ইন্দু বলল, 'সেকি?'

তারপর ছেলের হাতে লক্ষ্মীর পুঁথি দিয়ে ইন্দু চিন্ময়ের পিছনে পিছনে নেমে এল নিচে। গিয়ে দেখল হৈমবতীর অবস্থা এই কদিনে আরও খারাপ হয়েছে। বিছানার সঙ্গে লেগে গেছে তাঁর শরীর। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তাঁর হৃদরোগ আর আমাশা দুইই বেড়েছে।

তাঁর অবস্থাটা একটু দেখে ইন্দু চিন্ময়কে বলল, 'ভয় নেই, তুমি যাও, ডাক্তারবাবুকে খবর দাও। আমি এখানে আছি।'

চিন্ময় চলে গেলে হৈমবতীর বুকে আস্তে আস্তে ইন্দু হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, কোমল মৃদুস্বরে বলল, 'ভয় নেই মাঁয়েমা, আপনার কোন ভয় নেই।'

ইন্দুর শুশ্রূষায় খানিকটা সুস্থ বোধ করলেন হৈমবতী, একটু হাসতে চেষ্টা করে ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'আমার আবার ভয় কি মা। আমার তো এখন যাওয়াই মঙ্গল।'

ইন্দু বলল, 'এখনই যাওয়ার কী হয়েছে।'

হৈমবতী একথার কোন জবাব দিলেন না।

ইন্দু একটু কৈফিয়তের সুরে বলল, 'এ কদিন আমি আসতে পারি নি—।'

হৈমবতী বললেন, 'জানি মা। তোমার অশান্তির কথা আমি জানি। কী আর করবে। মেয়েমানুষকে অনেক সহ্য করতে হয়।'

এক সঙ্গে এই কটি কথা বলে হৈমবতী যেন হাঁপিয়ে উঠলেন। ইন্দু তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার আর কথা বলে কাজ নেই। কিছু খাবেন এখন?'

হৈমবতী বললেন, 'না। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। তোমাকে একটা অনুরোধ করব মা।'

'বলুন।'

'এখন নয়। এখন নিজেই আমি গুরুর নাম বলতে পারি। কিন্তু যখন সে শক্তি থাকবে না তখন তুমি আমার কানে হরির নাম দিয়ো। আমার ছেলে নাস্তিক। ওকে আমি বিশ্বাস করিনে। তুমি আমার মেয়ের কাজ করো মা। আমাকে ভগবানের নাম শুনিয়ো।'

ইন্দু ঘাড় কাত করল। এতক্ষণে ওরও যেন কথা বলবার শক্তিটুকু গেছে। ছলছল করছে চোখ দুটি।

খানিকবাদে ব্যোমকেশবাবু এলেন। রোগিণীকে পরীক্ষা করলেন, প্রেসক্রিপশন পাল্টালেন। তারপর যাওয়ার সময় ইন্দুকে একটু আড়ালে ডেকে বললেন, 'হয়তো রাত্রের মধ্যে কিছু হবে না। তবু সাবধান থাকা দরকার। আপনি এ ঘরে থাকতে পারলে ভালো হয়।'

ইন্দু মৃদুস্বরে বলল, 'আমি আছি।'

আরো কিছুক্ষণ পরে অনুপম ফিরে এল বাসায়। অফিসের ছুটির পর ভবানীপুরের একটি পার্টির কাছে গিয়েছিল। ভরসা ছিল হাজার তিনেক টাকার কেস পাবে। কিন্তু আজও কেবল প্রতিশ্রুতিই মিলেছে আর কিছু মেলে নি। ইনসিওরেন্সের এজেণ্টকে অমন ভুয়ো প্রতিশ্রুতি অনেকেই দেয়। ফিরে এসে স্ত্রীকে ঘরে দেখতে না পেয়ে অনুপমের মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। ছেলেকে দিয়ে ডেকে পাঠাল স্ত্রীকে। ইন্দু এসে দাঁড়ালে চড়া গলায় বলল, 'তুমি আবার ও ঘরে গেছ? লজ্জা বলে কোন জিনিসই কি তোমার মধ্যে নেই?'

ইন্দু শান্ত স্বরে বলল, 'চেঁচামেচি কোরো না, ও ঘরে চিন্ময়ের মার অবস্থা খুব খারাপ, আমার রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে। তোমরা এবার সকাল সকাল খেয়ে নাও এসে।'

স্বামী আর ছেলেমেয়েকে পাশাপাশি ঠাঁই করে দিয়ে ইন্দু তাদের খাইয়ে দিল।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে অনুপম বলল, 'তুমি খাবে না?'

ইন্দু বলল, 'আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি পরে খাব।'

চিন্ময় মায়ের কাছে স্থিরভাবে বসে ছিল। ইন্দু তার কাছে এসে কোমল স্বরে বলল, 'চল, সামান্য কিছু মুখে দিয়ে নেবে।'

বলে নিজেই একটু লজ্জিত হল ইন্দু। মা অসুস্থ হওয়ার পর থেকে চিন্ময় রোজ দুবেলা পাইস হোটেলে খাচ্ছে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইন্দু তাকে একদিন খেতে বলতে পারে নি, আজ যদি চিন্ময় 'না' করে ওকে দোষ দেওয়া যায় না।

ইন্দু আর-একবার অনুরোধ করল, 'চল।'

চিন্ময় বলল, 'না, কিছু খেতে আমার আর ইচ্ছা করছে না ইন্দুদি। আপনি যান খেয়ে আসুন।'

ইন্দু চিন্ময়ের মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে কি দেখল, তারপর বলল, 'আচ্ছা আর কিছু না খাও এক কাপ চা খেয়ে নেবে চল। রাত জাগতে সুবিধে হবে। আমিও খাব এসো।'

হৈমবতী ঘুমোচ্ছিলেন। দুজনে আস্তে আস্তে উঠে এল। ভাতের হাঁড়িতে জল ঢেলে দিল ইন্দু। উনুনে তখনও আগুন ছিল। তাড়াতাড়ি দুকাপ চা করে নিয়ে অনেকদিন বাদে ইন্দু ফের মুখোমুখি বসল চিন্ময়ের। এই চায়ের কাপ সামনে রেখে কতদিন কত আলোচনাই তারা করেছে। সাহিত্য নিয়ে সমাজ নিয়ে কত তর্কের ঝড় বয়ে গেছে তাদের মধ্যে। কিন্তু আজ মৃত্যুর ছায়ায় বসে দুজনেই মৌন হয়ে রইল।

একটু বাদে চিন্ময় হঠাৎ বলল, 'মা যে আজই চলে যাচ্ছেন তা নয়, অনেকদিন আগে থেকেই তিনি যেন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বিদায় দিয়েছিলাম ইন্দুদি। সংসারে তিনি ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই। তবু এক ঘরে থেকেও আমরা যেন ছিলাম আলাদা পৃথিবীর মানুষ। শেষের দিকে তিনি আমাকে আর বুঝতে পারতেন না, আমি তাঁকে বুঝতে চাইতুম না। তিনি আমার মনের নাগাল না পেয়ে আমার শরীরকেই বেশি করে আঁকড়ে ধরতেন। তাতে আমার আরো রাগ হত, ঘৃণা হত।'

চিন্ময়ের গলা ধরে এল। একটু চুপ করে থেকে সে ফের বলতে লাগল, 'আজ মনে হচ্ছে বিদ্যাই বলি আর বুদ্ধিই বলি, সংসারে ভালোবাসার চেয়ে বড় কিছু আর নেই। সেই ভালোবাসার অভাবে আমি তাঁকে পেয়েও পুরোপুরি পাই নি। তাঁর কাছে থেকেও চিরকাল দূরেই রয়ে গেছি। আজ তাঁকে একেবারেই হারাচ্ছি। ফিরে পাওয়ার কোন আশাই আর রইল না।'

কথার মধ্যে অনুপ্রাস আর পানীয়ের মধ্যে চা চিন্ময়ের বড় প্রিয়। কিন্তু ইন্দু লক্ষ্য করল আজ সেই দুটি প্রিয়বস্তুকে চিন্ময় ছুঁয়েও দেখছে না। ইন্দুর চা প্রায় শেষ হয়ে এল। কিন্তু চিন্ময়ের চায়ের কাপ তেমনি ধরাই পড়ে রয়েছে।

হঠাৎ সেই ঠাণ্ডা চায়ের কাপের মধ্যে দুফোঁটা উষ্ণ চোখের জল গড়িয়ে পড়ল চিন্ময়ের।

ইন্দু ওর আরো কাছে সরে এল, মৃদু আর কোমলস্বরে বলল, 'ওকি হচ্ছে চিন্ময়। তুমি না পুরুষ। তুমি না বড় হয়েছ। মা কি কারো চিরকাল থাকে।'

জলভরা ঝাপসাচোখে চিন্ময় এবার ইন্দুর দিকে তাকাল, আজও বড় সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। মাথায় আধখানা আঁচলের নিচে সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা। স্মিত শান্ত মুখশ্রীতে আজ বিষাদের ছায়া পড়েছে। বাল্যে কৈশোরে দেখা সিঁদুর-ভূষিত মায়ের সেই স্নিগ্ধ সুন্দর মুখকান্তি চিন্ময়ের স্মৃতিতে আজ আবার

উজ্জল হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবল ইন্দুর কথাই ঠিক, মা কারো চিরকাল থাকে না। প্রিয়ার মধ্যে প্রিয়তমার মধ্যে সে মিশে থাকে।

দুজনে ফিরে এল হৈমবতীর ঘরে। ইন্দু তাঁর পাশে গিয়ে বসল, চিন্ময় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল তাঁর সামনে। তারপর সেই রোগজীর্ণা বৃদ্ধ মায়ের ক্লিষ্ট মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। মনে হল এর চেয়ে প্রিয় এর চেয়ে সুন্দর মুখ পৃথিবীতে আর নেই। ছাব্বিশ বছর ধরে এই মুখের কত রূপ আর কত রূপান্তরই না চিন্ময় দেখেছে। এই মুখের কত আশ্বাস, কত সান্ত্বনা, কত ভালোবাসার কথাই না শুনেছে। মায়ের কাছ থেকে মানুষ ভাষা পায়। আর ভাব পায় বোধহয় বাপের কাছ থেকে। কিন্তু ভাব আর ভাষা দুইই চিন্ময় মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছে। অল্প বয়সে তার বাবা মারা যান, মা-ই ছিলেন একসঙ্গে বাবা আর মা। ভরণপোষণ শিক্ষা দীক্ষার সব ভার তাঁর ওপর ছিল। ছেলেবেলার সেই স্নেহ আর শাসনভরা দিনগুলির কথা চিন্ময়ের মনে পড়তে লাগল।

রাত বাড়তে লাগল।

খাওয়ার পর অনুপম বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ কিছুতেই তার ঘুম এল না। দুটো চোখের ভিতর যেন জ্বালা করছে। আসলে বুকের জ্বালা। ইন্দু তার উপস্থিতিতে, তাকে অগ্রাহ্য করে চিন্ময়ের ঘরে গিয়ে বসেছে। একই ঘরে একই সঙ্গে রাত জাগছে। আজ তারা মুখোমুখি বসে চা খেয়েছে, কথা বলেছে, একজন আর একজনকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। সবই লক্ষ্য করেছে অনুপম। কিছুই তার চোখ এড়ায় নি। অথচ সব দেখে সব জেনেশুনে অনুপম কিছুই করতে পারছে না। এখন তার উচিত চুলের মুঠি ধরে ইন্দুকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে আসা, আর উচিত লাথি মেরে চিন্ময়কে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া। তা সে পারে। সে শক্তি অনুপমের আছে। কিন্তু শক্তি থাকলেও শক্তিপ্রয়োগের জো নেই। ওরা একটি মরণাপন্ন রোগীর কাছে বসে রয়েছে। সাধারণ সামাজিক ভদ্রতার জন্য এই মুহূর্তে অনুপমের কিছুই আর করবার নেই। আজকের রাতটা তাকে মরা মানুষের মত চুপ করেই থাকতে হবে, যত আপত্তিকর ব্যবহারই ওরা করুক। অনুপম আজ কিছুই বলতে পারবে না। কারণ মৃত্যুর ছুতো পেয়েছে ওরা। তাকে শিখণ্ডীর মত দাঁড় করিয়েছে সামনে। অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করতে করতে অনুপম এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঠিক ঘুম নয়, পাতলা তন্দ্রা। সামান্য কী একটা শব্দে সে তন্দ্রা ভেঙে গেল। পাশে তিলু আর মিনু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু ইন্দুর জায়গা শূন্য। সে এখনো ফেরে নি। কিসের একটা তীব্র যন্ত্রণায় বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল অনুপমের। কেবল বিছানাই নয়, বুকের অনেকখানি জায়গা খালি হয়ে গেছে। সেই শূন্যতা আর ভরবার নয়।

ঘরে আলো জলেছে। সেই আলোয় দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো দামী হাতঘড়িটার দিকে তাকাল অনুপম। রাত সাড়ে তিনটে। ঘড়ির দুটো কাঁটা অসংখ্য কাঁটা হয়ে অনুপমের চোখে বিঁধল: সাড়ে তিনটে! এখন পর্যন্ত সে নিচে আছে। একসঙ্গে রাত ভোর করছে। আর বোকার মত একা একা ঘুমোচ্ছে অনুপম। বিছানার ওপর তড়াক করে সে উঠে দাঁড়াল। লম্বা পায়ে ডিঙিয়ে গেল ছেলেমেয়েকে। ঘর থেকে বেরিয়ে দুতিনটে সিঁড়ি একসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে লাগল। আর এক মুহূর্ত নয়, আর এক মুহূর্তও নয়।

চৌকাঠের সামনে এসে অনুপম থেমে দাঁড়াল। হৈমবতীর বুকের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে চিন্ময়. আর ইন্দু চিন্ময়কে এক হাতে আলিঙ্গন করে তার মুখের কাছে কী যেন বলছে। চিন্ময়ের মত আত্মীয় যেন ইন্দুর পৃথিবীতে অপর কেউ নেই, চিন্ময় ছাড়া যেন আর কেউ নেই।

মুহূর্তকাল পাহাড়ের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনুপম। তারপর সেই পাহাড়ে আগুন জ্বলল। লাভাস্রোত বয়ে গেল আগ্নেয়গিরির।

অনুপম তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'ইন্দু উঠে এস।'

চিন্ময়ের হাত ছেড়ে দিয়ে ইন্দু বলল, 'মাঐমা চলে গেছেন।'

অনুপম বলল, 'তাতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয় নি। তুমি উঠে এসো।'

শোকস্তব্ধ বিমূঢ় চিন্ময়ের মুখ থেকে কোন কথা বেরুল না। ইন্দু তার দিকে একবার তাকিয়ে স্বামীর পিছনে পিছনে চলে এল।

সিঁড়ির কাছে তিলু আর মিনুর গলা শোনা গেল, 'মা, মা।'

খালি ঘরে তারা ভয় পেয়ে জেগে উঠেছে।

কিন্তু ইন্দু কোন সাড়া দিল না।

স্ত্রীকে নিজের ঘরের মধ্যে এনে দোর বন্ধ করে দিল অনুপম, তারপর তার চোখে চোখ ডাকল, 'ইন্দু।'

ইন্দুর মনে পড়ল অনেকদিন বাদে স্বামী আবার তাকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছে। বিয়ের পর প্রথম প্রথম গুরুজনদের আড়ালে অনুপম ইন্দুর নাম ধরে ডাকত। ডেকেই কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়ত। মাঝে মাঝে বলত, 'শরদিন্দুনিভাননা।' বলত আর হাসত। ঠাকুরদার দেওয়া এই ছিল ইন্দুর পুরো নাম, সে নাম ছোট হতে হতে হল ইন্দুলেখা, পরে লেখাটুকু মুছল। ছেলেমেয়েরা একটু বড় হওয়ায় ইদানীং নাম ধরে আর স্ত্রীকে বড় একটা ডাকে না অনুপম। আজ ফের ডাকল। কিন্তু কিসের একটা অস্বস্তি আছে যেন এই ডাকের মধ্যে. রাজ্যের ঘৃণা যেন এই দুটি অক্ষরের ধ্বনিটুকুর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে।

অনুপম আর-একবার ডাকল, 'ইন্দু।'

ইন্দু বলল, 'বল।'

'তুমি কেন ওকে ছুঁয়েছিলে, কেন ওকে ধরেছিলে!'

'এসব কথার তুমি কি আর দিন পেলে না। একজন লোক পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল। তোমার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তুমি এখনও ওই কথাই বলছ। তুমি মৃত্যুকে অপমান করছ!'

ইন্দুর দুচোখ থেকে, তার কণ্ঠ থেকেও আজ যেন ঘৃণা ঝরতে লাগল।

অনুপম দাঁতে দাঁত ঘষল। 'মরা মানুষকে অপমান করলাম। ফের সেই নভেলী ঢং! মৃত্যুর আবার মান-অপমান কি? কিন্তু তুমি যে দিনের পর দিন আর একটা তাজা জীবন্ত লোককে অপমান করে চলেছে তার কী হবে, সে শাস্তি তুমি এড়াবে কী করে?' বলতে বলতে ইন্দুর ডান হাতখানা নিজের কঠিন মুঠির মধ্যে চেপে ধরে একটা মোচড় দিয়ে অনুপম ফের জিজ্ঞাসা করল, 'কী বলে এড়াবে?'

দুঃসহ যন্ত্রণায় ইন্দু আর্তনাদ করে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিল অনুপম। ইন্দু মেঝেয় বসে পড়ল।

আর সব কাজের মত শবদাহের ব্যাপারেও অনুপমের দক্ষতা আছে। মনে যতই অশান্তি থাকুক না, এসব সামাজিক কর্তব্যে তার কোন ত্রুটি হয় না। অল্প সময়ের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। হৈমবতীর শব নিয়ে শ্মশান-বন্ধুরা এগিয়ে চললেন। যন্ত্রের মত চিন্ময় চলল সঙ্গে।

একটু বেলা হলে দোর খোলা পেয়ে তিলু আর মিনু ঢুকল ভিতরে।

তিলু বলল, 'ওকি মা, কী হল তোমার?'

মিনু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'মার হাত ভেঙ্গে গেছে দাদা।'

ইন্দু ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসেছে। ম্লান হেসে বলল, 'না না, কিছু হয় নি। তোমরা যাও ও ঘরে।'

তিলু পাশের ঘরে গেল না। পাশের বাড়ির বন্ধুর দিদির কাছে থেকে আয়োডেক্স চেয়ে নিয়ে এসে বলল, 'তোমার হাত দাও মা, লাগিয়ে দিচ্ছি, এক্ষুনি সেরে যাবে।' মায়ের কোন মানা শুনল না। আঙুল দিয়ে তিলু মায়ের হাতে আয়োডেক্স ঘষে দিতে লাগল।

অনুপম ভেবেছিল পরদিনই চিন্ময়কে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলবে। মেয়েছেলে আর তো কেউ রইল না। এখন একা-একা এই গৃহস্থের বাড়িতে ও কী করে থাকবে। এবার ও ঘর ছেড়ে দিয়ে কোন মেসে টেসে গিয়ে উঠুক। এ মাসের ভাড়াটা অনুপম না হয় ছেড়ে দেবে। কিন্তু বলতে গিয়ে দোরের কাছে থেমে দাঁড়াল অনুপম। দরজা খোলাই ছিল। তবু ঘরে ঢুকতে পারল না। দেখল দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে চিন্ময় পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। ওর চুলগুলি উস্কোখুস্কো। ঘরময় বই আর কাগজপত্র ছড়ানো রয়েছে। যেন এখনো শ্মশানের মধ্যে বসে আছে। মনে মনে ভারি মায়া

হল অনুপমের। তার বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। এই মুহূর্তে সে ভুলে গেল চিন্ময় তার শত্রু, চিন্ময় তার প্রতিদ্বন্দ্বী। পনের-ষোল বছর আগের মাতৃ-শোকাতুর আর একটি যুবকের কথা মনে পড়ে গেল অনুপমের। চব্বিশ বছর বয়েসে সে নিজেও মাকে হারিয়েছিল। হারিয়ে চিন্ময়ের মত অমন ধীর স্থির ভাবে বসে থাকতে পারে নি। তখন অনুপম ছিল গাঁয়ের বাড়িতে। বর্ষাকাল। বাড়ির চারিদিকে জল থৈ থৈ করত। সেই দ্বীপ থেকে হাঁটা পথে কোথাও বেরোবার জো ছিল না। কিন্তু ঘাটে ডিঙি বাঁধা থাকত। বৈঠা আর সেই ডিঙি নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত অনুপম। খাল পার হয়ে নদী, নদী পার হয়ে মাঠ। জলভরা শস্যভরা মাঠের এক ধারে নৌকা থামিয়ে মায়ের শোকে চোখের জল ফেলত অনুপম। আস্তে আস্তে সূর্য অস্ত যেত, সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসত, তার আগে কিছুতেই বাড়ি ফিরত না।

ফিরে এলে পিসীমা রাগ করতেন, 'বেড়াতেই যদি যাবি, একা-একা যাস কেন। বন্ধু-বান্ধব কি চাকর-বাকর কাউকে নিয়ে যা। গুরুদশার সময় একা একা ঘোরা কি ভালো।'

'কেন, তাতে কী হয় পিসীমা?'

'কী আবার হবে। দোষ হয়। সে কি এত অল্পেই মায়া কাটাতে পারে। মায়া কাটানো কি এত সহজ। সে বহুকাল পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে, টেনে নেওয়ার জন্য ছল-ছুতো খুঁজবে। খবরদার, আর কখনো একা একা বেরোবিনে।'

হাতে বাঁধা রক্ষাকবচটা ঠিক আছে কিনা, গায়ের চাদরে লোহার চাবিটি বাঁধা আছে না খসে পড়ে গেছে, অশৌচের একমাস রোজ পরীক্ষা করে দেখতেন পিসীমা। সেই মাও নেই, পিসীমাও নেই। তাঁদের কথা ভেবে মনটা ভারি উদাস হয়ে গেল অনুপমের। চিন্ময়ের শোকস্তব্ধতা না ভেঙে ফিরে চলে এল। একবার ভাবল, ওকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসে। কিন্তু পারল না। ওর সঙ্গে কথা বলতে কেমন যেন একটু লজ্জা হল অনুপমের। নিজের জন্যে নয়, চিন্ময়ের জন্যে, চিন্ময়ের অপরাধের জন্যেই লজ্জা। অনুপমের স্ত্রীকে যে কুনজরে দেখেছে তার সঙ্গে কী করে কথা বলবে অনুপম। বলতে গেলে কটুকথা বলতে হয়, গালাগাল দিতে হয়, মারধোর করতে হয়। যাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে তার সঙ্গে কিছুতেই ভদ্রতা করতে পারে না অনুপম। সে খেলোয়াড়ের জাত। তার মন আর মুখ ভিন্ন নয়। বেশ তো ছিল চিন্ময়। অনুপম তো তাকে আদর করেই বাড়িতে ডেকেছিল। ওকে স্নেহ করেছিল ছোট ভাইয়ের মত। তবু কেন চিন্ময় অমন আহাম্মুকি করতে গেল। সংসারে কি মেয়ের অভাব আছে। টুলিকে পছন্দ না হত কলেজে-পড়া আর-কোন মেয়েকে বিয়ে করে ভালোবাসত, না হয় ভালোবেসে বিয়ে করতে পারত চিন্ময়। তাতেও কোন দোষ ছিল না। কিন্তু এমন মহা-অপরাধ করতে গেল কেন? কিসের আশায়? যার স্বামী আছে, সন্তান আছে, তার কাছ থেকে লুকোচুরি করে কতটুকুই বা পেতে পারে চিন্ময়? পরস্ত্রীর সেই দুচার ফোঁটা

ভালোবাসার দাম কি এতই বেশি যার জন্তে নিজের মান-সম্মান, অন্তের সুখ-শান্তি নিয়ে এমন জুয়ো খেলতে গেল চিন্ময় ? যে অনুপম দাদার মত, বন্ধুর মত তাকে ভালো-বেসেছে, কিসের জন্তে সেই স্নেহ আর বিশ্বাস চিন্ময় হারাতে গেল ? পুরুষ পুরুষকে যে সম্মান দেয়, শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে তার কাছে কি কোন মেয়েলি প্রেমের তুলনা হয় ? অনুপম নিজে হলে কিছুতেই অমন ভুল করত না, চিন্ময়ের মত অমন বে-আক্কেল আর আহাম্মক হত না সে।

রান্নাঘরের সামনে বসে ইন্দু বঁটি পেতে তরকারি কুটছিল। অনুপম এসে সেখানে দাঁড়াল, স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'শোন।'

ইন্দু মুখ না তুলেই জবাব দিল, 'বল।'

অনুপম বলল, 'চিন্ময় যদি চায় অশৌচের মাসটা থেকে যেতে পারে। আমি নিরঞ্জনকে কোন রকমে বলেকয়ে রাখব। কিন্তু এক মাস পরে ঘর তাকে অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে।'

ইন্দু বলল, 'বেশ তো, তাকে বলে দাও।'

অনুপম একটু হাসল, 'তুমিই বলে দিয়ো। কথাবার্তা যখন ফের শুরু করেছ তখন আর লজ্জা কি।'

ইন্দু কোন জবাব দিল না।

খানিক বাদে নাওয়া-খাওয়া সেরে অনুপম অফিসে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বলল, 'হাতে কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে ?'

ইন্দু বলল, 'না।'

মিনু জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, মার হাত ভাঙল কি করে ?'

অনুপম জবাব দিল, 'পা পিছলে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল জানিসনে বুঝি।' তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, 'সন্ধ্যার পর এসে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাব।'

খানিকক্ষণ কি চিন্তা করল ইন্দু, তারপর ঠিক করল চিন্ময়কে আজই সে বলে দেবে। এখান থেকে চলে যেতে বলে দেবে। এখানে যত বেশি সে থাকবে তত অশান্তি বাড়বে। তার আর এখানে থেকে কাজ নেই।

কাজকর্ম সেরে চিন্ময়ের ঘরের সামনে এগোতেই তার কাণ্ড দেখে ইন্দু অবাক হয়ে গেল। চিন্ময় জানলার সামনে ছোট আয়নাখানা নামিয়ে ক্ষৌরী হতে বসেছে। গালে কেবল সাবান মাখতে শুরু করেছে, এখনো ক্ষুর ধরে নি।

যেন সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে ইন্দু তেমনি দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে চিন্ময়ের সামনে থেকে শেভ করার সরঞ্জামগুলি ছিনিয়ে নিয়ে বলল, 'এ কী হচ্ছে শুনি ? তোমার না অশৌচ, গুরুদশা ?'

ইন্দুর এই ব্যস্ততায় চিন্ময় একটু অবাক হয়ে থেকে বলল, 'তাতে কি হয়েছে। শোক তো আমার ভিতরে। তাকে বাইরে টেনে এনে লাভ কি।'

ইন্দু বলল, 'লাভ-লোকসান বুঝিনে। আমি যতক্ষণ আছি, তোমাকে এসব অনাচার করতে দেব না। তুমি কি হবিষ্য-টবিষ্য কিছুই করবে না? শ্রাদ্ধ-শান্তি সব বাদ দেবে?'

চিন্ময় বলল, 'তাই তো ভেবেছি।'

ইন্দু বলল, 'ওসব ভাবনা ছাড়। ধর্ম না মানো, সমাজ তো মানো।'

চিন্ময় একটু হাসল, 'আমাকে তো জানেন। আমি শুধু অধার্মিক নই, অসামাজিকও। যে দু-চারজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমার সমাজ তারা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।'

ইন্দু বলল, 'কিন্তু তারা ছাড়া কি আর কেউ নেই?'

চিন্ময় বলল, 'আরো একজন অবশ্য আছেন।'

আরক্ত মুখে ইন্দু চোখ নামিয়ে নিল। কিন্তু পরক্ষণে সমস্ত দ্বিধাসংকোচ ত্যাগ করে মুখ তুলে বলল, 'বেশ, সে আছে বলে যদি স্বীকার কর, তাহলে তার কথাও তোমায় শুনতে হবে।'

চিন্ময় বড় বিব্রত বোধ করল। ইন্দুর সঙ্গে তার কেবল হৃদয়ধর্মে মিল। বিচার-বুদ্ধিতে রুচিপ্রবৃত্তিতে কোন মিল নেই। তবু সেকথা বলতে চিন্ময়ের বাধল। যে নারী শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা, শাসন তিরস্কার সত্ত্বেও তার কাছে আসতে পেরেছে, স্বামীর সমস্ত ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে পরম বিপদের দিনে তার পাশে এসে দাঁড়াতে পেরেছে, তাকে আঘাত দিতে চিন্ময়ের মন সরল না। আচার-বিচারের তর্ক এই মুহূর্তে নেহাতই তার কাছে বাইরের বস্তু মনে হল। ওসব মানা না-মানা একই কথা। কিন্তু ইন্দুর খুশী হওয়া না-হওয়া চিন্ময়ের কাছে এক কথা নয়।

ইন্দু বলল, 'অত ভাবছ কেন। বেশ, নিজের জন্যে ওসব মানতে যদি তোমার লজ্জা হয়, আমার জন্যেই মানো। তোমার মা-ও দুবার করে মারা যাবেন না, আমিও দুবার করে তোমাকে এসবের জন্যে অনুরোধ করব না। শুধু একটিবার। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। একটা তো মোটে মাস। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

চিন্ময় বলল, 'আচ্ছা।'

ইন্দু চলে যাচ্ছিল, চিন্ময় তাকে ফের ডাকল, 'আপনার হাতে ও কী হয়েছে?'

হাতখানা এবার বেশ খানিকটা ফুলে উঠেছে, যন্ত্রণাও হয়েছে খুব। তবু তাই নিয়ে কাজকর্ম করে যাচ্ছে ইন্দু। চিন্ময়ের কৌতূহল দেখে হাতখানা সে তাড়াতাড়ি আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলল, 'ও কিছু না, একটা চোট লেগেছে।'

চিন্ময় একটুকাল ইন্দুর দিকে তাকিয়ে রইল, কী একটা কথা ফের জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ইন্দুর বিব্রত ভাব দেখে থেমে গেল।

একটু বাদেই ঘর থেকে চলে গেল ইন্দু।

তার কথা বলবার ধরনে, চোখ সরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার ভঙ্গিতে চিন্ময়ের বুঝতে বাকি রইল না ইন্দু তার কাছে সত্য কথা বলে নি, সব কথা বলে নি, তার হাতে চোট লাগার পিছনে এক গোপন অকথিত কাহিনী রয়ে গেছে। কিন্তু ইন্দু যদি তার কাছে সব কথা খুলে না বলে চিন্ময় কী করতে পারে। মনে মনে ভারি অভিমান হল চিন্ময়ের। ইন্দু কেন তাকে সব বলে না। কই চিন্ময় তো কোন কথা তার কাছে গোপন করে নি। নিজের ভালো লাগা মন্দ লাগা রুচি-প্রবৃত্তি আশা-আকাঙ্ক্ষার সব কিছুই তো ইন্দুর কাছে সে প্রকাশ করেছে। তবু ইন্দু কেন নিজেকে এমন সরিয়ে রাখে, দূরে রাখে। কেন চিন্ময়কে তার সুখ-দুঃখের সমভাগী করে না।

পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে চিন্ময় এবার বেরোবার উদ্যোগ করল। বারান্দায় নামতেই হৈমবতীর দোর-ভেজানো ঘরখানার দিকে চোখ পড়ল চিন্ময়ের। বুকের ভিতরটা কী একটা দুঃসহ যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল। নতুন করে মনে পড়ল মা নেই। আস্তে আস্তে দোর ঠেলে ঘরে ঢুকল চিন্ময়। ঘর শূন্য। ঠিক শূন্য নয়। হৈমবতীর ব্যবহার্য সব জিনিসই পড়ে রয়েছে। তাঁর জলের ঘটি, জপের মালা, দড়িতে ঝুলানো থান কাপড়, শাদা সেমিজ, বাসন-কোসন, সংসারের আসবাবপত্র সবই পড়ে রয়েছে, শুধু মা-ই নেই। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ ভারি শূন্যতা বোধ করল চিন্ময়। অবরুদ্ধ কান্না যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইল। অথচ এই একটু আগেও মায়ের কথা সে সম্পূর্ণ ভুলে ছিল। মা যে নেই তার জন্যে চিন্ময় কোন অভাব বোধই করে নি। সে বরং ইন্দুর সঙ্গে কথা বলেছে, তাকে সুখদুঃখের অংশ দেয় না বলে অভিমান করেছে, আঘাত পেয়েছে, কিন্তু মা যে নেই সেই পরম দুঃখের কথা তার মনে হয় নি। সেকথা ভেবে চিন্ময় ভারি লজ্জা বোধ করল। ছি ছি ছি, চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি এরই মধ্যে এত বড় দুঃখকে সে ভুলল কি করে? ইন্দু কে যে সে চিন্ময়ের মার স্মৃতিকে আড়াল করে রাখে, পবিত্র শোককে ঢেকে দেয়? না, চিন্ময় মাকে ভুলবে না, দেহকে দুঃখ দিয়ে, কষ্ট দিয়ে অশৌচ পালনের কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়ে মাকে সে মনে রাখবে, মাকে সে প্রতি মুহূর্তে মনে করবে। এই স্মরণশ্রাদ্ধ ছাড়া আর কোন শ্রাদ্ধ সে মানে না, আর কোন অনুষ্ঠানের তার প্রয়োজন নেই।

দোর ভেজিয়ে রেখে চিন্ময় আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল। বাগবাজার পোস্ট-অফিসে ঢুকে সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে সপ্তাহখানেকের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠাল। ছুটি চিন্ময়ের পাওনাই আছে। দরকার হলে পরে আরো নিতে পারবে।

পোস্ট-অফিস থেকে বেরিয়ে চিন্ময় গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। জোর করে অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে মার কথা ভাবল। বলতে গেলে সারাজীবনই তো মার

সঙ্গে জড়িয়ে আছে চিন্ময়। যার স্মৃতি মানে চিন্ময়েরই অতীত ইতিহাস। বাল্য-কৈশোরের সে অতীত শুধু মুখর অতীত নয়; মধুর অতীত।

বাসায় যখন ফিরল, তখন দেড়টা বেজে গেছে। ইন্দু উদ্বিগ্নভাবে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে। চিন্ময়কে দেখে সে মৃদু তিরস্কারের সুরে বলল, 'কি কাণ্ড বল তো, কোথায় ছিলে? আমি কতক্ষণ ধরে সব গুছিয়ে-টুছিয়ে তোমার জন্যে বসে আছি।'

শেষ কথাটুকু ভারি মধুর লাগল চিন্ময়ের কানে। 'তোমার জন্যে বসে আছি'। তার সমস্ত দুঃখ সমস্ত শোকের ওপর যেন স্নিগ্ধ শ্বেতচন্দনের প্রলেপ পড়ল। চিন্ময় চোখ তুলে চেয়ে দেখল চন্দনের স্নিগ্ধতা ইন্দুর মধ্যে। আজও ওর পরনে ধোয়া চওড়া লালপেড়ে শাড়ি। মাথায় আঁচল নেই। ঘন কালো মসৃণ ভিজে চুলের রাশে পিঠ ঢেকেছে। মুখখানা একটু শুকনো শুকনো।

ইন্দু বলল, 'চল, আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই, তাড়াতাড়ি চান সেরে নাও।'

চিন্ময় সহানুভূতির সুরে বলল, 'আপনার বোধ হয় এখনও খাওয়া হয় নি।'

ইন্দু মৃদু হেসে বলল, 'সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি এর আগে কবেই বা খাই।'

ইন্দুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে চিন্ময়ের মনে হল চন্দনের স্নিগ্ধতা শুধু ওর অঙ্গে নয়, হৃদয়ে। সেখান থেকেই সিত চন্দনের সুরভি উঠে আসছে। ধূপ আর চন্দন যার নিজের মধ্যেই, এমন পূজারিণীকে সঙ্গে পেলে চিন্ময় চিরজীবনের জন্যে পৌত্তলিক হয়ে যেতে রাজী আছে।

হৈমবতীর রান্নাঘরে ওর জন্যে হবিষ্যের উপকরণ গুছিয়ে রেখেছিল ইন্দু। স্নান সেরে চিন্ময় খেতে বসল। ঘি, আলুসিদ্ধ আর আতপ চালের ভাত। সামনে বসে হাওয়া করে আস্তে আস্তে পরিবেশন করতে লাগল ইন্দু।

খেতে খেতে চিন্ময়ের মনে পড়ল গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটু আগে সে নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করেছিল, ইন্দু কে? তখন জবাব পায় নি, এখন পাচ্ছে। ইন্দু জীবন, ইন্দু জীবনের প্রতীক। মৃত্যুকে তো সে আড়াল করে দাঁড়াবেই, তাই তো তার ধর্ম। সে শূন্যতাকে ভরে তোলে, ক্ষুধাকে তৃপ্ত করে—ইন্দু অন্নদা, প্রাণদা, ইন্দু চিন্ময়ী আনন্দময়ী। চিন্ময়ী, চিন্ময়ী। কথাটা অস্ফুটভাবে বার দুই উচ্চারণ করল চিন্ময়। বড় ভালো লাগছে বলতে, ভালো লাগছে ভাবতে।

ইন্দু মৃদু হেসে বলল, 'ওকি, মনে মনে মন্ত্র পড়ছ নাকি?'

চিন্ময় বলল, 'হ্যাঁ, মন্ত্র তো মনে মনেই পড়তে হয়।'

ইন্দু কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু জবাব দেওয়া হল না। পিছনে আর-একজনের হাসির শব্দে চমকে উঠে ফিরে তাকাল।

'বাঃ, বেশ বেশ। সস্ত্রীকং ধর্মমাচরেৎ। এ কি তাই হচ্ছে নাকি চিন্ময়।'

অনুপম হেসে উঠল। যেন তপ্ত তরল সিসা কানে গলে পড়ল দুজনের।

আজ শনিবার। দেড়টায় ছুটি হয়ে গেছে অনুপমের। কারো সে খেয়াল ছিল না।

চিন্ময় ভাতের থালা ঠেলে রেখে উঠে দাঁড়াল। ইন্দুও বাইরে চলে এসে হাত ধুয়ে ফেলল। তারপর বাথরুমের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ইন্দু স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কী শুরু করেছ বল তো। দিনান্তে একজনের খাওয়াটা অমন করে নষ্ট করে দিলে।'

অনুপম বলল, 'প্রাণে খুব লেগেছে, না? আর তুমি যে আর-একজনের সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে দিলে, সে কিছু নয়?'

এ ধরনের প্রশ্ন স্বামীর মুখে হাজার বার শুনেছে ইন্দু। আগে অনেকবার অনেকরকম করে জবাব দিয়েছে। আজ দিল না। নিঃশব্দে ওপরে উঠে গেল।

স্ত্রীর স্পর্ধা দেখে জ্বলতে লাগল অনুপম। অথচ আশ্চর্য, অফিসে বসে একটু আগে সে নিজেই ভেবেছে ইন্দুকে বলবে চিন্ময়ের হবিষ্যের ব্যবস্থাটা যেন তাদের ঘরেই করে। ও তো নিজে রাঁধতে জানে না, কাজ কি এই গুরুদশার সময় হোটেলে-টোটেলে খেয়ে। অনুপম সে কথা আজই বলত, এখনই বলত। কিন্তু ইন্দুর সেই সবুরটুকু পর্যন্ত সইল না, স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার একটু সময় কি ইচ্ছা তার হল না। পাছে অনুপম আপত্তি করে, সেই ভয়ে ইন্দু নিজেই সব ব্যবস্থা করে বসল। চিন্ময়ের সঙ্গে এতই তার প্রাণের টান! কিন্তু অনুপম যদি সম্মতি না দেয় ইন্দুর কতটুকু সাধ্য আছে? কতটুকু সাধ্য আছে তার নিজের ইচ্ছামত চলবার ফেরবার, এখান থেকে ওখানে নড়ে বসবার। সাধ্য যে নেই সেই কথা জোর গলায় ঘোষণা করে দেওয়ার জন্যে অনুপম দোতলায় উঠে গেল।

ইন্দু জানালার শিক ধরে প্রায় দেওয়ালের সঙ্গে মিশে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল, অনুপম তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'শোন।'

ইন্দু মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'বল।'

অনুপম জোর গলায় হুকুমের ভঙ্গিতে বলল, 'শোন, আমার দিকে ফিরে চাও।'

ইন্দু এবার স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল। নির্ভীক, স্থির, শান্ত তার দৃষ্টি।

অনুপম বলল, 'তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি। এত স্পর্ধা তোমার কোত্থেকে হল।'

ইন্দু কোন জবাব দিল না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

অনুপম অবাক হল। ওই তো চিকন কাঁচা বাঁশের মত চেহারা। ওকে অনুপম এই মুহূর্তে মট করে ভেঙে ফেলতে পারে। অনুপমের সামনে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস ওর কোত্থেকে এল। কই, আগে তো এমন পারত না।

অনুপম এবার গলা নামিয়ে শান্তভাবে বলল, 'আচ্ছা ইন্দু, লজ্জা তুমি অনেকদিন আগেই বিসর্জন দিয়েছ। কিন্তু তোমার প্রাণভয়ও কি নেই?'

ইন্দু বলল, 'না তাও নেই। কাল তোমার হাতে মার খেয়ে আমার সেই ভয়ও ভেঙেছে।'

অনুপম দুঃখের সঙ্গে বলল, 'মার? ওই সামান্য একটু হাত মোচড়ানোকে তুমি মার বলো।'

ইন্দু এবার একটু হাসল, 'ভুল হয়েছে। বোধ হয় আদর বলাই উচিত ছিল।'

ওর হাসি দেখে অনুপমের ফের রাগ চড়ে গেল। অধীরভাবে চড়া-গলায় বলল, 'তুমি হাসছ! এত সব কাণ্ডের পরেও তুমি হাসতে পারছ! এত রস তোমার মধ্যে!'

ইন্দু শান্তভাবে স্বীকার করে বলল, 'হ্যাঁ রস তো আছেই।'

অনুপম পরম নৈরাশ্য, পরম ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'আছে কিন্তু সে রস আমার জন্যে না। অন্যের ভোগের জন্যে। কিন্তু তুমি যা ভেবেছ, তাও হবে না ইন্দু। আমি নিজে যা পাব না আমি তা কাউকে ভোগ করতেও দেব না।' অনুপম দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'তোমার সব রস আমি নিংড়ে নিংড়ে বের করব। তারপর আমি তা রাস্তার ধুলোয় ঢালব, নর্দমায় ঢালব তবু তা অন্য কাউকে ভোগ করতে দেব না। আমাকে তুমি তেমন পুরুষ পাও নি।'

সিঁড়িতে লঘু চঞ্চল পায়ের শব্দ শোনা গেল। বইখাতা বগলে তিলক স্কুল থেকে ফিরে এসেছে। ইন্দু তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেল, 'তোর দেরি হল কেন রে তিলু?'

অনুপমও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ তোর অত দেরি হল কেন?'

তিলক দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'ছুটির পর নতুন মাস্টারমশাই আমাদের ম্যাজিক দেখাচ্ছিলেন বাবা, কি চমৎকার ম্যাজিক মা, তুমি যদি দেখতে!'

অনুপম স্থির করল আর এক মুহূর্তও চিন্ময়কে সে এ বাড়িতে থাকতে দেবে না। নোটিস তো অনুপম আগেই দিয়েছে। এবার চিন্ময় ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাক। অনেক সহ্য করেছে অনুপম। অনেক উদারতা দেখিয়েছে। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে। আর এক মুহূর্তও নয়। ওর মত লম্পট বদমায়েশের আবার গুরুদশা কি?

নিচে নেমে এসে অনুপম চিন্ময়ের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'তুমি তাহলে আজই বিকেলে চলে যাচ্ছ।'

চিন্ময় ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে ছিল। অনুপমের সাড়া পেয়ে দোরের কাছে এগিয়ে এসে দৃঢ়স্বরে বলল, 'না, আমি যাচ্ছি নে।'

অনুপম তার স্পর্ধা দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, 'যাচ্ছি নে মানে? এখানে তুমি একা একা আর থাকবে কী করে? কোন মেয়েছেলে নেই।'

চিন্ময় বলল, 'আছেন।'

অনুপম তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'কার কথা বলছ তুমি?'

চিন্ময় বলল, 'কালীঘাটে আমার এক মামীমা আছেন, তিনি এসে থাকবেন এখানে।'

অনুপম বলল, 'না, তাহলেও তোমাদের এখানে আর থাকা চলবে না। আজই তোমার এ ঘর দুখানা ভ্যাকেট করে দিতে হবে। আমি নিরঞ্জনকে কথা দিয়েছি। তুমি একা মানুষ, কোন মেসে গিয়েও আপাতত থাকতে পারবে।'

কলতলায় কী যেন কাজ করছে ইন্দু। চিন্ময় যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে তাকে। তাদের কথাবার্তাও যে ইন্দু সব শুনতে পাচ্ছে তাতে চিন্ময়ের কোন সন্দেহ রইল না।

চিন্ময় বলল, 'আমি উকিলের কাছে গিয়েছিলাম। আপনার নোটিসের জবাব তার কাছ থেকেই পাবেন। ঘর আমি ছাড়ব না।'

অনুপম কিছুক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'নিশ্চয় ছাড়বে। তোমাকে ছাড়াতে আমার উকিল-মোক্তার, থানা-পুলিশের দরকার হবে না। তোমাকে বের করে দিতে আমি একাই পারব। বেশ, আরো চব্বিশ ঘণ্টা সময় তোমাকে দিলাম। কিন্তু কাল যেন আমি ঘর খালি পাই।'

অনুপম বেরিয়ে গেল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইন্দু সব কথাই শুনছিল। লজ্জায় সে তাকাতে পারছিল না কারো দিকে। আচ্ছা সব পুরুষই কি সমান? চিন্ময়ও এত গোঁয়ার হল কি করে? ও কোন্ জোরে লড়তে চায়? কোন্ জোরে ও পারবে অনুপমের সঙ্গে? গায়ের জোরে নয়, আইনের জোরেও নয়। সমাজ-সংসার রীতি-নীতি আইন-কানুন সবই তো অনুপমের পক্ষে। তবু এত সাহস, এত জোর ওর হল কোত্থেকে? ও কি ইন্দুর ভরসা করছে নাকি? সবকিছু একদিকে আর ইন্দু অন্যদিকে? ও কি তাই ভেবেছে—ছি ছি ছি। ইন্দু তা কী করে পারবে? কিন্তু সবাই যদি ওর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, আর ও যদি ইন্দুর ওপর নির্ভর করেই থাকে তাহলে ইন্দু ওর পক্ষ না নিয়েই বা পারবে কী করে? ওর মা যে বলে গেছেন ওকে দেখতে। কিন্তু সব বাঁচিয়ে সবদিক দিয়ে ওকে কী করে দেখবে। তার অত শক্তি কোথায়, অত সাধ্য কই? চিন্ময়ের জন্য বড় দুর্ভাবনা হল ইন্দুর মনে।

সারাদিন ভাবল ইন্দু, সারারাত ভাবল। ভাবনার আর শেষ নেই।

পরদিন অনুপম অফিসে বেরিয়ে গেলে ইন্দু আস্তে আস্তে চিন্ময়ের ঘরের দিকে চলল। চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল, দ্বিধা হল, বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করল বুঝি একটু। তারপর আর দেরি না করে ঢুকে পড়ল ওর ঘরের মধ্যে।

চিন্ময় তখনও চুপ করে বসে ছিল। হঠাৎ ইন্দুকে এমন অতর্কিতভাবে আসতে

দেখে চিন্ময় এগিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল। তারপর ইন্দুর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'কিছু বলবেন ?'

ইন্দু আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি চলে যাও।'

চিন্ময় বলল, 'চলে যাব ? কেন ?'

ইন্দু একটু হাসবার চেষ্টা করল, 'আবার বলে কেন! কিন্তু এখানে থেকেই বা তোমার কী হবে।'

চিন্ময় সোজা ইন্দুর দিকে তাকাল, 'কী হবে তা জানিনে। কিন্তু এখানে আমাকে থাকতে হবে।'

ইন্দু বলল, 'থাকতেই হবে ?'

চিন্ময় বলল, 'হ্যাঁ, কোথাও না কোথাও থাকতে যখন হবেই, এখানেই বা কেন নয় ?'

ইন্দু বলল, 'কিন্তু তার পরিণাম জানো ?'

চিন্ময় বলল, 'জানি। অনুপমদা এই খানিকক্ষণ আগেও শাসিয়ে গেছেন। কিন্তু আইন-আদালত তো কেবল তাঁর জন্যেই খোলা নেই। তা আমিও করতে জানি।'

ইন্দু একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'ছিঃ, ও-সবের মধ্যে যেয়ো না। তাতে কারোরই মান থাকবে না। তার চেয়ে তুমি চলে যাও চিন্ময়, সেই ভালো।'

চিন্ময় ইন্দুর আরো কাছে এগিয়ে এল, বলল, 'তুমিও আমাকে চলে যেতে বলছ।'

'তুমি' কথাটা কানে একটু লাগল ইন্দুর। কিন্তু কোন প্রতিবাদ না করে চিন্ময়কে কোন বাধা না দিয়ে সে আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ তাই বলছি।'

চিন্ময় হঠাৎ ইন্দুর হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরল, 'যদি যাই, আমি তোমাকেও নিয়ে যাব ইন্দু, আমি একা যাব না।'

ইন্দু মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল, স্পন্দন যেন থেমে গেল হৃৎপিণ্ডের। এ যেন সেই লাজুক ভীরু চিন্ময় নয়, এ যেন অন্য মানুষ, অন্য পুরুষ।

একটু বাদে আস্তে আস্তে হেসে বলল, 'ছেড়ে দাও, হাতে বড় লাগছে। ওই হাতটাই ভেঙে গেছে আমার।'

চিন্ময় এবার ইন্দুর ফুলেওঠা হাতখানার দিকে তাকিয়ে একটু অপ্রতিভ হল, মুঠি শিথিল করল, কিন্তু হাতখানা একেবারে ছেড়ে দিল না।

বেশ একটু বিদ্বেষের সুরে চিন্ময় বলল, 'ভেঙে গেছে বোলো না, ভেঙে দিয়েছে বলো। আমি সব জানি।'

ইন্দু বলল, 'তাহলে তো জানোই।'

চিন্ময় কোমল বেদনার্ত কণ্ঠে ডাকল, 'ইন্দু।'

কদিন ধরে নিজের নাম সে নতুন করে স্বামীর মুখে শুনছে। আজ আবার আর-একজনের মুখে শুনতে পেল। দুজনের মুখে ওই একই নামের উচ্চারণ একেক রকম, ধ্বনি আলাদা, মানে আলাদা। সেই আহ্বানে ইন্দুর হৃদয়ের সবগুলি তার যেন একসঙ্গে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। সেই ঝঙ্কারের তীব্রতায় ইন্দুর মনে হল বুঝি সব ছিঁড়ে যাবে, আজ বুঝি সব ছিঁড়ে যাবে।

কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের আবেগকে সংযত করে ইন্দু স্থির, সহজভাবে দাঁড়াল। এখনো তার হাত চিন্ময়ের হাতের মুঠোয় ধরা। ইন্দু তা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল না। চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'বল, কী বলছিলে।'

চিন্ময় বলল, 'আমি সব জানি, আমি সব দেখেছি। এই পীড়নের মধ্যে, নিত্যকার এই অপমান অসম্মানের মধ্যে তোমাকে আমি ফেলে যেতে পারব না। তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।'

ইন্দু ফের একটুকাল স্তব্ধ হয়ে চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল সত্যিই বুঝি এতদিনের সব বন্ধন ছিঁড়ে গেল সমস্ত শিকড় একটানে উন্মুলিত হল।

কিন্তু পরমুহূর্তে ইন্দু ফের হাসল, 'সঙ্গে নিয়ে যাবে বলছ, কিন্তু কোন্ দোর দিয়ে বের করবে আমাকে। এ সংসার থেকে বেরোবার রাস্তা তো আমার অত সহজ নয়। বেরোবার সময় যখন আসবে তখন আমি একাই বেরোব।'

চিন্ময় বলল, 'একা ?'

ইন্দু বলল, 'হ্যাঁ একা। যে হাত আমার স্বামী ভেঙে দিয়েছেন সেই হাতই তুমি শক্ত মুঠিতে ধরে রয়েছ। প্রথমটায় বড় যন্ত্রণা পেয়েছিলাম, এখন আর অতটা নেই। আর একজনের ভেঙে-দেওয়া হাত তোমার হাতের মধ্যে দেখতে দেখতে আমার কি মনে হচ্ছে জানো ? তোমাদের দুজনের মধ্যে ভারি মিল আছে। সে মিল এতদিন আমার চোখে পড়েনি, আজ পড়েছে।'

চিন্ময়ের মুখ দিয়ে হঠাৎ কোন কথা বেরোল না।

ইন্দু একটু হাসল, 'আমি তা চাই নে চিন্ময়, তুমি অবিকল আর একজনের মত হও আমি তা চাইনে। তুমি আমার চোখে সম্পূর্ণ আলাদা, তুমি আমার কাছে কতটুকু কী পেয়েছ জানিনে, দেওয়ার মত আমার কীই বা আছে। কিন্তু আমি তোমার কাছে অনেক শিখেছি, অনেক পেয়েছি। এতখানি দিয়ে তুমি সেই দান ফিরিয়ে নিও না চিন্ময়, আমার সব পাওয়া নষ্ট করে দিয়ে যেয়ো না।'

ইন্দুর মুখের দিকে আরো একটুকাল তাকিয়ে রইল চিন্ময়। তারপর আস্তে আস্তে ওর হাত ছেড়ে দিল। ইন্দু ফের চলে গেল নিজের ঘরে।

ঘণ্টাখানেক বাদে হঠাৎ তিলু-মিনুর ডাকে ইন্দুর চমক ভাঙল।

মিনু বলল, 'মা জানো চিনুকাকা চলে গেল। দাদার কাছে কতগুলি টাকা দিয়ে গেছে জানো? দাদা বল কিনবে।'

তিলু বলল, 'দূর বোকা মেয়ে। বল কেনার টাকা বুঝি? এ হল, এ মাসের ভাড়ার টাকা। এই নাও মা।'

ইন্দু হাত বাড়িয়ে টাকাগুলি তুলে রাখল।

মিনু বলল, 'বেশ মজা হবে দাদা। দুটো ঘরই আবার আমাদের হয়ে যাবে।'

ওরা দুজনেই খুশী হল। কেউ চিন্ময়কে পছন্দ করে নি। খানিকক্ষণ বাদে অনুপম অফিস থেকে ফিরে এল। আজ একটু তাড়াতাড়িই ফিরেছে। ক্লোজিং-এর সময় এলে রবিবারে অফিসে বেরোতে হয়। কিন্তু অ্যাসিস্ট্যাণ্টদের সব বুঝিয়ে দিয়ে দুদিন ধরে নিজে আগে আগেই চলে আসছে অনুপম। মন স্থির করে কাজ করবার মত অবস্থা এখন নয়। চিন্ময়কে তাড়িয়ে তিনদিনের কাজ একদিনে সারবে।

ঘরে এসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে অনুপম স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'ওকি ওখানে অমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? শোন এদিকে।'

আরো বার দুই ডাকতে ইন্দু কাছে এসে দাঁড়াল, মৃদুস্বরে বলল, 'কী বলছ।'

অনুপম বলল, 'আসবার সময় নিচে একবার ওর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে এলাম। ঘরে মানুষজন কেউ আছে বলে তো মনে হল না। ও গেল কোথায়?'

ইন্দু তেমনি আস্তে আস্তে বলল, 'ও চলে গেছে। ঘর ছেড়ে দিয়ে গেছে।'

অনুপম একটু হাসল, 'বল কি! সত্যি! তখন যে খুব আস্ফালন করছিল। তারপর ভয়ে ভয়ে নিজেই চলে গেল বুঝি।'

ইন্দু বলল, 'আমি ওকে চলে যেতে বললাম। থাকলে অনর্থক চেঁচামেচি কেলেঙ্কারি হত। সেদিনের মত।'

অনুপম বলল, 'ঠিক ঠিক, তুমি বুদ্ধিমতীর কাজ করেছ। ওকে তখন ভয় দেখিয়েছিলাম বটে, কিন্তু এই নিয়ে পাড়াময় একটা হৈচৈ উঠলে সত্যিই খুব খারাপ হত। তার চেয়ে ও যে ভালোয় ভালোয় চলে গেছে সেই বেশ হয়েছে। নিরঞ্জনরা বোধহয় কাল সকালেই এসে পড়বে। ওদের খুব গরজ।'

নিচের ঘরে ছেলেদের ছুটোছুটি দাপাদাপির শব্দ শোনা গেল।

তিলু আর মিনু নিচের ঘর দুটি অনেকদিন বাদে ছাড়া পেয়ে খুব লাফালাফি শুরু করেছে।

অনুপম ভাবল, করুক। কয়েক ঘণ্টার জন্য রাজত্ব যখন পেয়েছে ওরা ভোগ করে নিক।

একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দোরটা একটু ভেজিয়ে দিল অনুপম, তার পর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে বলল, 'সত্যি, ভারি ভালো লাগছে, এত সহজে যে ব্যাপারটা মিটবে—।'

ইন্দু কোন জবাব দিল না।

স্ত্রীর শান্ত গম্ভীর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটু মুচকি হেসে হঠাৎ স্ত্রীকে পাজা কোলে করে তুলে নিল অনুপম। তারপর মুখের কাছে মুখ নিয়ে মিষ্টি করে বলল, 'রাগ করেছ?'

ইন্দু নীরবে স্বামার দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলল, 'রাগ কিসের। ছেড়ে দাও, পড়ে যাব।'

অনুপম নিজের মনেই হাসল। ভাবল, মান ভাঙাতে এবার সময় লাগবে। স্ত্রীকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বলল, 'আরে না না, পড়বে কেন।'

ইন্দুকে আরো শক্ত করে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল অনুপম। তারপর সেই আয়োডেক্স-মাখা হাতে চুমু খেল। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'জানো, তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে এমন শক্তি পৃথিবীতে কারো নেই।'

ইন্দু চুপ করে রইল।

অনুপম বলল, 'আমি কবিও নই, প্রফেসারও নই, সাধারণ সংসারী মানুষ। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকে কারো চেয়ে কম ভালবাসিনে। জান-প্রাণ দিয়ে তাকে রক্ষা করতেও জানি।'

ইন্দুকে ঠিক তেমনি করে বুকের কাছে ধরে রেখে পশ্চিমের জানলার ধারে এসে দাঁড়াল অনুপম, বলল, 'কী চমৎকার রঙ দেখেছ?'

ইন্দু কোন জবাব না দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল, পাশাপাশি দুটি বাড়ির মাঝখানে সরু একফালি ফাঁকা আকাশ। সেখানে সত্যিই সূর্যাস্তের রঙ লেগেছে।

যতক্ষণ সেই রঙ আস্তে আস্তে মিলিয়ে না গেল, সন্ধ্যার ছায়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে না গেল, অপলকে সেদিকে তাকিয়ে রইল ইন্দু। দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখল জোর করে। পাছে স্বামীর কানে যায়, পাছে নিজের কানে যায়। তারপর অনুপমের দিকে ফিরে ফের মৃদু অনুনয়ের সুরে বলল, 'দোহাই তোমার, এবার নামিয়ে দাও। ওরা কেউ এসে পড়বে।'

উল্টোরথ

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীচরণকমলেষু

উল্টোরথ

বেলা ন'টা বাজতে না বাজতেই খেতে এল প্রিয়লাল।

সুবর্ণ তখনো বঁটিতে মাছ কুটছে।

প্রিয়লাল বলল, 'কতদূর হোল সুবর্ণ?'

সুবর্ণ বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, 'এই তো কেবল ন'টা বাজল। আর বাজার ক'রে দিয়ে গেলেন তো মাত্র মিনিট পনের আগে। কতদূর হোল দেখতে পাচ্ছেন না?'

ঝাঁজ আছে সুবর্ণের গলায়।

সুবর্ণের মা নিভাননী ব'সে ব'সে শাক বাছছিলেন। মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন, 'আহাহা, কথার ছিরি দেখ মেয়ের। একেবারে ঘণ্টা মিনিট হিসাব করে দিচ্ছে। যেন ঘড়ি একটা ওর বাঁধা আছে হাতে। তাড়াতাড়ি আয় হাত চালিয়ে। যাও বাবা তুমি গিয়ে ব'সো। বেশি দেরি লাগবে না।'

ঘরের মধ্যে হাত পাঁচ ছয়েক মাত্র জায়গা। তার প্রায় বারো আনিই প্রিয়লালের তক্তপোশখানা জুড়ে রয়েছে। কিন্তু তক্তপোশে গিয়ে আজ আর বসল না প্রিয়লাল। দেয়ালে ঝুলানো খানকতক পুরনো শাড়ি আর একেবারে ছিঁড়ে যাওয়া একটা পাটিকে টুকরো টুকরো ক'রে সুবর্ণ আসন বানিয়েছে। প্রত্যেকটা আসনের ঠিক এক জায়গায় মোচড়ানো আর প্রায় গোটা তিন চারি ক'রে ফুটো আছেই। পুরোন শাড়ির রঙীন পাড় ছিঁড়ে সুবর্ণ সযত্নে মুড়ে দিয়েছে। তারই একখানা আসন পেড়ে নিয়ে ঘরের মেঝেতে উঠানের দিকে মুখ করে প্রিয়লাল ব'সে পড়ল। এখান থেকে সম্পূর্ণ দেখা যায় সুবর্ণকে। কিন্তু শুধু দেখলেই তো মন ভ'রে না, দেখা দিতেও সাধ যায়।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে থেকে প্রিয়লাল আবার তাড়া দেয়, 'মাছের আমার দরকার নেই। যা হয়েছে তাই দিয়েই দাও আমাকে।'

সুবর্ণ আবার বিরক্ত হয়ে ওঠে, সব সময় অমন যদি ঘোড়ায় চড়ে থাকেন আমার দ্বারা হবে না আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি।'

নিভাননী এবারও ধমক দেন, 'কথার ছিরি দেখ। তোর জন্য বাছা কি শেষে আফিস কামাই করবে নাকি?'

সুবর্ণ বলে 'অত যদি দরদ, নিজে এসে বেঁধে বেড়ে দিলেই পারো, আমার দ্বারা হবে না।'

নিভাননী বলেন, 'না তা হবে কিসের। রাজনন্দিনীর দেমাকে আর পা পড়ে না মাটিতে।'

প্রিয়লাল বিব্রত বোধ করে। ঝগড়া করলে সুবর্ণকে খুব খারাপ দেখায়। গলা মোটেই মিষ্টি শোনায় না। প্রিয়লাল চায় কেবল কথা বলতে। ঝগড়া ক'রতে তো চায় না, অথচ সুবর্ণ তা বোঝে না, কিংবা বুঝেও না বোঝার ভাণ করে।

স্বর্ণ মাছ কোটা শেষ করে চৌবাচ্চা থেকে বালতি ভরে জল তুলে মাছ ধোয়। তারপর বারণ্ডার তোলা উনান থেকে কড়া নামিয়ে কাঁধা উঁচু পিতলের পাত্রটায় ডাল সম্ভার দিয়ে রেখে মাছ চড়িয়ে দেয়। প্রিয়লাল বসেই থাকে।

মাছের ঝোলটা যখন প্রায় ঘন হয়ে ওঠে তখন এসে ঘরে ঢোকে স্বর্ণ। মাটির কলস থেকে জল গড়িয়ে দেয় গেলাসে। তারপর ঢোকে গিয়ে তক্তপোশের তলায়। রাঁধাবাড়া হয় বারাণ্ডাতেই, কিন্তু সেখানে কিছু রাখবার জো নেই। জল হ'লে বৃষ্টির ছাঁট আসে, খরার দিনে রোদের তাপে ভাত তরকারি শুকিয়ে ওঠে। রেঁধে বেড়ে সব একে একে তাই এই তক্তপোশের তলাতেই রাখে স্বর্ণ। বিধবা নিভাননী প্রথমে খুব খুঁৎ খুঁৎ করতেন, এখন আর কিছু বলেন না।

ভাতে হাত দিয়ে প্রিয়লাল বলে, 'মাছের ঝোল না খাইয়ে বুঝি আর ছাড়বে না? ভেজে দিলেই হোত একখানা। এদিকে যে লেট হয়ে গেলাম।'

স্বর্ণ বলে, 'লেট না ঘোড়ার ডিম হলেন। আর অত ভয়ই বা কিসের? একদিন লেট হ'লে কি ফাঁশি হবে, না চাকরি যাবে?'

প্রিয়লাল ফিস ফিস ক'রে বলে, 'অমন যদি বরাভয় দাও তাহ'লে রোজ লেট হই। ফাঁসি গেলেও ভ্রূক্ষেপ করি না, চাকরি গেলেও না।'

স্বর্ণের মুখখানা প্রথমটা লাল হয়ে ওঠে, তারপর আবার পাংশু ফ্যাকাসে হয়ে যায়। বলে, 'ছিঃ অমন বাজে রসিকতা ক'রতে আসবেন না আমার সঙ্গে। ও সব ভালোবাসি না আমি।'

স্বর্ণ গম্ভীর মুখে ডালের বাটি এগিয়ে দেয়, মাছের ঝোল ঢেলে দেয় পাতে। তারপর হাঁড়ি থেকে হাতায় ক'রে ফের ভাত দিতে গিয়ে হঠাৎ তক্তপোশে মাথা ঠুকে যায়। মড়া কাঠের আচমকা গুতো। লেগেছেও বেশি। বেদনায় বিরক্তিতে মুখখানা কালো হয়ে উঠছিল। প্রিয়লাল হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'গেছে, গেছে তো আমার তক্তপোশখানা?'

স্বর্ণ আর হাসি চাপতে পারল না। খিল খিল করে উঠল হেসে। আর একবার হাসি যদি আরম্ভ হয় সহজে তা থামতে চায় না। হাসতে হাসতে স্বর্ণ লুটোপুটি খাচ্ছে, ভারি চমৎকার লাগে দেখতে।

স্বর্ণ হাসতে হাসতে বলে, 'বাপরে বাপ, মানুষকে এমনও হাসাতে পারেন আপনি। ভাঙা তক্তপোশের জন্য মায়াই আপনার বেশি হোল, আমার যে মাথা ফেটে গেল তাতে কোন দুঃখ নেই!'

এ'দিক ওদিক তাকিয়ে প্রিয়লাল ফিস ফিস ক'রে বলে, 'দুঃখ আবার নেই! ঠোক্কর লেগেছে তোমার মাথায়, কিন্তু হৃদয় আমার ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। একথা কি বলবার জো আছে। বললেই তো তুমি এসে মুখ চেপে ধরবে।'

স্বর্ণ এসে মুখ চেপে ধরল না, মুখ কালো করে ধমক দিয়ে উঠল, 'ছি, ছি, ফের

আবার আপনি এসব আরম্ভ ক'রেছেন প্রিয়লাল দা? দাদার বন্ধু না আপনি, আপনার না বাড়িতে বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে তিনটি? মাসে মাসে টাকা দিয়ে খাচ্ছেন বলে কি আমার সঙ্গে এই সব নোংরা রসিকতা করবার অধিকারও আপনার জন্মে গেছে?'

সুবর্ণ ছোট নয়। এই তেইশ বছর বয়সে সংসারে তেয়াত্তর বছরের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। মানুষকে চিনতে তার আর বাকি নেই। 'আ তু' বললে তারা ঘাড়ের ওপর চড়ে বসে। ফেরার সময় ঘাড়ে ক'রে তারা নিয়ে যায় না, উল্টে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যায়।

প্রিয়লাল গম্ভীর মুখে খেতে লাগল।

নিভাননী এসে বসলেন কাছে, 'ওমা, ব'সে ব'সে তুই কি দেখছিস সুবি, প্রিয়র পাতে ভাত নেই যে!'

প্রিয়লাল বলল, 'ভাত আর লাগবে না মাসীমা, এই মাত্র নিয়েছি।'

নিভাননী বললেন, 'কথা শোন ছেলের। এই নিলেই যেন আর নেওয়া যায় না। ভাতে কম পড়বে ভেবেছ না কি? কি দিনই গেছে ওবার। হিসাব ক'রে গুনে গুনে মানুষ ভাতের দানা মুখে দিত। পাছে এ বেলা এক মুঠো বেশি খেলে ও বেলা উপোষ থাকতে হয়। দে সুবি, ভাত দে প্রিয়কে। আর মাছের তরকারি দে আর একটু। ওর কথা শুনিসনে তুই।'

সুবর্ণ ভাত দিতে যাচ্ছিল প্রিয়লাল প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, 'ঠাট্টা পেয়েছ না কি? সব কিন্তু শেষে প'ড়ে থাকবে পাতে।'

ধমকের বহরে নিভাননীও যেন বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেন, তারপর সামলে নিয়ে হেসে বললেন, 'ভারী তো ভয় দেখাচ্ছ বাবা, পাতে কিছু থাকলে তা বুঝি নষ্ট হবে, খাওয়ার লোক বুঝি আর কেউ নেই এখানে?'

প্রিয়লাল চেয়ে দেখল মুখখানা সুবর্ণের লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভাত আর সুবর্ণ দিল না। প্রিয়লাল মনে মনে ভাবল, কেন ভাত দিল না সুবর্ণ। মায়ের সামনে ধমক দেওয়ায় সে কি অপমানিত বোধ ক'রছে, না পাছে সত্যিই প্রিয়লাল পাতে ভাত রেখে যায় সেই ভয়ে? পাতে ভাত রেখে গেলে কি খাবে না সুবর্ণ? কেন খাবে না, লজ্জায় না ঘৃণায়?

খাওয়া হয়ে গেলে আঁচিয়ে এল প্রিয়লাল। পানের খিলিটা অন্যান্য দিনের মত আজ আর হাতে দিল না সুবর্ণ, একটা বাটিতে করে রেখে দিল তক্তপোশের ওপর।

প্রিয়লাল পান না নিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিল, সুবর্ণ বলল, 'পান নিলেন না আপনি?'

প্রিয়লাল বলল, 'না ওটা তক্তপোশেই থাক। আমাকে ছুঁলেই জাত যায় আমার তক্তপোশে তো আর যায় না।'

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল স্বর্ণ, 'ছি ছি ছি, কি ছোটলোক আপনি। এতখানি নোংরা মন নিয়ে যাতায়াত করেন আপনি। যান, এখনই নিয়ে যান আপনার তক্তপোশ। আর এক মুহূর্ত্তও যেন আমার ঘরে ওটা না থাকে। নিয়ে যান বের করে।'

নিভাননী নিজের রান্নার জোগাড় করছিলেন। চেঁচামেচি শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন, 'কি, হয়েছে কি তোর স্বুবি। অমন ক'রে চেঁচাচ্ছিস কেন? ডাকাত পড়েছে নাকি বাড়িতে?'

কিন্তু তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে সব থেমে গেছে। আর কারো মুখে কোন কথা নেই। গম্ভীর মুখে সন্দিগ্ধ চোখে দরজার দিকে তিনি একবার তাকালেন। তারপর বললেন, 'মুখশুদ্ধি টুদ্ধি কিছু পেয়েছ প্রিয়লাল?'

'হ্যাঁ।' বলেই প্রিয়লাল পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল, মুখ তারও থমথম করছে।

তক্তপোশখানা প্রিয়লালেরই। যুদ্ধের আগে আড়াই টাকায় কিনেছিল। এখন ওটার দাম চৌদ্দ টাকা। যতবার বাসা কিংবা মেস বদলেছে ততবারই এখানা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছে। কুলি আর রিক্সা ভাড়ায় দামের চতুর্গুণ খরচ হয়েছে। তবু বিক্রি করেনি। কিন্তু এবার নিমতলা অঞ্চলের যে কাঠগোলার দোতালায় সীট নিয়েছে প্রিয়লাল, সেখানে এই তক্তপোশ ধরল না। এক ঘরে থাকতে হয় সাতজনকে তার ওপর আবার তক্তপোশ। পেতে তো শোয়ার জো-ই নেই, খাড়া ক'রে যে কোথাও রাখবে এমনও জায়গা নেই একটু। বিক্রি করবার জন্য খদ্দের ডাকছে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল স্বর্ণদের কথা। কিছুকাল ধরে ওদের ওখানে প্রিয়লাল খোরাকী খরচ দিয়ে খাচ্ছিল। পাইস হোটেলের চেয়ে ব্যবস্থাটা অনেক ভালো। খরচ প্রায় সমান সমান পড়লেও ডালের মধ্যে ফেন তো আর ওরা মিশিয়ে দেবে না, টাটকা ব'লে বাসি তরকারিও দিতে পারবে না এনে পাতে, আর শত হলেও মেয়েছেলের রান্না। হাতের গুণে স্বাদটাও তাতে থাকবে।

মায়ে ঝিয়ে শুয়ে থাকত একতলার এই স্যাঁৎসেঁতে মেঝেয়।

প্রিয়লাল বলল, 'আমার একখানা তক্তপোশ আছে এনে দি।'

নিভাননী বললেন, 'সে কি বাবা, তুমি কি পেতে শোবে?'

প্রিয়লাল বলল, 'সেজন্য ভাববেন না, আমার চেয়ে আপনাদের দরকার বেশি।'

আড়ালে পেয়ে স্বর্ণকে জবাব দিল, 'এতে আমার দরকারও মিটবে।'

স্বর্ণ বলল, 'কি অসভ্য আপনি।'

প্রত্যেকটি পায়ার নিচে দুখানা ক'রে ইঁট দিয়ে দিয়ে বেশ উঁচু ক'রে প্রিয়লালই তক্তপোশখানা পেতে দিয়ে গেল। বলল, 'দেখ, তোমাদের একতলা ঘরকে কি রকম দোতলা বানিয়ে ছাড়লুম।'

তা এক রকম দোতলাই হোল। রেঁধে বেড়ে ভাত তরকারি এনে স্বর্ণ তক্তপোশের তলায় রাখতে লাগল। সেখান থেকে প্রিয়লালদের পরিবেশন করে।

প্রথম দিন তক্তপোশের ওপর স্বর্ণের মা নিভাননীই শুয়েছিলেন। স্বর্ণ ঘুমিয়েছিল মেঝেতে বিছানা পেতে, কিন্তু পরদিন ভোরে উঠে নিভাননী গজ গজ করতে লাগলেন। ছারপোকার কামড়ে সারারাত ঘুম আসেনি নিভাননীর। তিনি আর ওর ওপর শোবেন না।—'দূর ক'রে দাও এই তক্তপোশ। যার খাট নিয়ে যাক সে। দরকার নেই এমন ভালো মানুষেমির।' তারপর থেকে স্বর্ণ নিজেই উঠল খাটে। রাত্রির প্রথম দিকটায় ছারপোকায় একটু কামড়ায় বটে, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে প্রায় কোন অসুবিধা হয় না স্বর্ণের, লক্ষ ছারপোকার কামড়েও তার ঘুম ভাঙে না।

এ সব ইতিহাস স্বর্ণের মুখ থেকেই প্রিয়লাল শুনেছে। শুনতে শুনতে এমন অদ্ভুত প্রশ্নও একেকবার মনে এসেছে যে, ছাড়পোকার কামড়ে স্বর্ণের কেন কষ্ট হয় না, সে কি কেবল তার ঘুম বেশি থাকার জন্যই? সালঙ্কারে স্বর্ণের এই গাঢ় ঘুমের বর্ণনার মধ্যে কি আর কোন অর্থ নেই, আর কোন ব্যঞ্জনা?

প্রিয়লাল বেরিয়ে গেলে স্বর্ণ বলল, 'মিথ্যা কথা কেন বলতে গেলে মা। কারো পাতের ভাত আমি খাই? দেখেছ আমাকে খেতে কানদিন? গা ছুঁয়ে বল দেখি?'

নিভাননী গম্ভীর মুখে বললেন, 'বললাম বলেই হোল না কি?'

'হোল না? ভদ্রতা ক'রে আজ হয়তে পাতে কিছু রেখে গেল না কিন্তু কাল থেকে দেখবে রোজই হয়তো ভাত তরকারি রেখে যাবে।'

নিভাননী কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তাতে তোর কি হবে পোড়ারমুখী। ওর নিজের খোরাক নিজে নষ্ট করবে, নিজেই মরবে খিদেয় জ্বলে।'

স্বর্ণ অদ্ভুত একটু হাসল, 'তেমন ভালো মানুষই ওকে ভেবে রেখেছ বুঝি? নিজের ভাত তরকারি নষ্ট করবে তেমন মানুষই পেয়েছ ওকে? পেটভরে নিজে আগে খাবে, তারপর অন্যের খাবার চেয়ে চেয়ে নিয়ে এঁটো ক'রে রেখে যাবে পাতে। তোমার আর কি, তুমি তো ব'লেই খালাস, তোমার তো আর গিলতে হবে না তা?'

নিভাননী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আর একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে কি দেখলেন, তারপর কঠিনকণ্ঠে বললেন, 'আমি কেন গিলতে যাব, গিলবি তুই। গিলতে পারলেই যখন ধন্য হয়ে যাস তখন গিলবি।'

স্বর্ণ চেঁচিয়ে উঠল, 'মা হয়ে তুমি এই কথা বললে আমাকে? বেশ, পারব না আর কাউকে রেঁধে খাওয়াতে। ব'লে দিয়ো বিকাল থেকে কেউ যেন এখানে আর না আসে! উপোষ ক'রে থাকব সেও ভালো।'

নিভাননী বললেন, 'তা থাকতে পারলে আর কথা ছিল কি।'

স্বর্ণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আমি খুব পারি। পারি কিঁ না দেখে নিয়ো। কিন্তু

তুমি কোনদিন পারবে না মা। আর পারবে না সে কথা জানো ব'লেই এমন করছ, চোরকে বলছ চুরি করতে, গেরস্থকে বলছ জেগে থাকতে।'

নিভাননী তেড়ে এলেন, 'মেয়ে হয়ে তুই একথা বললি আমাকে? গলায় দড়ি দিয়ে মরলেও তো এ জ্বালা আমার যাবে না সুবি।'

সুবর্ণ জবাব দিল, 'আর মা হয়ে তুমি যে কথা বলেছ তাতে বুঝি গলায়-দড়ি দিলেই আমার জ্বালা মিটবে?'

রাত্রে প্রিয়লাল খেতে এসে দেখল তক্তপোশের উপর দিকে যে এক চিত জায়গা আছে সেখানে মাতুর পেতে সুবর্ণ পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে।

তক্তপোশের তলা থেকে নিভাননী লাগলেন পরিবেশন করতে।

প্রিয়লাল গম্ভীর মুখে বলল, 'আপনি কেন মামীমা। ওর কি হোল, ওকি এরই মধ্যে আজ ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?'

নিভাননী বললেন, 'হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে বাবা। শরীরটা আজ ওর ভারী খারাপ।'

প্রিয়লাল অদ্ভুত একটু হেসে ডালের বাটিটা পাতের কাছে টেনে নিতে নিতে বলল, 'শরীর বুঝি ওর দুপুরের পর থেকে খারাপ মাসীমা? রান্নাবান্না আপনাকেই সব করতে হয়েছে, না?'

নিভাননী অবাক হয়ে বললেন, 'কেন বাবা, রান্না তো এখনো তুমি খেয়ে দেখনি।'

প্রিয়লাল তেমনি হাসল, 'খেয়ে দেখতে হবে কেন মাসীমা। রঙ দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু বুড়ো মানুষ আপনি, এত কষ্ট করবার দরকার ছিল কি। এক বেলা না হয় হোটেলেই খেতাম।'

নিভাননী বললেন, 'তাই কি আর হয় বাবা। যতক্ষণ পর্যন্ত হাড় ক'খানি আছে ততক্ষণ কি আর তোমাদের হোটেলে খেতে বলতে পারি। খেয়ে দেখ, হোটেলের চেয়ে রান্না বোধহয় নিতান্ত খারাপ হয়নি।'

তোয়াজ ক'রে চলতে হয় প্রিয়লালকে। প্রিয়লাল অনেক জানে। অনেক উপকারও ক'রেছে। কিন্তু তার কৃতজ্ঞতার দাবীর যেন শেষ নেই। শনিকে পূজা ক'রতে হয় তার দৃষ্টি ছাড়াবার জন্য। কিন্তু পূজার লোভেই দৃষ্টি তার ছাড়তে চায় না।

হঠাৎ নিভাননী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভালো কথা প্রিয়লাল, সুবর্ণের জন্য তোমাকে যে একটা সম্বন্ধ দেখতে ব'লেছিলাম, তার কি করলে? তুমি একটু গা করলেই হয়ে যায় বাবা। পুরুষ মানুষ দশ জায়গায় যাওয়া আসা কর, দশজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে তোমার। একটু চেষ্টা করে দেখ না বাবা। দোজবর-টোজবর হলেও আপত্তি নেই। মেয়েরও তো বয়স কম হোল না। আর ভালো চাইলেই তো কপালে মিলবে না।'

প্রিয়লাল তেমনি গম্ভীর মুখে বলল, 'আচ্ছা দেখব মাসীমা।'

ভারী দায় পড়েছে প্রিয়লালের। মাসে মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা খরচ ক'রে এখানে খাবে। আবার দেশ ভ'রে তার মেয়ের জন্য সম্বন্ধ খুঁজে বেড়াবে। এই ধাড়ী বজ্জাত মেয়েকে কেউ ঘরে নেওয়ার জন্য ব'সে আছে। সাত খোপ কবুতর খেয়ে বেড়াল আজ তপস্বী হয়েছে। একটু ছুঁলেই তার জাত যায়, একটু হাসলেই গায়ে ফোস্কা পড়ে। এদিকে পেট তো চলে প্রিয়লালের খরচে।

পরদিন থেকে মাও গম্ভীর, মেয়েও গম্ভীর। দুজনের মুখ যেন কেউ সেলাই ক'রে রেখেছে। স্বর্ণ নীরবে পরিবেশন করে, নিভাননী পান এগিয়ে দেন। আচ্ছা, প্রিয়লালও দেখে নেবে। মাসের এই আট দশটা দিন গেলেই সে গিয়ে আবার ঢুকবে হোটেলে। আর যেই আসুক এত খরচও কেউ দেবে না। এত ফাই ফরমাসও খাটবে না কেউ।

দিন কয়েক পরে প্রিয়লাল হঠাৎ এক সম্বন্ধ নিয়ে এলো। ছেলের নাম গোকুল রায়। প্রিয়লালদের অফিসেই কাজ করে। মা বাপ কেউ নেই। তবে ছেলে খুব ভালো। বয়স সাতাশ আটাস, ভারী চৌকস ছেলে।

নিভাননী সন্দিগ্ধভাবে বললেন, 'কিন্তু এমন ছেলে আমার মেয়েকে কেন নেবে বাবা? তাছাড়া আমি তো কিছু দিতে থুতেও পারব না। শাঁখা সিঁদুরেই নামাতে হবে মেয়েকে।'

প্রিয়লাল বলল, 'তাই করবেন। ছেলের দাবীটাবী কিছু নেই। মেয়ে দেখে পছন্দ হ'লেই হোল।'

নিভাননী তবু বললেন, 'কিন্তু স্বভাব চরিত্র কুলবংশ ভালো ক'রে খোঁজ নিয়েছ তো বাবা?'

প্রিয়লাল বলল, 'খোঁজ না নিয়েই কি এসেছি। স্বভাব-চরিত্র নির্মল। অফিসের যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সেই বলবে। বংশে অবশ্য কুলীন কায়স্থ নয় আপনাদের মতন। আসল উপাধি বরাট। কিন্তু ওর ঠাকুরদা নাকি রায় খেতাব পেয়েছিলেন। বাড়িঘরও ক'রেছিলেন কলকাতায়। ওর বাবা সব খুইয়েছিলেন, কিন্তু এখনো একখানা বাড়ি আছে লক্ষ্মী দত্ত লেনে। সেখানেই থাকে। বেশ ছেলে দেখুন। সেও এসে মেয়ে দেখে যাক। আলাপ-সালাপ ক'রে খোঁজখবর নিয়ে পছন্দ হয় করবেন, না হয় করবেন না!'

আলাপ-সালাপের পর গোকুলকে খুবই পছন্দ হোল নিভাননীর, অপছন্দের কিছু নেই। দিব্যি ছেলে, শান্ত বিনীত কথাবার্তা, নম্রস্বভাব। দেখতেও একেবারে কার্তিকের মত। প্রিয়লালদের নেভিগেশন অফিসে পঞ্চাশ টাকা মাইনের কাজ করে এও ঠিক। গোপনে নিভাননী খোঁজ নিয়ে জানলেন, পাঁচ বছর ধরে ওই অফিসে সুখ্যাতির সঙ্গেই সে কাজ করছে। প্রথমে ঢুকেছিল বাইশ টাকায় এখন পায় পঞ্চাশ। এমন ছেলে,

চরিত্র তার ভালই হবে। কিন্তু কুল বংশ সম্বন্ধে একটু খুঁৎখুঁতি রয়ে গেল নিভাননীর। এ বিষয়ে কেউ কোন পরিষ্কার খোঁজখবর দিতে পারে না। কিন্তু কায়েত যে একথা সবাই বলে। তাই হলেই হোল। তারপর আর সব মেয়ের ভাগ্য। এমন সুবিধার এমন সুপাত্র আর কোথায় পাবেন নিভাননী।

পথে নিয়ে প্রিয়লাল গোকুলকে সাবধান করে দিল, 'খবরদার সাতপুরুষের নামধাম সব ঠিক করে রাখিস কিন্তু, সকলের উপাধি যেন বরাট হয়, আর গোত্র কাশ্যপ। বার টানটা প্রথম প্রথম ছেড়েই দিস। মুখ রাখিস আমার।'

গোকুল হেসে প্রিয়লালের পিঠ চাপড়ে দিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু এতে তোর কি স্বার্থরে প্রিয়? এমন চমৎকার মেয়ে হাতছাড়া করছিস কেন? কিছু ঘটিয়ে-টটিয়ে বলিসনি তো? ভাই past আমার নয়, সে সম্বন্ধে কোন prejudice নেই, কিন্তু দেখিস সেটা যেন futureএ গিয়ে না গড়ায়। তা হলে কিন্তু ফের তোমার ঘাড়ে এনে দেব। বিয়ের আগে অবশ্য Medical Examine আমি করিয়ে নিচ্ছি।'

প্রিয়লাল বলল, 'ছি ছি ছি, আমাকে অবিশ্বাস করছিস তুই? তোর গায়ে হাত দিয়ে বলছি সে সব কিছু নয়।'

গোকুল বলল, 'আচ্ছা দেখাই যাবে।'

মুখে যতখানি যা-তা গোকুল বলেছিল কার্যত অবশ্য তার কিছুই করল না। দিব্যি শান্ত ছেলের মত বিয়ে করে বউকে নিয়ে ঘরে তুলল। নীচের দুখানা ঘরে ভাড়াটেরা থাকে। ওপরের দুখানা নিজের। একখানা প্রায়ই তালাবদ্ধ থাকত, বিশেষ উৎসব আয়োজনে বিশেষ বিশেষ অতিথিরা আসত এখানে। আজ সেখানা ড্রয়িংরুমে দাঁড়াল। বাকিখানা যৌথ বেডরুম।

মাকে নিয়ে আসবার ইচ্ছা সুবর্ণ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু গোকুল রাজী হয়নি। বলেছে তাতে তাঁর সম্মানের হানি হবে। তার চেয়ে ওখানেই তিনি থাকুন। মাসে মাসে মাসোহারা পাঠাবে তাঁকে গোকুল। মনে মনে ভাবল এই ব্যবস্থাই ভালো। কেননা কোন সময় যে একটু বেশি বেসামাল হয়ে পড়বে তার তো কিছু ঠিক নেই। আর একটা দিক থেকে গোকুল ভারি সতর্ক হয়ে গেল। প্রিয়লালকে মোটেই প্রশ্রয় দিল না। প্রায় সমস্ত সংশ্রব তার এড়িয়ে চলতে লাগল। স্বামীর মনের ভাব টের পেয়ে সুবর্ণও এ সম্বন্ধে আর কোন কথা তুলল না।

মাঝে মাঝে নিভাননী দেখা করতে আসেন। খোঁজখবর নিয়ে যান মেয়ে জামাইয়ের। প্রিয়লাল নাকি একবার বাসা করেছিল, আবার বাসা তুলে দিয়ে হোটেল ধরেছে।

বছর দেড়েক পরে গোকুল সুবর্ণকে মায়ের কাছে যেতে অনুমতি দিল। ঘরে মেয়েছেলে আর কেউ নেই। আর প্রথম প্রথম এ অবস্থায় মেয়েদের মার কাছে থাকাই নাকি ভালো। বেশ যত্নে থাকবে, প্রিয়লালকেও এখন আর কোন ভয় নেই গোকুলের।

সাত আট মাসের অন্তঃস্বত্বা, স্বর্ণের যে রূপ এখন খুলেছে তা কেবল গোকুলেরই চোখে পড়বে, প্রিয়লালদের চোখ হয়তো টাটাবে, মুগ্ধ কিছুতেই হবে না।

স্বর্ণ ফের ফিরে এসেছে সেই মণ্ডল স্ট্রীটের বাড়িতে। স্যাঁৎসেঁতে একতলার একখানা ঘর, ছাতলা-পড়া ছটাকখানেক উঠান আর চৌবাচ্চা। ইচ্ছা হলে আজই স্বর্ণ চলে যেতে পারে। গোকুল যাওয়ার সময় সে কথা বলেও গেছে—'খারাপ লাগলে থেকো না।' কিন্তু খারাপ স্বর্ণের লাগছে না। অনেক দুঃখের স্মৃতি অবশ্য জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। কিন্তু তা তো আর সত্যি সত্যিই দুঃখ নয়, দুঃখের স্মৃতি মাত্র।

স্বর্ণ ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। প্রিয়লালের তক্তপোশটি এখনো এখানেই আছে। তার ওপর নিভাননীর বিছানা পাতা। ছারপোকার কামড়ে নিভাননীর বুঝি আজকাল আর ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।

স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করল, 'তক্তপোশটি প্রিয়লালদা নিয়ে যান নি?'

নিভাননী বললেন, 'নেবে কোন চুলোয়? কাঠগোলায় কি আর জায়গা আছে না কি?'

কিন্তু কাঠগোলা আর এই ঘর ছাড়া বুঝি আর জায়গা নাই পৃথিবীতে।

স্বর্ণ বলল, 'প্রিয়লালদার থালা গ্লাসও রয়ে গেছে দেখছি।'

'নিয়ে গিয়েছিল, আবার এনে দিয়েছে। মাসখানেক ধরে আবার এখানেই খাচ্ছে কিনা। হোটেলে খেতেও পারে না, টাকাও লাগে বেশি।'

স্বর্ণ মনে মনে হাসল। আসলে এখানকার মায়া প্রিয়লাল কাটাতে চায় না। 'দু' বেলা তোমাকেই রাঁধতে হয় তো?'

'তা আর কি করব মা। শত হলেও উপকারটা তার দ্বারাই হয়েছে তো!'

স্বর্ণ ফিক করে একটু হাসল, 'উপকার না ঘোড়ার ডিম। দাও মা আমিই আজ রাঁধি।'

'না বাছা রেঁধে তোমার আর দরকার নেই। এমনিতে সুস্থ থাকো সেই আমার ভালো।'

স্বর্ণ লজ্জিত মুখে বলল, 'আহাহা, রেঁধে যেন আমি আর খাইনে।'

নিভাননীর বাধা মানল না স্বর্ণ। জোর করে গিয়ে রাঁধতে বসল। কোন ক্লেদ নেই মনে, এত ভার সত্ত্বেও শরীর যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে। একবার ঘরে যাচ্ছে একবার বাইরে। বাড়িওয়ালার ঠিকে ঝিকে ডেকে টাকা বের করে দিল স্বর্ণ। 'সামনের দোকান থেকে ঘি আর গরমমসলা নিয়ে আয়।'

প্রিয়লাল এল যথাসময়ে। অবাক হয়ে বলল, 'তুমি।'

স্বর্ণ বলল, 'কেন, আমার আর আসতে নেই বুঝি? একেবারে পর হয়ে গেছি, না?'

প্রিয়লালের চোখে পড়ল সরু এক গাছি হার ঝুলছে স্বর্ণের গলায়। কানে আটা

দুখানা ইয়ারিং, হাতে চুরিও পরেছে চার গাছ করে। চাকরি ছেড়ে কনট্রাক্টরী কাজের মধ্যে গিয়ে এই যুদ্ধের বাজারে ভালোই করেছে গোকুল। দুহাতে পয়সা কামাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু অবশ্য চোখে পড়ে প্রিয়লালের। বুকের মধ্যে একটু কেমন যেন করে উঠল, কিন্তু পর মুহূর্তে মুখে হাসি টেনে বলল, 'পর ছাড়া আর কি, খোঁজখবর তো নাও না, দাও-ও না।'

'ঈশ, আপনিই যেন খোঁজখবর কত নেন-দেন। একবার না হয় যেচেই যেতেন। দেখতাম কত টান।'

নিভাননী বললেন, 'আমি একটু আসি ও-বাড়ি থেকে প্রিয়লাল। ভুবন ঠাকুর চমৎকার ভাগবৎ পড়ছেন। একটু শুনে আসি গিয়ে।'

নিভাননী সরে গেলে স্বর্ণ বলল, 'গেলেন না কেন শুনি? সাহস পেলেন না, না?'

প্রিয়লাল অবাক হয়ে গেছে। এ স্বর্ণ অন্য এক স্বর্ণ। এর কথার জবাব দেওয়া সহজ নয়।

ঠাঁই করে ঠিক আগের মতই প্রিয়লালের সামনে ভাতের থালা এগিয়ে দিল স্বর্ণ। যত্নটা আগের চেয়ে অনেক বেশী, কায়দাটা অনেক পাকা।

প্রিয়লাল বলল, 'এত সব রাঁধল কে, তুমি?'

স্বর্ণ বলল, 'কেন আজকাল বুঝি আর রঙ দেখে রান্না চিনতে পারেন না। খেয়ে দেখুন পারেন কিনা। পারবেন ব'লে তো মনে হয় না।'

প্রিয়লাল হেসে বলল, 'কেন?'

স্বর্ণ বলল, 'জিভ কি আছে মুখের মধ্যে?'

জিভ অবশ্য মুখের মধ্যেই আছে প্রিয়লালের। কিন্তু তা যেন একেবারে আটকে রয়েছে।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে স্বর্ণ পান দিল এনে হাতে। প্রিয়লাল আজ আর আঙুল চেপে ধরল না। অতি সন্তর্পণে পানটা হাত থেকে নিল। স্বর্ণের আঙুলগুলির ডগাই যেন হাতের তালু একবার স্পর্শ করল প্রিয়লালের। দু-একটা কুশল প্রশ্নের পর প্রিয়লাল চলে যাওয়ার আয়োজন করছে, স্বর্ণ বলল, 'বারে এখনই যাচ্ছেন যে। এত তাড়াতাড়ি কিসের, রাত্রেও অফিস আছে নাকি আপনার?'

প্রিয়লাল ভাবল একবার জিজ্ঞাসা করে রাত্রের অফিস গোকুলের এখনো আছে না কি? কিন্তু বলতে বাধল। স্বর্ণের কথার মধ্যে কুশ্রী কোন অর্থ যদি সত্যিই না থাকে? অনর্থক কেন ধরা দিতে যাবে প্রিয়লাল।

'না, রাত্রে আবার অফিস কিসের।'

'তা হ'লে বসুন না, একটু পরেই না হয় যাবেন। বসুন না।' স্বর্ণ প্রিয়লালের তক্তপোশ দেখিয়ে দিল।

প্রিয়লাল লক্ষ্য করল চমৎকার দামী একখানা সুজনী তার জীর্ণ তক্তাপোশখানায়

সযত্নে বিছিয়ে দিয়েছে সুবর্ণ। সুজনীর দামের মধ্যে খানিকটা দেমাক যে নেই তা নয়, এড়িয়ে যাওয়ার মত নয়।

প্রিয়লাল বলল, 'সুজনীটা কিন্তু বেশ হয়েছে। বেশ চমৎকার রঙ।'

সুবর্ণ বলল, 'হবে না? এ আমার নিজের পছন্দ করে কেনা, আপনার বন্ধুর যা একখানা পছন্দ।'

প্রিয়লাল বলল, 'অন্তত একখানা পছন্দ তার তো ভালই হয়েছে।'

সুবর্ণ প্রিয়লালের চোখের দিকে চেয়ে হাসল, 'তাই নাকি? হলেই ভালো, আমি তো ভেবেছিলাম এতদিনে আপনার মত বদলেছে।'

কথায় কথায় কখন প্রিয়লালের পাশে প্রায় গা ঘেঁষে বসে পড়েছে সুবর্ণ। মেয়েটা ভেবেছে কি? নিভাননী এসে পড়লে কি মনে করবেন।

'এতদিন পরে এলুম, কই একবার তো জিজ্ঞেসও করলেন না, কেমন আছি, বেঁচে আছি না মরে গেছি।'

'তুমিও তো জিজ্ঞেস করোনি।'

'আমি আবার জিজ্ঞেস করব কি, দশাটা তো আপনার দেখতেই পাচ্ছি চোখের সামনে।' বলে সুবর্ণ আবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

নিভাননী এসে ঘরে ঢুকলেন, 'আঃ, অত হাসছিস কেন সুবি, এ অবস্থায় অত হাসা কি ভালো?'

কিন্তু মাকে দেখেও সুবর্ণ আজ আর হাসি থামালো না। আপন ঐশ্বর্যে, আপন উচ্ছলতায় চারদিক সে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

ভালো, আর কি ভালো নয়, তা ঠিক করবার ভার আজ তার নিজের হাতে।

প্রথম বসন্ত

ম্যাট্রিক পরীক্ষা হ'য়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টুইশান শেষ হোল, কিন্তু তশিলদারী আর শেষ হতে চায় না। লতার বাবার কাছে বিনয় এখনো পনেরটি টাকা পাবে। মাসিক কুড়ি টাকা দক্ষিণায় তিন মাসের টুইশান। প্রথম মাসের টাকাটা ভদ্রভাবেই আদায় হয়েছিল। দ্বিতীয় মাসের দক্ষিণা প্রমথবাবু তিন কিস্তিতে শোধ করেছেন। কিন্তু এই তৃতীয় মাসের টাকা বুঝি মারাই গেল। পাঁচ টাকা দিয়ে সেই যে প্রমথবাবু অন্তরালে আশ্রয় নিয়েছেন আর সামনে আসেন নি।

পনেরটি মাত্র টাকা। তার জন্যে সপ্তাহে দুবার ক'রে এভাবে তাগিদ দিতে যাওয়ায় নিজের দীনতাও কম নেই। ন্যায্য প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নেওয়ার যুক্তিতেও সেই দৈন্য যেন ঢাকা পড়তে চায় না। সারাদিন অফিসের খাটুনির পর আবার এই

অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হ'তে মনও ভারি ক্লান্তি বোধ করে। কিন্তু করলে হবে কি, এই পনের টাকার দাম এখন পনের শো। সপ্তাহ তিনেক যাবত বাড়িতে ভাইপোটির টাইফয়েড। এক রাজসূয় ব্যাপার। ক্লান্ত শরীরে রাতের পর রাত জাগতে হয়, ছুটোছুটি করতে হয় ডাক্তারখানায়; বিরক্তি চেপে বউদিকে আশ্বাস দিতে হয়; শ্রদ্ধা এবং সম্মান বাঁচিয়ে দাদাকে তার সার্বজনীন নির্লিপ্তির জন্যে ভর্ৎসনা না করলে চলে না।

কিন্তু এতেও দায়িত্বের শেষ নেই। ধার-করা টাকা ফুরিয়ে এলেই বউদি কল্যাণী একদিন বাদে বাদে জিজ্ঞাসা করে, 'ভালো কথা ঠাকুরপো', ছাত্রীর বাবার কাছ থেকে আদায় হোল টাকাটা?'

বিনয়ের দাদা প্রকাশও তার স্বাভাবিক নির্লিপ্ততা বজায় রেখেই বলে. 'কেন মিছামিছি কষ্ট করছিস, ও কি আদায় হবে? ওর আশা ছেড়ে দেওয়া ভালো।' কি আদায় হবে না এবং কিসের আশা ছেড়ে দেওয়া ভালো সে কথা অপ্রকাশিত থাকলেও বিনয়ের বুঝতে বাকি থাকে না। ভিতরে ভিতরে মন তার জ্বলতে থাকে, বিস্তর অসুখ উপলক্ষে অমন কত পনের টাকা বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে বিনয় ধার ক'রে আনছে, সে হিসাব প্রকাশ রাখে না; কিন্তু একজন ধড়ীবাজ লোকের কাছ থেকে নিতান্ত প্রয়োজনের সময়ও বিনয় যে তার প্রাপ্য পনেরটি টাকা আদায় ক'রে আনতে পারছে না, প্রকাশের কাছে বিনয় যেন সেজন্যে চির অনুকম্পনীয় হ'য়ে রয়েছে।

বিরক্ত অপ্রসন্ন মুখে অফিস ফেরৎ বিনয় চিৎপুরের ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর দরজার ভিড় ঠেলে বি কে পাল এভেনিয়ুর মোড়ে নেমে পড়ল! প্রমথবাবু আজ আবার তারিখ ফেলেছেন। নির্ঘাৎ আজ নাকি টাকাটা দিয়েই দেবেন।

মোড়ে নেমে খানিকটা পথ হেঁটে যেতে হয়। বেনেটোলা স্ট্রীটের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে বাড়ি। পুরোন, ঐতিহাসিক আমলের কলকাতা। যেমন জীর্ণ তেমনি অপরিচ্ছন্ন।

নাগরিক কায়দায় বাইরে দাঁড়িয়ে কড়া নেড়ে লাভ নেই, বাড়িটির সাতখানা ঘরে ছ'ঘর ভাড়াটে, কড়া নাড়লে সহজে কেউ জবাব দেয় না। প্রত্যেকেই ভাবে অন্যে ঘরের অতিথি, সে কেন সাড়া দেবে। তাই বাইরে দাঁড়িয়ে পরিচিত নাম ধ'রে ডাকতে হয়। কিংবা গলা খাঁকারি দিয়ে অভিনয় করতে হয় নকল কাসির। উঠানে খোলা চৌবাচ্চার কাছে কোনো ঘরের বউঝি যদি বেসামাল ভাবে থাকে সাবধান হ'য়ে যাবে। কাসিটা বিনয়ের ভালো আসে না। তার চেয়ে নাম ধ'রে ডাকতেই সে ভালোবাসে। 'প্রমথবাবু আছেন?'

দু'তিনবার ডাকবার পর দোতলার ঘর থেকে একটি সতের আঠার বছরের মেয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল, 'কে? ও, মাস্টারমশাই? বাবাকে চাইছেন? তিনি তো এখনো ফেরেন নি।'

'ফেরেন নি!'

লতা বলল, 'না কিন্তু ফেরার সময় হয়েছে। আসুন, বসুন না এসে।'

আমন্ত্রণে আশান্বিত হয়ে বিনয় উপর উঠে এলো। না ফিরলেও টাকাটা হয়তো প্রমথবাবু রেখেই গেছেন।

বিনয় এসে ঘরে ঢুকে ছোট টেবিলটির ধারে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসল।

লতা বলল, 'দাঁড়ান, এই আসনটা আগে পেতে দিয়ে নি।'

এই মাস-তিনেক বিনয় যখন পড়াতে আসত আসনটা চেয়ারের ওপর পাতাই দেখত। আগেই সেটা পেতে রাখত লতা। খালি চেয়ারে মাস্টারমশাই বসতে পারবেন না। যা ছারপোকা। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আসনটা ওভাবে পেতে রাখবার প্রয়োজন আর নেই। সেটা এখন দুটো ঘর ভ'রে ন'ড়ে চড়ে বেড়ায়। কখনো মা সেখানা পেতে সন্ধ্যা করতে বসেন, কখনো বাবা টেনে নিয়ে যান তার উপর ব'সে ড্রইং করবেন।

বিনয় গম্ভীর মুখে বলল, 'আসন থাক, আসনে দরকার নেই।'

লতা বলল, 'না, দরকার নেই! খালি চেয়ারে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারবেন কেন।'

বিনয় বলল, 'আসন থাকলেও বেশিক্ষণ ব'সে থাকতে পারব না। তোমার বাবা কিছু ব'লে গেছেন?'

লতা বলল, 'বলছি, একটু বসুন।'

লতা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল।

বিনয় মনে মনে এবার আশ্বস্ত হোল, তাহ'লে প্রমথবাবু কি সত্যিই টাকাটা রেখে গেছেন? রাখতেও পারেন। শত হ'লেও চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস তো আছে মানুষের, এই নিয়ে আজ চারদিন ওই সামান্য টাকার জন্যে বিনয় তাগিদ দিতে এলো।

খানিকবাদে লতা এলো ফিরে। একহাতে সেই চটের আসন আর এক হাতে গোল সাদা একটি চায়ের পেয়ালা। কাপটি টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে লতা বলল, 'উঠুন, আসনটা আগে পেতে দি। বাব্বাঃ, এই চেয়ারে কি মানুষ বসতে পারে!'

বিনয় লক্ষ্য করল আগের চেয়ে ভারি সপ্রতিভ হয়েছে লতা। পরীক্ষার চিন্তায় এতদিন যেন সে নুয়ে পড়েছিল, তিনবার জিজ্ঞাসা করেও একটি কথার জবাব পাওয়া যায় নি। কিন্তু এখন আর তার কথার অভাব হয় না। পরীক্ষা হ'য়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত জড়তা গেছে কেটে। ফিরে এসেছে সহজ সুন্দর নিশ্চিন্ত কতকগুলি দিন। অঙ্কের পেপারটা অবশ্য লতা ভালো দেয়নি। কিন্তু টেনেটুনে যে ভাবেই হোক পাশ করবে। দু'চার নম্বর শর্ট পড়লে গ্রেস কি আর একেবারে মিলবে না? তাছাড়া মাষ্টারমশাইও তো খোঁজখবর নেবেন ব'লে ভরসা দিয়েছেন।

সে যা হয় হবে। রেজাল্ট বেরুবার দু'তিন সপ্তাহ আগে সে কথা চিন্তা করবে লতা। এখন তো এই দু'মাস নিশ্চিন্ত মুক্তির স্বাদ গ্রহণ ক'রে নিক।

অন্যান্য দিনের মতো আজও লতা একটু প্রসাধন করেছে। চুল আঁচড়ে সযত্নে বেঁধেছে খোঁপা। মুখের শ্যামবর্ণে চিক্‌চিক্ করছে সামান্য পাউডারের ছোপ। কপালের ছোট টীপটি মন্দ দেখাচ্ছে না। মুখখানির গড়ন নিখুঁৎ না হ'লেও লতার দুটি ঠোঁট আর চিবুকের ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর।

অবশ্য এ সৌন্দর্য বিনয়ের প্রথম কিছুদিন চোখে পড়েনি। প্রথম প্রথম বরঞ্চ ওর মুখ বিনয়কে বিমুখই করেছে। মনে হয়েছে মুখখানা যেন একটু বেশি রকমের গোলাকার। কালো রঙের ওপর পাউডারের ছোপ লাগিয়ে আসায় এবং কৃত্রিম উপায়ে ঠোঁটকে রঙীন করবার চেষ্টায় বিনয় মুগ্ধ হয়নি, ওর রুচির কথা ভেবে মনে মনে হেসেছে। মুখ নয়, বরং ওর শীর্ণ ঘাড়ের ওপর নুয়ে পড়া রাশীকৃত চুলের আলগা খোঁপাটা দেখতে বিনয়ের ভালো লেগেছে। তখন মুখ তুলে বেশি তাকায়ওনি লতা। বইয়ের ওপর মাথা নিচু ক'রে পড়া মুখস্থ করেছে, বিনয়ের দেওয়া টাসক্ করেছে ব'সে ব'সে, বিনয় মনে মনে প্রার্থনা করেছে ও যেন মুখ তুলে বেশি না চায়। ওর ওই কালো গোল ভোঁতা মুখের চেয়ে স্তূপীকৃত চুলের রাশ অনেক সুন্দর, অনেক রহস্যময়।

কিন্তু এই সাড়ে তিন মাস ধ'রে দেখতে দেখতে লতার মুখ যখন মোটামুটি সহনীয় হ'য়ে আসছে তখন ধীরে ধীরে মত বদলেছে বিনয়ের, চোখ বদলেছে। মুখেরও কি কিছু পরিবর্তন হয়নি লতার? কবরীর রহস্যের চেয়ে মুখের রহস্য আরও বিস্ময়কর, সে মুখ যত শ্রীহীনই হোক না কেন। সযত্ন-রচিত কবরী প্রতি সন্ধ্যায় বদলায়, কিন্তু মুখের মতো এমন প্রতি মুহূর্তে বদলাতে পারে না, আনতে পারে না নিত্য নতুন আভাস, নতুনতর সম্ভাবনা। কবরী দেখে দেখে চোখ হয়তো ভরে, কিন্তু মুখ না দেখলে মন ভরে না। বিনয়ের দিকে তাকিয়ে সলজ্জে একবার চোখ নামাল লতা, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'চা কি খুব খারাপ হয়েছে মাস্টারমশাই?'

বিনয় চমকে উঠে বলল, 'কেন খারাপ হবে কেন।'

'খারাপ হয়নি, তাহ'লে খাচ্ছেন না যে, রাগ করেছেন, বুঝি?'

পড়াশুনোর ব্যাপারে লতা কোনদিন সাহস ক'রে কোন মন্তব্য করেনি, কিন্তু এখন পড়াশুনোর বাইরে এসে দিনের পর দিন তার ক্রমবর্ধিত সাহস দেখে বিনয় অবাক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাহসটি নিতান্তই যে খারাপ লাগছে তা নয়।

বিনয় বলল, 'রাগ তো হওয়ারই কথা।'

লতা বলল, 'কেন?'

বিনয় বলল, 'এত খাটলুম তোমার অঙ্কের পেছনে, তবু সেই অঙ্কটাই খারাপ করলে।'

লতা ঠোঁটের অপূর্ব ভঙ্গি ক'রে বলল, 'ও, আমি ভাবলুম অন্য কোনো কারণে বুঝি রাগ হয়েছে আপনার। আমার বুকের ভিতরটা এখনো কাঁপছে।'

বিনয় মনে মনে হাসল। মেয়েটা বোধ হয় একটু বেশিই পেকেছে। এতদিন কেবল অঙ্কের ভয়েই লতার বুক কেঁপেছে, এখন তার কম্পনটা অঙ্ককে অতিক্রম ক'রে যেতে চায়।

বিনয় এবার চট ক'রে আসল কথায় এসে পড়ল, বলল, 'ভালো কথা। তোমার বাবা কিছু বলে গেছেন আমার সম্বন্ধে ?'

লতা অসঙ্কোচে বলল, 'না তো।'

বিনয়ের আর ধৈর্য রইল না, নিষ্ঠুরভাবে বলল, 'না তো! আমার মাইনেটা সম্বন্ধে আজও কি কিছু ব'লে যান নি? এই সামান্য পনেরটা টাকা নিয়ে কতদিন ঘোরাতে চান তিনি ?'

লতা কিছুক্ষণ নত মুখে চুপ ক'রে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'বলেছেন বসনালয়ের বিলটা আজও পান নি। তারা সামনের সোমবার তারিখ দিয়েছে। টাকাটা হাতে এলেই বাবা নিজে গিয়ে আপনার ঠিকানায় দিয়ে আসবেন। ঠিকানা তো আছে আমাদের কাছে।'

বিনয় শ্লেষ ক'রে বলল, 'তা তো আছেই। কিন্তু তিনি দিয়ে আসবেন এই ভরসায় থাকলে টাকাটা কোনো দিনই বোধ হয় আমার কাছে গিয়ে পৌঁছবে না।'

লতার চোখ দুটো অপমানে যেন ছল ছল ক'রে উঠল। আত্মসম্বরণ ক'রে বলল, 'তেমন ভাববেন না আমাদের। টাকা নিশ্চয়ই আপনি পাবেন।'

বিনয় বলল, 'পেলেই ভালো, আমি আর আসব না! টাকাটা যেন তিনি পাঠিয়ে দেন। এই নিয়ে চার দিন হোল, ওই সামান্য টাকার জন্যে এমন ক'রে তাগিদ দিতে আসতে আমারও লজ্জা করে। বাড়িতে নিতান্ত অসুখ-বিসুখ চলেছে এই জন্যেই—'

লতা বলল, 'ভালো কথা, আপনার ভাইপোর অসুখ কেমন, মাস্টারমশাই ?'

বিনয় গম্ভীর মুখে, বলল, 'এক রকম।'

বিনয় উঠে পড়ল। ফেরার পথে তাকে আবার ডিস্‌পেনসারি হ'য়ে যেতে হবে।

ঘর থেকে বেরোতেই দোরের কাছ থেকে লতার ছোট ছোট চার পাঁচটি ভাই বোন তাড়াতাড়ি স'রে গেল। বিনয় যে কড়া মাস্টার তা তারা বুঝেছে। আর এই কয়েক দিন ধ'রে সে যে আরও কড়া হচ্ছে একথাও টের পেতে ওদের বাকি নেই।

প্রথম প্রথম যখন আসত বিনয়, তখন ওদের মধ্যেও বেশ একটা সাড়া প'ড়ে যেত। শব্দ হোত ফিস ফিস ক'রে, 'মাস্টার এসেছে, দিদি মাস্টার এসেছে।'

লতা ফিস ফিস ক'রেই সেদিন ধমক দিয়েছিল, 'মাস্টার কিরে! বলবি মাস্টারমশাই।'

লতার বোন সতী বলেছিল, 'বা-রে, মাও তো মাস্টাররই বলেন।'

লতা ধমক দিয়ে উঠেছিল, 'হ্যাঁ, বলেন না আরো কিছু। তা ছাড়া মা বলেন ব'লে তুইও বলবি না কি?'

পেছনে পেছনে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এল লতা, বলল, 'মঙ্গলবার দিন আসবেন কিন্তু।'

বিনয় ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসবার তো কথা ছিল না।'

খানিকক্ষণ আগের কথাবার্তার কথা মনে করে লতা সলজ্জে মুখ নামাল, তারপর বলল, 'কথা না থাকলেই আসতে নেই বুঝি?'

বিনয় বলল 'আচ্ছা দেখা যাক।'

লতা ফিরে এসে রান্নাঘরে ঢুকে মাকে বলল, 'মা বাবাকে ব'লো বাকি টাকাটা যেন দিয়ে দেন মাস্টারমশাইকে। ছি ছি, আমার ভারি লজ্জা করে।'

নির্মলা গম্ভীর মুখে বলল, 'কেন তুই বলতে পারিসনে?'

লতা বলল, 'বাবাকে এসব কথা বলতে আমর ভারি লজ্জা করে।'

নির্মলা এবার রাগ ক'রে উঠল, 'তোর তো সবতাতেই লজ্জা। আমি তখনই বলেছিলাম দরকার নেই মাস্টার রেখে। ভাত জোটেনা আবার নবাবী আছে সাড়ে ষোল আনা। কুড়ি টাকা দিয়ে মেয়ের মাস্টার না রাখলে আর চলল না। প'ড়ে আর পাশ ক'রে তো মেয়ে ভারি কৃতার্থ করবেন। এই ষাটটা টাকা থাকলে কত এগুতো সংসারের। ছেলেমেয়েগুলোর জামা নেই, ফ্রক নেই, সেসব দিকে কোন খেয়াল আছে কারো? কেবল টাকা দাও বইয়ের জন্য, পড়ার জন্যে, আর টাকা দাও মাস্টারকে। অর্ধেক সারা গুষ্টী আর অর্ধেক মা ষষ্টি।'

লতাও চ'টে উঠে বলল, 'কে রাখতে বলেছিল তোমাদের মাস্টার? তখন মনে ছিল না? এখন মাইনে চাইতে এলেই মুখ কালো হয়ে যায় আর সারা গুষ্টীর কথা মনে আসে, না?'

নির্মলা ধমক দিয়ে বলল, 'দেখ্, আমার সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করতে আসিস নে। চার আঙুলে মেয়ে আট আঙুলে কথা। মাস্টার যে রেখেছিল তাকে বলবি। বিক্রি ক'রে হোক, বন্ধক রেখে হোক, সে এনে টাকা দেবে তোর মাস্টারের। আমি কি জানি?'

রাত্রির খাওয়া দাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে বাপের হাতে পান দিতে দিতে লতা বলল, 'মাস্টারমশাই আজও এসেছিলেন বাবা।'

প্রমথ পান চিবুতে চিবুতে বলল, 'এসেছিল নাকি?'

'বাঃ আসবেন না, আপনিই তো আসতে ব'লে গিয়েছিলেন? ভদ্রালোককে কথা দিয়ে কেন এমন ক'রে ঘোরাচ্ছেন। ফেলে দিলেই তো হয় পনেরটা টাকা।'

প্রমথ চ'টে উঠে বলল, 'ফেলে দিলেই হয়! টাকার গাছ আছে কিনা বাড়িতে! তোর আর কি, মুখ থেকে কথা খাসালেই হয়ে গেল। ফেলে দিলেই হয়!'

লতা কিছুক্ষণ মুখ ভার ক'রে রইল, তারপর বলল, 'তাহলে ব'লে দিন মাস্টার-মশাইকে, টাকা আপনি এখন দিতে পারবেন না।'

প্রমথ বলল, 'ও কথা কি কেউ আর স্পষ্ট ক'রে বলে? ও কথা কেউ বলে না। তাহলে তো ল্যাঠাই চুকে যেত, এমন ঘোরাঘুরির দায় থেকে বাঁচতাম।'

প্রমথর শেষ কথাটির অসহায় করুণ সুর লতার কানে লাগল। তার যেন সব মনে প'ড়ে গেল, 'তাহলে বসনালয় থেকে টাকাটা আজও আদায় হয়নি?'

প্রমথ ম্লান হাসল, 'না রে পাগলী না। তা হলে কি আর মাস্টারের ঐ কটা টাকা আমি ফেলে রাখি? এলে বলিস বুঝিয়ে, বিল আদায় হলেই তার টাকা আমি দিয়ে দেব। তার পনের টাকা মেরে আর আমি লাখপতি হব না।'

লতা বলল, 'কিন্তু তাঁর বাড়িতে অসুখ বিসুখ কিনা—'

প্রমথ বলল, 'সে সব বাড়ীতেই আছে। টাকার তাগাদায় এলে অসুখ অমন সকলের বাড়িতেই হয়। অসুখ! যেন আমরা ভারি সুখে আছি।'

মঙ্গলবার দিন অফিস ফেরৎ বিনয় আবার এসে হাজির।

'প্রমথবাবু আছেন?'

কিন্তু প্রমথ আজ সত্যিই আছে। মেয়েকে বলল, 'দেখ্‌তো কে।'

'মাস্টারমশাই।'

'মাস্টারমশাই? তাকে আজ আবার কে আসতে বলল? তুই বুঝি? না, তোদের জ্বালায় আমি বাড়ী-ঘরে আসা বন্ধ করব? ব'লে দে, বাবা নেই বাড়িতে।'

লতা বলল, 'বলতে হয় আপনি গিয়ে বলুন। আমি পারব না।'

প্রমথ স্ত্রীকে উদ্দেশ ক'রে বলল, 'শুনলে? কথা শুনলে মেয়ের?'

নির্মলা বলল, 'তুমিই শোন। কেন, ঘটি বাটি বিক্রি ক'রে না খেয়ে না দেয়ে লেখা-পড়া শেখাও মেয়েকে!'

অবশ্য তেমন জাঁদরেল নাছোড়বান্দা কোনো পাওনাদার নয়, মুখচোরা মাস্টার। ওর মুখোমুখি হতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবু সব সময়ই কি অমন তাগিদ আর ওয়াদা ভাল লাগে মানুষের?

প্রমথ গম্ভীর মুখে মেয়েকে বলল, 'না পারলে চলবে কেন? যেমন ডেকেছিস তেমনি নিজেই কথাবার্তা বলে বিদায় ক'রে দিয়ে আয়। বকবক করবার সময় নেই আমার, কাজ আছে।'

প্রমথ তার ছবি আঁকবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তাড়াতাড়ি স্টুডিওতে গিয়ে ঢুকল। ছাদের ওপর ছোট্ট একটু চিলেকোঠার মতো আছে। বাড়িওয়ালাকে অনেক ব'লে

ক'য়ে মাসিক চার টাকা ভাড়ায় প্রমথ সেটাকে তার স্টুডিও ক'রে নিয়েছে। গোটা-চারেক টাকা বেশি ব্যয় বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে প্রতিদিন যা এই ঘরটুকুর কাছ থেকে পাওয়া যায় তার তুলনা হয় না। এই ঘরটুকু না থাকলে নির্মলা আর তার একপাল ছেলেমেয়ের অনুক্ষণ চেঁচামেচির মধ্যে সাধ্য ছিল কি প্রমথর যে একমিনিটও তুলি নিয়ে বসতে পারত? কিন্তু ইদানীং শুধু প্রাণ নয়, মানও বাঁচায় এই চিলেকোঠা। বিনা নোটিশে আবস্থিত অভ্যাগত কেউ এলে প্রমথ এর মধ্যে এসে আশ্রয় নেয়, ব'লে পাঠায় স্টুডিওতে আছে। দু'চার জন নিতান্ত অভদ্র পাওনাদার ছাড়া পিছু পিছু এতখানি এসে আর্টিস্টের ধ্যানভঙ্গ করতে কেউ সাহস পায় না।

বিনয় লতাদের ঘরে ঢুকে দেখল আজ শুধু চেয়ারের ওপরই যে ফুল-তোলা চটের আসনটা পাতা আছে তা নয়, টেবিলেও নতুন একখানি টেবিল-ঢাকনি এসেছে। লতার নিজের হাতের তৈরী—সবুজ সরু একটি লতা চারপাশ দিয়ে ঘুরে এসেছে, মাঝে মাঝে বেরিয়েছে দু' একটি পাতার অঙ্কুর।

বিনয় ভূমিকা ক'রে বলল, 'বাঃ, তোমার হাতের কাজ তো বেশ ভলো।'

লতা প্রথম যেন ভারি লজ্জিত হোল, তারপর বলল, 'আমার হাতেরই যে কাজ তা আপনাকে কে বলল?'

বিনয় হাসল, 'ও কি আর বলতে হয়! কাজ দেখেই চেনা যায়।'

লতা আরক্ত মুখে বলল, 'যান।'

তারপর হঠাৎ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিনয় মনে মনে ভাবল ওদের লজ্জাটুকু ভারি উপভোগ্য। এই সাতাশ-আঠাশ বছর বয়সে ঠাট্টা পরিহাসের ভিতর দিয়ে অবশ্য আরো অনেক মেয়ের এমন উপভোগ্য লজ্জা প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য বিনয়ের হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে সব মনে পড়ল না। মনে হোল এই প্রথম, একটি তরুণী মেয়ের লজ্জানত দুটি চোখ এই যেন প্রথম তার চোখে পড়ল।

খানিক বাদে লতা আজও সেই বড় দুগ্ধধবল কাপটিতে চা আনল, চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে নিজের হাতে তুলে দিল বিনয়কে। বড় মধুর বড় নয়নাভিরাম লতার এই সতর্ক সঙ্কোচ।

চায়ে চুমুক দিয়ে বিনয় বলল, 'তারপর, পড়াশুনোর বালাই তো গেছে। সারাটা দিন কি ক'রে কাটাও? ঘুমোও বুঝি খুব?'

'হুঁ, তাই বুঝি ভাবেন। ঘুমোবার সময় তো খুব। কাজ আছে না সংসারে? এতোদিন একটু আলগা ছিলাম কিনা। এখন সুদে আসলে সব শোধ দিতে হচ্ছে।'

বিনয় বলল, 'সে রকম শোধ তো সবারই দিতে হয়। তবুও ইচ্ছে থাকলে সময়ের অভাব হয় না।'

লতা আরও অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠল, 'ঘুমোবার সময় তবুও হয়। কিন্তু ঘুমোবার ইচ্ছে

আমার হয় না। আমার ইচ্ছে করে কি জানেন? বেশ একটু ঘুরেটুরে বেড়িয়ে টেড়িয়ে আসি। অনেক দূরে চ'লে যাই।'

বিনয় হাসল, 'সে অবশ্য একটু শক্ত। দূরের কথা থাক। সুবিধা মতো কাছাকাছিও যদি একটু বেড়াতে পার দেখবে খুব চমৎকার লাগবে। ধরো কোনদিন বা গেলে বালি, কোনদিন বা টালিগঞ্জ। মাত্র সামান্য একটু চোখ বদলানো, কিন্তু মনে হবে পৃথিবীটাই যেন আগাগোড়া বদলে গেছে।'

লতা উল্লসিত হ'য়ে উঠল, 'সত্যি, তাহলে যাবেন একদিন নিয়ে?' সঙ্গে সঙ্গে মুখটা আরক্ত হ'য়ে উঠল লতার, সামলে নিয়ে বলল, 'মানে শিবু বিভূতি সতী ওরাও থাকবে সঙ্গে।'

বিনয় স্বর নামিয়ে হঠাৎ বলে ফেলল, 'থাকতেই যে হবে তার কি মানে আছে?'

এক অপূর্ব সম্ভাবনায় লতার সমস্ত শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সভয়ে চারিদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে ফিস ফিস ক'রে বলল, 'ছি ছি ছি, কি অসভ্য আপনি। কেউ যদি শুনে ফেলত।' তারপর কানে কানে বলবার মত ক'রে বলল, 'জানেন তো বাবা কি কড়া।'

বিনয় কেমন যেন একটু হাসল, বলল, 'তাই না কি? তা তো জানতাম না। তিনি কোথায়? আজও ফেরেননি নাকি?'

লতা তেমনি আস্তে আস্তে বলল, 'ফিরেছেন, ফিরেই ছবি আঁকতে বসেছেন। এদিকে আসবেন না। কি একটা জরুরী অর্ডার আছে কি না।'

ভাইপোর কতকগুলি জরুরী ওষুধপথ্যের কথা বিনয়ের মনে পড়ল, বলল, 'দরকারটা আমারও তো জরুরীই ছিল, তিনি ভুলে গেছেন বুঝি।'

হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেল লতা। মুখ নীচু ক'রে এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল। যেন সামলে নেওয়ার জন্যে সময় চাই তার।

বিনয় কঠিন শ্লেষের ভঙ্গিতে বলল, 'ওটা বুঝি তিনি আজও দিতে পারবেন না? বিলটা আজও আদায় হয় নি, না? এ আমি জানতুম। ঘরে ঢুকেই আমি টের পেয়েছি।'

একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতে লতা যেন চমকে উঠল, মনে হোল সে বুঝি আর্তনাদ ক'রে উঠবে। কিন্তু তা করল না, সোজা বিনয়ের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ঘরে ঢুকেই কি টের পেয়েছেন আপনি বলুন, কিসে কি টের পেয়েছেন?'

বিনয় অপ্রস্তুতভাবে তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করতে যাচ্ছিল, কিন্তু লতার উদ্ধত ভঙ্গি তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাল'—কিসে টের পেয়েছি তা তোমারও টের পাওয়ার কথা। অত বোকাও তুমি নও, খুকিও তুমি নও।'

কথা বলতে গিয়ে লতার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। রক্তের চাপে মুখখানা যেন ফেটে পড়বে।

শেষ পর্যন্ত লতা বলল, 'না, তা কেন হব। কিন্তু আপনার মতো অত ইতরও নই. অভদ্রও নই। দাঁড়ান, নিয়ে যান আপনার টাকা। যে ভাবেই হোক টাকা আমি এখনই আদায় ক'রে দিচ্ছি আপনাকে।'

নৃশংসতার একটা তীব্র স্বাদ আছে, নোংরামির মধ্যে আছে উগ্র মাদকতা। বিনয় উন্মত্তের মতো বলল, 'থাক্। ও টাকা তোমাকে আমি দিয়ে গেলুম।'

লতা বলল, 'দিয়ে গেলেন ? কেন ? আপনার টাকা আমি কেন নিতে যাব ?'

বিনয় বলল, 'মনে করো টাকাটা তোমারই, এতক্ষণ ধ'রে যা দিয়েছ তা পনের টাকার চেয়ে বেশি।'

লতা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হ'য়ে রইল। কালো পাথরের মতো থম থম করতে লাগল মুখ, তারপর সেও এক ঝিলিক হাসল, 'কিন্তু মাষ্টারমশাই, আরও বেশি যদি দিতাম, আর দয়া করে আরও বেশি যদি নিতেন তা'হলে অন্তত পনের শো টাকাও তো খরচ করতে হোত বাবাকে। এই পনের টাকা না হয় তাই মনে ক'রেই নিন। দাঁড়ান, পালাবেন না, টাকাটা আজ নিয়েই যান।'

বিনয় শুধু স্তব্ধ নয়, এতক্ষণ খানিকটা যেন মুগ্ধের মতোও তাকিয়ে ছিল। তীরের ফলাগুলি তার বুকেই এসে বিঁধছে, তবু তাদের কারুকার্যটা দেখবার মতো।

লতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে সে-ই আগে বেরিয়ে এল। তারপর সিঁড়ির মুখে পা দিয়ে হঠাৎ একবার মুখ ফিরিয়ে বিনয় বলল, 'আজ থাক, আর একদিন এসে পনেরশোই না হয় নেব।'

চাঁদ মিঞা

ট্রামের মধ্যে দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। নানা কসরতের পর দুই বন্ধুতে কোন রকমে ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়েছিলাম। আর আমাদের খুব কাছেই আর একজন তরুণ ভদ্রলোক তাঁর সহযাত্রিণীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন এবং সিগারেট টানছিলেন। সমস্ত লেডিজ সীটগুলি ভরতি। অন্যান্য যাত্রীরা মেয়েটিকে আসন ছেড়ে দিয়ে বার কয়েক শিষ্টাচার দেখিয়েছেন কিন্তু তরুণীটি সহাস্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কিছুতেই বসতে রাজী হন নি। ঠিক তেমনি তাঁর সহযাত্রীটির ধূমপানে ও আকারে ইঙ্গিতে অনেকেই আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু ভদ্রলোককে কিছুতেই নিবৃত্ত করা যায় নি। তিনি বেশ সতর্কতার সঙ্গেই কখনো বা গাড়ীর মধ্যে কখনো বা বাইরে সিগারেটের ছাই ফেলছিলেন। হঠাৎ মেয়েটির কি একটা কথায় তিনি স্থানকাল ভুলে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা সিগারেটের ছাই আমার র‍্যাপারের ওপর দিলেন ছিটিয়ে।

রুক্ষ কণ্ঠে প্রায় চেঁচাবার মত ক'রে বললুম; 'এটা কি হোল ?'

দুজনেই চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন। যুবকটি অপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন, 'সরি।'

বন্ধু মসিয়র মুখে উঠে কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মেয়েটি তাকে কিছু বলবারই সুযোগ দিলেন না, তাড়াতাড়ি রুমাল বের ক'রে সিগারেটের ছাইগুলি আমার র‍্যাপার থেকে ঝেড়ে দিতে দিতে অত্যন্ত লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, 'কিছু মনে ক'রবেন না।'

এরপর কিছু আর মনে ক'রবার জো ছিল না। কিন্তু যুবকটি দেখলাম ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে আমার দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কিছু মনে ক'রবেন না, আপনি বরং তার চেয়ে প্রতিশোধ নিন।'

মেয়েটির মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল, 'আঃ থাম, কি হ'চ্ছে।'

ট্রাম থেকে নেমে মসিয়র বলল, 'তুমি একেবারেই ভ্যাবা গঙ্গারাম। লোকটিকে আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিতে পারলে না যে মশাই আমার সিগারেটের ছাই গায়ে মেখে আপনার কি কিছু লাভ হবে ? আমার কিছু লাভ হবে ? আমার সঙ্গে কাঠখোট্টা এক বন্ধুই রয়েছে, অমন কোমল হৃদয় সুন্দরী কোনো বান্ধবী তো নেই ?'

হেসে বললুম, 'তা নাই বা থাকল। তাঁর সঙ্গে যিনি ছিলেন ছাই ঝাড়বার পক্ষে তিনি একাই কি যথেষ্ট ছিলেন না ?'

মসিয়র গম্ভীর হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'সে কথা ঠিক। পুরুষের ঈর্ষা বহু বিচিত্র।

তারপর একটু হেসে বলল, 'তুমি আজ বহু বাঁচা বেঁচে গেছ। মেয়েদের সহানুভূতিও কম সাংঘাতিক নয়।'

খানিককটা হাঁটতেই একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল। সেখানেও ভিড়। তবু তারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটু নিরিবিলি কোণ বেছে নিয়ে দুজনে বসলুম। একটা কাটলেটের খণ্ড কাঁটায় ফুঁড়ে মুখে তুলতে তুলতে মসিয়র বলল, 'আজকের এই ছোট ঘটনায় আমার অনেককাল আগের একটি কাহিনীর কথা মনে পড়ছে।'

বললুম, 'ব্যক্তিগত নাকি ?'

মসিয়র বলল, 'না ঠিক ব্যক্তিগত নয়, তবে প্রায় পরিবারগত বলতে পার। কাহিনীর নায়ক নশরৎ আলী ছিলেন আমার বাবারই আপন চাচা। সেই হিসাবে তাঁর ঘরের গুপ্ত কথা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সমীচীন নয়। কিন্তু কথাটা কিছুতেই গোপন ছিল না। স্বয়ং নশরৎ আলীর আর তাঁর উত্তরপুরুষদের চেষ্টাতেও নয়। বেশ মনে আছে, আমাদের অঞ্চলে ছেলেবেলায় এ নিয়ে ছড়া গান পর্যন্ত লোককে বাঁধতে শুনেছি।'

মীরপুর এবং আশেপাশের পাঁচ-সাতখানা গাঁয়ের জমিদার ছিলেন নশরৎ আলী মৃধা। লোক লস্কর, পাইক পেয়াদা, কিছুরই অভাব ছিলো না। অভাব ছিল কেবল সন্তানের। পীরের দরগায় সিন্নি দিয়ে, ফকির দরবেশের কাছ থেকে নানা রকম গাছ-

গাছড়া তাবিজ কবচ জড়ো করেও ছেলে তো ভালো, একটি কাণা মেয়ের মুখ পর্যন্ত মৃধা সাহেব দেখতে পারেন নি। কিন্তু অদ্ভুত তাঁর জেদ। বলতেন খোদায় সঙ্গে আমার জেহাদ। ছেলে যতদিন না হবে ততদিন কেবল বিবির পর বিবি এনে ঘর ভ'রে ফেলব, দেখি ছেলে না হয়ে যায় কোথায়। আমি জানি, আমার নিজের কোন দোষ নেই, ছেলে যে হয় না তা কেবল এই বিবিদের দোষ।

প্রায় ষাটের কাছাকাছি যখন তাঁর বয়স তখন কেবল গুটিচারেক বিবি তাঁর ঘরে ছিলেন এবং আর গুটি চার পাঁচ ম'রে নিষ্কৃতি পেয়ে'ছলেন।

তার কিছুকাল আগে থেকেই শুধু ফকির দরবেশের কেরামতিতেই নয়, খোদার অস্তিত্বের ওপরও মৃধা সাহেব আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। মোল্লা মুন্সীদের দেখতে পারতেন না, বাড়ি থেকে কোরাণ সরিফ দূর ক'রে ফেলেছিলেন, রোজা নামাজ পর্যন্ত পালন করতেন না।

মানুষজনের চেয়ে পশু পক্ষীর ওপরই প্রীতি যেন তাঁর কিছু বেশি পরিমাণে ছিল। বিচিত্র রকমের বিচিত্র রঙের পাখী পুষতেন, আর ছিল ঘোড়া। হরিহরছত্রের মেলায় নিজে যেতেন ঘোড়া কিনতে। বেছে বেছে নানা আকারের নানা রঙের ঘোড়া আনতেন। ঘোড়ার রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে রাখতেন সহিসদের, ঘোড়ার নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে রাখতেন তাদের নাম।

নশরৎ আলীর মস্ত বড় বাড়ীর পাশেই ছিল মস্ত বড় মাঠ। তার অর্ধেকটা জুড়ে পৌষ মাস থেকে ঘোড়দৌড় সুরু হ'ত। শ'য়ে শ'য়ে ঘোড়া আসত। আর হাজারে হাজারে লোক। প্রত্যেক ঘোড়াওয়ালাকে নশরৎ আলী কলস দিয়ে সম্মান দেখাতেন আর তার সওয়ারদের দিতেন দামী শাল।

একদিন নশরৎ আলীর কানে গেল তিন চারখানা গাঁ পশ্চিমে নূরগঞ্জে আতাজদ্দি মিঞার নাকি এক চমৎকার ঘোড়া আছে। তেমন ঘোড়া কাছে-ধারে আর কারো নেই। সে ঘোড়া সে ঘোড়দৌড়ের মেলায় আনে না পাছে নশরৎ আলী তা কেড়ে নেন। শুনে নশরৎ আলী হাসলেন, তারপর ভাবলেন তিনি নিজেই যাবেন সেই ঘোড়া দেখতে আর ঘোড়াওয়ালাকে আশ্বাস আর নির্ভর দিয়ে আসতে। নিজের অদ্ভুত সব খেয়ালের কাছে মান-সম্ভ্রম পর্যন্ত তাঁর তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। আত্মীয় পরিজন কারো নিষেধ না শুনে তিনি নিজেই চললেন একদিন সেই ঘোড়ার সন্ধানে। আস্তাবল থেকে সব চেয়ে ভালো ঘোড়াটি বেছে নিয়ে চ'ড়ে বসলেন তার পিঠে। বারণ সত্ত্বে কেউ কেউ দূরে দূরে থেকে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল। পীরকান্দায় এসে একটা পানাভরা পুকুর দেখে তাঁর ঘোড়া ছুটে গেল মরিয়া হয়ে। মৃদু হেসে নশরৎ আলী রাশ ছেড়ে দিলেন।

ঘোড়ার জল খাওয়া দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল পুকুরের ওপারে একটা কুঁড়ের দিকে। বাড়ির বাইরের দিকে দোচালা একটা শনের ঘর, কোন দিকে কোন বেড়ার বালাই নেই। তার মধ্যে একটি মেয়ে হাঁটু গেড়ে নামাজ পড়ছিল। গাছের

গোড়ায় ঘোড়া বেঁধে রেখে মৃধা সাহেব নিঃশব্দে সেই ভাঙা দোচালার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন সেই নামাজ—আঠের উনিশ বছরের একটি তন্বী মেয়ের অপরূপ আত্মনিবেদন।

নামাজ পড়া শেষ হ'লে পিছন ফিরে মেয়েটি তাঁকে দেখতে পেয়ে যেন চমকে উঠল, তারপর একটা অস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গে মেয়েটি একেবারে বাড়ির মধ্যে গিয়ে পালাল।

তার ভয় দেখে মৃধা সাহেব হাসলেন, তারপর আস্তে আস্তে তিনিও এগুলেন বাড়ির ভিতরে। এ বাড়ি তার অপরিচিত নয়। আইনদ্দিন ফকিরের বাড়ি। তাঁর মনে পড়ল অনেককাল আগে গাছগাছড়ার খোঁজে আইনদ্দিনের কাছে তিনি গোপনে নিজে এসেছিলেন। গাছড়া নশরৎ আলী পেয়েছিলেন কিন্তু ফল কিছু পান নি।

এতকাল বাদে নশরৎ আলীকে নিজের বাড়ির দোরে দেখতে পেয়ে আইনদ্দিন বিস্মিতও হ'ল, ভীতও হ'ল; বলল, 'আজ্ঞে হুজুর, আপনি নিজে কেন এত কষ্ট করলেন, দরকার থাকলে লোক লস্কর পাঠিয়ে আমাকে তলব ক'রলেই তো হ'ত।'

নশরৎ আলী মাথা নাড়লেন, 'না লোক লস্করে তা হ'ত না। এই মাত্র যে মেয়েটি গিয়ে ঘরে ঢুকল সে কি তোমার?'

ফকির সন্ত্রস্ত হ'য়ে বলল, 'আজ্ঞে হাঁ হুজুর।'

নশরৎ আলী বললেন, 'দেখ, বহুকাল আমার খোদার ওপর কোন আস্থা ছিল না, আজ তোমার মেয়েকে দেখে ফের আবার সেই আস্থা ফিরে এসেছে। ওর নামাজপড়া দেখে আমার ভারি সাধ হচ্ছে ওর পাশে দাঁড়িয়ে আমিও খোদার নাম ক'রে নামাজ পড়ি।'

আইনদ্দিন ফকির বিব্রত ভীত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু হুজুর, আমার মেয়ে রাবেয়া যে বড় দুর্ভাগিনী। এক সপ্তাহও হয়নি অমন জোয়ান স্বামীকে সে হারিয়েছে। দিনরাত অভাগীর চোখের জলে কাটছে।'

নশরৎ আলী বললেন, 'ভয় কি, তার চোখের জল মোছাবার ভার আমি নিলুম।'

কিন্তু তবু আইনদ্দিনের ভয় ভাঙল না। দিনে অসংখ্যবার নশরৎ আলীর লোক লস্কর এসে হানা দিতে লাগল।

রাবেয়া বলল, 'বা-জান, আমি মন ঠিক ক'রে ফেলেছি। তুমি মৃধা সাহেবকে বল যে আমি রাজী আছি।'

আইনদ্দিন আর তার স্ত্রী চোখের জল ফেলে বলল, 'পাগলী, আমাদের বাঁচার জন্য তুই এমন ক'রে মরণ ডেকে আনতে চাস। তার চেয়ে চল রাতারাতি এমুলুক ছেড়ে আমরা কোথাও চ'লে যাই।'

রাবেয়া তার সুন্দর ছোট কপালটুকু দেখিয়ে বলল, 'কিন্তু এ তো আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাবে।'

নশরৎ আলী মিথ্যা কথা বলেন না। চোখের জল মুছবার জন্য সত্যিই তিনি

আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। সোনাদানায় রাবেয়ার গা ভরে দিলেন, দাসী বাঁদীতে ভরলেন ঘর; কিন্তু তবু রাবেয়ার মন যেমন শূন্য ছিল তেমন শূন্যই রইল, আড়ালে চোখের জলেরও বিরাম রইল না।

অন্যান্য বিবির বেলায় এ সব রোগে নশরৎ আলী শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু রাবেয়াকে দেখার পর আল্লার দুনিয়াকে তিনি যেন নতুন চোখে দেখতে সুরু করলেন।

একদিন বললেন, 'রাবেয়া, এতকাল ছেলে ছেলে ক'রে পাগল হয়ে বেড়িয়েছি। ভেবেছি স্বামীর কোলে ছেলে ধ'রে দিতে না পারলে তার রূপ বৃথা, তার যৌবন বৃথা, তার মেয়ে জন্মটাই অর্থহীন। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সে ভুল এতদিনে ভেঙেছে। শুধু তুমিই যথেষ্ট। তুমি যে আছ এই সব চেয়ে বড় লাভ, পুত্রলাভ এর কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তোমার কাছে আলাদা ক'রে আমি কিছু চাই না, ছেলে নয় মেয়ে নয়, আমি কেবল তোমাকেই চাই।'

রাবেয়াকে নীরব দেখে বললেন, 'জানি চাইলেই পাওয়া যায় না, এ জিনিস জোর-জবরদস্তিতে হওয়ার নয়, এর জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়। কিন্তু অপেক্ষা করবার মত সময় আমার হাতে যে খুব বেশী নেই।'

নশরৎ আলীর কথা শুনে রাবেয়ার চোখে আবার জলের ধারা নামত। নশরৎ আলী ক্ষুণ্ণ মনে ভাবতেন দেহে এমন রূপ, কণ্ঠে এমন মাধুর্য, স্পর্শে এমন আবিষ্টতা কিন্তু চোখের জল ছাড়া কি আর কোন ভাষা রাবেয়ার জানা নেই? অমন কাজলকালো দুই চোখ কি চিরকাল কেবল জলে ভ'রে থাকবে?

হাইকোর্টে কি একটা বাটোয়ারার মামলায় হেরে নশরৎ আলী সেদিন কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ব'সেছিলেন। সেজো বিবি মেহেরজান এসে চটুল ভঙ্গিতে বলল, 'সুখবর এনেছি, কি পুরস্কার দেবে বল।'

নশরৎ আলী ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকালেন। মেহেরজান একটুও ভয় পেল না, তেমনি সহাস্যে বলল, 'তোমার ছোট বিবির মন বেহেস্ত থেকে একেবারে ধূলামাটির দুনিয়ায় নেমে এসেছে। দরিয়ার সওয়ার চাঁদমিঞাকে দরিয়া একটা ছাঁট দিয়ে ফেলে দিয়েছিল—ছোট বিবি জানালা দিয়ে দেখতে পেয়ে আহা হা ক'রে উঠেছেন। তারপর চাঁদমিঞার হাঁটু ছ'ড়ে আর মচকে গেছে শুনে ছোট বিবি নিজ হাতে তার জন্য চুন-হলুদ গরম ক'রে পাঠিয়েছেন।'

নশরৎ আলী বললেন, 'কেবল এই? এও তো সেই দয়ার কথা, সেই পুরোনো চোখের জলের কথা। বলি রাবেয়াকে কেউ হাসাতে পেরেছে?'

মেহেরজান বলল, 'কেন পারবে না? চাঁদমিঞা তোমার রাবেয়াকে হাসিয়েছেও। দানাপানি নিয়ে ঘোড়াকে যখন চাঁদমিঞা কেবল সাধ্যসাধি করছিল আর তোমার সাধের

দরিয়া বার বার মান ক'রে মুখ সরিয়ে নিচ্ছিল আমি স্পষ্ট দেখেছি ছোট বিবিও মুখ মুচকে মুচকে হাসছে।'

নশরৎ আলী বললেন, 'হ্যাঁ এ খবরের পর পুরস্কার তুমি পেতে পার।' বলে হাতের সব চেয়ে দামী আংটি খুলে তিনি মেহেরজানকে দিতে গেলেন।

মেহেরজান পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'বাঁদীর কসুর মাপ করবেন হুজুর। ও আংটি পরবার যোগ্য আঙুল আমার হাতে নেই। তা কেবল ছোট বিবির হাতে আছে আর আছে চাঁদমিঞার হাতে।'

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। চাঁদমিঞার মত সুপুরুষ সহিস সওয়ারদের মধ্যে তো দূরের কথা, বড় বংশেও খুব কম মেলে। অনেক চেষ্টায় অনেক খুঁজে পেতে নশরৎ আলী তাঁর সবচেয়ে পেয়ারের দুধবরণ ঘোড়ার জন্য অমন সোণারবরণ সওয়ার সংগ্রহ ক'রেছেন। অমন সুন্দর ঘোড়ার উপর যদি কালো কুশ্রী যেমন তেমন একটা সওয়ার উঠে বসত তা হ'লে কি মান থাকত নশরৎ আলীর, না তার রুচিরই প্রশংসা করত? দৌড়ের সময় মাঠের হাজার হাজার লোক যে দিশেহারা হয়ে ভাবে, ঘোড়া দেখবে, না তার ওপরের সওয়ার দেখবে এ তো নশরৎ আলীরই কৃতিত্ব, তাঁরই গর্বের বস্তু।

তবু ভালো যে তাঁর বাড়ীর একটা জিনিস অন্তত রাবেয়ার চোখে ভালো লেগেছে। হীরা নয়, জহরৎ নয়, হরিণ নয়, ময়ূর নয়, রাবেয়ার ভালো লেগেছে নশরৎ আলীর সবচেয়ে পেয়ারের আর সবচেয়ে খুবসুরৎ সওয়ার চাঁদমিঞাকে। এতো সুখবরই। তবু মেহেরজানের কথার ধাঁচে কোথায় যেন নশরৎ আলীর একটু বিঁধল। সেটা মেহেরজানের জিভেরই দোষ। এতকাল তো তাকে তিনি দেখে এসেছেন। মেহেরজানের জিভ যেমন বাঁকা, তেমনি ছুঁচালো।

এক সময় চাঁদমিঞাকে তিনি নিজের কামরায় ডাকিয়ে আনলেন, 'তুমি নাকি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল?'

চাঁদমিঞা লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু ক'রে রইল।

নশরৎ আলী সহাস্যে সস্নেহে বললেন, 'ব্যাপার কি মিঞা, তোমার এত পেয়ারের দরিয়া, সে-ই তোমাকে পিঠ থেকে পায়ের নিচে ফেলে দিল?'

চাঁদমিঞাও অপ্রতিভভাবে একটু হাসল, 'আজ্ঞে হুজুর, ওরা রঙ্গ দেখবার জন্য অমন মাঝে মাঝে করে।'

'রঙ্গ দেখবার জন্য?'

'আজ্ঞে হাঁ। ফেলে দিয়ে আমার দিকে এমন ক'রে তাকাচ্ছিল যে মনে হ'ল ওর চোখ ফেটে জল আসছে।'

নশরৎ আলী চমকে উঠে বললেন 'কার, কার চোখ ফেটে জল আসছিল?'

চাঁদমিঞা তেমনি বিনীত কণ্ঠে বলল, 'আজ্ঞে হুজুর, দরিয়ার।'

'ও দরিয়ার। যাক গে, তিন দিন বাদে আবার ঘোড়দৌড়ের বন্দোবস্ত করছি।

তুমি কি পারবে, না দরিয়ার রঙ্গ আর চোখের জলের স্রোতে পিঠ থেকে আবারও আছড়ে পড়বে ?'

'আজ্ঞে না হুজুর, তাহ'লে কি আর মান থাকে ?'

'হ্যাঁ, মানের কথা মনে থাকে যেন।'

তা মনে থাকবে চাঁদমিঞার। রাবেয়ার দিকে তাকাতে গিয়ে ঘোড়া থেকে প'ড়ে তার লজ্জার সীমা ছিল না, রাবেয়া অবশ্য করুণ-ছলছল চোখে অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়েছিল, নিজ হাতে দাওয়াই তৈরি ক'রে পাঠিয়েছিল, কিন্তু অমন হাত থেকে কি কেবল দাওয়াই নিতে ইচ্ছা হয়, অমন চোখে কি কেবল দয়া দেখতে ভাল লাগে ?

নির্দিষ্ট দিনে ঘোড়দৌড়ের আয়োজন পূর্ণ হ'ল। ঘোড়া আর মানুষে পূর্ণ হয়ে গেল মাঠ। নশরৎ আলীর প্রাসাদের জানালায় বিবিরা এসে দাঁড়ালেন। কুটুম্ব স্বজনরা উঠল ছাদে। সমস্ত মাঠ কল্লোলে কোলাহলে ভ'রে গেল। উৎসুক দর্শকদের ভারে আশেপাশের গাছগুলি কেবলি দোল খেতে লাগল।

পাল্লার প্রান্ত থেকে কাতারে কাতারে ঘোড়া ছুটল। নশরৎ আলী এক সময় এসে রাবেয়ার পাশে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'ঘোড়দৌড় তোমার ভালো লাগছে ?'

রাবেয়া মাথা নাড়ল।

নশরৎ আলী বললেন, 'সাদা ঘোড়ার পিঠে চাঁদমিঞাকে বেশ মানিয়েছে, না ?'

রাবেয়া স্বামীর মুখের দিকে তাকাল, তারপর মৃদু একটু হেসে বলল, 'মানাবে না ? মানাবার জন্যই তুমি তো এমন করেছ। অমন খুবসুরৎ সওয়ারকে তুলে দিয়েছ অমন চমৎকার খুবসুরৎ ঘোড়ায়।'

এক সঙ্গে রাবেয়ার এত কথা, এত মিষ্টি কথা যেন কোন দিন নশরৎ আলী শোনেন নি। প্রসন্ন হাস্যে বললেন, 'জুড়ি মিলাবার আমার হাত আছে বলো ?'

রাবেয়া আবার তার বড় বড় স্নিগ্ধ প্রশান্ত চোখ দুটি তুলে স্বামীর দিকে তাকাল, বলল, 'তা তো আছেই।'

জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ পাশের দেওয়াল-আয়নার দিকে চোখ পড়ল নশরৎ আলীর। দেখলেন, দুটি বিস্মিত বিষণ্ণ চোখ মেলে রাবেয়াও সেই আয়নার দিকেই তাকিয়েছে। স্বামীর সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই রাবেয়া তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাঠের দিকে তাকাল।

আড়চোখে নশরৎ আলী দেখলেন ঠিক সেই মুহূর্তে সমস্ত ঘোড়াগুলিকে পিছনে ফেলে চাঁদমিঞার ঘোড়া বিদ্যুতের মত পাল্লার আর এক প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে নশরৎ আলী আবার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালেন, তাকালেন অন্যদিকে মুখ ফেরানো রাবেয়ার দিকে। মনে হ'ল জোড় ঠিক মেলে নি। কিন্তু যদি না মিলে থাকে তাতেই বা কি আসে যায় ? আর কেনই বা

মেলেনি? মেয়েদের মত পুরুষের রূপ আর যৌবন তো কেবল তার দেহেই নয়, তার সামর্থ্যে, তার খ্যাতিতে, তার ঐশ্বর্যে,—তা তো নশরৎ আলীর এখনও আছে। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর সম্পদ রাবেয়ার চোখ ঝলসে দেয়নি, রাবেয়ার চোখকে মুগ্ধ করেছে তাঁরই একজন দীনাতিদীন অনুচরের দেহসৌষ্ঠব। এর চেয়ে লজ্জার, এর চেয়ে বিস্ময়ের আর কি হ'তে পারে। নশরৎ আলীর মনে পড়ল তিনিও রাবেয়ার দেহলাবণ্য দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। গুন নয়, বংশ নয়, শুধু রূপ। কিন্তু নশরৎ আলী মুগ্ধ হয়েছিলেন ব'লে কি রাবেয়াও তাই হবে? অমন সুন্দর বিস্ময়কর দুটি চোখ কি কেবল পুরুষের স্থূল দেহসৌষ্ঠবেই আটক থাকবে? আরও গূঢ়, আরও বিস্ময়কর কিছু আবিষ্কার করতে পারবে না?

হঠাৎ তুমুল কলধ্বনিতে নশরৎ আলীর চমক ভাঙল। 'চাঁদমিঞা জিতেছে, চাঁদমিঞা জিতেছে।'

নশরৎ আলী অদ্ভুত একটু হাসলেন। তাঁরই ঘোড়া, তাঁরই সওয়ার, তবু জিত চাঁদমিঞারই। নশরৎ আলীর নামগন্ধ কোথাও নেই।

নশরৎ আলী বললেন, 'শুনেছ, চাঁদমিঞা জিতেছে। খুশি হয়েছ তো?'

রাবেয়া বলল, 'কেন হব না, তুমি হওনি?'

'নিশ্চয়ই।' নশরৎ আলী রাবেয়ার প্রসন্ন মুখের দিকে তাকালেন, তারপর হাতের সেই দামী আংটিটি খুলে বললেন, 'এই নাও।'

রাবেয়া বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও কি, আবার আংটি কেন।'

নশরৎ আলী বললেন, 'ভারি খুশি হয়েছি। কেন না তোমাকে এতখানি খুশি হতে আর দেখিনি।'

রাবেয়া মৃদু হেসে বলল, 'তাই নাকি। কিন্তু বকশিশটা আমাকে কেন?'

নশরৎ আলী বললেন, 'তবে কাকে? চাঁদমিঞাকে? তার জন্য ভেবনা। তাকে অন্য জিনিস দেব। আংটিটা তুমিই পর।'

পরদিন থেকে চাঁদমিঞাকে কোথাও দেখা গেল না। দরিয়ার জন্য অন্য সহিস নিযুক্ত হ'ল। সমস্ত বাড়ীটা নিঃশব্দ ইঙ্গিতে আর আশঙ্কায় থম থম করতে লাগল।

একটু ইতস্তত ক'রে রাবেয়া বলল, 'কেউ কেউ বলছে চাঁদমিঞা আর পৃথিবীতে নেই—'

নশরৎ আলী নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে হাসলেন, 'কিন্তু তোমার হৃদয় কি বলছে, আর তোমার খোদা।'

রাবেয়ার ঠোঁট দুটি একটু কেঁপে উঠল, কিন্তু কোন কথা বেরোল না।

একঘুমের পর জেগে উঠে নশরৎ আলী দেখলেন রাবেয়া তখনো শোয়নি। পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে নিশ্চলভাবে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। যেন শ্বেত পাথরে খোদা এক

মূর্তি। রাবেয়ার এই মূর্তি, এই ভঙ্গি দেখেই নশরৎ আলী একদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন; কিন্তু আজ তাঁর চোখ তৃপ্ত হ'ল না, জ্বলতে লাগল। জ্বলতে লাগল বুক, মনে হ'ল ও মূর্তি একান্ত পাথরেরই, ওর মধ্যে প্রাণ নেই।

তিনি ডাকলেন, 'রাবেয়া।'

দু' তিন ডাকের পর রাবেয়ার চমক ভাঙল, ফিরে তাকাল স্বামীর দিকে।

নশরৎ আলী বললেন, 'খোদাকে যতক্ষণ ধ'রে ডাকছ তার চার আনি সময়ও যদি আমাকে ডাকতে আমি তোমার মনের আশা মিটাতে পারতুম। চাঁদমিঞা পৃথিবীতেই আছে। দেখবে তাকে?'

রাবেয়া মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বলল, 'না, আমি তাকে দেখতে চাইনে।'

নশরৎ আলী বললেন, 'না চল, তোমার একবার দেখে আসা ভালো।'

হাত ধ'রে নশরৎ আলী তাকে টেনে তুললেন।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। খোপে খোপে মানুষ ঘুমচ্ছে, খাঁচায় খাঁচায় পাখি। নশরৎ আলী রাবেয়াকে নিয়ে একটা অন্ধকার সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে এসে থামলেন। ঘুরে ঘুরে একটা সরু সিঁড়ি মাটির নিচে গিয়ে নেমেছে। সিঁড়ির শেষে আরও ছোট, আরও সংকীর্ণ একটি ঘর। নশরৎ আলী একটা মোম জেলে রাবেয়ার হাতে দিয়ে বললেন, 'ধর', তারপর চাবি বার ক'রে বন্ধ তালা খুলে দরজার পাল্লা ঠেলে দিয়ে বললেন, 'দেখ।'

মোমের ম্লান মৃদু আলো ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ল। রাবেয়া একবার সেদিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল, 'না না, আমি দেখতে চাইনে।'

চাঁদমিঞার সর্বাঙ্গ, বিশেষ ক'রে সমস্ত মুখ নির্মম চাবুকের দাগে ছিঁড়ে ফেটে গিয়েছে। ক্ষতের মুখে রক্ত কালো হয়ে জমে রয়েছে। স্ফীত মুখখানা এমন বিকৃত আর কুশ্রী দেখাচ্ছে যে মানুষের মুখ ব'লে চিনবার জো নেই। চোখের ভ্রূ এবং পাতার ওপরেও চাবুকের ঘা পড়েছিল। রাবেয়ার ক্ষীণ আর্তনাদে প্রাণপণ শক্তিতে চোখের পাতা চাঁদমিঞা টেনে তুলতে চেষ্টা করল। তারপর স্বামীর সঙ্গে আশ্লিষ্ট ভীত শঙ্কিত রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে মনে হল চাঁদমিঞা যেন হাসল। রাবেয়া তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল; তারপর কাতর মিনতিতে ব'লল, 'আমাকে নিয়ে চল!'

সঙ্গে সঙ্গে নশরৎ আলী তার ক্ষীণ কম্পিত দেহ দুহাতে তুলে নিলেন। মুখে তাঁর অদ্ভুত আত্মপ্রসাদের হাসি। শুধু চাঁদমিঞা নয়, খোদার সমস্ত দুনিয়াটাকে যদি তিনি এমনি চাবুকের ঘায়ে বিকৃত ক'রে দিতে পারতেন!

ঘরে এসে সযত্নে রাবেয়াকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। রাবেয়া আস্তে আস্তে বলল, 'কেন এমন করলে, কি ক'রেছিল ও।'

নশরৎ আলী বললেন, 'বিশেষ কিছু করেনি। ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে জিতে এসে গভীর রাত্রে ঘুমন্ত ঘোড়াকে আস্তে আস্তে রাবেয়া রাবেয়া বলে ডাকছিল।'

রাবেয়া আর কোন কথা না বলে পাশ ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে নশরৎ আলী তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। কথাটা শুনে রাবেয়ার মুখের রঙ কি রকম বদলায় হয়তো নশরৎ আলীর দেখবার লোভ হয়েছিল। কিন্তু তীক্ষ্ণ কুটিল দৃষ্টির সামনে অত্যন্ত বিবর্ণ নিষ্প্রভ রক্তহীন একখানি মুখাবয়ব মৃতবৎ স্থির হয়ে রইল।

নশরৎ আলী যেন খানিকটা তৃপ্তি পেলেন। তারপর হঠাৎ পরম ঔদার্যের স্বরে বললেন, 'এই রইল সেই ঘরের চাবি। এরপর এখন তাকে তুমি যা খুসি তাই ক'রতে পার।'

দুঃসহ আতঙ্কে রাবেয়া আর একবার শিউরে উঠল, 'না না না।'

তার সেই শিহরিত কোমল বাহুখানির ওপর আস্তে নিজের দীর্ঘ প্রশান্ত হাতখানি রাখলেন নশরৎ আলী। সমস্ত সত্তা দিয়ে রাবেয়ার সেই শিহরণ তিনি যেন অনুভব ক'রবেন, সমস্ত অনুভূতির মধ্যে সেই শিহরণটুকুকে তিনি যেন চিরকালের জন্য সঞ্চয় ক'রে রাখবেন।

খানিকক্ষণের মধ্যে গভীর ক্লান্তিতে নশরৎ আলী ঘুমিয়ে পড়লেন।

কিন্তু রাবেয়ার চোখে ঘুম নেই। তার চোখের সামনে সেই বিকৃত ক্ষতলাঞ্ছিত মুখ অনুক্ষণ ভেসে রয়েছে। দেখে দেখে রাবেয়ার মনে হ'ল সে মুখ বীভৎস নয়, অত্যন্ত করুণ, অত্যন্ত অসহায়। এক অস্ফুট চাপা আর্তনাদ সেই মাটির নিচের গহ্বর থেকে রাবেয়ার কানে যেন বারবার ভেসে আসতে লাগল।

রাবেয়া আস্তে আস্তে বিছানার ওপর উঠে বসল। ঘরের এক কোনে মোমদানিতে একটা মোম জ্বলে জ্বলে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। রাবেয়া আর একটা নতুন মোম জ্বালাল। তক্তপোশের নিচে তার বাবার দেওয়া বড় একটা ঝাঁপিতে অনেক গাছড়া আর নানা রকমের ওষুধের তেল করা রয়েছে। ফকির ব'লে দিয়েছে এগুলি তাকে সব রকম বিপদ আপদ অসুখ বিসুখ থেকে রক্ষা ক'রবে।

ঝাঁপিটা বার ক'রে কি একটু চিন্তা করল রাবেয়া। তারপর কয়েকখানা গাছড়া আর একটা তেলের শিশি তুলে নিল। চাবিটা তার বিছানার পাশেই প'ড়ে রয়েছে। তুলতে গিয়ে হাতটা যেন একটু কেঁপে উঠল। তারপর ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকাল রাবেয়া। একটু কি ইতস্তত করল, হয়তো ভাবল তাঁকে ডেকে তাঁর অনুমতি নিয়েই যাবে। আবার কি ভেবে নিরস্ত হ'ল। তারপর চাবিটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর কোন ভয় নেই, কোন শঙ্কা নেই, অদ্ভুত সাহস এসেছে রাবেয়ার মনে। গাছড়ার ঝাঁপিতে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন অলৌকিক দৈবশক্তি সে হাতে পেয়েছে। খোদার নির্দেশ শুনতে পেয়েছে হৃদয়ের মধ্যে সারারাত।

সারারাত দুঃসহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে ভোরের দিকে চাঁদমিঞার বোধ হয় একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, ঘরের মধ্যে আলো আর পায়ের সাড়ায় সে চমকে জেগে উঠল,

চোখ মেলতেই দেখল রাবেয়া তার দিকে ছোট একটা শিশি হাতে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ যেন ব্যাপারটা তার বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হ'ল না। কিন্তু পরক্ষণেই খানিকক্ষণ আগের ঘটনাকে তার মনে পড়ে যাওয়ায় সর্বাঙ্গের দুঃসহ যন্ত্রণা যেন দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল। গূঢ় অভিমানে রাবেয়ার হাতখানা ঠেলে দিয়ে বলল, 'না!'

ধাক্কা লেগে রাবেয়ার হাতের শিশিটা দূরে ছিটকে পড়ল। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে একমুহূর্তে যেন বিমূঢ় হয়ে রইল রাবেয়া। তারপর হঠাৎ আঙুলের জলন্ত অঙ্গুরীর দিকে তার চোখ পড়ল। দুই ঠোঁটে অদ্ভুত এক ঝিলিক হাসি ফুটে উঠল। আস্তে আস্তে হাতের আংটিটা খুলে চাঁদমিঞার একটা আঙুলে পরিয়ে রাবেয়া তেমনি দুর্বোধ রহস্যময় মৃদু হাস্যে বলল, 'এবার তো আর ওষুধে তোমার কোন আপত্তি নেই?'

বিস্ময়ে আনন্দে চাঁদমিঞা নির্বাক হয়ে রইল। দেহ মনের কোন জ্বালার কথাই তার আর মনে পড়ছে না।

রাবেয়া উঠে গিয়ে সেই শিশিটা তুলে নিয়ে এল। তারপর হাতের তালুতে ঘন খানিকটা তেল ঢেলে ডান হাতের আঙুল ভিজিয়ে চাঁদমিঞার মুখের ক্ষতস্থান বুলিয়ে দিতে লাগল। চাঁদমিঞা গভীর শান্তিতে চোখ বুজল।

হঠাৎ পিছন থেকে একখানা বজ্রকঠিন হাত এসে রাবেয়ার কণ্ঠ চেপে ধরল। রাবেয়া মুখ ফিরিয়ে দেখতে পারল না, কিন্তু হাতের স্পর্শ সে চিনতে পারল।

চাঁদমিঞা চীৎকার ক'রে এগিয়ে আসতেই পায়ের ঠোকরে নশরৎ আলী তাকে ঘরের আর এক কোণে ঠেলে ফেলে দিলেন। তারপর সেই বিবশ মূর্চ্ছিত অপরূপ দেহাধারটিকে অনায়াসে দুহাতে তুলে নিয়ে তিনি আর একবার সেই ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন।

পরের দিন শোনা গেল অকস্মাৎ হার্টফেল ক'রে রাবেয়া মারা গেছে। সহরের ডাক্তারও সেই রিপোর্ট দিল। বাড়ির আত্মীয়স্বজন অনুচরেরা আর একবার নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। খবর পেয়ে থানার ইন্সপেক্টর চৌধুরী সাহেব বন্ধুবৎ সমবেদনা জানাতে এলেন এবং খানিকক্ষণ নিভৃতে নশরৎ আলীর সঙ্গে কি দু একটি কথাবার্তা ব'লে বিদায়ও নিলেন। রাবেয়াকে কবর দেওয়ার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ক'রতে নশরৎ আলীর ঘন্টাখানেকের বেশী লাগল না। অনুচরেরা রাবেয়াকে তুলে নিয়ে গেল। নশরৎ আলী তাদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন ঘরে। চার বিবির কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস পেল না।

শূন্য ঘরের মধ্যে হঠাৎ এক দুঃসহ বেদনায় নশরৎ আলীর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। চোখ ফেটে আসতে চাইল কান্না। কিন্তু নিজেকে নশরৎ আলী অনেক কষ্টে সংবরণ ক'রলেন। কান্না ছাড়া তার আরও এক কাজ এখনো বাকী আছে। যে কুকুর তাঁর রাবেয়াকে অশুচিস্পর্শে কলঙ্কিত ক'রেছে, তার চরম শাস্তি আছে এখনো। সে শাস্তি নিজের হাতে না দিলে নশরৎ আলীর অন্তর শান্ত হবে না।

পরিজনেরা এখানে ওখানে জটলা পাকাচ্ছে। নশরৎ আলী অলক্ষ্যে এক সময় সিঁড়ি বেয়ে সেই গুপ্ত গহ্বরের উদ্দেশ্যে নেমে চললেন।

হঠাৎ মসিয়র উঠে দাঁড়াল, বলল, 'ওঠ, এবার আমরাও চলি, অনেক কাজ আছে।'

আমি তার হাত ধ'রে টেনে বসালাম। 'উঠব মানে? আগে চাঁদমিঞার কি পরিণতি হ'ল তাই ব'ল।'

মসিয়র রহমান সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রহস্যাত্মক ভঙ্গিতে হাসল, 'পরিণতিটা তেমন সুবোধ্য নয়, এখানে এসে গল্পটা কিছু অলৌকিক আকার নিয়েছে, মাঝখানের খানিকটা অংশ অত্যন্ত অস্পষ্টও হয়ে গেছে।'

অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, 'ভণিতা না ক'রে সংক্ষেপে বল চাঁদমিঞার শেষ দশাটা কি হ'ল।'

মসিয়র বলল, 'শুনেছি অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে নশরৎ আলীর চাঁদমিঞাই সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ছিলেন। চাঁদমিঞা হাত ধ'রে তাঁকে রাবেয়ার কবরভূমিতে নিয়ে যেত, তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত, আবার রোজ সন্ধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে আসত বাড়িতে। শেষের দিকে দুজনের মধ্যে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক উঠে গিয়ে গভীর সৌহার্দের সৃষ্টি হয়েছিল।'

বললুম, 'হঠাৎ এরকম অভিনব কুটুম্বিতার কারণ?'

মসিয়র হেসে বলল, 'যারা আইনদ্দিন ফকিরের কেরামতিতে বিশ্বাস ক'রত তারা বলত ফকিরের গাছড়ার গুণ। যে সব গাছড়া রাবেয়া চাঁদমিঞার ঘরে ফেলে এসেছিল তা হাতে পেয়ে চাঁদমিঞা অসীম দৈববলে বলীয়ান হয়েছিল, নশরৎ আলীর জিঘাংসা তাকে স্পর্শ ক'রতে পারেনি।'

বললুম, 'আর যারা ফকিরের কেরামতিতে বিশ্বাস করে না?'

মসিয়র বলল, 'তারা আমার টীকায় বিশ্বাস ক'রবে?'

'তোমার টীকাই শুনতে চাচ্ছি।'

মসিয়র বলল, 'নশরৎ আলী চাঁদমিঞাকে যে হত্যা করতে গিয়েও ক'রতে পারেননি, তা কোন গাছগাছড়ার জন্য নয়, চাঁদমিঞার আঙুলে পরিয়ে দেওয়া রাবেয়ার সেই আংটিটির জন্য। তার হাতে আংটিটি দেখে নশরৎ আলী প্রথমে জ্বলে উঠেছিলেন। বজ্রমুষ্টিতে সেই আংটি শুদ্ধ হাত তার চেপে ধ'রেছিলেন। এটা তাকে উদ্ধার ক'রতেই হবে। এটা রাবেয়ার স্মৃতিচিহ্ন। কিন্তু ছিনিয়ে নিতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছিল, শেষ চিহ্ন হ'লেও রাবেয়া তো তার হাতে সেটা দিয়ে যায়নি। দিয়ে গেছে তারই এই বীভৎস, শ্রীহীন অনুচরটির হাতে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদমিঞার মুখের দিকে নশরৎ আলী তাকিয়েছিলেন। ক্ষতস্থানের মুখে মুখে রাবেয়ার দেওয়া সেই মলম শুকিয়ে লেগে রয়েছে। রাবেয়ার আঙুলের শেষ স্পর্শ। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে নশরৎ আলীর বোধ হয় মনে হয়েছিল রাবেয়ার অঙ্গুরীটির মত তার আঙুলের স্পর্শ-

গুলি স্মৃতি হিসাবে আরও মূল্যবান। সেগুলি রাখতে হয়, কেন না এক হিসাবে সে-ই রাবেয়ার জীবন্ত স্মৃতিচিহ্ন।'

হেসে বললাম, 'ফকিরের চেয়ে তোমার কেরামতি কম কঠিন নয় মসিয়র। কিন্তু নশরৎ আলীকে চাঁদমিঞা ক্ষমা করল কি ক'রে?'

মসিয়র কোন জবাব না দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

সংক্রামক

মাথা আঁচড়ে একটি একটি ক'রে কোটের বোতাম এঁটে এবার নিচু হ'য়ে সরযূ ছেলের জুতোর ফিতে বেঁধে দিচ্ছিল, শশাঙ্ক এসে ঘরে ঢুকল। মুহূর্তকাল চোখ তেরছা করে সরযূ আর তার ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে শশাঙ্ক বলল, 'বাঃ, লাটের বেটার সাজখানা তো আজ দিব্যি মানিয়েছে।'

সরযূ একবার শশাঙ্কের দিকে চেয়ে আবার ফিতে বাঁধায় মন দিল। যেন সে আর তার ছেলে ছাড়া এ ঘরে তৃতীয় কোন মানুষ নেই।

কিন্তু শশাঙ্কের অস্তিত্ব অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একটু চুপ করে থেকে সে আবার আরম্ভ করল।

'বলি, সাজিয়ে গুজিয়ে ছেলেকে এই ভর সন্ধ্যায় কোথায় পাঠাচ্ছ সরযূ?'

সরযূ জবাব দিল, 'কোথায় আবার পাঠাব? পার্কে খেলতে যাবে।'

শশাঙ্ক একটু হাসল, 'ও তাই বল, আমি ভাবলুম আমাদের কানাই বুঝি সেজে গুজে মজা লুটতে বেরুচ্ছে।'

বিস্ময়ে ক্রোধে এক মুহূর্ত হতবাক হয়ে থেকে সরযূ রুখে উঠল, 'আজ আবার মদ খেয়ে এসেছ বুঝি?'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'ক্ষেপেছ, এই মাসের শেষে অত পয়সা কোথায়। বিশ্বাস না হয় মুখ শুঁকে দেখতে পারো'; ব'লে সত্যিসত্যিই শশাঙ্ক সরযূর মুখের দিকে মুখ এগিয়ে নিল।

সরযূ সভয়ে দুপা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'ছি ছি ছি, চোখের মাথা একেবারে খেয়েছে। অত বড় ছেলে রয়েছে সামনে, লজ্জাও করে না একটু।'

শশাঙ্ক বলল, 'ঠিক ঠিক, লজ্জা করাই তো উচিত। ভুলে গিয়েছিলাম এত বড় ছেলে তোমার সামনে। সত্যিই তো। তাহলে যাও তো বাবা কানাই, জুতোর ফিতে তো তোমার বাঁধা হয়ে গেছে, এবার তুমি বাইরেই যাও, দেখছনা তোমার মা লজ্জায় মরে যাচ্ছে।'

ব'লে শশাঙ্ক সত্যিই কানাইয়ের ঘাড়ে হাত দিয়ে অসঙ্কোচে তাকে দোরের বাইরে

ঠেলে দিল, তারপর তার মুখের সামনে সশব্দে দোর বন্ধ করে দিয়ে এসে তক্তপোশের উপর বসল।

কানাই রুদ্ধ আক্রোশে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বন্ধ দরজায় লাথি মেরে বলল, 'শালা।' ব'লেই তাড়াতাড়ি দৌড়ে বেরিয়ে গেল, পাছে শশাঙ্ক এসে ধরে ফেলে।

শশাঙ্ক কিন্তু দোর খুলবার একটুও চেষ্টা না ক'রে বলল, 'শোন একবার, কথা শোন তোমার ছেলের। ন'বছর বয়সেই কি তেজ দেখছ, বড় হ'লে ও যুদ্ধের ক্যাপ্টেন হবে।'

সরযূ বলল, 'হবেই তো।'

শশাঙ্ক হাসল, 'ও, সেই ভরসাতেই আছ বুঝি। কিন্তু আর দু' একটা বছর যেতে দাও; সঙ্গে ক'রে নিয়ে পাড়া চিনিয়ে দিয়ে আসব। দেখবে ওর মুখে তখন কি রকম বুলি'; বলে সরযূর থুথনি ধরে শশাঙ্ক কীর্তনের সুরে গেয়ে উঠল, 'রাধে তুমি আমার প্রেমের গুরু,' তারপর আচমকা তাকে একেবারে বুকে চেপে ধরল।

সরযূ নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'ছাড়ো, ছাড়ো শিগগির আমাকে। কেন, কি করেছি আমি তোমার, যে দিনের পর দিন ছেলের সামনে আমাকে তুমি এমন করে অপমান করছ। আর ওই এক ফোঁটা ছেলে এত হিংসা তোমার তাকে। তোমার নিজের ছেলে যদি হোত—'

শশাঙ্ক বাধা দিয়ে বলল, 'আর সে যদি তোমার বোনের পেটে জন্মাতো তাহলে তুমিও ঠিক এমনিই করতে।'

সরযূ বলল, 'তুমি একটা পশু, নর-পিশাচ।'

শশাঙ্ক কোন কথা না বলে বিড়ি ধরাল, মেয়েমানুষের এই রুষ্ট বিক্ষুব্ধ রূপ দেখতে তবু এক রকম কিন্তু ওরা যখন পোষমানা বিড়ালের মত কোলের ওপর গা এলিয়ে দেয় তখন শশাঙ্ক কিছুতেই যেন তা আর সহ্য করতে পারে না। অথচ প্রথম যত বিদ্রোহই দেখাক, এক সময় না এক সময় ওরা পোষ মানবেই, এই সরযূই কি কম বাধা দিয়েছে, কম ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছে। কিন্তু এখন? একেবারে যেন সাত জন্মের বিয়ে-করা বউ। তার আচরণে কে এখন টের পাবে শশাঙ্ক সত্যিই তার পতি নয়, ভগ্নীপতি?

ভায়রা সুখময় তখনো বেঁচে। সেবার সস্ত্রীক ভায়রার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল শশাঙ্ক। খাওয়া দাওয়ার পর সরযূ পানের খিলি শশাঙ্কের হাতে তুলে দিচ্ছে—বলা নেই কওয়া নেই তার আঙুল শুদ্ধ শশাঙ্ক খিলিটা চেপে ধরল। যমুনা পাশেই দাঁড়ানো ছিল। রাগে এবং লজ্জায় দুই বোনের সুগৌর মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে।

সরযূ ধমকের ভঙ্গীতে বলল, 'ছিঃ, এসব ইতর রসিকতা আমরা একটুও ভালোবাসিনা শশাঙ্ক। আমি যমুনার বড় বোন। সম্পর্কে তোমার দিদি, ঠাট্টা ইয়ার্কির লোক নয়! যাত্রা থিয়েটারে ঢুকে সভ্যতাভব্যতা একেবারেই বিসর্জন দিয়েছ।'

তারপর এই আটদশ বছরে কালচক্রের আবর্ত্তনে সংসারে পরিবর্তন হয়েছে অনেক। যক্ষ্মায় ভুগে এবং চিকিৎসায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে সুখময়ের মৃত্যু হয়েছে। আর স্বামীর অত্যাচার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে যমুনা ক'রেছে গৃহত্যাগ।

দুর্ভিক্ষের বছরে ঘটিবাটি যেখানে যা ছিল বিক্রি ক'রেও যখন নিজের আর ছেলের দু'মুঠো ভাত জোগানো অসম্ভব হয়ে উঠল তখন সরযূ অগত্যা শশাঙ্ককে তার কলকাতার ঠিকানায় চিঠি লিখল, 'বলবার তো আর মুখ নেই, হতভাগী সকলের মুখে কালি দিয়ে গেছে। কিন্তু চক্ষুলজ্জার সময় তো এখন নয় ভাই। চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে না খাইয়ে খাইয়ে ছেলেটাকে যদি মেরেই ফেলি তখন তুমিই একদিন বলবে, এমন দশায় পড়েছিলেন দিদি আমাকে না হয় একটা চিঠিই দিতেন। তাই চিঠি দিয়ে অবস্থাটা সব তোমাকে খুলে জানালাম। এখন তোমার ধর্মে কর্মে যা লয় কোরো।'

এমন চিঠি আরো দু' তিন জনকে সরযূ লিখেছিল, লিখেছিল খুড়তুতো ভাইকে, দূর সম্পর্কের এক ভাসুরপোকে আর স্বামীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে। আর কি মনে ক'রে শেষে শশাঙ্ককেও লিখেছিল একখানা। কিন্তু কারো কাছ থেকে কোন জবাব এলো না, জবাব এলো কেবল শশাঙ্কের কাছ থেকে। শশাঙ্ক দশ টাকা মনিঅর্ডার ক'রে লিখেছে, এভাবে আলাদা করে টাকা তুলে দেওয়া তো তার পক্ষে সম্ভব নয় তবে সরযূ যদি শশাঙ্কের বাসায় এসে থাকে এবং তার বুড়ো পিসিমার এক আধটু দেখা শোনা করে তাহ'লে কোন মতে গরিবভাবে সবাই মিলে থাকা যায়। পাড়াপড়শিরা বলল এমন সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। কিন্তু শশাঙ্কের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে বড় বদনাম শোনা গেছে যে। পরক্ষণে সরযূ নিজেই নিজের প্রতিবাদ করল। মানুষ কি আর চিরকালই এক রকম থাকে? বয়সের কালে এক একটু ফচকেমি ফিচলেমি করেছে ব'লে এখনও কি আর শশাঙ্ক তাই করবে? তা ছাড়া সরযূরই বা এখন আর ভয় কিসের, সেও তো এখন কচি মেয়ে নয়, ছেলেই তো তার এই ন' উৎরে দশ বছরে পড়ল, তারপর কলকাতায় গিয়ে পড়তে পারলে কত রকম কত সুবিধা সুযোগ জুটে যেতে পারে। আর ছেলেটাকে যদি কোন রকমে মানুষ ক'রে তুলতে পারে তাহ'লে আর দুঃখ কিসের সরযূর। কিন্তু সে সব কথা পরে। এখন সমূহ সমস্যা হ'চ্ছে ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখবার। উপোষ ক'রে ছেলে যদি তার মরেই যায় তা হ'লে এই মান সম্মান ধুয়ে কি জল খাবে সরযূ?

**

ষ্টেশনে শশাঙ্ক উপস্থিত ছিল। কিন্তু সরযূর চেহারা আর সঙ্গে তার অত বড় ছেলে দেখে শশাঙ্কের সমস্ত উৎসাহ যেন নিভে এলো। একবার ভাবল এখান

থেকেই বিদায় ক'রে, তারপর মনে করল ক'দিন না হয় একটু পরখ ক'রে দেখা যাক আজকাল কতখানি ঠাট্টা ইয়ার্কি হজম করবার সরযূর শক্তি হয়েছে। তাছাড়া যে যমুনা তাকে এমন ভাবে জব্দ ক'রে গেছে তার খানিকটা শোধও তো শশাঙ্ক তুলে নিতে পারবে, যমুনার ওপর শোধ তুলবার সুযোগ কি জানি জীবনে যদি একেবারে নাই-ই আসে।

কর্ণায়ালিস স্ট্রীটের ফ্লাটবাড়িতে শশাঙ্ক নিয়ে তুলল সরযূ আর তার ছেলেকে। দুখানা ছোট ছোট থাবকার ঘর, একটা পাকের ঘর, আর একটা বাথরুম। সরযূকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিল শশাঙ্ক। এত সুখ সুবিধার কথা সে ভাবতেও পারেনি।

একটু বাদে সরযূ বলল, 'কই, তোমার পিসিমা কোথায় শশাঙ্ক? তাঁকে তো দেখছিনে।'

শশাঙ্ক মুখ মুচকে হেসে বলল, 'তাকে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছি। বুড়ী ভারী ঝগড়াটে। আপনি তার সঙ্গে কিছুতেই বনিয়ে থাকতে পারতেন না সরযূদি।'

সরযূ বলল, 'এ তোমার কি রকম কথা হোল শশাঙ্ক। তার সঙ্গে আমার অবনিবনা হওয়ার কি আছে। তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'করলামই বা, এক আধটু ঠাট্টা ইয়ার্কি তো আমাদের মধ্যে চলতেই পারে।'

'তোমার পিসিমা তাহ'লে তোমার সঙ্গে এখন থাকেন না?'

'কোন কালেই না। পিসিমা বলেই যে কেউ আমার নেই সরযূদি।'

'তা হ'লে কে এখানে আর থাকতো। বিয়ে-থা তো তারপর আর করোনি শুনেছি।'

শশাঙ্ক বলল, 'সে ঠিকই শুনেছেন, যা হয়ে গেল তারপরও আবার বিয়ে? কিন্তু নিতান্ত মেয়েছেলে না হ'লে নাকি পুরুষের চলেনা সেই জন্যই তমাললতাকে কিছুদিন রেখে ছিলাম, আপনি আসবেন বলে তাকে বিদায় করেছি।'

সরযূ জিজ্ঞাসা করল, 'তমাললতা আবার কে।'

শশাঙ্ক বলল, 'এই পাপমুখে সে কথা বলতে লজ্জা করে। শত হ'লেও তো যমুনার আপনি বড় বোন, সম্পর্কে গুরুজন।'

সরযূ নির্বাক হয়ে গেছে, ইচ্ছা ক'রেছে তখনই ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু রাস্তার দিকে তাকিয়ে তার ভয়ে বুক কেঁপেছে, কিলবিল করে কেবল অচেনা মানুষ আর মানুষ। কে জানে, এর প্রত্যেকটিই হয়তো একেকজন শশাঙ্ক, তার চেয়ে এই চেনা শশাঙ্কই ভালো, যত ঠাট্টা তামাসাই করুক একেবারে যা তা কিছু তো আর করতে পারবে না, গলায় তো ছুরি বসাতে পারবেনা আর।

কিন্তু ঠাট্টা তামাসা ধাপের পর ধাপ চড়াতে চড়াতে দু'তিন দিন পরেই শশাঙ্ক যখন তাকে একেবারে বুকে চেপে ধরল সরযূ মনে মনে ঠিক করল আর নয় এবার ছেলেকে

নিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে, পৃথিবীতে ভয় করবে সে কাকে, কিসের জন্তই বা? আর তার কি অবশিষ্ট আছে হারাবার?

ঘুমন্ত ছেলেকে জাগিয়ে সরযূ চুপে চুপে বলল, 'চল কানাই এখানে আর আমরা থাকবনা।'

কানাই সোৎসাহে বলল, 'চলো।'

ছেলের হাত ধ'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে একবার সদর দরজা পর্যন্ত এসে থেমে দাঁড়াল সরযূ। অসংখ্য গাড়ী ছুটে চলেছে রাজপথে, রাত্রির অন্ধকারে তাদের আলোগুলি জলছে রূপকথার রাক্ষসের চোখের মত।

কানাই বলল, 'কই মা চল।'

সরযূ তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'যাব বাবা, যাব, তুই আর একটু বড় হয়ে নে, তারপর তো যাবই।'

কানাই বলল, 'বড় তো আমি হয়েছি মা।'

সরযূ হেসে বলল, 'আরও একটু বড় হ'তে হবে যে বাবা।'

সরযূ ফিরে এল, সত্যিই তো, হারাবার আর তার কি আছে, ভয় করবার আর তার কি আছে যে সে এমন মরীয়া হয়ে গাড়ী চাপা পড়তে যাচ্ছিল? তার অদৃষ্টে যা হবার তা যখন হয়েছেই তখন এই সুযোগ ছেলেকে কেন বড় ক'রে তুলবেনা সরযূ, পরের পয়সায় তাকে মানুষ ক'রে তুলবার সুযোগ কেন আর সে হাতছাড়া করবে?

তারপর বিনা বাধায় বিনা আপত্তিতে সরযূ যখন তার সমস্ত আদর সোহাগ গ্রহণ করল। তখন শশাঙ্ক নিজেই বিস্মিত না হয়ে পারলনা। এত অল্পতেই যে পোষ মানবে সরযূ তা সে আশা বরং আশঙ্কা করেনি, আর এই নিতান্ত সাধারণ রূপহীনা গতপ্রায় যৌবনা সরযূর মত মেয়ে যদি পোষ মানল, যদি শশাঙ্কের এই সব অবৈধ আদর বৈধ বলেই মেনে নিল তা হ'লে আর রস রইল কোথায়। ঝাঁঝের মধ্যেই তো মদ আর মেয়ে মানুষের যত মাধুর্য।

যাকে দিদি বলে ডাকতে হোত গুরুজন বলে সমীহ ক'রে চলতে হোত, এমন কি সময় বিশেষে পা ছুঁয়ে প্রণাম পর্যন্ত করতে হোত মুখের ওপর তাকে নাম ধরে ডাকতে পারার মধ্যেই একটা নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতার স্বাদ আছে।

সরযূ দু' একদিন মৃদু আপত্তি করে বলেছিল, ছিঃ অমন ক'রে নাম ধরে ডেকোনা, বড় লজ্জা করে আমার, বরং কানাইয়ের মা ব'লে ডেকো।'

শশাঙ্ক জবাব দিয়েছিল, 'সে কানাইয়ের বাবা হ'লে ডাকত।'

আরো কয়েকদিন বাদে সরযূ আবার বলল, 'আচ্ছা নাম ধ'রে ডাকতে চাও ডাক কিন্তু তাই ব'লে কি অত বড় ছেলের সামনেও ডাকবে? শত হ'লে চক্ষুলজ্জা বলেও তো কিছু আছে মানুষের? ন' দশ বছরের ছেলে। ও কি বোঝে কি?'

ফলে শশাঙ্ক নতুন খেলার সন্ধান পেয়ে গেল, সরযূর যাতে লজ্জা শশাঙ্কের তাতেই

আনন্দ। কানাইয়ের কাছে সরযূকে তো সে নাম ধ'রে ডাকেই, মাঝে মাঝে অনুরাগের এমন বাহ্য প্রকাশ করে যে রাগে আর ঈর্ষায় ন' বছরের ছেলে কানাইয়ের চোখ জ্বলতে থাকে আর অসহায় অপমানে আর লজ্জায় আধাবয়সী সরযূর ফ্যাকাসে মুখ রক্তে যেন ফেটে পড়তে চায়,-ভারি অপূর্ব দেখতে সে জিনিস, ভারি মজার।

থিয়েটারে পার্ট করে শশাঙ্ক, মাঝে মাঝে সিনেমাতেও নামে, অভিনয়ে তার নাম আছে, আর শুধু যশ নয় টাকাও সে পকেট ভ'রে আনে।

একদিন তার মনে প্রশ্ন এলো এত টাকা দিয়ে করে কি সরযূ, দামী কাপড় চোপড় গহনা পত্র কিছুতেই সরযূকে পরানো যায়নি, যদি বা শশাঙ্কের জোর জবরদস্তিতে পরেছে কোনদিন তার পরমুহূর্তেই আবার ছেড়ে ফেলেছে। কোনদিন নিজের জন্য কোন জিনিস তাকে আনতে বলেনা সরযূ, নিজে হাতে ক'রে যে কেনে তাও নয়। যমুনা, মালতী যুঁইফুল, তমাললতা সবারই এই বেশবাসের দিকে ঝোঁকে ছিল; ব্যতিক্রম কেবল সরযূ।

তারপর একটু সতর্ক হয়ে লক্ষ্য ক'রতেই অবশ্য টাকার খোঁজ মিলল। ছেলের জন্য দামী দামী রকম বেরকমের জামা কাপড় জুতো—পাঠ্য বই কয়েক খানা-ছাড়া ও চমৎকার ছবিওয়ালা সব বই, বাঁধানো মোটা মোটা খাতা, দামী কাঁচের দোয়াতদানি, কলম, রঙীন পেনসিল আর রকমারী সব খেলনায় সরযূর ঘর একেবারে ভ'রে গেছে; খোঁজ নিয়ে জানা গেল সরযূর তত্ত্বাবধানে কানাইয়ের নামে পাড়ারই-ব্যাঙ্কে একটা এ্যাকাউণ্ট পর্যন্ত আছে।

শশাঙ্ক মনে মনে হাসল। তাহ'লে সরযূকে সে যত বোকা ভেবেছিল তা তো সে নয়। শিখিয়ে পড়িয়ে ছেলেকে দিব্যি মানুষ ক'রে তুলছে, কানাই তার একমাত্র আনন্দ; ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা, তারপর একদিন হয়তো এই কানাইকেই সে লেলিয়ে দেবে শশাঙ্কের ওপর, তার সমস্ত অপমানের শোধ তুলবে।

এরপর শশাঙ্ক বেশ একটু সতর্ক হয়ে চলতে চেষ্টা করল। টাকা পয়সা আর তেমন ক'রে দেয় না। সামান্য কারণে কানাইয়ের কান ম'লে দেয়, গাল টেনে ধরে। এ যেন দুই নখের মধ্যে টিপে ছার-পোকা মারার আনন্দ।

একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে শশাঙ্ক পার্টের রিহার্সাল দিচ্ছে হঠাৎ জানালা দিয়ে তার চোখ পড়তেই দেখল কানাই বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'বিকৃত মুখভঙ্গিতে তাকে ভেংচাচ্ছে—দেখেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল শশাঙ্কের।

'তবেরে বাঁদরের বাচ্চা!' ব'লে শশাঙ্ক রুদ্রমূর্তিতে ঘর থেকে এক লাফে বেরিয়ে এল, পড়ি কি মরি ক'রে কানাইও দিল ছুট। শশাঙ্ক ছুটল তার পিছনে। ধরা পড়বার ভয়ে কানাই দু' তিনটা সিঁড়ি এক লাফে ডিঙাতে চেষ্টা করতেই কি ক'রে তার পা ফসকে গেল এবং গোটা বিশেক সিঁড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে একবারে মাটিতে এসে পড়ল।

গেছে গেছে ক'রে সরযূ এল ছুটে, ততক্ষণে কানাই সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে আর ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে মাথা থেকে !

এ্যাম্বুলেন্স্ এল, কানাই গেল মেডিক্যাল কলেজে। ডাক্তারদের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল অবস্থা গুরুতর। এরপর সরযূর মুখের দিকে তাকাবার আর সাহস হোল না শশাঙ্কের।

দিন দুই পরে কানাইয়ের জ্ঞান ফিরল, সরযূ আর শশাঙ্ক দু'জনেই উৎকণ্ঠিত মুখে বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

অস্ফুটস্বরে কানাই ডাকল, 'মা !'

সরযূ ঝুঁকে পড়ে বলল, 'এই যে বাবা।'

কানাই বলল, 'বাবা কোথায়।'

শশাঙ্ক এগিয়ে এসে কানাইয়ের বিছানার পাশে বসল, তারপর তার ছোট রোগজীর্ণ হাতখানি নিজের মুঠির ভিতর নিয়ে বলল, 'কেন বাবা, এই যে আমি।'

সঙ্গে সঙ্গে তার শিরা উপশিরার ভিতর দিয়ে যেন একটা অভূতপূর্ব চমক খেলে গেল।

অপাঙ্গে একবার তাকাল শশাঙ্ক সরযূর দিকে,-তার জলভরা চোখে লজ্জার এক অপূর্ব রঙ লেগেছে। কানাই বলল, 'আমি বাড়ী যাব।'

শশাঙ্ক বলল, 'যাবেই তো, কালই তো তোমকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।'

কানাই একটু ভীত দৃষ্টিতে শশাঙ্কের দিকে তাকাল, আর মারবে না তো ?'

শশাঙ্ক কানাইয়ের দুর্বল ছোট মুঠিটুকু হাতের মধ্যে চেপে ধরে সস্নেহ হাস্যে বলল, 'দুষ্ট ছেলে ! মারব কেন ?'

তারপর শশাঙ্ক আর কানাইয়ের অন্তরঙ্গতা দিনের পর দিন এমন গভীর হ'তে লাগল যে সরযূ অবাক হয়ে গেল। কিছুদিন আগেও যে এরা পরস্পরকে অত্যন্ত বিদ্বেষের চোখে দেখত তা এখন কে বিশ্বাস করবে। শশাঙ্ক যেন নতুন জন্ম নিয়েছে। যতক্ষণ বাড়ী থাকে কানাইকে এক মুহূর্ত্ত চোখের আড়াল করে না। খাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে খেতে বসে, শোয়ার সময় পাশে নিয়ে গল্প করে। বেশির ভাগ সময় শশাঙ্কের আজকাল কানাইকে নিয়েই কাটে। সকালে বিকালে পড়তে বসায়। কোন দিন বা নিয়ে যায় সিনেমায়, কোন দিন বা খেলার মাঠে। যেদিন বেরুতে পারে না সেদিন ব'সে ব'সে ছেলেমানুষের মত কানাইয়ের সঙ্গে ক্যারামবোর্ড খেলে।

সরযূ একদিন বলল, 'তোমার হয়েছে কি, আদর দিয়ে দিয়ে যে ছেলেটার মাথা খাচ্ছ।'

শশাঙ্ক পরম বিজ্ঞের মত বলল, 'ওটা তোমার ভুল, আদর যত্নে ছেলেরা ভালোই হয়।' তারপর একটু হেসে বলল, 'বিগড়োয় কেবল মেয়েরা।'

সরযূ বলল, 'আহা।'

সেদিন কানাইকে নিয়ে শশাঙ্ক সিনেমা দেখতে যাবে। বইখানায় শশাঙ্কেরও ভূমিকা আছে। এর আগে সরযূ কোনদিন শশাঙ্কের সঙ্গে সিনেমায় যায়নি, কোথাও বেড়াতেও বের হয় নি। শশাঙ্কের বহু অনুরোধ উপরোধ তিরস্কার ভৎর্সনাতেও নয়। কোন বড় রকমের বাধা শশাঙ্ককে দেওয়ার শক্তি তো নেই, তবু যে কোন উপায়ে ছোটখাট ইচ্ছার বিরোধিতা ক'রে সরযূ অপূর্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে।

কিন্তু আজ যখন কানাইকে নিয়ে শশাঙ্ক বেরুবার আয়োজন করেছে সরযূ নিজেই এসে ছদ্ম অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, 'বলি যাওয়া হচ্ছে কোথায়? সব সলা পরামর্শ কেবল ছেলের সঙ্গে! কানু ছাড়া এ বাড়ীতে আর কেউ থাকেনা বুঝি।'

এই অভিমানের অভিনয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটু বেদনার আভাস ছিল, এমন কি কানাইয়েরও কানেও তা ধরা পড়ল। কানাই একবার মার দিকে চেয়ে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করল, তারপর শশাঙ্ককে বলল, 'মাকেও নিয়ে চল বাবা।' বলেই কানাই তাড়াতাড়ি লজ্জায় মুখ ফিরাল। চুক্তিভঙ্গের লজ্জাজনক সম্বোধনটা শশাঙ্ক আর কানাইয়ের মধ্যে একটি গোপন রত্নের মত ছিল। সেই গোপনতার মধ্যে কত কৌতুক, কত রহস্য।

শশাঙ্ক এক মুহূর্ত সেই লজ্জিত কিশোর কোমল মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লজ্জার বিচিত্র প্রকাশ শশাঙ্ক কত প্রণয়িণীর আনত চোখে আর আরক্ত কপোলে নির্ণিমেষে চেয়ে চেয়ে দেখেছে, কিন্তু তা কি এত মধুর, এত নয়নাভিরাম?

কানাইকে শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে তার অপ্রতিভ মুখখানি নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে সরযূর দিকে চেয়ে সকৌতুক হাস্যে বলল, 'আমাদের কানাই মহারাজের যখন আদেশ তখন তো তার মাকে নিতেই হয় সঙ্গে, কি বলো?'

কিন্তু সরযূর চোখে কৌতুকও নেই, আনন্দও নেই, তার দুই চোখে আবার সেই প্রথম দিনের ঘৃণা আর বিদ্বেষ জ্বল জ্বল করে উঠেছে।

খানিকক্ষণ চুপ কোরে থেকে শশাঙ্কের দিকে তাকিয়ে নীরস রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'হুঁ, এই সবই বুঝি আজকাল শেখান হচ্ছে ছেলেকে? তারপর কানাইয়ের দিকে ফিরে বলল, 'কানাই সিনেমায় তোমার আজ যাওয়া হবে না।'

কানাই মুখ তুলে মার দিকে তাকাল, 'বাঃরে, বললেই হোল যাওয়া হবে না। তোমার কথাতেই হবে বুঝি?'

সরযূ ক্রুদ্ধ জলন্ত দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'না তা আর হবে কেন? হতভাগা কোথাকার, এখন থেকে তোমার কথাতেই সব হবে।' বলে সরযূ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শশাঙ্ক সস্নেহ ধমকে বলল, 'ছিঃ, মার সঙ্গে এমন করে কথা বলে বুঝি? মা হোল সকলের চেয়ে গুরুজন জানো না।'

যেতে যেতে কথাটা কানে যাওয়ায় অতি দুঃখেও হাসি পেল সরযূর। ভণ্ডের মুখে

মহাভারত। মায়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে না করবে তাও সরযূর ছেলেকে আজ শশাঙ্কের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে।

সরযূ সেই যে গিয়ে ঘরে খিল দিয়েছে অনেক সাধ্যসাধনায়ও শশাঙ্ক তা খুলতে পারল না। এদিকে কানাই নাছোড়বান্দা। সে যাবেই, রাগে আর অভিমানে বারবার তার দুটি কোমল সুন্দর ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে।

শশাঙ্ক অবশেষে বলল, 'আচ্ছা চল।'

বুক ফেটে সরযূর কান্না এল। বহুদিন পরে আজ আবার তার স্বামীর কথা মনে পড়েছে! অকৃতজ্ঞ ছেলের নির্লজ্জতার লজ্জায়, ধিক্কারে সরযূর ম'রে যেতে ইচ্ছা করল। জাগল একে একে সমস্ত কথা, সমস্ত ইতিহাস তার মনে; দিনের পর দিন কি অত্যাচার, কি লাঞ্ছনা আর অপমানই না শশাঙ্কের কাছ থেকে দু'হাত ভরে গ্রহণ করেছে সরযূ। একমাত্র ঐ ছেলের দিকে চেয়ে। সে বড় হলে আর কোন দুঃখ থাকবে না সরযূর। জীবনের যত গ্লানি যত লজ্জা সব কানাইয়ের ভক্তি আর ভালোবাসার অজস্র ধারায় নির্মল হয়ে যাবে। আর কেউ না বুঝুক বড় হ'লে কানাই তো বুঝবে সরযূর এই আত্মত্যাগের মূল্য। সে নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারবে কেবল তার জন্যই সরযূ দিনের পর দিন এই অপমানের দুঃসহ জীবনের ভার বয়ে চলেছে। কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়েই মরতে সরযূর মন যায় নি।

কিন্তু আজ যেন নতুন দৃষ্টি খুলে গেল সরযূর। জলভরা চোখের সামনে ভবিষ্যতের যে মূর্তি ফুটে উঠল তাতে আঁৎকে উঠল সরযূ। এই তো কেবল সুরু। এরপর একটু বড় হ'লে কানাই মুখের ওপরই তাকে অপমান করা আরম্ভ করবে। আচারে আচরণে চোখের দৃষ্টিতে মুখের ভাষায় মায়ের ওপর তার ঘৃণা আর অবজ্ঞা ঝ'রে ঝ'রে পড়বে। ছি ছি ছি, এমন ভুল কি ক'রে করল সরযূ। কেন তখনই বেরিয়ে গেলনা ছেলের হাত ধ'রে। কেন আত্মহত্যা ক'রে মরল না। এত মোহ, এত ভালবাসা এই ছার জীবনের ওপর!

সরযূর দু চোখ আবার জলে ভ'রে উঠল। ধিক্কারে অনুশোচনায় নিজেকে সে যেন নিশ্চিহ্ন করতে পারলে বাঁচে। এই বছর কয়েকের মধ্যেই ম্লান হয়ে আসা স্বামীর মুখ মনে আনতে চেষ্টা করল, সুখময় যেখানে যে-লোকেই থাক তার কাছে তো গোপন নেই তাদের ছেলেকে অনাহার থেকে বাঁচাতে গিয়েই সরযূর আজ এই দশা।

শশাঙ্কের বহু অনুরোধ উপরোধে হাতে দু গাছ করে চুড়ি আর সোনার সরু এক গাছা হার ব্যবহার করা আরম্ভ ক'রেছিল সরযূ। আজ তা খুলে ফেলল, তারপর তার চোখে পড়ল বেশ খানিকটা চওড়া লালপেড়ে শাড়ী তার পরণে। লজ্জায় ঘৃণায় সরযূর মনে হ'তে লাগল পাড়টাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। শশাঙ্ক কিছুতেই সাদা থান পরতে দেবে না। তাই চুল পাড় থেকে ইঞ্চি পাড়, ইঞ্চি পাড় থেকে একরঙা চওড়া লাল কি কালো পেড়ে শাড়ী সরযূকে বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই অন্ত-

সব দামী নক্সা পাড় শাড়ী শশাঙ্ক সরযূকে পরাতে পারে নি। ওইটুকু কৃচ্ছ্রতা, ওইটুকু অবাধ্যতা দিয়ে সরযূ নিজের কাজের ন্যায় এবং নীতির খানিকটা মর্যাদা রাখতে চেষ্টা ক'রেছে। কিন্তু আজ এই লালপাড়টুকু সরযূর কাছে নিজের সমস্ত পরাজয়, সমস্ত অপমানের প্রতিভূ হয়ে দেখা দিয়েছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ল যে, দুখানি সাদা থান সে আসবার সময় নিয়ে এসেছিল তা এখনো আলমারীর এক কোণায় শশাঙ্কের দেওয়া অব্যবহৃত অসংখ্য বিলাস উপকরণের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে আছে। সরযূর মনে হোল একমাত্র সেই শুভ্র শুচিবাসে তার সমস্ত জ্বালা, সমস্ত লাঞ্ছনা ঢাকা পড়বে।

সরযূ আঁচলের চাবির গোছা থেকে চাবি বের ক'রে শশাঙ্কের দামী কাঁচের আলমারী খুলে ফেলল।

তাক ভ'রে রঙ বেরঙের শাড়ী আর সেমিজ ব্লাউস আর পেটিকোট। এক মুহূর্তে সেই রঙীন বৈচিত্র্যের দিকে সরযূ মুগ্ধ বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল, এত রঙ পৃথিবীতে, আর রঙে এত আনন্দ, এতদিন সরযূ কি চোখ বুজেছিল। ধীরে ধীরে এক একটি ড্রয়ার খুলে ফেলল সরযূ। কোনটিতে অলঙ্কার, কোনটিতে প্রসাধনের নানা মূল্যবান সামগ্রী, এ পর্যন্ত কিছুই সরযূ স্পর্শ করেনি। আজ প্রতিটি জিনিস বার বার ক'রে সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগল, সব তার, সব কেবল সরযূর জন্য,—সব, সমস্ত পৃথিবী।

সিনেমা থেকে কানাইকে নিয়ে ফিরে এল শশাঙ্ক। উল্লাসে আর আনন্দে কানাই যেন ফেটে পড়ছে!

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'তা হলে সত্যিই তোর খুব ভালো লেগেছে কানু?'

কানাই সোৎসাহে বলল, 'চমৎকার, আর সাহেবের বেশে এমন মানিয়েছিল তোমাকে, তারপর তুমি যখন বন্দুক নিয়ে একা একা অমন অন্ধকার বনের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলে আর গুণ্ডাটা লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার পিছু নিল আমি তো ভয়েই অস্থির। এমন বোকা তুমি। গুণ্ডাটাকে তুমি কেন আগেই দেখতে পেলে না আমি তাই ভাবি।'

শশাঙ্ক সস্নেহে কানাইয়ের কাঁধে হাত রেখে মৃদু হাসল। এমন তৃপ্তি এত আনন্দ শশাঙ্ক যেন আর কখনো জীবনে পায়নি। কত গুণমুগ্ধ ভক্তের কাছ থেকে কত অভিনন্দন কত প্রশংসা এসেছে, পাশে বসে কত নারী তাদের অপরূপ বিচিত্র ভঙ্গীতে শশাঙ্কের অভিনয় নৈপুণ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছে, কিন্তু কারো কণ্ঠেই কি এত আন্তরিকতা ছিল, এত মাধুর্য? এর আগে কি কারো দুটি আনন্দোজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের অমরত্ব সম্বন্ধে শশাঙ্ক এমন নিঃসংশয় হতে পেরেছে?

গভীর স্নেহে কানাইকে কোলের মধ্যে টেনে নিল শশাঙ্ক, মধুর বাৎসল্যে তার অন্তর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

হঠাৎ কানাই চমকে উঠে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'মা।'

শশাঙ্কও মুখ তুলে দেখলে সামনে সরযূ।

কিন্তু একি বেশ তার, সেই পরিচিত অনাড়ম্বর সজ্জা কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শাড়ীর জমকালো রঙে, অলঙ্কারের প্রাচুর্যে, প্রসাধনের অপটু আতিশয্যে সরযূকে আর চিনবার জো নেই।

শশাঙ্ক আর কানাই দুজনেই বিহ্বল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সরযূ একটু মুচকি হাসল, 'সিনেমা দেখা হয়ে গেল তোমাদের?'

শশাঙ্ক বলল, 'হুঁ।'

'তুই কেমন দেখলিরে কানাই?'

কানাই কোন জবাব দিল না, নির্বাক বিস্ময়ে এবং খানিকটা কৌতুক ও কৌতূহলের চোখে সে মাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। ছেলের চোখকে অবজ্ঞা করে সরযূ শশাঙ্কের দিকে তাকাল, তারপর প্রগলভ তরল কণ্ঠে বলল, 'কি মুখে যে একেবারে রা নেই। খুব খারাপ লাগছে নাকি দেখতে?'

শশাঙ্ক ইঙ্গিতে একবার কানাইকে দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ ওর উপস্থিতিতে এসব প্রসঙ্গ আলোচ্য নয়।

কিন্তু সরযূর কোন দিকে কোন খেয়াল নেই, সে যেন নতুন স্বাদ পেয়েছে জীবনে, নতুন নেশা।

সরযূ তেমনি তরল স্বরে বলল, 'বাঃরে, এতদিন পরে তোমার পছন্দ মত করে সাজলুম, একবার মুখ ফুটে বলবেও না কেমন লাগছে।'

শশাঙ্ক বিব্রত এবং বিমূঢ় ভাবে সরযূর দিকে তাকাল। হঠাৎ কি হয়েছে সরযূর? টনিকের বদলে ভুল করে অন্য কিছু খেয়ে বসেনি তো? কিন্তু ভুল করবার মেয়ে তো সরযূ নয়, যদি করে থাকে ইচ্ছা করেই করেছে, কিন্তু কেন হঠাৎ এমন দুর্মতি হল সরযূর?

সরযূ এবার এগিয়ে এসে শশাঙ্কের হাত ধরে আস্তে একটু নাড়া দিল, 'বলো না গো, না হলে আমি সব কিন্তু আবার ছেড়েছুড়ে ফেলব।'

শশাঙ্ক এবার কানাইয়ের দিকে তাকাল, 'যাও তো কানাই, ওঘরে গিয়ে ছবির এ্যালবামটা দেখতো ততক্ষণ, আমি এখুনি আসছি।'

সরযূ খিল খিল করে হেসে উঠল, 'ওমা, তাই বল, কানুকে দেখে তোমার এত লজ্জা, আহা-হা, ও যেন আর জানেই না কিছু। মিটমিটে শয়তান।'

স্বখাস্থান

ভোরেও ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হয়েই থাকে। কোন দিকে কোন ফাঁক নেই আলো আসবার। একটি মাত্র জানালা আছে পশ্চিমের দিকে কিন্তু সেটিও খুলবার জো নেই। জানালার ওপারেই সেই বাবরিকাটা মুসলমান ছোকরাটির বিড়ির দোকান। মাঝখানে মাত্র দেড়হাত গলি। ইচ্ছা করলে একটু এগিয়ে এসে শিকের ফাঁক দিয়ে সে উমার আঁচলও টেনে ধরতে পারে। ইচ্ছা যে ওর করে না তা নয়, কিন্তু অতখানি সাহস আজও হয়নি। তবে হতে কতক্ষণ। স্পর্ধা ওর দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। জানালা একটু খোলা পেলেই উমার দিকে তাকিয়ে সে হাসে, চোখের ইসারায় অনুরাগ জানায়, আজকাল শিস্ দিয়ে গানও আরম্ভ করেছে, 'চোখে চোখ রাখি হায়রে।'

বউদি সুলতা আধো সুরে বাকি কলিটুকু গেয়ে দেয়, 'তবু তারে ধরা যায় না।' 'আহাহা, বেচারার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে—ধরা তাকে একটুখানি দাও না ঠাকুরঝি।'

উমা বলে, 'মর তুমি। এত দয়া থাকে তুমি ধরা দিলেই পার।'

সুলতা বলে, 'আহাহা আমাকে তো আর চায় না। জানে কিনা যে আমার একজন আছে।'

উমা চুপ করে যায়। একজন তার নেই। বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই সে বিদায় নিয়েছে।

সুলতা বুঝতে পারে, কথাটি ভালো হয়নি। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে অত হিসাব ক'রে ক'রে কি আর কথা বলা যায়, না বলতে ভালো লাগে।

তবু সুলতা কথাটা আবার ঘুরিয়ে নেয়, 'তাছাড়া আমি ধরা দিলে তোমার দাদার দশাটি কি হবে তা ভাব দেখি।'

উমা বিরক্ত হয়ে বলে, 'থাক বউদি, ওসব ইতর রসিকতা আমার ভালো লাগে না। দাদাকে বলো না বাড়িটা বদলাতে। মাগো, এমন পাড়ায় ভদ্রলোক থাকে। আর এখানে এসেছি তো ছ'মাস হয়ে গেল, এর মধ্যে অন্য কোন জায়গা পাওয়া গেল না শহরে?'

সুলতাও বিরক্ত হয়, 'পাওয়া গেলে কি আর সাধ করে এখানে কেউ থাকে ঠাকুরঝি! ভালো বাড়িতে থাকবার ইচ্ছা সকলেরই করে। কিন্তু দেখছ তো চোখে, মরবারও কি সময় আছে মানুষটার!'

উমা চুপ করে থাকে, দাদার সম্বন্ধে কিছু বললেই বউদি ভয়ঙ্কর বিরক্ত। দাদার ওপর অভিমান করবারও যেন কোন অধিকার নেই উমার। তাকে ভালোও বলবে বউদি, মন্দও বলবে বউদি—কেবল উমাই কিছু বলতে পারবে না, সংসারে কেবল উমারই সব কথা একেবারে অবান্তর।

বেলা নটায় টিউসনি শেষ ক'রে ঘরে ফিরল প্রফুল্ল। এই একটি ঘণ্টার মধ্যে নেয়ে খেয়ে দশ মিনিট পথ উল্টো হেঁটে ট্রাম ডিপোতে পৌঁছে সেখান থেকে অফিসের ট্রাম ধরতে হবে। কেন না মাঝপথ থেকে ট্রামে ওঠা এক মল্লযুদ্ধের ব্যাপার। যুদ্ধে সব দিনই যে জয়ী হওয়া যাবে তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া এক সপ্তাহের মধ্যেই একদিন গেছে পকেট কাটা আর একদিনের হাতাহাতির ফলে নতুন কেনা জামার হাতটা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সুতরাং কিছু দিন থেকে প্রফুল্ল হাঁটতে সুরু করেছে। এতে খানিকটা হাঁটতে হয় বটে কিন্তু ভিতরে গিয়ে নির্বিবাদে ব'সে যাওয়া যায়।

প্রফুল্ল ঘরে ঢুকে জানালাটা খুলে দিতে দিতে স্ত্রীকে বলল, 'দিন দুপুরে কি ডাকাত পড়বে না কি ঘরে? এমন গরম আর অন্ধকারের মধ্যে দোর জানালা বন্ধ ক'রে কি দম আটকে মরবে?'

সুলতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'মরলে তো বাঁচতুম। কিন্তু তুমি ভেবেছ কি? অন্য কোথও ঘর দোর দেখবে না, এই হতচ্ছাড়া পাড়াতেই চিরটা কাল কাটিয়ে যাব।'

স্ত্রীর কথায় কোন জবাব না দিয়ে প্রফুল্ল বোনের দিকে তাকায়, 'আজও আবার বাঁদরামি করেছে না কি ছোঁড়াটা? কাল যে অত ক'রে ধমক দিলাম তাতেও আক্কেল হোলো না!'

উমা মনে মনে কেমন যেন একটু লজ্জা বোধ করে। কথাটা দাদা বউদির কাছে শুনলেই পারতেন, সরাসরি তাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন।

সুলতার আক্রোশ যায়নি, বলল, 'ধমক! ধমক দিতে তুমি জানো? ধমক দেওয়ার মত জোর আছে তোমার গলায়!'

'যতটুকু ছিল, তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেই তা গেছে।'

উমা বিব্রত হয়ে বলে, 'চান ক'রতে যাও দাদা, অফিসে কিন্তু আজ আবার লেট হয়ে যাবে।'

প্রফুল্ল বলে, 'ধুত্তোর অফিস। চল্ উমা, দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকি। চল্লিশ টাকার শহুরে জীবন আর নয়। দু'চার বিঘা যা জমি আছে চাষ আবাদ ক'রে খাব।'

উমা মনে মনে হাসে। অফিসে লেট হবার সম্ভাবনা দেখলেই এ কথা প্রফুল্ল প্রায়ই বলে। এখনো মাঝে মাঝে দেশের বাড়িতে ফিরে যেতে চায় প্রফুল্ল। এখনো এক মন তার গাঁয়ের জন্য কাঁদে, কিন্তু আর এক মন ফের এই গলিতে এসে বাসা বাঁধে।

অফিসে বেরোবার মুখে প্রফুল্ল উমাকে ভরসা দিয়ে যায়, 'তুই ভাবিসনে উমা। ছোঁড়াটা আবার যদি কোন অভদ্রতা করে আমি এবার নিশ্চয় পুলিশে খবর দেব।'

উমা ভাইপোকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে ঘাড় নাড়ে কথা বলে না।

প্রফুল্ল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দোকানে ব'সে হামিদ আবার শিস দিয়ে গান জুড়ে দেয়। জানলাটা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। তা যাক্ কিন্তু কান তো আর বন্ধ করতে পারবে না।

আশ্চর্য এতদিন ধ'রে এত চেষ্টা করছে হামিদ কিন্তু মেয়েটার মন মোটে টলে না। অবশ্য পয়সা ব্যয় করলে পাড়ায় মেয়ের অভাব নেই। ঐ বয়সী যথেষ্ট মেয়েই আছে। কিন্তু ঐ রকম মুখ, ঐ রকম চোখের দৃষ্টি যে আর কারোরই নেই। এমন রূপ এমন চেহারা থাকা সত্বেও এত বেরসিক কেন মেয়েটা? তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই ক্রুদ্ধ বিরক্ত মুখে সশব্দে জানালাটা বন্ধ ক'রে দেয়। ঐ মুখে কি বিরক্ত মানায়! মানায় ঐ চোখের অমন কড়া শাসনের ভঙ্গি। মোলায়েম ক'রে একটু হাসলে না জানি আরো কত সুন্দর দেখাতো মেয়েটিকে—ও নিজেও বোধ হয় সে কথা জানে না।

ছোট্ট আরশিটুকু সামনে নিয়ে হামিদ তার বাবরি চুলগুলি বার বার ক'রে আঁচড়ায়, বিড়ির পাতা কাটা কাঁচিটা দিয়ে কচি গোঁফের বাড়ন্ত রোমগুলি ছেঁটে ছেঁটে দেয়। দেখা যাক্ আরো দু-চারদিন। ভালোয় ভালোয় মেয়েটা যদি রাজী হয়ে যায় তো ভালো, না হ'লে একদিন জোর ক'রে খিল ভেঙে ঢুকবে গিয়ে ওর ঘরে। চেনে না তো হামিদকে!

হামিদের উৎপাতের ভয়ে পারতপক্ষে এ ঘরেই আসে না উমা। ভিতরের দিকের ঘরগুলির সামনে যে লম্বা একফালি বারান্দা আছে চিলতে চিলতে ক'রে বাড়িওয়ালা তা প্রত্যেক ভাড়াটেকে বাঁটোয়ারা ক'রে দিয়েছে। সেই দু' হাত আড়াই হাত জায়গায় তোলা উনুনে রান্না করতে হয়। উমাদের বারান্দা নেই। ঘরের সামনে সদর দরজার রাস্তা। ভুবনবাবু ঘরের ভাড়া নিয়মিত দিতে পারেন না। তার শাস্তি হিসাবে রান্নার জায়গার অর্ধাংশ প্রফুল্লদের দিতে হয়েছে। সকাল সন্ধ্যায় রান্নায় সময়টা উমার সেখানেই কাটে। কোলের কাঁদুনে ছেলেটাকে নিয়ে বউদির কষ্ট হয়, অফিসের ভাত তাড়াতাড়ি ক'রে দিতে পারে না। তাই উমাই প্রায় রোজ আসে রাঁধতে। মাছের রান্না শেষ ক'রে উনুন লেপে নিজের জন্য আবার আলাদা করে রেঁধে নিতে হয়।

শোয়ার জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা হয়নি। বাড়িওয়ালার বুড়ো মা ছোট ছোট নাতিনাতনীদের নিয়ে দোতলার কোণের ঘরটায় থাকে। রাত্রে সেইখানে গিয়ে বিছানা পাতে উমা। বুড়ী বলে, 'তোর কোন ভয় নেই মা! আমার পাশে নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমো। কেউ তোর চুলের ডগাটুকুও ছুঁতে পার'ব না।'

শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত তবু ঘুম আসতে চায় না উমার, বাড়িওয়ালা উঠে মাঝে মাঝে বাইরে যায়। আর তার চটি জুতার শব্দে বুকের মধ্যে অকারণে উমার টিপ টিপ করতে থাকে, বার বার ঘুম ভেঙে যায়। একেকবার মনে হয়, এর চেয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকাই ভালো ছিল। কিন্তু থাকবে কি ক'রে। সেখানে শাশুড়ী আর ভাসুর তাকে

দু'চোখে দেখতে পারলেন না। তাতে ক্ষতি ছিল না। দেবরটি দু'চোখ ভরে দেখতে চাইল, তাতেই হোলো বিপত্তি।

সুলতা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, 'ঠাকুরঝি তোমার কিন্তু ভাই একটু বাড়াবাড়িও আছে; দুপুর বেলায় তো নিজেদের ঘর এসে ঘুমোতে পার। ওর দিকে না তাকালেই হোলো; না শুনলেই ওর শিস দেওয়া গান।'

উমা চুপ করে থাকে, সুলতা তো জানে না কপাল যাদের পোড়া অত সহজে তারা ছাড়া পায় না। কেবল না শুনলে ও না তাকালেই হয় না, অন্যের তাকানো শুনানোর জবাবদিহিও দিতে হয়।

কিন্তু তবু সুলতা সেদিন জোর ক'রেই উমাকে ধ'রে নিয়ে এল,—'তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরঝি, সারাদিন তুমি এঘর ওঘর করতে পারবে না। থাকো আমার পাশে শুয়ে। কে তোমার কি করতে পারে আমি দেখি।' তার পর ঘরের জানালাটা খুলে দিল সুলতা। দিন রাত জানালা বন্ধ রাখতে রাখতে ভিতরটায় ভ্যাপসা গন্ধ হয়ে গেছে।

সুলতা ছেলে কোলে নিয়ে অঘোরে ঘুমোয় কিন্তু উমার ঘুম পায় না, সে যে এ ঘরে এসেছে কি ক'রে টের পেয়ে গেছে ছোঁড়াটা। শিস দিয়ে আবার গান ধরেছে। উমা উঠে জানালাটা বন্ধ করতে গেল। হামিদ বোধহয় এইই চেয়েছিল। উমা যেই জানালার ধারে এলো হামিদ এক বাক্স সাবান আর তরল আলতা উঁচু ক'রে তাকে তুলে দেখাল। হামিদ কিছুদিন ধরে জিনিসগুলি কিনে রেখেছিল। আলতা সাবানের লোভ কোন মেয়ে সম্বরণ করতে পারে না। কিন্তু উমা যখন তারপরেও সশব্দে আগের মতই জানালা বন্ধ ক'রে দিল, হামিদের মন হোলো - তার হৃৎপিণ্ডটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। এমন নিষ্ঠুর এই মেয়ে জাতটা? ওদের কেবল ওপরটাই নরম, ভিতরটা শক্ত পাথর ছাড়া কি কিছু নয়?

প্রফুল্ল বাড়ি এসে সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। আর তো চুপ ক'রে থাকা চলে না, বাড়ি এবার বদলাতেই হোলো। কিন্তু বদলাবার চেষ্টা কি আর সে করে না? ক'রলে হবে কি? কারোর মুখে এমন কথা শোনা যায় না যে অমুক জায়গায় আছে ঘর একখানা। কিন্তু বাড়ি বদলাতে পারুক আর না পারুক ছোঁড়াটাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার দরকার। দিনের পর দিন ও যে ক্রমেই প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও প্রফুল্ল খুব ভেবে দেখেছে। এই নিয়ে হৈ চৈ হাঙ্গামা ক'রে লাভ নেই। পাড়া ভ'রে গুণ্ডা আর বদমাসের আড্ডা। তাছাড়া এ বাড়ির লোকের প্রকৃতিও সে জানে। সাহস ক'রে কেউ হামিদের গায়ে হাত দেয় না। সামনে লোক দেখানো একটু ধমকটমক হয়তো দেবে কিন্তু আড়ালে গিয়ে মুচকি হাসবে আর বলবে, 'এক হাতে কি আর তালি বাজে মশাই!'

কিন্তু আজ আর প্রফুল্লর সহ্য হোলো না। হামিদের বিড়ির দোকানের সামনে

গিয়ে বলল, 'হারামজাদা বদমাস! তোমাকে আমি পুলিসে দেব—তবে ছাড়ব।'

হামিদ মনে মনে হাসল। রোজ দেখে দেখে লোকটিকে সে চিনেছে। সকাল বেলায় উর্ধশ্বাসে দৌড়ায়, সন্ধ্যায় গড়াতে গড়াতে আসে; কখনো কোন দিকে তাকায় না, সকালে থাকে না সময়, সন্ধ্যায় থাকে না সামর্থ্য।

হামিদ নিতান্ত নিরীহ ভঙ্গিতে বলল, 'মাথা গরম করেন কেন বাবু। আমি তো কেবল বিড়ি বাঁধি আর বেচি। পুলিস কেন আসবে এখানে। যদি আসে তো বিড়ির লোভেই আসবে। ভারি মিঠে কড়া বিড়ি আমার। আপনি তো কোনদিন খেয়ে দেখলেন না।'

কথাটা কেবল পরিহাস করেই যে হামিদ বলে তা নয়। মাঝে মাঝে ভারি সাধ যায় প্রফুল্লকে তার নিজের হাতে বাঁধা বিড়ি খাওয়াতে। শত হলেও প্রফুল্ল তো মেয়েটির দাদা।

'আচ্ছা, তোমার ছ্যাবলামি আমি বের করছি দাঁড়াও!' দাঁত কিড়মিড় করতে করতে প্রফুল্ল ফিরে আসে।

জানালায় দেখা না পেলেও পথে মাঝে মাঝে উমাকে হামিদ দেখতে পায়। তার দোকানের সামনে দিয়েই একটা বুড়ীর সঙ্গে উমা কোন কোন দিন নাইতে যায় গঙ্গায়। ফেরবার পথে তার সুন্দর ছোট কপালে শ্বেতচন্দনের ছাপ দেখে হামিদ মনে মনে ভাবে. মুসলমান বিড়িওয়ালা না হয়ে গঙ্গার ঘাটের ঠাকুর হয়ে জন্মালে আর কিছু না হোক ঐ কপালে নিজের হাতে সে চন্দনের তিলক তো পরিয়ে দিতে পারত।

হঠাৎ সেদিন তার চোখে পড়ল মেয়েটির পরনের কাপড়খানা শতছিন্ন। গিঁট ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। যে কাপড়খানা পুঁটলির মত হাতে করে নিচ্ছে সেখানারও একই দশা।

পরের কয়েকদিন মেয়েটিকে আর গঙ্গায় যেতে দেখা গেল না। হামিদ সব বুঝতে পারল। কাপড় নেই শহরে একথা অনেককেই বলাবলি করতে শুনেছে কিন্তু আজ এই প্রথম যেন সে স্বচক্ষে তা দেখতে পেল। না থাকবার বেদনাটা এই প্রথম বিঁধল হৃদয়ে। ছিছি, কেন মিছামিছি আলতা আর সাবান সে কিনেছিল। কাপড়ের কথাটা কেন তার মনে হয়নি, কেন চোখে পড়েনি।

পরদিন কি একটা কাজে জানলার কাছে আসতেই উমা আর সুলতার চোখে পড়ল, হামিদ একখানা লাল ডুরে শাড়ি তাদের উঁচু করে তুলে দেখাচ্ছে আর মিষ্টি মিষ্টি হাসছে।

সুলতা বলল, 'আহাহা, দিচ্ছে যখন হাত পেতে নাওই না ঠাকুরঝি।'

উমা কঠিন ভঙ্গিতে বলল, 'বউদি ইতরতার কি সীমা নেই তোমার?' তারপর উমা জানালাটা ফের বন্ধ ক'রে দিল।

বাসায় এসে খবরটা শুনে প্রফুল্ল কিন্তু আজ আর তেমন চটল না, বলল, 'বোধ হয় চোরাবাজার থেকে কিনেছে, এখন চড়া দামে বিক্রি করতে চায়। আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি খোঁজ নিয়ে। যদি ধরা যায়, মন্দ কি।'

শাড়িখানি নিজের হাতে উমাকে পৌঁছে দিতে পারলেই সব চেয়ে আনন্দ হোতো হামিদের, কিন্তু তেমন সুবিধা তো শিগগির হবে না, মেয়েটা তাকে দেখলেই পালায়। দেওয়া যাক ওর দাদার মারফতেই। বিনা পয়সায় দিতে পারলেই সব চেয়ে ভালো হোতো কিন্তু ইব্রাহিম সেখ ঐ শাড়িখানার জন্যে পুরোপুরি দশটা টাকা তার কাছ থেকে নিয়েছে। আজ বাদে কালকের হোটেল খরচটাও হামিদের কাছে আর নেই।

হামিদ বলল, 'দশ টাকা দিন বাবু, কেনা দামেই দিচ্ছি আপনাকে।'

মনে মনে ভাবল, বিনা দামে যদি দিতে পারতাম। প্রফুল্ল তবু দর করে, 'দশ টাকা! মাথায় বাড়ি দিতে চাস নাকি তুই, দেব একবার পুলিসে খবর!' অগত্যা ন'টাকায় রফা করতে হয়। বেচতে তাকে যে হবেই। লোকসানে না বেচলেই কি লোকসান সে ঠেকাতে পারবে!

কিন্তু পরদিন সবিস্ময়ে হামিদ দেখতে পেল, ডুরে শাড়িখানি উমা পরেনি। তার বউদিই সেখানা পরে ছেলে কোলে নিয়ে ঘর ভরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হামিদের মনে যে জ্বালা ধরল একশ টাকা লোকসানে তা হয় না। তলে তলে তাহলে এই শয়তানিই ছিল ওদের মনে। আচ্ছা হামিদও দেখে নিচ্ছে। তার পর থেকে হাসিতে দৃষ্টিতে অশ্লীল সুরের গানে হামিদের প্রণয় নিবেদন স্পষ্টতর হোল, উচ্চতর হোল এবং অবিশ্রাম গতিতে চলতে লাগল। দোকানের সামনে দিয়ে ফের ওকে একবার যেতে দেখলে হয়, হাত ধ'রে উমাকে সে টেনে আনবে ভিতরে। দেখবে কে তার কি করতে পারে।

সুলতার বাপের বাসা বেনেটোলায়। ষষ্ঠী পূজার দিন সকালবেলায় সুলতার ভাই নিতাই এল সবাইকে নিতে। 'চল দিদি।'

'এখনই! বলিস কিরে, তোর জামাইবাবু অফিসে যাবে না? রেঁধে বেড়ে দিতে হবে না তাকে?'

উমা বলল, 'তাতে কি, তুমি যাও বউদি—আমি দেখব সব।'

নিতাই বলল, 'তাই বুঝি ভেবেছেন উমাদি। দেখবার জন্যে আপনাকে রেখে যাচ্ছি! চলুন চলুন চটপট তৈরী হয়ে নিন।'

সুলতা বলল, 'চল ঠাকুরঝি।'

প্রফুল্ল বলল, 'আমার জন্যে ভাবিসনে। একবেলা হোটেলে চালিয়ে নেব।'

নিতাই বলল, 'আহাহা কেন আবার মিছামিছি হোটেলে খরচ করতে যাবেন, ওবেলা তো নেমন্তন্নেই যাচ্ছেন।'

কিন্তু নিতাই কি পাগল হয়েছে? উমার কি জো আছে যাওয়ার?

নিতাই বলল, 'কেন—কি হয়েছে উমাদি।'

'হবে আবার কি। শরীর ভাল নেই ভাই।'

প্রফুল্লও একটু যেন অসন্তুষ্টভাবে বলল, 'কেন কি হয়েছে তোর শরীরে?'

তারপর উমার দিক তাকিয়ে কি যেন বুঝতে পেরে প্রফুল্ল বলল, 'যাওতো নিতাই, দুটো সিগারেট নিয়ে এসো তো সামনের দোকান থেকে, এই নাও পয়সা।'

নিতাই বেরিয়ে গেলে প্রফুল্ল বলল, 'তুই আমার ধোয়া কাপড়খানা পরে যা, চুল পেড়ে কাপড়ে তো দোষ নেই।'

উমা ম্লান একটু হাসল, 'আর তুমি? তুমি বুঝি ঐ পা-জামা প'রে যাবে জামাই ষষ্ঠীতে!'

উমা ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নার আয়োজন করতে বসল এবং কারো ডাকাকাকিতেই আর ফিরল না।

সুলতা মনে মনে লজ্জিত হোলো, ক্ষুব্ধ হোল। কিন্তু শরীর ভাল না থাকার অছিলায় সে তো আর না গিয়ে পারে না। কাপড় কি তারই আছে? আটপৌরের মধ্যে সেদিনের কেনা ঐ ডুরে শাড়িখানাই কেবল আস্ত। কিন্তু তা পরে তো আর বেরোন যায় না। বাপ মায়ে ভাববে, একবারেই ফকির হয়ে গেছে। বাক্স ঘেঁটে অবশেষে একখানা অত্যন্ত পুরোনো শাড়ি বেরোল। পরে যাওয়া যায়। কিন্তু অতি সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা প্রতিমুহূর্তে। সুলতার যাওয়ার খানিক পরেই খেয়ে দেয়ে প্রফুল্লও বেরিয়ে গেল অফিসে।

উমা চান ক'রে কেবল কাপড় বদলেছে—বাড়িওয়ালার মা বললেন, 'আহাহা নেয়ে উঠলি মা, পিণ্টুকে যদি নাইয়ে দিতিস একটু। ওর মা তো হাসপাতালে দিব্যি আছে, যত জালা হয়েছে আমার।'

অপ্রসন্নতা চেপে উমা বলল, 'তাতে কি মা, পাঠিয়ে দিন—আমিই দিচ্ছি ওকে নাইয়ে।' কিন্তু পাঁচ ছ'বছরের ছেলে হলে কি হবে পিণ্টু একেবারে বদমাইসের হাঁড়ি। ওর মাথায় এক ঘটি জল ঢালতে না ঢালতে ও সমস্ত বালতির জল দিল উমার গায়ে ছিটিয়ে। পিণ্টুকে নাওয়াতে গিয়ে উমা নিজেই আর একবার নেয়ে উঠল।

একখানা মাত্র কাপড় আছে শুকনো। বউদির সেই ডুরে শাড়িখানা। ঘরে এসে আলনা থেকে পেড়ে নিয়ে ভিজে কাপড় বদলে ফেলল উমা। কিন্তু এখানা প'রে সকলের সামনে গিয়ে খেতে বসতে লজ্জা করে। একটু দেরি করলেই আগের ভিজে কাপড়খানা শুকিয়ে যাবে।

সমস্ত ঘরটা অগোছালো। বাপের বাড়ি যাওয়ার আগে ছেলেকে সাজিয়েছে, নিজেকে সাজিয়েছে, কিন্তু ঘরটা একটু সেরে-তেরে রেখে যাওয়ার বউদির সময় হয়নি। কেন উমাই তো আছে। বলিহারি মানুষের আক্কেল! অপ্রসন্ন মুখে উমা ঘরটা ঝাঁট দিতে লাগল। তারপর সুলতার প্রসাধন পর্বের শেষে যা সামান্য আবর্জনা জমেছিল ঘরে,

সব জড়ো ক'রে জানলার একটা পাট খুলে দুটো শিকের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে সেগুলি ফেলে দিল রাস্তায়।

হামিদ যেন এতক্ষণ তাকে তাকে ছিল। উমার সাড়া পাওয়া মাত্রই বিড়ি বাঁধা বন্ধ রেখে দু'চোখ তুলে জানালার দিকে তাকাল। মুহূর্তকাল মুগ্ধভাবে তাকিয়েই রইল, তারপর প্রসন্নকণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে—চমৎকার মানিয়েছে এবার।'

উমা চমকে উঠে জানালা বন্ধ ক'রে সরে এল ওখান থেকে। লোকটা আরও কি ক'রে বসবে ঠিক কি। ভয়ে বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, হামিদ আজ আর শিস দিয়ে উঠল না, অশ্লীল স্বরে গানও ধরল না, চুপ করেই রইল। তবু উমার দুই কান ভরে একটি মৃদু কণ্ঠ বারবার ধ্বনিত হতে লাগল: চমৎকার মানিয়েছে।

পাথরের চোখ

বছর তিনেক বয়সের সময় কি একটা খারাপ জ্বরে ডান পা খানা বীণার শুকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সমস্ত পৃথিবীটা শুকিয়ে গেল এই উনিশ বছর বয়সে এসে যখন পৃথিবীতে এতলোক থাকতে তার সম্বন্ধ এলো কাণা সরোজ সেহানবিশের সঙ্গে—কোন চক্ষুষ্মানের চোখে সে পড়ল না। অথচ শুকনো পা'র ক্ষতি আর সব দিক দিয়েই পূরণ হয়েছে বীণার। চোখ মুখের গড়ন তার নিখুঁৎ, সুন্দর সুগঠিত নাক, পাতলা দুটি ঠোঁট—আর কোন অঙ্গেই কোন একটু ত্রুটি বিচ্যুতি ধরবার জো নেই। আর শুধু বহিরঙ্গই নয়, মনের দিক থেকেও সাধারণ নিম্নবৃত্ত ঘরের মেয়ের পক্ষে যা সম্ভব তার থেকে বেশীই বীণা নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এক পা না থাকায় স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বাড়িতেই ভাইবোনেদের বই পত্র নিয়ে নিজের গরজে লেখাপড়া শিখেছে, পাশের বাড়ির রেকর্ড শুনে শুনে শিখেছে গান, সেলাই আর ঘরকন্নার কাজে অল্প বয়সেই হাত পাকিয়েছে, তবু কোন সুস্থ সম্পূর্ণ মানুষের মনের মত সে হতে পারল না। তার চেয়ে বিদ্যায় বুদ্ধিতে, কাজকর্মে সব দিক থেকে হীন হয়েও পাড়ার লীলা, বেলা, সীতা, চিনু সবারই যোগ্য বরে বিয়ে হয়ে গেল, এমন কি নিজের ছোট বোন মীনার বিয়ে পর্যন্ত আটকালো না। পৃথিবী শুদ্ধ মানুষের অপছন্দের বস্তু হয়ে রইল কেবল বীণা—কেউ তাকে ভালবাসল না, কারোরই তাকে ভালো লাগল না।

অবশ্য ভালো যে কারোরই এক আধটু একেবারে লাগেনি তা নয়। কিন্তু সে ভালোলাগা দিয়ে কি করবে বীণা। কোন্ কাজে লাগাবে কৃপণ মানুষের এই হিসাব করা ভালোলাগাকে। এর চেয়ে ওদের ঘৃণা ছিল ভালো, অবজ্ঞা ছিল ভালো, কিন্তু এই হিসাবী ভালবাসা বীণা যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।

পাশের বাড়ির অতুল ডাক্তারের মেয়ে বেলাকে বিয়ে করেছে পরেশ। কলকাতায়

চাকরি করে। ছুটিছাটায় প্রায়ই আসে এই মফঃস্বল সহরের শ্বশুর বাড়ীতে। কিন্তু বিয়ের আগে যেমন থাকত তেমনি এখনও এখানে এলে বেশির ভাগ সময় কাটায় বীণাদের বাড়ীতে। বীণার সঙ্গে তার কথা বলতে, আলাপ করতে নাকি ভারি ভালো লাগে। পরেশ প্রায়ই বলে, 'এত মেয়ের সঙ্গে আলাপ হোল কিন্তু এমন চমৎকার কথা আর কারো মুখেই শুনলাম না।' বীণা অদ্ভুত একটু হাসে, 'চমৎকার কথা বলতে আপনিই বুঝি কম ওস্তাদ।'

বীণার কথার চমৎকারিত্ব পরেশ বিয়ের আগে থেকেই জানে তবু সে বিয়ে করেছে অতুল ডাক্তারের মেয়ে বেলাকে। কথা তার বীণার মত চমৎকার নয়, কিন্তু দু'খানা পা মেলে চমৎকার সে চলে। বলবার মত অমন চলবার শক্তিও যদি বীণার থাকত—তাহলে কি আর কোন ইতস্ততঃ করত পরেশ। কিন্তু খোঁড়া মেয়েকে ভালোবাসলেও বিয়ে করবার সময় একটু দ্বিধা আসে বইকি। পা থাকতেও তো এদেশের মেয়েরা খোঁড়া। সারাজীবন ঘাড়ে করে তাদের বয়ে বেড়াতে হয়, তারপর সাধ ক'রে আবার পা না-থাকা খোঁড়াকে জীবনসঙ্গিনী করা! সে কথা ভাবতেও ভয় হয়।

চিন্ময়ীর বর পরিতোষও বীণাকে কম ভালবাসে না। বউয়ের চিঠির মধ্যে দ্ব্যর্থ চৌরপঞ্চাশিকা এখনো সে মাঝে মাঝে বীণাকে পাঠিয়ে থাকে। অপরাধের মধ্যে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর দু'চারি লাইনে বন্ধুর বরকে বীণা দু' একখানা চিঠি দিয়েছে। তার বদলে দু'চার হাজার লাইনও কি পরিতোষ লেখেনি। কত মেয়ের কত রকমের হাত আর হাতের লেখা দেখেছে পরিতোষ কিন্তু বীণার মত এমন রসভরা হস্তাক্ষর আর কোথাও চোখে পড়েনি। অদ্ভুত ক্ষমতা বীণার। রস-সিন্ধুকে সে অক্ষয় অক্ষর-সিন্দুকে বন্দী ক'রে রেখেছে। এমন নিপুণ কথাশিল্পী সে। কিন্তু দুঃখ পরিতোষের এই কৃপণ বীণা কেবল দু'চার ছত্র চিঠি পত্রের মধ্যেই তার নৈপুণ্যকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখল, বন্যার মত সব কিছুকে ভাসিয়ে নিতে দিল না।

এখন পর্যন্ত অবিবাহিত আরো দু'একজন তাকে ভালোবাসে। কলেজের তরুণ অধ্যাপক তারক সোমের সঙ্গে তাদের দূর সম্পর্কের কি একটু আত্মীয়তা আছে। মাঝে মাঝে সেই সুবাদে তিনি আসেন। এসেই বীণার গান শুনতে চান। এমন কণ্ঠ তিনি আর কোথাও শোনেন নি। আর একটু চর্চা করলে বীণা রেকর্ডে রেডিয়োতে নিশ্চয় গান দিতে পারবে একথাও শোনান। তবু গান আজকাল বীণা তার সামনে কদাচিৎ গায়। কেননা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হরগোবিন্দ চাকলাদারের ছোট মেয়ে বি, এ, ক্লাসের ছাত্রী পরিমিতার সঙ্গে তারকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হ'তে যাচ্ছে। পরিমিতা অবশ্য গান গাইতে জানেনা, কিন্তু কলেজের মধ্যে সব চেয়ে বিদুষী মেয়ে। তার চমৎকার দুটি পা, সহরের মধ্যে হাই-হীল জুতো এমন আর কারো পায়ে মানায় না। সখ করে যে দিন আলতা পরে সেদিনও তাকে অপূর্ব দেখায়। ভাগ্যক্রমে বীণা জুতোও পরতে

পারে না, আলতাও পরতে পারে না, হাঁটু থেকে ডান পায়ের পাতা পর্যন্ত বেঁকে চুরে শুকিয়ে এমনি চামসে হয়ে গেছে।

কলেজের তরুণতর ছাত্রদের মধ্যে গুণগ্রাহী আরো একাধিক আছে। বীণাদের বাড়ীর সামনের লাল সুরকী-ছাওয়া রাস্তায় খাতাপত্র হাতে তারা যখন যাতায়াত করে, তখন জানালার শিকের ফাঁকে বীণার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার ইচ্ছা অনেকের মুখেই ফুটে উঠে। কেউ বা বোনকে পাঠায়, কেউ বা বউদিকে ; বীণার হাতের টেবিল ঢাকনি না হলে সাহিত্য সভার টেবিল ঢাকে না।

তবু বীণার সম্বন্ধ এলো সরোজ সেহানবিশের সঙ্গে, একটি চোখ যার নেই। কিন্তু তা ছাড়া আর সবই আছে। মা বাপ ভাই বোন আছে, সহরের দক্ষিণপ্রান্তে খোলা জায়গায় আছে পাকা একতলা বাড়ী, আদালতে আছে পাকা পেশকারি চাকৃরি, মাইনের তিন চারগুণ উপরি আছে—আর কি চায় বীণা, আর কি সে চাইতে পারে।

কিন্তু বীণা তবু মুখ ভার ক'রে বলল, 'আমার বিয়ের দরকার নেই মা।'

কথাটা মার মুখ থেকে যথারীতি গেল বাবার কানে। নীলরতনবাবু ধমকে উঠলেন, 'তা থাকবে কেন? চিরকাল এমন ইয়ার্কি ফাজলামী করেই দিন কাটাবি ভেবেছিস না?' কনকতারা ইঙ্গিতে স্বামীকে থামিয়ে দিলেন, 'আহাহা তুমি থামো, যা বলবার আমি বুঝিয়ে বলব। সোমত্ত মেয়ে অমন ক'রে বলতে লজ্জা করে না তোমার?'

মেয়েকে বললেন, 'অমন করছিস কেন মা। এমন ভাগ্য তো নিখুঁৎ সুন্দরী মেয়েরও হয় না। এমন ভদ্র শান্ত চরিত্রবান ছেলে। দোষের মধ্যে একটা চোখ কেবল নেই। মানুষের চোখছাড়া কি আর কিছু তোর চোখে পড়ল না।'

বীণা নতমুখে বলল, 'আর কিছু চাই না মা, শুধু দুটো চোখ যেন তার থাকে।' কনকতারা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, এর বছর খানেক আগে একজন বোবার সঙ্গে তার সম্বন্ধ এসেছিল। অন্যান্য দিক থেকে সেও ছিল সুপাত্র।

কিন্তু বীণার এক কথা, মানুষের মুখে কথা না শুনে কি ক'রে থাকবে।

আজ কথাওয়ালা ছেলে যখন মিলল তখন তার চোখে বেজেছে চক্ষুহীনতা। এখন খোঁড়া মেয়ের জন্য সর্বাঙ্গ সুন্দর পাত্র কোথায় মিলবে। তারপর অগাধ টাকা পয়সা থাকত, সে এক কথা।

নীলরতন শক্ত মানুষ। বীণার 'না' শুনলে তাঁর চলে না, এমন সম্বন্ধ হাত ছাড়া হ'লে মিলবে না। লোকে বলে মাথায় একটু ছিট আছে সরোজের। তেমন একটু ছিট থেকে ভালোই হয়েছে, না হ'লে কেবলমাত্র এক চোখ না থাকার জন্য এক পা না থাকা মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চায়। এমন সম্বন্ধ হাতছাড়া ক'রে কি শেষে পস্তাবেন নীলরতন। তা ছাড়া মেয়ের কেবল এক পা নেই তাই তো নয়, আরো অনেক কিছু তার আছে। আছে চমৎকার চোখ মুখ, চমৎকার কথাবার্তা বলবার কায়দা, তাতে দু'পাওয়ালা মানুষকে অনায়াসে কাছে টানতে পারে। কিন্তু বোকা, সংসার

সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞা মেয়ে, ওকি বুঝবে, মানুষকে শুধু কাছে টানতে পারলেই হয় না, তাকে ধ'রে রাখবার ক্ষমতাও থাকা চাই।

তাই কারো আপত্তিই টিকল না। শেষ পর্যন্ত সরোজের সঙ্গে বীণার বিয়ে হয়ে গেল। শুভদৃষ্টির সময় বীণা মোটেই বরের দিকে তাকাল না। কি হবে দেখে। বাঁ চোখ যে তার পাথরের এ তো সে জানেই। কিন্তু আশ্চর্য সরোজের মুখে কোন অপ্রসন্নতার ছাপ নেই। এমন কি বীণা যে তাকে পছন্দ করেনি সে কথা জেনেও তার মনে কোন বৈলক্ষণ্য এসেছে তা বোঝা গেলনা।

বাসরঘরে শালী শালাজ সম্পর্কীয়াদের পরিহাসের সে দিব্যি চটপট জবাব দিল। কিছুতেই তাকে অপ্রতিভ বা অপ্রসন্ন দেখাল না। বীণা মনে মনে একটু অবাক হোল।

বাসরের ভিড় ভাঙলে বীণা ভালো ক'রে স্বামীর চোখের দিকে তাকাল। বাঁ চোখটি তার পাথরের সত্যিই, সে চোখে পলক পড়ছে-না।

সরোজ তার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'কি দেখছ? আমার পাথরের চোখটা বুঝি?'

বীণা অপ্রতিভ হয়ে চোখ নামাল।

সরোজ বলল, 'শুনলুম একটা চোখ নেই ব'লে আমাকে তোমার পছন্দ হয় নি।'

বীণা কোন জবাব দিল না!

সরোজ বলল, 'অথচ একখানা পা নেই ব'লেই তোমাকে আমার এত পছন্দ হয়েছে যে তোমার অপছন্দকেও আমি গ্রাহ্য করিনি।'

একখানা পা না থাকার কথাটা এবং ব্যথাটা বীণার যেন নতুন ক'রে মনে পড়ল। নিজের খুঁতের কথা এতক্ষণ সে ভুলেই ছিল। কিন্তু সরোজের কথার ভঙ্গিতে তার ব্যথা ছাপিয়ে বিস্ময়ই বড় হয়ে উঠল। কৌতূহলী কণ্ঠে বীণা বলল, 'আমার খুঁতের জন্যই আমাকে পছন্দ ক'রেছ! তার মানে!'

সরোজ এবারো তেমনি অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল, 'মানে অত্যন্ত সোজা। এক চোখে দু'পাওয়ালা স্ত্রীকে কতদিন আর পাহারা দিয়ে রাখতে পারতাম।'

সরোজের হাসির ভঙ্গিতে বীণা যেন শিউরে উঠল। তারপর আহত চোখে আবার তাকাল স্বামীর মুখের দিকে।

সরোজ বলল, 'বারবার অমন ক'রে কি দেখছ বলতো, পাথরের চোখ দেখে দেখে আর সাধ মেটে না?'

বীণা ম্লান একটু হাসল, 'পাথরের চোখই দেখব কেন শুধু।'

'তবে আর কি?'

'তার ভিতর দিয়ে পাথরের হৃদয়ও তো চোখে পড়েছে।'

সরোজ একটু যেন থমকে গেল। তারপর একখানা হাত বাড়িয়ে বীণার হাতখানা মুঠোর ভিতর নিয়ে বলল, 'তা'হলে আর ভয় নই। এবার দু'ফোটা চোখের জল পড়লেই হৃদয়ের পাথর গলে পড়বে। এতো আর চোখের পাথর নয়।'

নতুন রাস্তাটির কোল ঘেঁষে খানিকটা ফাঁকা জায়গা বেরিয়েছে। দিনের বেলায় হিন্দুস্থানী কয়েকটি ঘুঁটেওয়ালী এখানটায় গোবর ছড়িয়ে যায় কিন্তু সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে সেই গোবরেই আবার পদ্মফুল ফুটতে সুরু করে। ফাঁকা জায়গাটুকুর পিছনে রূপ-জীবিনীদের একটি ছোট-মত পল্লী। সেজেগুজে একটির পর একটি তারাই এসে দাঁড়ায় এখানে। দূর থেকে শরতের এমনও একেক দিন মনে হয় দাবার ছকে যেন রঙ-বেরঙের ঘুঁটি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শরৎ যে রোজই দূর থেকে দেখে তা নয়, মাসে পাঁচ সাত দিন কাছেও আসে। তখন কোন মুখটিকেই আর ফুলের মত মনে হয় না। ঘুঁটীগুলির রঙের ঔজ্জ্বল্যও ম্লান হয়ে আসে, কিন্তু তাই ব'লে ফিরেও শরৎ চলে যেতে পারে না! অনেক দিনের অভ্যাস, এর মধ্যেই একটু বিচার-বাছাই ক'রে নেয়, কোন কোন মুখ একটু বা কচি পাওয়া যায়। টিকালো নাক, টানা টানা চোখও যে এক আধ দিন না জোটে তা নয়।

আজও শরৎ এমনি ভাবেই বাছাই ক'রে চলছিল। পছন্দ আর হয় না। তার নির্বাচনের ভঙ্গি দেখে মুখগুলি অবশ্য নীরব হয়ে নেই। শ্লেষ আর কটূক্তিতে শরতের কান দুটি ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।

'কাণ্ড দেখ মিন্‌সের, চোখ দিয়ে দেখছে তো না যেন চেটে নিচ্ছে!'

'হাতে আঙুল নেই তোদের? ঢুকিয়ে দিতে পারিসনে চোখের মধ্যে? জন্মের শোধ হয়ে যায় দেখা!'

কথাগুলি কানে ঠিক মধু বর্ষণ করে না কিন্তু চোখের তৃপ্তির জন্য কান না হয় খানিকটা কষ্ট স্বীকারই করল। একসঙ্গে সর্বেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি কি সকলের ভাগ্যে ঘটে?

একেবারে কোণের দিকে লাইট পোষ্টের গা ঘেঁসে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে এতক্ষণে শরতের তাকে চোখে পড়ল। বয়স আঠের উনিশের বেশি হবে না। মুখটি বেশ কচি কচিই মনে হচ্ছে। এবং সবচেয়ে আনন্দের কথা যে মুখে কোন জলন্ত বিড়ি দেখা যাচ্ছে না।

শরৎ খুব কাছে এগিয়ে আসতেই মেয়েটি হঠাৎ যেন চমকে গিয়ে একেবারে আঁৎকে উঠল, তারপর আবার ঠিক হয়ে দাঁড়াল।

মেয়েটির এমন আকস্মিক ভয় দেখে শরতেরও বিস্ময় কম হয় নি। একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে বলল, 'কি খুব চেনা চেনা লাগছিল বুঝি।'

রাধার বুকের ভিতরটা তখনও কাঁপছে। আস্তে আস্তে বলল, 'ও কিছু না। আসবেন ?'

রাধাকে শরতের পছন্দ হয়েছে। মুখখানি শুধু কচিই নয়, সুন্দরও। রূপ যাদের উপজীবিকা সৌন্দর্য তাদের মধ্যে কদাচিৎ মেলে। রাধাকে সেই ব্যতিক্রমের মধ্যেই ফেলতে হয়।

তিনটে টাকা শরতের কাছে একটু দুর্মূল্যই মনে হোল। কিন্তু এ মুখের জন্য একটা টাকা বেশী দেওয়া চলে। মেয়েটির পিছনে পিছনে শরৎ এগিয়ে গেল।

পুরণো দোতলা বাড়ী, কবুতরের খোপের মত ছোট ছোট পনের ষোলটি ঘর। এর অনেক ঘরেই শরৎ এসেছে। আঁচলের চাবি দিয়ে একতলায় সবচেয়ে দক্ষিণ দিকের যে ঘরটির তালা খুলছে রাধা, শরতের মনে পড়ল মাস কয়েক আগে এখানেও সে ঢুকেছিল। তখন অবশ্য যে মেয়েটির পিছনে সে দাঁড়িয়েছিল সে এর চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী এবং চতুর্গুণ মোটা। তার তুলনায় এতো অপ্সরী।

রাধা দোর খুলে নিজে আগে ঘরে ঢুকলো তারপর শরতের দিকে চেয়ে বলল, 'আসুন।' শরৎ ঘরে এলে হ্যারিকেনের আলোটা আর একটু উসকিয়ে দিল রাধা।

বাজে কাঠের পুরোণ একটা তক্তপোশ, তার ওপর পরিপাটি করে পাতা বিছানা।

সেদিকটায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'বসুন না।'

শরৎ বসবার সঙ্গে সঙ্গেই তক্তপোশটা কঁ্যাচ কঁ্যাচ করে উঠল।

শরৎ শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল, 'ভেঙে পড়বে নাকি !'

রাধা খিলখিল করে হেসে উঠল, 'না, না, প্রথম দিন থেকেই রোজ অমন শব্দ হয়। কিন্তু ভেঙে কোন দিন পড়ে না, ভয় নেই।'

ফের হাসতে গিয়ে শরতের মুখের দিকে চেয়ে রাধা হঠাৎ থেমে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল।

আশ্বস্ত হয়ে শরৎ আবার বসল। মেয়েটি বোধ হয় খুব বেশী দিন আসেনি। গলার স্বর এখনো তার কর্কশ নয়, হাসির ধ্বনিটি এখনো বেশ মিষ্টি। শরৎ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার, অমন লুকিয়ে লুকিয়ে কি দেখছ মুখের দিকে চেয়ে। ফের সেই চেনা লোকের মুখ মনে পড়ছে নাকি ? কার মুখের মত মনে হচ্ছে ?'

রাধার মুখ দিয়ে যেন হঠাৎ বেরিয়ে এল, 'আমার মেজদার।'

শরৎ দম নিল। মেয়েটি তো ভারি বেরসিক। মনে হ'লেও ও কথা কি এখানে কেউ বলে ? মেয়েটি খুব অল্প দিন এসেছে সন্দেহ নেই।'

শরতের ভাবান্তর দেখে রাধা আবার মুখ নিচু করল।

প্রসঙ্গ বদলে শরৎ জিজ্ঞাসা করল, 'নাম কি তোমার ?'

রাধা নিজের নাম বলল।

'কতদিন এসেছ কলকাতায় ?'

'মাস ছয়েক, তার মধ্যে তিন মাস তো মাখনের সঙ্গেই ছিলাম।'

শরৎ বলল, 'মাখন কে ?'

রাধা আর একবার চোখ নামাল, 'আপনার কাছে বলতে লজ্জা হচ্ছে। তার সঙ্গেই তো প্রথম এলাম বাড়ি ছেড়ে।'

এই সব গল্প সম্বন্ধে শরতের আর কোন কৌতূহল নেই। সবাই প্রায় ঠিক একই রকম বলে। সকলেই প্রেমাস্পদের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালায় আর তারা শেষে পালায় এদের ছেড়ে! যে সব মেয়ের এই পাড়াতেই জন্ম তারাও ওধরণের গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলে। শুনে নবাগতের মন সরস এবং করুণ হয়ে ওঠে। নিজেকে মনে হয় তার সেই প্রথম প্রেমিকের মত। ওরাও ভাব বুঝে অনেকটা সেই ধরণের অভিনয় করে! এ সব গল্প শুনে শুনে শরতের অরুচি ধরে গেছে। কিন্তু মেয়েটি ভারি চালাক। ওর বলবার ভঙ্গির মধ্যে নতুনত্ব আছে। এদের মধ্যে আর কোন মেয়ে শরৎকে কোনদিন এমন ক'রে জানায়নি যে তার পূর্বের প্রণয়-কাহিনী বলতে লজ্জা করছে। ভারি চতুর তো মেয়েটি। কিন্তু শোনাই যাক আরো কি বলে। শরৎ বলল, 'পালিয়ে কেন এলে, ভালোই যদি বেসেছিলে তাকে বিয়ে করলেই পারতে।'

রাধা বলল, 'এক জাত না হ'লে বিয়ে কি করে হয় ?'

শরৎ বলল, 'কি জাত ছিল মাখনরা ?'

'গয়লা ঘোষ।'

শরৎ হাসল, 'আর তোমার ?'

'আমরা কায়স্থ।'

একটু যেন গর্বের মত শোনাল। জাতি গৌরব রাধার যেন এখনো যায়নি।

শরৎ বলল, 'মাত্র এই জন্যই বিয়েটা আটকে রইল ? কিন্তু এখন তো এক জাতের সঙ্গে আর এক জাতের বিয়ে মাঝে মাঝে হয়। পালিয়ে না এসে বললেই পারতে বাড়িতে।'

রাধা বলল, 'কাকে বলব, মেজদাকে ? ওরে. বাবা, ওকে তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না।'

'কেন গয়লা ঘোষ ব'লে ?'

রাধা হাসি চেপে বলল, 'তিনি বলতেন লোকটা শয়তান। ওর মতলব ভালো নয়। তাছাড়া তার বউ ছেলে মেয়ে সব ছিল কিনা।'

'ও, তাহ'লে তো তিনি ঠিকই বলেছেন। তিনি তাহ'লে লোক চিনতেন।'

শরতের ভাবে মনে হোল যেন কৃতিত্বটা তারই।

রাধা বলল, 'তা চিনবেন না কেন ? যেমন বুদ্ধিমান তেমনিই খাঁটি মানুষ তিনি ! এমন লোক সহজে দেখা যায় না !'

শরৎ মনে মনে হাসল, খাঁটি সংসারে সবাই। ‍দুনিয়ায় লোক চিনতে আর বাকি নেই শরতের।

এক হাত আর এক হাতের মধ্যে ধরে একটু পিছু হেলে গায়ের আড়মোড়া ভাঙল রাধা। চোখ বুজে হাই তুলল একবার।

এ সব লক্ষণ শরতের সুপরিচিত। কেউ বা স্পষ্ট মুখ ফুটেই টাকাটা চেয়ে নেয়, কেউবা একটু ইসারা-ইঙ্গিতে ভদ্রতা রাখতে ভালবাসে।

ব্যাগ থেকে তিনটে টাকা বার করল শরৎ। বলল, 'এই নাও, কথায় কথায় বোধ হয় দেরীই ক'রে ফেললাম তোমার। গল্প করতে করতে ভুলেই গিয়েছিলাম। চমৎকার লাগছিল তোমার সঙ্গে গল্প করতে।'

রাধা মুখ ফিরিয়ে হাসল। ঢং দেখ লোকটার। আসলে ঘুঘু, কিন্তু দেখাচ্ছে যেন সাধু সন্ন্যাসী ! আচ্ছা দেখে নিচ্ছে রাধাও। কিন্তু কিছুতেই আজ তেমন আর উৎসাহ আসছে না। শরীরে জুৎ নেই। আজ সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পারলেই ভালো হোত। দুটো খাকি-পরা শিখ কাল সমস্ত রাত জ্বালিয়ে মেরেছে। ক্লান্তি আর অবসাদে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে, চোখ মেলে চাইতে ইচ্ছা করছে না।

রাধা মুখ নিচু করে বলল, 'কি যে বলেন। আমার ভারি লজ্জা করছে আপনার কথা শুনে।'

শরৎ অবাক হয়ে বলল, 'কেন, আমার কাছে লজ্জার কি হোল তোমার। বলোই না খুলে ব্যাপারটা কি !'

রাধা একবার শরতের মুখের দিকে তাকিয়ে ফের চোখ নিচু করল, 'দয়া করে অমন পীড়াপীড়ি করবেন না। আপনার জোর করবার ধরণটিও একেবারে ঠিক তাঁর মত। দায়ে পড়ে এই পথে এসেছি বলে কি আত্মীয় স্বজনের কথা সব একেবারে মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে !'

শরৎ আর একবার ধাক্কা খেল। বলে কি মেয়েটা। এখনো কি তার মেজদার সঙ্গে শরতের মুখের সাদৃশ্যটা মনে ক'রে রেখেছে না কি। ভালো জ্বালা। ভারি হাসি পেল শরতের। এ তো কেবল সাদৃশ্য। বন্ধু বিনোদের দুই বোন উমা আর রমাও তাকে পরিষ্কার দাদা বলে ডাকত। বিয়ের পর ফের আবার দাদা ডাকতে সুরু করেছে।

শরৎ একটু করুণ সুরে বলতে চেষ্টা করল, 'সে সব মনে ক'রে রেখে আর কি লাভ বলো। তোমার মেজদা তো এতদিনে নিশ্চয়ই সব শুনেছেন।'

রাধা বলল, 'শুনেছেন বৈকি। এত দিনে কি শুনতে বাকী আছে ?'

'কি ভাবছেন তিনি ?'

'সে কথা কি ভাবা যায় !'

শরৎ হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, তিনি খুব ভালবাসতেন তোমাকে, না।'

'বাসতেন আবার না? বড়দা মারা গেলেন, ছোড়দা মারা গেলেন, সংসারে রইলাম কেবল আমি আর তিনি।'

শরৎ বলল, 'তাহলে এক কাজ করলে না কেন? ফিরে গেলে না কেন তার কাছে।'

'তাই কি আর হয়? এই পোড়ামুখ কি আর দেখান যায় তাকে।'

'আচ্ছা ধরো এখন যদি গিয়েই বসো কি করবেন তিনি? তাড়িয়ে দেবেন?'

'তাড়িয়ে কি আর দেন? বাড়িতে যদি নাও রাখেন কোন একটা ভালো জায়গায় নিশ্চয়ই রাখবার ব্যবস্থা করব। শুনেছি আশ্রম টাশ্রম নাকি আছে কত জায়গায়।'

শরৎ বলল, 'তাতো আছেই। যাবে তুমি কোন আশ্রমে?'

রাধা কৌতূহলী হয়ে বলল, 'তেমন কোন জায়গা জানা আছে আপনার? নেবে সেখানে আমাকে?'

শরৎ বলল, 'কেন নেবে না? আমি একটু বলে কয়ে দিলে নিশ্চয়ই নেবে।'

রাধা কাতরভাবে বলল, 'তাহলে দিন না একটু বলে কয়ে, আমার আর মন টেঁকে না এখানে। আর ভালো লাগে না এসব।'

শরৎ মনে মনে হাসল, ঈস একেবারে সতী-সাবিত্রী হয়ে পড়েছে দেখছি, একটু বাদেই তো গিয়ে আবার রাস্তায় দাঁড়াবে।

'কিন্তু সেখানে খুব সৎভাবে থাকতে হবে, একেবারে গৃহস্থ ঘরের মেয়ের মত। পারবে তো?'

রাধা বলল 'কেন পারব না? গৃহস্থ ঘরের মেয়েই তো ছিলাম। কি করতে হবে সেখানে গিয়ে?'

আশ্রম যেন শরৎ একটি নিজেই খুলেছে, সর্বময় অধ্যক্ষ যেন সে-ই।

'কি আর করবে? পড়াশুনো আরম্ভ করবে, সেলাই শিখবে, নানা হাতের কাজ শিখবে। কাপড় বুনবে তাঁতে। তারপর যদি চাও ভালো দেখে বিয়ে-টিয়েও দেওয়া যেতে পারে।'

রাধা আরক্ত মুখে বলল, 'না না তার দরকার নেই। আপনি আমাকে কেবল সেই আশ্রমে ঢুকিয়ে দিন। কবে দেবেন বলুন।'

'যেদিন চাও, ইচ্ছা হলে কালই হতে পারে।'

'কালই? কাল আপনি আসবেন?'

'যদি বল আসব না কেন?'

রাধা বলল, 'না এলে চলবে কি করে? আপনি ছাড়া সঙ্গে করে নিয়েই বা যাবে কে? কিন্তু সেখানে কি পরিচয় দেব।'

শরৎ হঠাৎ ভারি একটা রসিকতা করে ফেলল, 'বলবে আমার মেজদার মুখের সঙ্গে এর মিল আছে।'

হাসতে হাসতে হঠাৎ শরৎ থেমে গেল, ভারি বোকার মত একটা কথা বলে ফেলেছে তো সে। রাধাও দেখা গেল মুখ নিচু করে রয়েছে লজ্জায়। কথায় কি যায় আসে। তবু কোথায় যেন একটু বাধো-বাধো লাগে। এ সব জায়গায় এসে নানা রকমের রসিকতাই সে করেছে। কিন্তু এমন বোকামি এই প্রথম। এসব ভাবকে তো প্রশ্রয় দিলে চলবে না। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সে আসেনি যে বেশ্যার সঙ্গে বোন পাতিয়ে সে বিদায় নেবে। বিশেষ করে অমন খাসা একটি মেয়ে, টাকাও দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এর পর ফের আবার কি করে আরম্ভ করা যায়। শরৎ ভাবতে লাগল আলাপটিকে ফের সরস ধারায় বইয়ে দেওয়া যায় কি ক'রে। কিন্তু রাধার লজ্জা যেন আর ভাঙতে চায় না। সেই যে মেয়ে ঘাড় নুইয়েছে আর তুলতে পারল না। খোঁপায় জড়ানো বেলফুলের মালাটা এরই মধ্যে যেন শুকিয়ে এসেছে, হয় তো ফুলগুলি বাসি ছিল, হয় তো তেমন পয়সা দিয়ে কিনতে পারেনি। নুয়ে পড়া খোঁপার নীচে গ্রীবাটি বড় শীর্ণ। ও যে এত রোগা প্রথম দেখে তো তা মনে হয়নি।

কিছুক্ষণ চুপ করে দেখতে দেখতে শরৎ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সোজা চ'লে গেল দরজার দিকে। খুলল খিল। তারপর নতমুখী রাধার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চললুম ?'

রাধা যেন চমকে উঠল, একটু এল পিছনে পিছনে, বলল, 'আপনি রাগ করে চললেন ?'

শরৎ বলল, 'না-না, রাগ করব কেন।'

'আপনি এমন করে চলে যাচ্ছেন, টাকা রাখতে লজ্জা করছে আমার।'

'আমার কাছে আর লজ্জা কি !'

রাধা সানুনয়ে বলল, 'কাল আসবেন, ঘর তো চেনাই রইল সোজা চলে আসবেন একেবারে। আসবেন তো ?'

শরৎ বলল, 'আসব।'

রাধা বলল, 'আমি তাহলে তৈরী হয়ে থাকব ?'

শরৎ বলল, 'থেকো।'

রাধা তাকে সদর দরজা পর্যন্ত সযত্নে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল, কিন্তু ঘরের দোর পর্যন্ত আসতে না আসতে পাশের ঘরের কুমুদিনী হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল তার গায়ে, 'জানালার পাল্লা খুলে আমি সব দেখেছি। মাগো, এত রঙ্গ জানিস তুই, মাত্র একবার তো সিনেমায় গিয়ে সখি সেজেছিলি, তাতেই এত সেয়ানা হয়ে গেছিস।'

রাধা ছদ্মকোপে বলল, 'সেয়ানা আবার কি লো। আমি কাল সত্যিই আশ্রমে চলে যাচ্ছি, দেখে নিস।'

কুমুদিনী বলল, 'যাস বাপু যাস, তোকে একদিন আশ্রমেই যেতে হবে। যে ভাবে খদ্দের ঠকাচ্ছিল তাতে তোর ব্যবসা বন্ধ হল বলে। শরীর তো বাপু মাঝে মাঝে

সকলেরই খারাপ হয়। সেদিন না বেরোলেই হোল। কিন্তু বেরোবি৹, টাকাও নিবি, শেষে মেজ'া বলে বিদায় করবি খদ্দের? দাঁড়া তোর জারি-জুরি আমি সব ভেঙ্গে দিচ্ছি।'

রাধা এবার সত্যি রাগ করল, মুখ বিকৃতি করে বলল, 'দিস দিস, জানা আছে তোর ক্ষমতা।'

হয় তো রাগ করেই রাধা এ রাত্রে আর বেরোলো না। পরদিনও সন্ধ্যার পর সবাই যখন সেজেগুজে বেরুচ্ছে রাধা ঘরেই রইল। শরীরটা ভালো নেই।

যাওয়ার সময় কুমুদিনী বলল, 'কি লো বেরোবি না।'

রাধা বলল, 'না লো না, আমার মদনমোহন আজ নিজেই আসবে। তার জন্য পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে না। ঘর সে চিনে গেছে।'

কুমুদিনী বলল, 'কালকের মেজদা আজ বুঝি মদনমোহন হল?'

রাধা বলল, 'যাঃ, কি যে ইয়ার্কি দিস সব সময়, ভালো লাগে না।'

সে নিশ্চয়ই আসবে। মুখ দেখে তো রীতিমত ঘুঘু বলে মনে হল। ঠাট্টা সে নিশ্চয়ই হজম করবে না। আজ এসে হয়ত সুদে আসলে আদায় করবে।

করে যদি করুক। সত্যি এমন ভাবে ঠকানটা ভাল হয় নি। আর যদি যথার্থই সরল লোক হয় সে? সত্যিই আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে? তা হ'লে? হঠাৎ শ্বাস যেন রোধ হয়ে এল রাধার। তাহলে সে চলে যাবে এখান থেকে। এই পঙ্ককুণ্ডের মায়া সে আর করবে না। আশ্রমের সেই সুন্দর পবিত্র জীবন, যেখানে গৃহস্থ ঘরের মেয়ের মত সে থাকবে পড়বে, তাঁতে কাপড় বুনবে, তারপর—রাধার মুখ এবার সত্যি আরক্ত হয়ে ওঠে।

পাইস হোটেলে খাওয়া সেরে রাত ন'টায় শরৎ আবার সেই দাবার ছকের কাছে এসে পৌঁচেছে। কিন্তু কালকের মনোরম ঘুঁটিটি আজ আর নেই। হয়তো এতক্ষণে অন্য কোন খদ্দের পাকড়ে ঘরে ঢুকেছে। আচ্ছা ঠকিয়েছে কাল মেয়েটা। জীবনে আর এমন ঠকেনি শরৎ।

রাধার ঘর অবশ্য শরৎ চেনে। গিয়ে ঢুকলেই হয় সেখানে। ঘরে যদি আর কেউ থাকে সে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই চলবে।

কিন্তু গলির দিকে পা বাড়িয়েই হঠাৎ শরৎ থমকে দাঁড়াল। মেয়েটা যদি সত্যিই কালকের কথাগুলি বিশ্বাস ক'রে থাকে। যদি সত্যিই আশ্রমে যাওয়ার জন্য তৈরী হ'য়ে ব'সে থাকে রাধা? আজ তো আর শরৎ লোভ সামলাতে পারবে না। সাধুগিরি ক'দিন আর দেখান যায়। কিন্তু কাল তো সে পেরেছে, দেখাতে পেরেছে সে মহৎ, জিতেন্দ্রিয়। রাধা নিশ্চয়ই বিশ্বাস ক'রেছে। সেই বিশ্বাসটুকু ভেঙে দরকার নেই। সেই স্মৃতিটুকু থাক রাধার মনে। টাকা ক'টি হয় তো কোন কাজে ব্যয় করবে

না রাখা। সৎ লোকের দান ব'লে দীর্ঘকালের জন্য বাক্সে তুলে রাখবে। তারপর রোজ এই মাঠে দাঁড়িয়ে নিত্য নতুন আগন্তুকদের মধ্যে খুঁজবে একখানি মুখ, যার সঙ্গে তার মেজদার মুখের মিল আছে।

সৌরভ

সবদিক থেকে বিপদ একেবারে ঘিরে ধরেছে। একে তো জিনিস-পত্রের এই দুর্মূল্যের বাজার, তারপর দুটি ছেলে মেয়েরই একসঙ্গে টাইফয়েড, দেবব্রত অত্যন্ত ঘাবড়ে গেল। কলেজের প্রফেসারী আজকাল মাস্টারীর সমান। তারপর নতুন কলেজ। ধোপদুরস্ত জামা কাপড়ে, গলায় চাদর জড়িয়ে, একদল উজ্জ্বল জীবন্ত তরুণ তরুণীর সামনে বিদেশী কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা নিজের কাছেও বেশ উপভোগ্য মনে হয়; কিন্তু মাসের শেষে অধ্যাপনার দক্ষিণা বাবদ হাতে যা আসে তাতে সংসারের খরচ কুলোয় না। সকালে বিকালে টিউশনি দুটো তাই বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছে। তার মধ্যে একটা থেকে নিয়মিত যা আদায় হয় তা এক কাপ চা আর কিছু মিষ্টি কথার সৌজন্য। কলেজ-কমিটির প্রেসিডেণ্টের ছোট মেয়ে। প্রেসিডেণ্ট নাকি খুব রক্ষণশীল। অন্যান্য সিনিয়ার এবং প্রৌঢ়বয়স্ক প্রোফেসরদের বাদ দিয়ে দেবব্রতকে যে তিনি নিয়েছেন এতেই তো তার ভাগ্য মনে করা উচিত। মাসে মাসে টাকাপয়সার তাগিদে বিপিনবাবু বিরক্ত হন। সেজন্য অত ভাবে কেন দেবব্রত। যখন যা দরকার বাড়ির ছেলের মতো নিঃসঙ্কোচে চেয়ে নিলেই তো পারে। একসঙ্গে সব টাকা দিতে হবে তার কি মানে আছে। এই তো গেল ছাত্রীর বাবার ধারণা। ছাত্রীর ধারণা আরো মারাত্মক। তার নিতান্ত সন্নিকটে সামনা সামনি ব'সে দেবব্রত যে তাকে পড়াতে পারছে এতেই তো আর কৃতার্থ হওয়া উচিত। তার বুদ্ধি সম্বন্ধে, পড়াশুনোর ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে ক্ষীণতম কোন মন্তব্য করার আগে দেবব্রত যেন ভুলে না যায় যে ডলি রায়ের বয়স আঠের; পৃথিবীতে যে বয়স আর কোন মেয়ের কোন দিন হয়নি, হবেও না।

পরিচিত, স্বল্পপরিচিত সবরকমের বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকেই ধার করতে দেবব্রত বাকি রাখেনি। পরিশোধের ভাবনা ভেবে মাথা খারাপ এখন না করলেও চলবে। আপাতত ক্রেডিট মানে কৃতিত্ব। যার কাছ থেকে যা পাওয়া যায় যে ভাবেই হোক সংগ্রহ করতে পারলেই দেবব্রত আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

দেবব্রতের চেয়ে কল্যাণী বরং অনেক শক্ত। মনে মনে ভয় পেলেও স্বামীর কাছ থেকে তা সে গোপন রাখতেই চেষ্টা করে। উল্টে সেই বরং ভরসা দিয়ে বলে, 'এত

ঘাবড়াবার কী আছে, অসুখ বিসুখ কি হয় না ছেলেমেয়েদের? আজ এই বাজার দর কি তোমার একার জন্য চড়েছে?'

কিন্তু এই লোক-দেখানো নির্ভীকতা ভালো লাগে না দেবব্রতের। এতে সে আরো চটে যায়। 'হুঁ, ঘরে বসে অমন বীরত্ব সবাই দেখাতে পারে। বাইরে বেরিয়ে একবার পঁয়ত্রিশ টাকার জায়গায় ত্রিশ টাকা দরে দু'মণ চাল জোগাড়ের চেষ্টা ক'রে দেখ কতখানি মাথার ঘাম পায়ে ঝরে, কোন বন্ধুর কাছে দু'টাকা চাইতে গেলে কতখানি বাগজাল বিস্তার করতে হয়।'

কল্যাণীর অসন্তুষ্টি এবার কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে, 'ঘরে বসে মরচে পড়ে গেলুম তোমার জন্যই। না হ'লে আই-এর কোর্সটা তো শেষ ক'রেছিলাম, পরীক্ষাটাই কেবল দেওয়া হয়ে উঠল না। মনে আছে তোমাকে কত অনুরোধ ক'রেছিলাম? তারপর কত মেয়ে বেরিয়ে গেল তোমার হাত দিয়ে, কেবল বড় ঘরামির চালায় শন উঠল না।'

'হ্যাঁ, সেই এ্যাড্‌ভান্সড্‌ স্টেজ এ পরীক্ষা দিতে গিয়ে এক ফ্যাসাদ ঘটিয়ে বসতে তাই বুঝি ভালো হোত?'

বছর আটের আগেকার ঘটনা, তবু সেদিনের কথা স্মরণ ক'রে আজও সলজ্জে কল্যাণী মুখ নিচু করল। যেন সে ব্যাপারের সমস্ত লজ্জা কল্যাণীর একার।

সেই প্রথমদিনগুলির কথা কল্যাণীর মনে পড়ল। তাকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার সম্বন্ধে তখনো দেবব্রতের দারুণ উৎসাহ। কিন্তু তার চেয়েও বেশি উৎসাহ প্রকাশ হয়ে পড়ত অন্য কাজে। কল্যাণী ছদ্মগাম্ভীর্যে একটু স'রে গিয়ে বলত, 'কী অসভ্য, ওসব কি হচ্ছে?'

দেবব্রত প্রত্যুত্তরে আবৃত্তি করত, 'পুরুষের সে অধৈর্য তাহারে গৌরব মানি আমি।'

আজো ভাবতে ভালো লাগে সেই দিনগুলির কথা। কথায় কথায় কবিতা, আর পদে পদে মিল। চিঠির পাতায় আর কবিতার খাতায় তখনকার অসংখ্য মুহূর্ত দেবব্রত ধরে রাখতে চেষ্টা ক'রেছে। কিন্তু সে সব উল্টে দেখবার সময় কই, তাছাড়া মিল দেওয়া কবিতা দেবব্রতের কানে আজকাল ভালগার লাগে।

দুখানা ছোট ছোট পায়রার খোপের নাম একটি ফ্ল্যাট। আর তারই ভাড়া চল্লিশ টাকা। তা হলেও এর চেয়ে খারাপভাবে আর থাকা যায় না। শত হ'লেও শিক্ষিতা স্ত্রী এবং প্রেমজ বিবাহ। ভাববে কি। তা ছাড়া নিজেরও একটা পদমর্যাদা আছে তো সমাজে।

কিন্তু ছোট হোক বড় হোক সমাজই কি আছে এখানে? অন্তত কোন স্পষ্ট ধারণা এ সম্বন্ধে দেবব্রতের নেই। কোন প্রতিবেশী নেই এখানে; এক একটি ফ্ল্যাট যেন এক একটি দ্বীপ। কোনটির সঙ্গে কোনটির যোগসূত্র নেই। এখানে কারো সঙ্গে তার

আলাপ হয়নি, আলাপের কোন প্রয়োজনও সে বোধ করেনি। কিন্তু এখন, ছেলেদের এই অসুখের সময় আজ তার মনে হচ্ছে আলাপ ক'রে রাখলে বোধ হয় মন্দ হোতনা। তাহ'লে তার ছেলে মেয়ে যখন দুঃসহ ব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছে, তখন পাশের ফ্ল্যাটে এই যে চব্বিশ ঘণ্টা রেডিও চলছে, অনুরোধ উপরোধে তার মধ্যে অন্তত দু'এক ঘণ্টা সে রেহাই পেতে পারত।

চারটে পর্যন্ত ক্লাস ছিল। কলেজ ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে এল দেবব্রত। ধারাচুড়া খুলতে খুলতে বলল, 'এসেছিলো ডাক্তার?'

কল্যাণী বলল, 'হ্যাঁ।'

'কি বলল সুধীর?'

'বললেন তো ভয় নেই।'

'ওতো ওদের বাঁধা বুলি। কতদিনের মধ্যে সেরে উঠবে তা কিছু বলল? যত্ন ক'রে দেখে, না কেবল গল্পটল্প ক'রেই চলে যায়!'

'কি যে বল, শত হলেও তোমার বন্ধু তো।' কল্যাণী ক্লান্ত স্বরে বলল। দেবব্রত যেন বড় বেশি নার্ভাস, আর বড় বেশি বদমেজাজী হয়ে গেছে। কল্যাণী আর পেরে উঠছেনা। ছেলেদের শুশ্রূষাই করবে, না স্বামীকে সামলাবে। একটু চুপ ক'রে থেকে কল্যাণী বলল, 'যাও মুখ-হাত ধুয়ে এসো বাথ-রুম থেকে, আমি ততক্ষণে তোমার চা ক'রে আনি। ওদের কাছে তোমর বসতে হবেনা, কিছুক্ষণ আগে ওদের পথ্য খাইয়েছি। এখন বেশ ঘুমোচ্ছে ওরা।'

চায়ে চুমুক দিয়ে দেবব্রত খানিকটা চাঙ্গা বোধ করল। কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে সত্যিই ভারি মায়া হোল তার। রাত জেগে জেগে কি চেহারাই হয়েছে। মুখে শুষ্ক শীর্ণতা, চোখের কোলে কোলো ছায়া পড়েছে। সমস্ত শরীর ঘিরে ওর ক্লান্তির ছাপ। অনুতপ্ত কণ্ঠে দেবব্রত বলল, 'সত্যি, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার। স্বার্থপরের মত তোমাকে কেবল খাটিয়ে নিচ্ছি। তোমার দোষ আছে। পালা ক'রে তো জাগবার কথা, আমাকে কেন ডেকে দাওনা সময়মত?'

কল্যাণী একটু হাসল। তার ক্লান্ত ওষ্ঠাধরে ভারি ম্লান, ভারি করুণ দেখাল সে হাসি। কল্যাণী বলল, 'আর তুমিই বুঝি কম খাটছ, সারাদিন তো যায় ছুটোছুটিতে, তারপর রাত্রেও যদি এক-আধটু না ঘুমোতে পারো, শরীর টিঁকবে কি ক'রে? আমার একটুও কষ্ট হয়না, তুমি ভেবনা।'

'না কষ্ট আর কিসের! আজ সন্ধ্যার পরই খাওয়া-দাওয়া সেরে তুমি শুতে যাবে, আমি জাগব সারারাত। আজও আর ভাবছি যাবনা টিউশনিতে, মিছামিছি কি হবে গিয়ে, টাকা যখন আদায় হবেনা।'

কল্যাণী বলল, 'না না, দুদিন ধরে তো যাওই না, আজ দেখ যদি বলে কয়ে কিছু আদায় করতে পার। সব খুলে বললে এই অবস্থায় কিছু যাহোক অন্তত দেবেই। মানুষ

তো। আর গেলেই আদায়ের কিছু সম্ভাবনা থাকে, 'অভিমান ক'রে বসে থাকলে তো আর ওরা দিয়ে যাবেনা, একবার দেখ চেষ্টা ক'রে, রাত-পোহাইলেই টাকার কত দরকার তা তো জানো।'

'তা আর জানিনে? আচ্ছা।'

সন্ধ্যার পর বালিগঞ্জের একটা বাসে ভ ড় ঠেলে অতি কষ্টে নিজেকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল দেবব্রত। অত ভীড় অত অসুবিধার মধ্যেও মাঝে মাঝে কল্যাণীর করুণ ক্লান্ত মুখচ্ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। তার স্নিগ্ধ প্রেমের মাধুর্যে জীবনের আদি অন্ত দেবব্রতের ছেয়ে গেছে। শুধু তার জন্যই সমস্ত দুঃখ-দৈন্য দুর্ভাবনাকে সে 'ট্রাজেডির' মত উপভোগ করতে পারছে।

'ষ্টপেজ' থেকে ডান হাতি একটা গলি ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলে তবে বিপিনবাবুর বাড়ি। কয়েকটি সুদৃশ্য মোটর বাড়ির দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখে দেবব্রত বিস্মিত হোল। একদল স্ত্রী-পুরুষ বাড়ির মধ্যে ঢুকল, আর একদল বেরিয়ে এল। কি ব্যাপার! কোন উৎসব-অনুষ্ঠান আছে নাকি এ-বাড়িতে। নানা দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় দেবব্রতের যেন স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গেছে, বুদ্ধি গুলিয়ে গেছে যেন।

কিন্তু পরমুহূর্তে ডলিকে দেখা গেল। কয়েকটি সমবয়সী বন্ধুকে দোর পর্যন্ত সে এগিয়ে দিতে এসেছে। এই উৎসব উপলক্ষে চমৎকার ক'রে সেজেছে, উজ্জ্বল উল্লাস তার সর্বাঙ্গ বেয়ে ঝরে পড়েছে যেন। এ যেন অন্যান্য দিনের ডলি নয় যাকে সে নোট মুখস্থ করিয়েছে, যার মূঢ়তায় মনে মনে সে হেসেছে। এ আর একজন, এ অসাধারণ।

মুহূর্তের জন্য দেবব্রতের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতে ডলি চোখ নামিয়ে নিল। তারপর বলল, 'বেশ মাস্টারমশাই, আমার জন্মদিন, আর আপনি এই এলেন।'

মীরা ডলির কানে কানে বলল, 'ইনি তোর মাস্টারমশাই নাকি, ডলি? তোকে হিংসা করতে ইচ্ছা হয় সত্যি।'

'কি যে বলিস।' ডলি সলজ্জে হাসলে।

দেবব্রতের মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে তার জন্মদিনের কথা ডলি বলেছিল বটে। কিন্তু আমন্ত্রণের মধ্যে তেমন আগ্রহ ছিল বলে তার মনে হয়নি। অসুখে ডাক্তারে আর বন্ধুদের কাছে ধার ক'রে ক'রে একথা তার একবারেই মনে ছিলনা, আর মনে থাকলেই বা কি হোত। সে কি আসত নাকি!

বন্ধুদের বিদায় দিয়ে ডলি দেবব্রতকে বলল, 'আসুন, সবাই চলে গেল, আর আপনি এলেন। দেরি দেখে আমি তো ভাবলুম, আজও বুঝি এলেন না। দু'দিন ধরে তো আসাই বন্ধ করেছেন।'

দেবব্রত একটু হাসল, 'এ ক' দিন পড়াশুনা তো এমনিতেও হোত না তোমার।'

'বেশ, শুধু কি পড়াশুনোরই সম্পর্ক নাকি আপনার সঙ্গে ?' বলতে বলতে ডলি নিজেই আরক্ত হয়ে উঠল।

কুমারীর নয়নের এই সলজ্জ আভাস দেবব্রত কি এই প্রথম দেখল জীবনে? নাহ'লে সে চোখ ফিরাতে পারছে না কেন ?

একটু পরে বিপিনবাবুকেও দেখা গেল। 'এই যে, এতক্ষণ পরে দেবব্রত এসেছ। যাও ডলি, তোমার মাস্টারমশাইকে নিয়ে যাও। দেরি করোনা আর, রাত হচ্ছে।'

ডলি দেবব্রতকে তার পড়ার ঘরে নিয়ে গেল। একটা নতুন টেবিল-ঢাকনি টেবিলের ওপর। ফুল-দানিতে রজনীগন্ধা। সামান্য এক-আধটু আসবাব-পত্রের অদল-বদলে ঘরখানিও যেন নতুন রূপ নিয়েছে।

ডলি বলল, 'আমার জন্মদিন আজ।'

দেবব্রত বলল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'কি মনে হচ্ছে ?' ডলি জিজ্ঞাসা করল।

দেবব্রত বলল, 'তোমার জন্মদিন।'

'এখানে এসে আপনার মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারি, একথা আপনার মোটেই মনে ছিলনা।'

'ওকথা বিশ্বাস করতে তোমার ইচ্ছা হয় ?'

'ইচ্ছা হয়না, কিন্তু কথাটা তো সত্যি। যদি মিথ্যাই হবে, বলুন তো কি এনেছেন আমার জন্যে ?'

মুহূর্তের জন্য দেবব্রত একটু বিব্রত বোধ করল, তারপর বলল, 'জানতো, আমি যা দেব, তা আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে হয়না।'

'কি, কি দেবেন আপনি ?' ডলির স্বর একটু কেঁপে উঠল।

দেবব্রত একটু হাসল, পেনটা খুলে নিল পকেট থেকে, হাতড়ে হাতড়ে সাদা কাগজ আর বেরুলো না, বেরুলো একটা হলদে রঙের সিনেমার হ্যাণ্ডবিল, একপিঠে লেখা, কিন্তু আর এক পিঠের রঙ চমৎকার। নিজেরই একটা পুরোণ কবিতা অক্ষরের স্রোতে অনায়াসে নেমে এলো তার ওপর। কিন্তু এ যেন নতুন কবিতা লেখার আনন্দ।

সাদা ঝকঝকে চিনেমাটির প্লেটে প্লেটে এলো খাবার, এলো চা। সলজ্জ বিনয়ে টেবিলের একপাশে দাঁড়িয়ে রইল ডলি। তার দিকে না তাকিয়েও তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ডলি বলল, 'কাল আসবেন তো ?'

দেবব্রত বলল, 'আসব।'

ডলি বলল, 'কিন্তু আপনি যে-দিনই আসবেন বলেন, সেদিন আর আসেন না। কাল আসবেন কিন্তু।'

দেবব্রত বলল, 'আচ্ছা।'

একটুর জন্য দেবব্রত শেষ ট্রামটা মিস করলনা, ছুটে এসে ধরতে হোল হ্যাণ্ডেল। শেষ ট্রামের যাত্রীরা যেন শেষের যাত্রী। শ্রান্তিতে শুষ্ক প্রত্যেকটি মুখ। কিন্তু অপূর্ব প্রসন্নতায় দেবব্রতের অন্তর পূর্ণ হয়ে গেছে। নিজেরই কবিতার লাইন গুণগুণ করছে তার মনের মধ্যে।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে নিজেদের ফ্ল্যাটবাড়িটার সামনেই ষ্টপেজ। ট্রামটা থামতেই নেমে পড়ল দেবব্রত। অনেক রাত হয়ে গেছে।

কাগজের ঢাকনি দেওয়া ম্লান আলোর নিচে তখনো কল্যাণী ঘুমন্ত ছেলে-মেয়েদের শিয়রে বসে রয়েছে। দেবব্রত ঢুকতেই কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, 'এত রাত হোল যে।'

'হু, তুমি খেয়ে নাওনি বুঝি?'

কল্যাণী ম্লান একটু হাসল, তারপর বলল, 'টাকাটা আদায় হলো?'

'রাতদিন কেবল টাকা আর টাকা, তুমি কেমন যেন হয়ে গেছ আজকাল কল্যাণী।'

কল্যাণী ব্যথিত বিস্ময়ে স্বামীর দিকে তাকাল, 'আদায় হয়নি তাহ'লে? কিন্তু ভোর হ'লেই তো টাকার দরকার। দিলু আর মিণ্টুর ওষুধ-পত্র একেবারেই ফুরিয়ে গেছে।'

দেবব্রত বিরক্তি দমন ক'রে কোমলকণ্ঠে বলল, 'তুমি ভেবনা, কালই একটা ব্যবস্থা হবে।'

কল্যাণী একটু নিস্পৃহভাবে দূর থেকে বলল, 'হোলেই হোল।'

'হবে হবে, আমার কথা বিশ্বাস কর।'

খেতে বসল দুজনে পাশাপাশি। রোজ যেমন বসে। কল্যাণী দেবব্রতের থালার দিকে চেয়ে বলল, 'খাচ্ছনা যে? সবই যে পড়ে রইল।'

'এই তো খাচ্ছি, সবদিন কি সমান খাওয়া যায়? খিদে নেই তেমন।'

'খিদে নেই কেন, আর কি খেয়েছ নাকি কোথাও?'

এমন খুঁটে খুঁটে প্রশ্ন করার অভ্যাস কল্যাণীর! দেবব্রত এক ঝোঁকে বলল, 'হ্যাঁ, জলটল খেতে হোল কিছু, ডলির জন্মদিন ছিল!'

কল্যাণী একমুহূর্ত চুপ ক'রে রইল, তারপর হেসে বলতে গেল, 'তাই বল, পেটপুরে খেয়ে এসেছ আর বলছিলে খিদে নেই।'

খাওয়া-দাওয়ার পর একটা সিগারেট শেষ ক'রে দেবব্রত বলল, 'যাও, তুমি শুয়ে পড়, কদিন ধরেই তোমার রাত-জাগা পড়ছে, চেহারা গেছে খারাপ হয়ে। আমিই আজ জাগি।'

কল্যাণী বলল, 'নানা, তোমার এ সব অভ্যাস নেই, তুমি শোও গিয়ে।'

দেবব্রত বলল, 'কিচ্ছু ভেবনা। আমি আজ খুব জাগতে পারব।'

স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে কল্যাণী চোখ ফিরিয়ে নিল।

দেবব্রত বুঝতে পারল একটা অহেতুক উল্লাস এই সমস্ত পরিবেশকে ছাপিয়ে উঠেছে, যা তার নিজের কাছেই অত্যন্ত অশোভন লজ্জাকর বলে মনে হোলো। নিজের আচরণের জন্য দুঃখ হোল দেবব্রতের।

কল্যাণীর দিকে তাকাল। তার পাণ্ডু বিশীর্ণ মুখে ক্লান্তির ছায়া নেমে এসেছে। কেন যেন চুলে তেল মাখছে না কদিন ধরে। ছোট কপালের ওপর কয়েকগাছ চুল এসে পড়েছে। মুখখানি ভারি ম্লান।

দেবব্রত গাঢ় কোমল স্বরে বলল, 'যাও শোও গিয়ে লক্ষ্মীটি।'

কল্যাণী বলল, 'না, আমিই থাকি ওদের কাছে।'

দেবব্রত একটু যেন সোল্লাসে বলল, 'আচ্ছা বেশ, দুজনেই একসঙ্গে আজ রাত জাগা যাবে।'

'ওদের টেম্পারেচারটা একবার নিয়ে দেখা যাক। চার্ট কোথায়? এর আগে কত ছিল জ্বর?'

কল্যাণী খাতাটা নীরবে এগিয়ে দিল। তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে পারা নামাবার জন্য থার্মোমিটারটা দু'একবার ঝাড়া দেওয়ার সময় হঠাৎ দেবব্রতের মুখ দিয়ে মৃদু গুঞ্জনে বেরিয়ে গেল, 'আমার চোখের রঙে, কামনার রঙে আজি মোর।'

চমকে উঠে পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল দুজনে, তারপর দুজনেই চোখ ফিরিয়ে নিল।

মিণ্টু পাশ ফিরতে ফিরতে কাতোরোক্তি ক'রে উঠল, 'মাগো।'

দুর্জ্ঞেয়

কারো কারো শারীরিক গড়নে এমন একেক ধরণের শ্রীহীনতা থাকে যাতে অনেক সময় দর্শকের মনে অনুকম্পা এমন কি সহানুভূতি জাগায়; হীনস্বাস্থ্য লোক দেখলে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি। কিন্তু আরেক শ্রেণীর কুশ্রীতা আছে যা শুধু চোখকে পীড়িত করেই ছাড়ে না, অস্তিত্বকে পর্যন্ত দুঃসহ করে তোলে।

সামনের ঘরের সতের-আঠার বছরের রাণী নামে যে মেয়েটি রোজ দোতলার রেলিঙে ভর করে এসে দাঁড়ায়, পরিতোষ মর্মে মর্মে অনুভব করেছে তার কুশ্রীতাও ঠিক দ্বিতীয় শ্রেণীর। কলেজে এক কবিবন্ধু তাকে মাঝে মাঝে বলত ক্লাসের দু' একটি মেয়ের সৌন্দর্য তাকে নাকি সিম্প্লি পাগল করে তোলে। ট্রামে, বাসে, জলসায়, মজলিসে বহু রকমের বহু মেয়েকে সে এ বয়সে দেখেছে, কিন্তু এতকাল উন্মত্ততার হাত থেকে রেহাই পেয়ে এসে শেষ পর্যন্ত এই মেয়েটার হাতে সে বুঝি পাগলই হয়ে বসল।

মেয়েটা শুধু যে অস্বাভাবিক শ্রীহীন তাই নয় অসম্ভব রকমের নির্লজ্জও। তার প্রসাধনের ঘটা দেখলে একেক সময় যে হাসি না পায় তা নয়, কিন্তু সে যখন পরিতোষের সঙ্গে কোন রকমে চোখাচোখি হলেই মুচকি হাসে, তখন পরিতোষের পায়ের তলা জ্বলে যেতে থাকে। পরিতোষ যখন কলের কাছে হাতমুখ ধোয়, যতক্ষণ সে চৌবাচ্চা থেকে বালতি ভরে জল ঢালতে থাকে মাথায়, তখনই কোন না কোন ছলে মেয়েটি এসে দাঁড়ায় ওপরের বারাণ্ডায়।

তার অনুরাগের প্রকাশ শুধু এতেই শেষ হয় না। কোন্ মান্ধাতার আমলের এক ভাঙা হারমোনিয়াম যেন কোত্থেকে জোগাড় করেছে, তার সহযোগে সকাল সন্ধ্যায় রোজ তার সঙ্গীত সাধনা চলে। সাম্প্রতিক সিনেমার চলতি গানগুলিকে তারস্বরে বেতালায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তবে তার তৃপ্তি। তার সবকটিই প্রেমসঙ্গীত এবং বোধহয় পরিতোষের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

বাড়িটায় ঢুকে অবধি পরিতোষের মনের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়ে গেছে। দাদার যত কাণ্ড। এমন বাড়ি কি নিজে দেখে কেউ পছন্দ করে। কিন্তু সে কথা বলবার উপায় নেই। বললেই বলে বসবেন, 'আর দুখানা ঘর যদি তুই সারা কলকাতা সহরে খুঁজে বার করতে পারিস আমি এই মুহূর্তে এ বাসা ছেড়ে দিতে রাজি আছি।' বাড়ি পাওয়া যায় না তা ঠিক। এই বছর খানেকের মধ্যে সমস্ত বাংলা দেশটা যেন এই কলকাতা সহরে এসে জড় হয়েছে, আর তার চার আনি লোক অন্তত কাঁটাপুকুর লেনের এই জীর্ণ বাড়িটায়। ওপরে নীচে সাত ঘর বাসিন্দা। রান্নাঘর বলে আলাদা কোন জিনিস নেই। শোয়ার ঘরের মধ্যেই রেঁধে নিতে হয়, কিংবা ঘরের সামনে যে দেড়হাত প্রস্থের বারাণ্ডার তিন হাত করে একেক সরিকের ভাগে পড়েছে তাতেও কেউ কেউ রান্না করে। সকাল সন্ধ্যায় সাতটি চুল্লির যে যজ্ঞধূম ঊর্ধে উত্থিত হতে থাকে তা কাশীমিত্রের ঘাটের ধোঁয়াকেও হার মানায়। পাকা নর্দমার ব্যবস্থা নেই। উঠানের মাঝখানে দিনরাত এক ডাস্টবিন খাড়া করে রাখতে হয়। ভাতের মাড়ে, তরকারির খোসায় সমস্ত আকাশ-বাতাস সৌগন্ধে ভরে ওঠে।

সুখ-সুবিধার চূড়ান্ত। তারপর এই রাণীর অনুরাগ। পরিতোষ বৌদিকে বলে, 'ঘরসংসার তোমরা করো, লোটাকম্বল নিয়ে আমি এবার প্রবজ্যা গ্রহণ করব, আর নয়।'

পারুল মুখ টিপে হাসে, 'বৈরাগ্যের কারণ তো জানি। সবুর সইছে না। কিন্তু কি করব ভাই, আমরা হলুম ছেলেপক্ষ, আমাদের কি আগ বাড়িয়ে প্রস্তাব করা সাজে? ওঘরের চক্রবর্তী মশাই আর মাসীমাই বা কী। ওঁদের কি চোখ বলে কোন জিনিস নেই। ওঁরা কি দেখতে পাচ্ছেন না দিনের পর দিন দুটি হৃদয় কেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে? দেখি অগত্যা আমাকে গিয়েই বলতে হবে। মানের জন্য শেষে কি প্রাণ খোয়াব? তাছাড়া পট্ করে শেষে যদি একদিন তুমি সন্ন্যাসী হয়েই পড় আমার বাজার এনে দেবে কে?'

পরিতোষও হাসে, 'এ আর মুখ ফুটে বলবে কি? ঠাকুরপোর আদর যে বাজারের জন্যই, এ তো প্রতিদিনই টের পাচ্ছি।'

স্কুল-ছুটির পর একটা টিউশানি সেরে সরোজ এলো ঘরে। আরেকটা টিউশানি আছে বাসার কাছেই, নিবেদিতা লেনে। দুই টিউশানির ফাঁকে স্ত্রীর হাতের এক কাপ চা পেয়ে সরোজের মেজাজটা এই সময় কিঞ্চিৎ সরস থাকে। পরিতোষের শেষের কথাগুলি তার কানে গিয়েছিল, চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সরোজ বল্‌ল, 'হ্যাঁ কি বলছিলি তখন, কি টের পাচ্ছিস?'

পরিতোষ জবাব দিল, 'এ বাড়িতে দু'দিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।'

সরোজ স্ত্রীর দিকে তাকায়, 'শাস্ত্রে আছে এ অবস্থায় একটু উন্মাদ-উন্মাদ ভাবই হয়, তাই না?'

পারুল পরিতোষের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে।

সরোজ আবার বলে, 'কেন বাড়িটা মন্দ কি, তাছাড়া এ বাড়িতে একমাত্র তুই তো স্বতন্ত্র একটা ঘর পেয়েছিস, বলতে গেলে তুই তো এ বাড়ির রাজা।' সরোজের ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির আভাস দেখা যায়।

পারুল খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠে, 'একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে। ব্যাকরণে কোন ভুল নেই অন্তত।'

কেবল এই সূক্ষ্ম হাসিঠাট্টাতেই ব্যাপারটা যে সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। সমস্ত বাড়ি ভরে একথা নিয়ে আলোচনার ঢেউ ওঠে। এ সব বক্র আলোচনা হাসিঠাট্টা চক্রবর্তীদের যে কানে না যায়, তা তা নয়? তবু এতে যেন তাদের কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং পরিতোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার উৎসাহটা তাদের দিনের পর দিন যেন বেড়েই চলেছে।

সেদিন রাত্রে সরোজ তখনও টিউশানি করে ফেরেনি। পারুলের রান্না সব নামতে না নামতেই পরিতোষ নিজেই পিঁড়ি পেতে বসে গেল, বছর চারকের ভাইপো নীপুকে ডেকে পাশে বসিয়ে বলল, 'আয়রে আমরা সব আগেই খেয়েনি। না হ'লে ভিড়ের মধ্যে পতি-সেবায় আরেকজনের আবার অসুবিধা হবে।'

পারুল হেসে বলল, 'গরজ যে কার তাতো বোঝা গেছে। এ অবস্থায় নাকি মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা জ্ঞান থাকে না। আর তোমার দেখি হু হু করে তা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু খাবে কি দিয়ে, কিছুই যে নামেনি এখনও।'

পরিতোষ বলল,'দাও দাও, আর ভদ্রতা করতে হবে না, এতক্ষণে ভাত যে ফুটোতে পেরেছে এই তো ভাগ্য।'

একটু বাদেই বাটিতে করে কি একটা মাছের তরকারি নিয়ে রাণী এসে দোরের সামনে দাঁড়াল, 'ধরুন তো দিদি, মা পাঠিয়ে দিলেন।'

পারুল বলল, 'ও আবার কি? আহা, ও আবার কেন তুমি নিয়ে এসেছ?'

'আহা ধরুনই না। জাত যাবে না, আমরাও তো ব্রাহ্মণ।'

পারুল মুচকি হাসল, 'ভাগ্যে ব্রাহ্মণ, না হলে এযাত্রা জাত না দিয়ে বুঝি আর পারতুম আমরা। তা আমাকে ধরতে বলছ কেন? অন্যের হাত দিয়ে দিলে কি আর সাধ মিটবে? নিজেই দিয়ে যাও।'

পরিতোষ কঠিন দৃষ্টিতে পারুলের দিকে একবার তাকালো। অর্থাৎ এধরণের অভদ্র বাড়াবাড়ি সে পছন্দ করেনা। তারপর বলল, 'ওসব আমার দরকার নেই, ফিরিয়ে নিতে বল।'

রাণী আহত কর্কশকণ্ঠে বলল, 'এসেছি কি ফিরিয়ে নেবার জন্য নাকি? খেতে হয় খান না হয় ফেলে দিন।'

পারুল গম্ভীরভাবে বলল, 'সত্যিই তো, ফিরিয়ে নিতে বললেই কি আর ফিরিয়ে নেয়া যায়।'

রাণী ফিক্ করে হেসে বাটিটা পরিতোষের পাতের সামনে নামিয়ে রেখে সরে গেল।

পরিতোষের যতই দুঃসহ লাগতে লাগল গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতায় রাণীরা ততই নাছোড়বান্দা হ'য়ে উঠল। কোনদিন বা মাছের ঝোল, কোনদিন বা একটা তরকারি প্রায়ই ওঘর থেকে আসে। রাণীর মা কাজকর্মের অবসরে এঘরে এসে বসেন, নানা গল্পগুজব করেন, কোনদিন বা বঁটিটা টেনে নিয়ে নিজেই কুটনো কুটতে আরম্ভ করে দেন।

পারুল বলে, 'আহা হা, আপনি কেন আবার—?'

রাণীর মা বলেন, 'তাতে কি। এক জায়গায় থাকতে গেলে আমারটা তুমি দেখবে তোমারটাও আমি দেখব; এ না হ'লে কি চলে? দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে সেই সাতসকালে উঠে আপিসের রান্না, তাও যদি শরীরটা তোমার শক্ত থাকতো। অত পর পর ভাব কেন মা, যখন যা অসুবিধা বোঝ আমাকে বলতে পার, রাণীকে পার—একটুও লজ্জা কোরোনা মা, লজ্জা করলে কি আর সহর-বন্দরে মানুষ চলতে পারে?'

পারুল মনে মনে হেসে ঘাড় নাড়ে, 'তা তো ঠিকই।'

হঠাৎ রাণীর মা বলেন, 'এবাড়িতে তোমার দেওরই তো দেখি সবচেয়ে আগে বের হয় আপিসে, কোন আপিসে কাজ করে যেন?'

পারুল বলে, 'ডি. জি. এম. পি.।'

রাণীর মা নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করেন, 'মাইনে পায় কত?'

পারুল গম্ভীরভাবে বলে, 'জানিনে।'

পর মুহূর্তে নিজের রূঢ়তা বুঝতে পেরে মোলায়েম স্বরে খানিকটা নালিশের ভঙ্গিতে বলে, 'কি করে জানব মাসীমা? আমাকে কেউ কিছু কি বলে? যেমন দাদা তেমনি তার ভাই, আজকালকার চাকুরেদের ধরণই আলাদা। তাঁদের মাইনের কথা জিজ্ঞেস করা যেন মস্ত বড় এক অভদ্রতা।'

শুষ্ক হেসে রাণীর মা তাড়াতাড়ি কথা ফিরিয়ে নেন, 'তা আর কি করবে মা, যে কালের যা রীতি।'

নানা ছলে রাণীও দু'তিন বার দিনের মধ্যে এঘরে আসবেই। বিকেলের দিকে এসে বলে, 'আমার চুলটা একটু বেঁধে দিন না দিদি।'

পারুল বলে, 'হু, আমি এখন তোমার চুল বাঁধতে বসি, আর আমার রাজ্যের কাজ পড়ে থাকুক।'

'আপনার কাজ যেন কেবল পড়েই থাকে। আর কেউ আর কুটোগাছটাও নেড়ে দেয় আপনার?'

কথাটা অসত্য নয়। সুযোগ পেলেই রাণা পারুলের সাহায্য করতে আসে। ঘর, ঝাঁট দেয়, বিছানা পাতে, রুটি বেলে দেয়, কোলের ছেলেকে ঝিনুক ভরে দুধ খাওয়াতে বসে। পারুল প্রথম প্রথম ভারি অস্বস্তি বোধ করত, আজকাল আরামই পায়। সত্যি কাজকর্মে এমন আটপিঠে শক্তমেয়ে আজকালকার দিনে পাওয়া কঠিন। আহা মেয়েটা যদি অমন কুশ্রী আর হ্যাংলা না হ'ত, তাহলে লেখাপড়া না জানার জন্য এসে যেতনা, তা শিখিয়ে নিতে আর কতক্ষণ লাগত।

সেদিন আপিস থেকে এসে ঘরে ঢুকে হাতঘড়িটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে হঠাৎ পরিতোষ তারস্বরে চীৎকার করে ডাকল, 'বউদি, বউদি।'

পারুল আসতে আসতে সাড়া দিল, 'অত জোরে চেঁচাচ্ছে কেন ঠাকুরপো, কানে খাট তোমার দাদা, আমি তো নই।'

'ঠাট্টা রাখ, আমার এই বইগুলির ওপর এমন বিশ্রীভাবে নাম লিখে গেল কে? বিদ্যে ফলাবার আর জাগগা পেলনা?'

লেখার ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পারুল মুচকি হাসল, 'ঠিক জায়গায় ফলিয়েছে বলেই তো মনে হয়।'

পরিতোষ এবারে কঠিন কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল, 'তামাসা ছেড়ে দাও, দিনরাত তো কেবল ঐ নিয়েই আছ। নিজেও যেমন প্রশ্রয় পেয়েছ, অন্যকেও তেমনি প্রশ্রয় দিচ্ছ। 'রুচি আর সাধারণ সম্মানবোধ বলে তোমার কিছু আছে এতকাল আমার ধারণা ছিল।'

পারুল মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'লেও আবহাওয়াটাকে হাল্কা করবার চেষ্টায় হেসে বলল, 'বড় বড় বক্তৃতার আড়ালে নিজের মনের কথা ঢাকতে কেন বৃথা চেষ্টা করছ ঠাকুরপো, হাতের লেখা যেমনই হোক লিখেছে তো তোমারই নাম।'

পরিতোষ সে কথায় কান দিলনা, তেমনি রূঢ় কণ্ঠেই বলে যেতে লাগল, 'সংসারে এমন কি কাজ যা করতে তোমাকে হাঁপিয়ে উঠতে হয়, যাতে অন্য কারো সাহায্য না নিলে একেবারেই চলে না। সন্ধ্যায়-সকালে ঝি তো একটা আসছেই, এর পরেও যদি সাহায্যের

দরকার বোধ করো দাদাকে বলো, তাকে সব সময় রাখবার ব্যবস্থা করে দেবে। ঠাট্টা তামাসার মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে একটা অন্য ঘরের বয়স্থা মেয়েকে দিয়ে নিজের সব কাজ করিয়ে নেয়া আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। তোমার রুচিতে সেটা না বাধতে পারে কিন্তু আমার বাধে।'

পারুল তরল পরিহাসের কণ্ঠে আরো কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু পরিতোষের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল, একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা।'

অস্বস্তিতে সমস্ত মন ভরে উঠল পরিতোষের। এমন গায়ে পড়ে প্রেমে পড়বার চেষ্টা যদি না করত মেয়েটি, তার কদর্য চেহারা সত্ত্বেও পরিতোষ হয়ত খানিকটা সহানুভূতি বোধ করতে পারত। মেয়েটি যদি মনে মনেই তাকে ভালবাসত, তার প্রতিদান দিতে না পারলেও তার জন্য একটু করুণা, একটু অনুকম্পা না এসেই পারত না। শুধু তাই নয়, গোপনে গোপনে আত্মপ্রসাদ বোধ করে নিজের মনও পরিতোষের কিছুটা প্রসন্ন ও সরস হ'য়ে উঠত। কিন্তু শিক্ষাহীন, রুচিহীন আচার-ব্যবহার, আর শ্রীহীন চেহারা নিয়ে রাণী যে সরবে বাড়ি ভরে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে যে তাকে সে ভালবেসেছে, পরিতোষের পক্ষে এর চেয়ে অপমানকর আর যেন কিছু নেই। বাড়িভরা লোকের ঠাট্টা-পরিহাসের পিছনে এ ধরণের একটা মনোভাবই কি নেই যে আসলে পরিতোষ এই ধরণের একটি মেয়েরই উপযুক্ত? এর চেয়ে ভাল কোন মেয়ে তাকে ভালবাসতে পারে না?

শ্যামবাজারের এক যজমানের বাড়িতে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন সেরে চক্রবর্তী মশাই এই সময় ফিরে এলেন। পরিতোষের ঘরের সামনে দিয়েই পথ। ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে পরিতোষকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'এই যে, ছুটি হ'ল আপিস?'

কণ্ঠস্বরের স্নেহের আতিশয্যে পরিতোষের শরীর রি রি করে উঠল। তবু রক্ষা, ইতিমধ্যে জামাতা বাবাজী বলে সম্বোধন করেনি। রূঢ় শুষ্ক কণ্ঠে পরিতোষ বলল, 'হ্যাঁ হোল। শুনুন চক্রবর্তী মশাই, কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

কথার ভঙ্গিতে চক্রবর্তী যেন একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

'কী কথা?'

'ঘরে আসুন।'

চক্রবর্তী মশাই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন।

পরিতোষ একটু চুপ করে থেকে কথাটাকে সাধু ভাষায় গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনাকে যদি কেউ মিথ্যে আশা দিয়ে থাকে তার জন্য দায়ী আমি নই। কিন্তু ঠাট্টা-তামাসায় না ভুলে নিজের অবস্থা বুঝবার বয়স আপনার হয়েছে।'

চক্রবর্তীমশাই বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'এসব কথা কেন উঠল আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

পরিতোষ সশ্লেষে হাসল, 'কিছুই বুঝতে পারছেন না? না-বুঝতে পারায় যেখানে সুবিধে সেখানে আমরা বুঝতে চাইও না, কিন্তু এক্ষেত্রে তা মনে করবেন না।'

চক্রবর্তী চুপ করে রইলেন।

পরিতোষ বলল, 'বেশ, আপনি যদি বুঝতে না পেরে থাকেন আমাকে আরো স্পষ্ট ভাষাতেই বুঝিয়ে দিতে হবে।'

'হ্যাঁ, তা'হলেই ভালো হয়।' চক্রবর্তীর কণ্ঠেও এবার খানিকটা ঝাঁঝের আভাস পাওয়া গেল।

পরিতোষ আরো মরিয়া হয়ে উঠল, 'ভালো হয়? তা হলে শুনুন আপনার মেয়ে আমার ঘরে এসে আমার বইপত্র ঘাঁটাঘাটি করে, যখন তখন নির্লজ্জের মত অমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, এসব আমি মোটেই পছন্দ করিনে। আর এ ধরণের গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠতা করে কিছু যে লাভ হবে তাও আমার মনে হয় না। তার চেয়ে সময় থাকতে আপনাদের অন্যত্র চেষ্টা করাই বোধ হয় ভালো, কথাটা আপনার স্ত্রী এবং কন্যাকে একটু বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলবেন।'

মুখ কালো করে চক্রবর্তী তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন এবং ঘরে গিয়েই সুরু করলেন, 'মান-সম্মান কিছু আর রইলো না, কই সে হারামজাদী, গেছে কোথায়? ফের যদি আবার ওমুখো হতে দেখি ঠেঙিয়ে পা ভেঙে দেব একেবারে। ছি ছি ছি। আর স্পর্ধা দেখ ছোঁড়াটার। কত বড় দেমাক। অমন নির্লজ্জ দুশ্চরিত্র ছেলের হাতে মেয়ে দেবার জন্য যেন জিভ দিয়ে জল পড়ছে আমার, তার আগে মেয়েকে জলে ফেলে দিতে পারব না?'

পরিতোষের ঘরের সামনে এসে নীপু বলল, 'কাকা, মা ডাকছে তোমাকে, এস শিগ্‌গির চা খেয়ে যাও।'

পরিতোষ জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'বল গিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি, বাইরে গিয়ে চা খাব।'

নীপু নেচে উঠল, 'কাকু দাঁড়াও আমিও আসছি, আমিও তোমার সঙ্গে বাইরে চা খাব।'

পরিতোষ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ।'

কয়েকদিন চক্রবর্তী-গৃহিনীর তারস্বর অবিশ্রান্ত চলল। তারপর শুধু আসা-যাওয়া নয়, দুই পরিবারের মধ্যে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেল। কারো সঙ্গে যে কারো পরিচয় আছে তা এদের হাবভাবে কিছুতেই আর বোঝবার জো রইল না।

কয়লা একেবারেই দুর্ঘট হয়ে উঠেছে কলকাতায়। অনেক খুঁজে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে এক বন্ধুর সহায়তায় জোড়াবাগান অঞ্চল থেকে দুমণ কয়লা নিয়ে এলো পরিতোষ। রবিবারের সমস্ত বিকেলটাই মাটি। পারুলকে বলল, 'একটু কম কম করে খরচ কর দেখি বউদি, এত কয়লা লাগে কিসে?'

পারুল একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন থেকে বোধ হয় কয়লার আর দরকার হবে না।'

'কেন ?'

পারুল একটু মুচকি হাসল, 'মানুষের মনের আঁচেই রান্না সেরে ফেলতে পারব।'

পরিতোষ চটল না, হেসে বলল, 'তা যদি পারতে তো আমার আপত্তি ছিল না, কয়লা আনায় যা পরিশ্রম। কিন্তু কাজ নেই সে এক্সপেরিমেণ্টে।'

পারুল বলল, 'কেন ?'

পরিতোষ জবাব দিল, 'রান্না শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আঁচ যদি শেষ না হয়, যদি গিয়ে রাঁধুনীর গায়ে লাগে ?'

মুহূর্তের জন্য পারুলের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, তারপর বলল, 'সেজন্য ভয় নেই তোমার। রান্না করতে করতে হাত এত পেকে গেছে যে আঁচ ওঠাতে যেমন জানি, নেবাতেও তেমনি।'

তিন চারদিন বাদে সকালে এসে পারুল বলল, 'আর এক মণ কয়লা আনতে হবে ঠাকুরপো।'

পরিতোষ সবিস্ময়ে বলল, 'বলো কি ?'

পারুল শুষ্কমুখে বলল, 'হ্যাঁ, না হ'লে এবেলার আপিসের রান্নাই হবে না। আর এরপর থেকে কয়লা বাইরে সিঁড়ির নীচে আর রাখা হবে না। তোমার এই ঘরের মধ্যে রাখতে হবে। কয়লা যে চুরি যাচ্ছে এ আমার আগে থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল, কাল স্বচক্ষে দেখলাম। সত্যি মেয়েটার যে এমন হীন প্রবৃত্তি হবে ভাবতে পারি নি।'

'কি ব্যাপার ? কে আবার চুরি করল তোমার কয়লা ?'

পারুল সবিস্তারে বলতে আরম্ভ করল, 'তবে শোন, কাল রাত্রে দোর খুলে বাইরে এসে কেবল বাথরুমটার কাছাকাছি পর্যন্ত গেছি, দোতলার সিঁড়ির নীচ থেকে রাণী অমনি ফস্ করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তার কাঁখে ছোট ঝাঁকাটা, যেটায় তারা কয়লার টুকরো রাখে। আশ্চর্য কোন ভদ্রলোকের মেয়ে যে এমন—'

হঠাৎ পরিতোষের মুখটা অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে গেল, যেন দারুণ একটা কঠিন আঘাত লেগেছে তার মনে। কিন্তু পরমুহূর্তে বলল, 'হাতে হাতে ধরে ফেললেনা কেন ?'

পরিতোষের মুখের পরিবর্তনটা পারুলের চোখ এড়ায়নি, বলল, 'আমি ধরলে আর লাভ হত কি, যে ধরলে সত্যি সত্যি ধরা পড়ত—'

পরিতোষ রুক্ষ বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমার ঐ বস্তাপচা রসিকতা এবার থামাও তো দেখি।'

ভারি খারাপ লাগতে লাগল পরিতোষের। মনে হতে লাগল রাণীর এই হীন চৌর্যবৃত্তি পরিতোষের নিজের পক্ষেও যেন অত্যন্ত লজ্জাকর এবং অপমানের। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সমস্বরে মা আর মেয়ে তাদের লক্ষ্য করে যে সব অকথ্য গালিগালাজ আরম্ভ করল, তাতে পরিতোষের বিতৃষ্ণার আর অবধি রইল না। পারুল কি বলতে যাচ্ছিল, পরিতোষ বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'চুপ কর, ওদের সঙ্গে আমরাও কি ইতর হব।'

টুকটাক্ আলাপ আলোচনা কানে আসে, রাণীর নাকি বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কি ক'রে চক্রবর্তী মশাই সরোজের সঙ্গে আবার আলাপ জমিয়ে নিয়েছেন, কেনাকাটার ব্যাপারে তিনি তাঁর পরামর্শ চাচ্ছেন এবং সরোজও তা দিতে কার্পণ্য করছে না। কিন্তু ঘর নিয়ে মহাসমস্যায় পড়েছেন চক্রবর্তী। তাঁর ঐ একখানা মাত্র ঘর, তাও গৃহস্থালীর আসবাবপত্রে ঠাসা। সে-ঘর যদি কনে জামাইয়ের জন্য ছেড়ে দেন অন্যান্য ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজেরা যাবেন কোথায়? ইতিমধ্যে দু'চারজন স্বজন বন্ধুদের বাসায় ঘরের খোঁজ নিয়েছেন, কিন্তু কেউ তেমন ভরসা দিতে পারেনি। এ-সব শুনে সরোজ সেদিন নিজেই উপযাচকভাবে বলল, 'সে জন্য ভাবনা কি, পরিতোষ না হয় এক রাত্রের জন্য তার বন্ধুর মেসে গিয়ে শোবে। আপনি ওর ঘরেই মেয়ে জামাইকে তুলতে পারবেন, কোন অসুবিধা হবে না।'

এই উদারতায় ওপক্ষ থেকেও বেশ সাড়া এল। বিয়ের দুদিন আগেই রাণীর মা এসে পারুলকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন, সব দেখে শুনে করে দিতে হবে মা। এখানে তো আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, তোমরাই ভরসা।'

পারুলও বলল, তা কি আর অত করে আপনাকে বলতে হবে মাসীমা? আমরা করব না তো করবে কে?'

কিন্তু সত্যি সত্যি পারুলের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হোল না। বিয়ের দিন ভোরেই ভবানীপুর থেকে খবর এলো পারুলের মা ব্লাডপ্রেসারে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অবস্থা ভালো নয়, কখন কি হয় বলা যায় না। খবর পেয়ে সরোজ স্ত্রীকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেল।

রবিবার, আপিস নেই। ইচ্ছে হলে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গিয়ে আড্ডা দিয়ে আসা যেত। কিন্তু কেন যেন তেমন উৎসাহ বোধ করল না পরিতোষ। ইজি-চেয়ারটায় হেলান দিয়ে অলস, অন্যমনস্কভাবে একটা বইয়ের পাতা উল্টে যেতে লাগল।

রাণীকে মেয়েরা স্নান করাবার জন্য বাইরে নিয়ে এসেছে, একটি বউ তার মাথার ওপরে এক ঘটি হলুদ জল ঢেলে দিল। লালপেড়ে খাটো সাড়িখানা স্থানে স্থানে হলুদে রঙে ভরে উঠল, আর রাণীর সমস্ত চোখমুখ সলজ্জ চাপা আনন্দে। ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বইয়ের পাতায় মন দিল পরিতোষ।

যথারীতি বিয়ে হয়ে গেছে। বর-কনেকে নিজের ঘর ছেড়ে দিয়ে দাদার ঘরে এসে আশ্রয় নিল পরিতোষ। শীতের রাত, তাই গোটা বারোর মধ্যেই এয়োরা ওদের রেহাই দিয়ে যে যার ঘরে চলে গেল। শুয়ে শুয়ে তাও টের পেল পরিতোষ। তারপর তার কানে আসতে লাগল ওদের অস্ফুট মৃদু কথাবার্তা। চাপা হাসির শব্দ আর চুড়ির মিষ্টি আওয়াজ। ঘরখানা হঠাৎ যেন এক অপূর্ব রহস্যে আর ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে।

বিয়ের আসরে কে যেন তার জামায় খানিকটা আতর ছিটিয়ে দিয়েছিল। আলনায় ঝুলান সেই জামাটা থেকে মৃদু বাতাসে মাঝে মাঝে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। সব কিছু

মিলে অদ্ভুত এক স্বপ্নাচ্ছন্নতা। দেখতে দেখতে এক রহস্যময় অহেতুক বেদনায় পরিতোষের অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। এর পর সুশ্রী শিক্ষিতা কোন না কোন মেয়ের অতি-ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে পরিতোষ নিশ্চয়ই একদিন আসবে। কিন্তু এই যে মেয়েটি যার শ্রী নেই, রুচি নেই, প্রয়োজন হলে চুরি করতে যে দ্বিধা করে না, তার দেহের উত্তাপ আর হৃদয়ের স্পর্শ না যেন আরো কত বিচিত্র, আরো কত রহস্যময়। সে রহস্যের দ্বার পরিতোষের কাছে কোনদিনই কি আর খুলবে?'

পটক্ষেপ

রাগে আর অপমানে মুখখানা যেন ফেটে পড়ছে। ও যেন ষ্টুডিয়োতেই কাজ করছে। অস্থিরভাবে তেমনি পায়চারি করতে করতে শ্রীলতা বলল, 'তুমি যদি একটু সাহায্য করো তাহলে শোধ আমি এর তুলতে পারি।'

বললুম, 'সাহায্য করতে আমি রাজী কিন্তু শোধ সত্যি সত্যি তুমি কতটুকু তুলতে পারবে, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।'

শ্রীলতা বলল, 'নিজের সামর্থ্যের ওপর সন্দেহ থাকে তোমার থাক, কিন্তু আমার শক্তিকে অবিশ্বাস করো না।'

মনে মনে হাসলুম, থিয়েটারে সিনেমায় আমার চেয়ে শ্রীলতার নাম ইদানীং একটু বেশিই ছড়িয়েছে। তার কারণ জাতে সে স্ত্রী, রূপ আছে চেহারায়, বয়স যদিও ত্রিশের কাছাকাছি তবু শরীরের বাঁধুনি ভালো থাকায় উনিশ কুড়িতে সে অনায়াসে নামতে পারে। তাই নায়িকার ভূমিকা সে এখনো পায়, ষোড়শী কিশোরীর অংশে এখনো তাকে বেমানান দেখায় না।

আর এই কিঞ্চিদূর্ধ চল্লিশেই আমি একটু বেশি বুড়িয়ে গেছি। ওর বাপের কিংবা আর কোন অভিভাবকের ভূমিকাতেই নামবার সময় চুলে সামান্য কিছু সাদা রঙ মাখলেই চলে। কিন্তু মনের রঙ তবু মুছতে চায় না। অভিনয়ের মধ্যেও এই অকাল বার্ধক্যকে স্বীকার করে নিতে আমার কষ্ট হয়। ফলে ফাঁকে ফাঁকে অশোভন অসঙ্গত চটুলতা ধরা পড়ে। বিদুর কি যুধিষ্ঠিরের ভূমিকাতেও এক একদিন কীচকের মত্ততা প্রকাশ পেয়ে যায়। কর্তৃপক্ষকে বলি যে আসলে হয়তো ভালো লোক ব'লেই ভালো লোকের অভিনয় আমার দ্বারা হয় না। কিন্তু সে কথা তাঁরাও বিশ্বাস করেন না দর্শকেরাও না।

অথচ শ্রীলতাকে আবিষ্কার করেছিলাম আমি। উল্টাডিঙ্গির নিতান্ত অখ্যাত এক পল্লীতে একটা গ্যাস পোষ্টের আড়ালে শ্রীলতা সেদিন দাঁড়িয়েছিল। সেদিন সেই ম্লান আলোয় প্রতিভা অবশ্য ওর মুখে তখনো দেখিনি, কিন্তু রূপ দেখতে পেয়েছিলাম।

আজ চাকাটা ঘুরেছে। স্বরূপ চিনেছে শ্রীলতা। আমার চেয়ে তাই আত্মবিশ্বাস ওর বেশি।

অপমানটা আমাদের করে গেছে হিতাংশু। আমারই আপন মামাত ভাই, কিন্তু পরিচয়টা আজকাল মামাও দেন না, হিতাংশুও সহজে দিতে চায় না। মামা নামজাদা ডাক্তার। হিতাংশু এতদিন খ্যাতনামা ছাত্র ছিল, সম্প্রতি কি একটা সরকারী অফিসে ভাল চাকরী পেয়েছে। ইদানীং কি একটা সঙ্ঘেরও অধিপতি। তাতে ডাক পড়েছে অভিনেতাদের। সেই আমন্ত্রণ নিয়েই হিতাংশু এসেছিল।

ষ্টুডিয়োতে এই সেদিন বইটা শেষ হয়েছে। মধ্য সাপ্তাহিক প্রোগ্রামে মঞ্চেও আজ আর নামতে হয়নি। দয়া করে বন্ধু বান্ধব অনুপস্থিত। প্রমোদটি বহুকাল পরে শ্রীলতার সঙ্গে আজ জমেছিল।

সেই সময় হিতাংশুর কার্ড নিয়ে এল বেয়ারা, বিস্মিত হলুম। কেননা হিতাংশুর সঙ্গে য আমার সম্পর্ক তাতে কোন কারণেই এখানে আসবার ওর কথা নয়।

বললুম, 'শ্রীলতা, তুমি আড়ালে যাও।'

শ্রীলতার তখন ঘোর লেগেছে, বলল, 'পর্দার ওপরে থাকাই আমার অভ্যাস, আড়ালে কেন যাব। আমাকে পর্দানসীন করতে চাও নাকি শেষ পর্যন্ত। করো পরে কোরো। তার আগে দেখি তোমাদের ঋষ্যশৃঙ্গকে।'

হিতাংশু ঘরে ঢুকেই এক পা পিছিয়ে গেল, যেন ভয়ানক একটা খারাপ জায়গায় ঢুকতে যাচ্ছিল। আমি উঠে এগিয়ে গেলাম, 'এসো হিতাংশু।' নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই হয়তো নাকে রুমাল চাপতে পারল না, কিন্তু মুখটা ঈষৎ বাঁকিয়ে নিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল, 'আমি না হয় আরেক দিন আসব সোমনাথদা।' হেসে বললুম, 'আরেক দিন তো আসবেই। কিন্তু আজকের আসাটাকেই বা এমন ব্যর্থ করে দেবে কেন, বছরদশেক পরে দেখাটা যখন আজ হয়েই গেল, তখন একটু না হয় বসেই যাও।'

হাত ধরে টেনে আনলুম শ্রীলতার সামনের সোফায়, পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললুম, 'ইনি শ্রীলতা। কমলাক্ষীর নাম ভূমিকায় দেশীয় অভিনেত্রীদের মধ্যে ইনি তৃতীয় স্থান দখল করেছেন।'

হিতাংশু স্বল্প একটু হাসল, ছোট্ট একটু নমস্কার করল, তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বেশিক্ষণ বসবার আজ সময় নেই। আপনি শনিবার সাড়ে ছয়টায় আমাদের সঙ্ঘে উপস্থিত থাকলে খুসি হব। এই নিন কার্ড, আমাদের সঙ্ঘের নাম এবং উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই শুনেছেন।' আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'কিছুমাত্র না।'

হিতাংশু মুখ লাল ক'রে বলল 'কেন কাগজ কি আপনারা পড়েন না?'

'মাঝে মাঝে পড়ি।'

'মাঝে মাঝে! দেশের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে আপনাদের যোগ এত কম বলেই আমাদের শিল্প এমন পিছিয়ে পড়েছে। মহৎ জীবন না হলে মহৎশিল্প সৃষ্টি কি করে সম্ভব হবে।'

হেসে বললুম, 'তাতো বলতে পারি না হিতাংশু, কেবল এইটুকু জানি মদ যেদিন বেশি খেয়ে যাই সেদিনই পিতামহ ভীষ্মের ভূমিকায় জমাতে পারি বেশি।'

হিতাংশু বলল, 'আজও আপনি একটু বেশি জমে রয়েছেন ব'লে মনে হচ্ছে, আচ্ছা এ সম্বন্ধে আলোচনাটা প্রকাশ্য অধিবেশনেই করা যাবে। দয়া করে যাবেন কিন্তু।'

হিতাংশু চলে গেলে শ্রীলতা বলল, 'তোমার শ্মশ্রুশৃঙ্গ নিশ্চয়ই আমার নামও শোনেনি, অভিনয়ও দেখেনি, না হ'লে তোমার চেয়ে নিমন্ত্রণটা আমারই বোধ হয় বেশি প্রাপ্য ছিল।'

বললুম,'বাঙলা দেশের কেবল অভিনেতাদেরই ওরা ডেকেছে। নাটকটা বোধ হয় স্ত্রী ভূমিকা-বর্জিত, তা ছাড়া আমার এই সামান্য সম্মানে তুমি এত ঈর্ষা করছ কেন। তোমার গৌরবভার বয়ে বয়ে আমি অকালে বৃদ্ধ হয়ে গেলাম আর আমার ক্ষীণতম গৌরব তোমার এমন অসহনীয় লাগছে। আমি কি এতই পর ?'

শ্রীলতা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'ঢং কোরো না, তুমি কি সত্যিই যাবে না কি ওখানে ?'

আমি হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললুম, 'রাম বলো।'

অবশ্য কেবল শ্রীলতার নিষেধই নয়। না যাওয়ার ব্যক্তিগত আরও একটু কারণ ছিল।

বাপ মা অল্প বয়সেই মারা গিয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন। সাত আট বছর বয়সে থেকে মামা বাড়িতেই মানুষ। তখন তিনি কেবল প্র্যাকটিস সুরু করছেন। বাড়িতে আমি অপ্রতিদ্বন্দ্ব, সদ্য বিবাহিত দম্পতির মনে তখনো বাৎসল্যের আবির্ভাব হয়নি। তবু তাঁদের মাঝখানে আমার ভূমিকাও নিতান্ত নগণ্য ছিল না। প্রণয় কলহে পরস্পরের মধ্যে যখন কথা বন্ধ থাকত আমাকে করতেন ট্রানসমিটার। ওপর থেকে নিচে টুকরো টুকরো চিঠি নিয়ে যেতাম, নির্ভুল বিনিময় করতাম সাঙ্কেতিক শব্দগুলির। সেই বয়সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাঁজ করা রঙীণ কাগজের টুকরোগুলি দেখতাম খুলে। প্রথম ভাগ পড়া বিদ্যেয় জড়ানো লেখার প্রায় কিছুই পড়ে উঠতে পারতাম না, কিন্তু তার রঙটুকু তখন থেকেই যেন চোখে পড়তে সুরু ক'রেছিল।

তারপর হলো হিতাংশু, ও যত বাড়তে লাগল আমার মধ্যবর্তিতার প্রয়োজন কর্পূরের মত ক্ষয় হতে লাগল। তাও সইল কিন্তু একদিন মামীমা আবিষ্কার করলেন আমি হিতাংশুকে দেখতে পারি না. তাকে হিংসা করি, গলাটিপে তাকে মেরে ফেলতে চাই। ফলে সন্দেহ সতর্ক দৃষ্টির বেড়ায় ও রইল ঘেরা। নিচের ঘর থেকে ওর দোতলার ঘরে আমার যাওয়ার অধিকার রইল না, কেননা চাকরদের সঙ্গে আমাকে একদিন বিড়ি খেতে দেখেছেন মামীমা। অতঃপর এক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটি দেশলাই হিতাংশুর বইপত্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে এলাম। সে বিড়ির বাণ্ডিল মামীমার হাত থেকে আমার হাতে এসে পৌছল। নিঃশব্দে সহ্য করলাম তিরস্কার আর কানমলা।

আর একদিন দেখা গেল হিতাংশুর টেবিলের ওপর যে রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দের ছোট ছোট দুখানি ফটো রয়েছে বাঁধানো, তার পাশে একটি অনাবৃত ফরাসী অভিনেত্রীর প্রতিকৃতি। মৃদু কাণমলা চটি জুতায় উত্তীর্ণ হোল, আমিও চললুম পাল্লা দিয়ে।

তামাক থেকে মদে গিয়ে পৌছলাম, মদ থেকে মদীরাক্ষীতে। মামার কনিষ্ঠ কম্পাউণ্ডার বিষ্ণুবাবু প্রথম দীক্ষা দিলেন। আমিও ছোট বড় অনেককেই দীক্ষিত করলুম কিন্তু হিতাংশুকে ছুঁতে পারলাম না। ও আমাকে উপদেশ দিল, অনুকম্পা করল, কিছুতেই কাছে ঘেঁষল না।

মামীমা তারস্বরে বলতে লাগলেন, 'তাড়াও তাড়াও, ও আমার সর্বনাশ করে তবে যাবে, এর পরেও যদি বেশি মায়া থাকে ভাগ্নের ওপর হোষ্টেল বোর্ডিংএ দাও কিন্তু আমার বাড়িতে আর নয়।'

হোষ্টেল বোর্ডিংএও টিকতে পারলুম না। সেখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মামীমার চেয়েও বেশি পিওরিটান, মামাকে দিনের পর দিন রিপোর্ট করতে লাগলেন। মামা রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমার মুখ আর আমি দেখতে চাইনে। এক পয়সাও তোমাকে আর আমি দিতে পারব না।'

মুখ আর দেখালাম না। বার দুয়েক আই-এ ফেল ক'রে তৃতীয়বারের জন্য বিরক্ত এবং নিরাসক্তভাবে বইপত্র নাড়াচাড়া সুরু ক'রেছিলাম, দিলাম ছেড়ে। এক মার্চেণ্ট অফিসে চল্লিশ টাকার চাকরি জোগাড় করা গেল, তারপর চলল অবাধ স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা, চল্লিশ লক্ষ টাকাতেও অন্য কারো পক্ষে যা সম্ভব হোত না।

কিন্তু হিতাংশুর ওপর লোভ আমার রয়েই গেল। ক্লাসের পর ক্লাস ডিঙিয়ে ডিগ্রীর পর ডিগ্রী নিয়ে চলল। সহর ভরে ছড়িয়ে পড়ল ওর খ্যাতি। বিড়ি আর ফরাসী অভিনেত্রী ওকে ছুঁতেও পারল না।

ট্রামে বাসে পথে পার্কে মাঝে মাঝে দেখা হোত ওর সঙ্গে। কথা বলতে বলতে চুপ ক'রে যেতাম, ওর চোখে অনুকম্পা আর কৌতুক। মুখে মোহমুদ্গারের শ্লোক। আমাকে হাসতে দেখে ও আরো গম্ভীর হোত—কঠিন হয়ে উঠত। আর কিছুই ওকে স্পর্শ করতে পারত না, হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, স্নেহ পর্যন্ত নয়।

সেই হিতাংশু আজ আমার বাড়িতে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে এসে হাজির হয়েছে। বাড়ি অবশ্য এখন আর আমার নয়, শ্রীলতার। কিন্তু দিয়েছি তো আমিই। অবশ্য দেওয়ার কৃতিত্বের চেয়ে কৃতার্থতা বেশি। দিতে চেয়েছিল অনেকেই কিন্তু নিয়েছে শ্রীলতা আমার কাছ থেকে।

হিতাংশুর আজ আর ভয় নেই, আমার সংস্পর্শে চরিত্র হারাবার আর আশঙ্কা নেই তার, আমাকে আজ সে উন্নীত করতে এসেছে জনসমাজের সঙ্গে - শিল্পী রসিক গুণীজনের সঙ্গে আমার পরিচয় আর প্রতিষ্ঠা সে আরো ব্যাপকতর ক'রে দেবে। কিন্তু যে আমার

স্নেহকে পর্যন্ত ঘৃণায় ফিরিয়ে দিল তার দাক্ষিণ্য আর শুভেচ্ছাকে আমি নিতে যাব কোন লজ্জায়।

শ্রীলতাকে বললুম, 'রাজী আছি তোমাকে সাহায্য করতে।'

হিতাংশুদের প্রকাশ্যে অধিবেশনে গেলাম না, শ্রীলতার সঙ্গে গোপন অধিবেশনের আয়োজন চলতে লাগল।

দিন কয়েক বাদে চিঠি গেল হিতাংশুর নামে। শ্রীলতার প্যাডে শ্রীলতারই লতানো হাতের লেখায়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য হিতাংশুর দাদা যে যেতে পারেননি সেজন্য শ্রীলতাই লজ্জিত হয়েছে বেশি। হিতাংশু তাতে যেন ক্ষুব্ধ না হয়। আমাদের দেশে ওই ধরণের সম্মেলনে শ্রীলতাদের উপস্থিত থাকবার ভাগ্য এখনো হয়নি। তার জন্য প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। কিন্তু তার আগে গভীর কুণ্ঠায় পরম সঙ্কোচে শ্রীলতা একটি প্রশ্ন করবার স্পর্ধা জানাচ্ছে—হিতাংশু কি অনুগ্রহ ক'রে আর একবার এখানে পদধূলি দিতে পারেন না, নির্ধারণের চেষ্টা করা যায় না মহৎ জীবনের সঙ্গে মহৎ শিল্পের সত্যিকারের সম্পর্কটা কি ?

দিন কয়েক নীরবে কাটল। তারপর এক পোষ্টকার্ড এল হিতাংশুর। সে আসছে। সন্ধ্যায় নয়, সামনের ছুটির দিনে সকালে।

সময় নির্বাচনের মধ্যে সে দিনের কি একটু ইঙ্গিত যেন ছিল, শ্রীলতার মুখ ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল দেখতে পেলাম।

সকালেই স্নান সারল শ্রীলতা। আচলের ফাঁকে ভেজা চুল ছড়িয়ে রইল পিঠের ওপরে। চাওড়া লাল পেড়ে সাধারণ শাড়ী মাত্র পরনে। সিঁথিতে সিদুরের রেখা পড়ল, কপালে ছোট ক'রে ফোঁটা। পায়ে আলতার ক্ষীণ দাগ, যেন সকালের রোদে গলে গেছে, শিশিরে গেছে ধুয়ে।

বললুম, 'বড় বেশী বাড়াবাড়ি হোল। একেবারে উর্ব্বশী থেকে গৃহলক্ষ্মী। আতিশয্যটা অচিরাৎ ধরা পড়বে।'

শ্রীলতা বলল, 'তুমি চুপ করো।'

আমি চুপ করলুম—শ্রীলতাই কথা বলতে লাগল।

নমস্কার বিনিময়ের পর হিতাংশু বলল—সে দিন অমন ক'রে হঠাৎ চ'লে যাওয়ার জন্য সে লজ্জিত। কিন্তু সত্যিই তার বড় তাড়া ছিল।

শ্রীলতা সেদিনের কথা স্মরণ ক'রে লজ্জায় মুখ নামাল, কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'তাড়া না থাকলেও আপনাকে থাকতে বলবার সেদিন জোর ছিল না।'

আরক্ত মুখে হিতাংশু বলল, 'সে কথা থাক।'

সে কথা রইল।

শ্রীলতা বলল, 'এক কাপ চায়ে আপনি নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না।'

হিতাংশু ইতস্ততঃ ক'রে বলল, 'আপত্তির কি আছে। কিন্তু চা তো এইমাত্র খেয়ে এলাম।'

শ্রীলতা স্নিগ্ধ একটু হাসল, 'তাতে কি হয়েছে। কেবল একটু চা তো, ওটা খেয়ে সবাই আসেন আবার এসেও সবাই খান।'

উৎকর্ণ হয়ে উঠলুম। অন্যের বানানো কথাই এতদিন শ্রীলতাকে মুখস্থ বলতে শুনেছি। কিন্তু নিজেও যে ও এমন বানিয়ে কথা বলতে পারে তাতো জানা ছিল না।

স্বহস্তে ট্রেতে ক'রে দু' কাপ চা নিয়ে এল শ্রীলতা। ফুটন্ত পদ্মের মত বড় বড় নীল রঙের দুটি কাপ, ভেতরে তরল তামাটে রঙের পানীয়।

একটি কাপ আমার চেয়ারের হাতলে নামিয়ে রাখল শ্রীলতা। দ্বিতীয়টি নিজ তুলে দিল হিতাংশুর হাতে। সামান্য একটু ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেল। আর তাতেই শ্রীলতার সিঁথির সিঁদুর তার সমস্ত মুখে যেন ছড়িয়ে পড়ল।

মনে মনে বললুম—'অপূর্ব। লজ্জার এমন অভিব্যক্তি কোন চতুর্দশী কিশোরীর পক্ষেও সম্ভব হোত না।' শিল্পে আতিশয্যকে ক্ষমা করি, কেননা অপ্রত্যাশিতকে পাই।

আড় চোখে তাকিয়ে দেখলুম সিঁদুর কেবল নিজের মুখেই শ্রীলতা ছড়ায়নি, তার ছাপও ফেলেছে আরেকজনের ওপর।

হিতাংশু বলল, 'বা রে, কেবল আমাদেরই দিলেন, আপনি নিলেন না চা।'

শ্রীলতা হেসে বলল, 'না, আমি চায়ের তত ভক্ত নই।'

হিতাংশু বলল, 'কেবল অন্যদের বুঝি ভক্ত বানাতে চান।'

এবারে চমৎকৃত হলুম। সেই জ্যামিতি আর জীবনচরিত পড়া মুখচোরা হিতাংশু কথায় এমন ব্যঞ্জনা মাখাতে শিখল কবে। ভুলে গেলাম ব্যঞ্জনাটা চেষ্টা করে লাগাতে হয় না, একটা নির্দিষ্ট বয়সে হাসিতে কথায় ওটা আপনিই এসে লাগে।

কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর তোমাদের সম্মেলনের খবর কি হিতাংশু। সেদিন জমায়েৎটা বেশ আশানুরূপ হয়েছিল তো?'

হিতাংশু বলল, হ্যাঁ, কেন হবে না। চেষ্টার তো আমরা ত্রুটি করিনে।'

হেসে বললুম, 'চেষ্টার ত্রুটি না হলেই কি ফলটা সব সময় আশানুরূপ হয়? তা হ'লে বল আশাটাই তোমাদের ফলের অনুরূপ। ফল দেখে সেটা ওঠে আর নামে।'

হিতাংশু বলল, 'তা নয়। ফল আশানুরূপ না হ'লেও আমরা হতাশ হইনে। সময়ের জন্য আমরা অপেক্ষা ক'রতে পারি।'

হঠাৎ হিতাংশু শ্রীলতাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বলেন। তাই কি উচিৎ নয়?'

শ্রীলতা যেন একটু ঘাবড়ে গেল, বলল, 'নিশ্চয়ই, অপেক্ষা তো ক'রতেই হবে।'

হিতাংশু বলল, 'না, শুধু অপেক্ষা করলেই চলবে না। কাজের মধ্য দিয়ে সময়কে

এগিয়েও আনতে হবে। আমি ভেবেছি আমাদের পরের অধিবেশনে আপনাদেরও এরপর আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করব।'

শ্রীলতা সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'না না, অত ব্যস্ত হবেন না। প্রথমেই অত তাড়াতাড়ি করতে গেলে ফল হয়তো খারাপ হবে।'

দেখলুম বিষয়গুলি শ্রীলতার অভ্যস্ত অংশের বাইরে চলে যাচ্ছে। সুতরাং আলোচনার মোড়টা ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার।

বললুম, কিন্তু সেখানে গিয়ে এরা করবে কি?'

হিতাংশু বলল, 'যোগ দেবেন আলোচনায়। সকলের কথা শুনবেন, বলবেন নিজেদের কথা।'

হেসে বললুম, 'নিজেদের আবার কথা কি আছে। অন্যের কথা মুখস্থ ক'রে কোন্ ভঙ্গিতে কোন্ কৌশলে শ্রোতাদের শোনাতে হয় সে বিদ্যা এরা তো যথাস্থানেই দেখিয়ে থাকে।'

এরকম বিশ্বাসঘাতকতার কথা ছিল না।

দেখলুম শ্রীলতার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, বলল, 'আমরা কি কেবল অন্যের কথা মুখস্থই বলি?'

বললুম, 'যখন বলো না, তখনই বিপদে ফেল।'

শ্রীলতা আরো চটে গেল, বলল, 'হ্যাঁ, বিপদ এড়াবার জন্যই আমাদের দিয়ে কেবল তোমরা মুখস্থ করাও তা জানি। কিন্তু এটা জেনো, মুখস্থ করা কথা যখন সবাইকে শোনাই তখন তা একান্ত আমারই কথা আর কারো নয়।'

হিতাংশু খানিকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক বলেছেন।'

জীবন আর শিল্পের আলোচনা সেদিন স্থগিত রইল। অন্যান্য দু' একটি কথাবার্তার পর হিতাংশু উঠে গেলে শ্রীলতাকে বললুম, 'শাপে বর হোল। তোমাকে চটিয়ে দিয়ে ভালোই করেছি। আসরটা প্রায় মিইয়ে এসেছিলে। গরম হয়ে ফের গরম করে দিতে পেরেছ। আর একটু উষ্ণতার আশা রাখি।'

শ্রীলতা গম্ভীর মুখে বলল, 'না, এখন থাক।'

আরো দু' একটা উপলক্ষে হিতাংশুকে চিঠি লিখতে হোল। তারপর আর চিঠি লেখার দরকার হোল না। সে নিজেই বলল, 'যোগাযোগ কেবল আনুষ্ঠানিক সভা-সমিতিতে হবে না, তার জন্য আরও ঘনিষ্ঠভাবে এদের সঙ্গে এসে মিশতে হবে। আমাদের দেশের এই সব শিল্পীদের চিন্তার জড়তা, অভ্যাসের কুশ্রীতা নইলে দূর হবে না। আর জীবনকে সহজ সুন্দর নির্মল না করতে পারলে শিল্পও সার্থক হবে না, মহৎ হবে না'।

সুতরাং হিতাংশু আসতে লাগল, তার চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল শ্রীলতার। মনে মনে হাসলুম—এই তো চাই। স্বীকার করলুম কৃতিত্বকে। আমি যা

পারিনি, তা সে পেরেছে। কিন্তু এই কৃতিত্বের ফলটা আমিও ভোগ করব। যথাসাধ্য সুযোগ দিতে লাগলাম, শ্রীলতাকে সাহায্য করতে লাগলাম। হিতাংশুর যখন আসবার কথা থাকে আমি তখন থাকি না। আশা করি, না চটেও শ্রীলতা তখন আসর জমিয়ে রাখতে পারে। কোনদিন এসে শুনি চলছে অভিনয়-কলা সম্বন্ধে আলোচনা, কোনদিন বা সাহিত্যের কোনদিন বা রাজনীতির। নানারকমের বইপত্র শ্রীলতার টেবিলে জমতে থাকে, ভরতে থাকে শেলফের তাকগুলি। ইংরেজী শিখবার আগ্রহ তার দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

রেডিও থামিয়ে হিতাংশুর অনুরোধে মাঝে মাঝে গানও গায় শ্রীলতা। তার যে সব পুরোন গান রেকর্ড থেকে রেডিয়োতে, রেডিয়ো থেকে সহরবাসীদের মুখে মুখে ফিরেছে সে সবের পুনরাবৃত্তির মধ্যে যেন নতুন সুর, নতুন ব্যঞ্জনা, নতুন প্রাণ এসে যোজিত হয়।

একেকবার সন্দিগ্ধ হয়ে তাকাই, অভিনয়টা সত্যি কার সঙ্গে আরম্ভ করল শ্রীলতা। সহজে ধরা যায় না, সহজে ধরা দেয় না, ওরা জাত অভিনেত্রী।

একেকবার ভাবি হিতাংশুকে এবার জিজ্ঞাসা করি আমাদের সঙ্গে হিতাংশু যে এখন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তাতে আমার শুচিবায়গ্রস্থ মামা মামী কি ভাবছেন, বলছেনই বা কি। না তাঁরাও রাতারাতি সমাজ সংস্কারক হয়ে উঠলেন! কিন্তু চেপে যাই। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। জিজ্ঞাসা করবার সময় তো আসছেই। বহু জিজ্ঞাসা যে ওর মনেও এসে ভিড় করেছে তাও তো লক্ষ্য করছি।

কিন্তু শ্রীলতার হোল কি। কি পেল, কি এমন দেখল সে হিতাংশুর মধ্যে। অভিনয় নিয়ে এমন করে মেতে উঠতে ওকে কখনো দেখিনি, আসল অভিনয়ে ওর অন্যমনস্কতা ধরা পড়ছে। ষ্টুডিয়োতে কাজ করতে করতে ওর চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, 'সত্যি সত্যিই শেষে প্রেমে পড়ে যাবে না কি? খবরদার, খবরদার।' শ্রীলতাও হাসে, 'ঘাবড়িয়ো না। তেমন বুঝলে আগেই জানিয়ে রাখব। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ধরে তুলতে পারবে।'

বছর সাতেক যাবৎ শ্রীলতার সঙ্গে আমার পরিচয়। দুজনেই দুজনকে চিনি, কারো কাছেই নির্ভেজাল একনিষ্ঠতা আমরা প্রত্যাশাও করিনে দাবীও করিনে। কিন্তু উল্টো দিক থেকে শ্রীলতা যেন দিনের পর দিন একনিষ্ঠই হয়ে উঠেছে। কি পেয়েছে সে হিতাংশুর মধ্যে? এতদিন শিল্পী-জীবনের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতার আর উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে জীবন-রহস্যের সম্বন্ধ যে অঙ্গাঙ্গী তাতে তার কোন সংশয় ছিল না। আজ কি তার ধারণা বদলেছে, রুচি বদলেছে? জীবনের সমস্ত রস, সমস্ত রহস্য সে খুঁজতে চেষ্টা করছে বিধানের মধ্যে, চরিত্রবানের মধ্যে, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের মধ্যে? আমি কি ঠকে যাচ্ছি? আমি কি প্রতারিত হচ্ছি?

কিন্তু প্রতারণা ওরা করল না। বছর খানেক পরে হিতাংশু পরিষ্কার ভাষায় বলল—শ্রীলতাকে সে বিয়ে করতে চায়। শ্রীলতার দিকে তাকালুম। সে তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিল, ভাবলুম হয়তো হাসি গোপন করে নিচ্ছে শ্রীলতা। হিতাংশুর ওপর দয়া হোল। এবার ওকে রেহাই দেওয়া উচিত।

হেসে বললুম 'কি বলছ হিতাংশু! চায়ের সঙ্গে তোমার বউদি বোধহয় পরিহাস করে কিছু মিশিয়ে টিশিয়ে খাইয়েছেন?'

শ্রীলতা চমকে উঠল, বলল, 'কক্ষণো নয়।'

এবার আমার চমকাবার পালা।

তিক্ত হেসে বললুম, 'মদের কথা বলছি না। তা ছাড়াও তো মেশাবার মত আরো অনেক নেশার জিনিস তোমাদের আছে। কিন্তু সে নেশাও চিরস্থায়ী নয়, তাও একদিন ভাঙবে। তখন কি উপায় হবে তোমার? তখন কি উপায় হবে হিতাংশুর?'

হিতাংশু বলল, 'সে ভাবনা আমারাই ভাবব।'

বললুম, 'চমৎকার। কিন্তু সম্প্রতি বোধ হয় আরো কিছু তোমাকে ভাবতে হবে হিতাংশু। তোমার মা বাবার কথা, সমাজের কথা, আত্মীয় স্বজনের কথা।'

চাকা ঘুরেছে। মোহমুদ্গর আওড়াবার ভার এবার আমার ওপর।

হিতাংশু আস্তে আস্তে বলল, 'তার আগেও আপনার কথাই আমার ভাবা উচিত ছিল। ভাবিনি যে তাও নয়।'

হেসে উঠলুম, 'সত্যি না কি? ভেবে বুঝি শেষ পর্যন্ত এই ঠিক করলে?'

হিতাংশু বলল,—'হ্যাঁ। আপনার ছেলে মেয়ে আছে, স্ত্রী আছে—'

বললুম, 'সুতরাং আমার এই বাড়তি উপস্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার অধিকারও তোমার আছে। চমৎকার যুক্তি। তোমাদের সঙ্গে পার্থক্য আমাদের এই—আমরা যখন বদমাস নির্ভেজাল বদমাস, তখনো সমাজ সংস্কারের মুখোস পরে থাকি না।'

হিতাংশু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বোধ হয় নিজেকে সংযত করে নিল, তারপর, বলল, 'আপনি হয়তো প্রকৃতিস্থ নেই।'

বললুম, 'হয়তো তোমার চেয়ে অনেক বেশী প্রকৃতিস্থ আছি।'

শ্রীলতা শান্তভাবে আমার দিকে আস্তে আস্তে বলল, 'তর্ক করে কি লাভ।'

জবাবে অনেক কথা এসেছিল, কিন্তু সে কথা তুলে লাভ নেই, তর্ক করে লাভ নেই সত্যিই। একথা শ্রীলতাকে আজ মনে করিয়ে দিতে যাওয়া ভুল যে আমিই তাকে প্রথম রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম, প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম দশজনের মধ্যে। তার আজকের এই সমস্ত খ্যাতি, সমস্ত প্রতিপত্তির মূলে ছিলাম আমিই। একথা শ্রীলতাকে

মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই। সে কথা থাক। সেই উপকারের কথা না হয় না-ই তুললাম, তার চেয়েও কি বড় কিছু করিনি। এই দীর্ঘ সাত আট বছর ধরে তাকে কি একটুও ভালোবাসিনি? সেই ভালোবাসায় সমাজের স্বীকৃতি অবশ্য ছিল না, ভবিষ্যৎকে মজবুত করবার জন্য আইনের বাঁধন কিছু ছিল না, তা সত্ত্বেও এই দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতার কি কোন মূল্যই নেই? এমন শান্ত নির্বিকারভাবে শ্রীলতা আজ বলতে পারল কোন লাভ নেই তর্ক করে?

লাভ নেই তা ঠিকই। শ্রীলতা একাধিক কোম্পানীর সঙ্গে আজ চুক্তিবদ্ধ রয়েছে। তাতে বিচ্যুতি ঘটলে আইনগত নানা অসুবিধা আছে; কিন্তু আমার সঙ্গে তার এই অলিখিত চুক্তি নিঃসংশয়ে সে ভাঙতে পারে। সমাজ কিংবা আইন তাকে স্পর্শ করবে না।

খবর পেয়ে মামা-মামী এলেন মোটরে। মামা বলেলেন, 'যদি একদিনের অন্নও আমার কাছে তুমি পেয়ে থাক ওকে ফেরাও।'

মামীমা হাসলেন, 'কাকে কি বলছ। ওই তো এসব করেছে। ও তো এই চায়, এই চেয়েছিল!'

বললুম, 'এই চেয়েছিলাম।'

'তাছাড়া কি। ছেলেবেলা থেকে অনুক্ষণ তোমার তো এই চেষ্টাই ছিল। কিসে ওকে নষ্ট করবে। মনে নেই সেকথা? আজ পেরেছ। নিজের নাক কেটে পেরেছে আজ অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করতে।'

হিতাংশুকে ফেরান গেল না। শ্রীলতাকেও না। সাধারণ সহজ ভাবে আমি ওদের ফেরাতে চেষ্টাও করলাম না। শাসন তিরস্কারও নয়, অনুনয় বিনয়ও নয়। আমি ভেবে রেখেছি আমার পদ্ধতি। শ্রীলতাকে আমি হয়তো ফিরিয়ে নিতে পারব না, কিন্তু অতীতকে, কুশ্রী কলঙ্কমলিন অতীতকে, প্রণয়-মধুর, বেদনাভরাতুর অতীতকে বারংবার ওদের মধ্যে বয়ে নিয়ে যেতে পারব।

বিদায় দিলাম শ্রীলতাকে। বললুম, 'অভিনয়ের সময় অভিভাবক বা ব্যর্থপ্রেমিকের বেশে বহুবার তোমার নবপ্রণয়কে আশীর্বাদ করেছি, অভিনন্দন জানিয়েছি। আজ আর তা করব না শ্রীলতা। আমি জানি আমার শুভেচ্ছা তোমার না হলেও চলবে।'

শ্রীলতা কথা বলল না, দুটো চোখ আরও ছলছল করে উঠল।

কিন্তু এসব ব্যাপারে ওর অভ্যস্ততা তো দীর্ঘকালের। হেসে বললুম 'যাও, এই মুহূর্তে নাট্যকার আমার মুখে কোন কথা বসিয়ে দেন নি। আমার কিছু বলবারও নেই, করবারও নেই। অদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেবল হাসতে হবে।'

শ্রীলতা যেন একটু শিউরে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তা কেন, তোমার আরো অনেক করবার রইল।'

হেসে বললুম, 'রইলই নাকি ?'

শ্রীলতা আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামাল। বলল, 'হ্যাঁ, তুমি আমাকে সাহায্য কোরো।'

কি রকম করে উঠল মনের মধ্যে। কিছু বলতে পারলুম না। জানি আজ এই সাহায্যের অর্থটা কি। কিন্তু শ্রীলতার গলার ওই কম্পনটুকুর মধ্যে অর্থাতীত কি আর কিছুই নেই ?

পতাকা

ছবি মিত্র

করকমলেষু

শ্রেণীপ্রমিথুন

নতুন ভাড়াটের জন-সংখ্যা দেখে বাড়ির অন্য চার ঘর ভাড়াটের প্রত্যেকে ভারি তৃপ্তি বোধ করল। সংখ্যায় মাত্র দুজন, স্বামী আর স্ত্রী—একটি সংসারের একেবারে সংক্ষিপ্ততম রূপ। ছেলেপুলের ঝামেলা নেই, বাড়তি আত্মীয় স্বজন নেই, অনুক্ষণ বকবক করবার জন্য একটি বুড়ি মা পর্যন্ত এদের সঙ্গে আসেননি, একেবারে নিঝ'ঞ্ঝাট, বাহুল্যহীন একঘর আদর্শ ভাড়াটে।

এদের আগে উত্তর পশ্চিম কোণের এই ঘরটাতেই ছিল কুঞ্জ কম্পাউণ্ডার। স্ত্রী, ছ'টি ছেলেমেয়ে আর একটি খিটখিটে মেজাজের মা তো ছিলই এর পরে আবার মাঝে মাঝে কুটুম্বস্বজনও এসে উদয় হোত, শাশুড়ী গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এসে দু একমাস কাটিয়ে যেত, শালী আসত চোখের চিকিৎসার জন্য, কুঞ্জ কাউকে না ক'রত না, নির্বিকার মনে সবাইর জন্যই ঘরের দোর খুলে রাখত। যত ঝক্কি পোহাতে হোত অন্যান্য ভাড়াটেদের চৌবাচ্চায়। জল পাওয়া যেতনা, সদরের সরু পথটুকুর মধ্যে পা ফেলবার জো থাকত না, সেখানেও কুঞ্জের সন্তান আর স্বজনেরা ছড়িয়ে থাকত।

সেই জায়গায় এরা এল কেবল দুজন, মন্মথ আর লতা। স্বাস্থ্যবান ছাব্বিশ সাতাশ বছরের যুবক আর একুশ বাইশের ফর্সা আর ছিপছিপে গড়নের একটি বউ, দেখে প্রত্যেকের মনই প্রসন্ন হয়ে উঠল, পাশের ঘরের প্রৌঢ় বিপিনবাবু বললেন, 'এতদিনে বাড়ির শোভা বেড়েছে।'

দোতালার বুড়ো নিবারণ বাড়ুয্যে ছেলেপুলের কান এড়িয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'ভারি চমৎকার মিলেছে। ওদের দেখে বছর তিরিশেক আগেকার দিনগুলির কথা মনে পড়ে। তখন দেখতে তুমি ওই রকমটি ছিলে '

নিভাননীর সামনের দু' তিনটি দাঁত নেই। হাসিতে তবু যেন সেই কৈশোরের লজ্জা এসে দেখা দিল, স্বামীর চোখের সামনে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'কি যে বল।'

নিবারণবাবুর মেজ ছেলে বিনয় কলেজে পড়ে, সে-ই এরই মধ্যে দু'তিনবার এসে মন্মথদের সঙ্গে আলাপ ক'রে গেল। বলল, 'কোন রকম দরকার হ'লেই ডাকবেন। একেবারে পর মনে করবেন না যেন বউদি।'

লতা খাটো ঘোমটার আড়াল থেকে মৃদু হেসে জবাব দিল, 'পর কেন মনে ক'রব, এখানে আপনারাই তো সবচেয়ে আপন।'

কিন্তু সপ্তাহ খানেক কাটতে না কাটতেই সবাইর ধারণা আর সম্বন্ধ দুইয়েরই পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল।

মন্মথদের ঠিক সামনে দুখানা ঘর নিয়ে থাকে বিভূতি, কোন্ এক মার্চেন্ট অফিসে

কাজ করে। তার মা কাত্যায়নী এসে সেদিন লতাদের ঘরের সামনে দাঁড়ালেন, 'তোমার আঁশ বটিখানা দাওতো মা। বাজার থেকে একটা গোটা ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছে ছেলে, কিন্তু বটিখানার দশা এমন যে চোরের নাক কাটেনা। কোন দিকে যদি একটু লক্ষ্য থাকে বউয়ের, তোমার বটিখানা একবার যদি দিতে মাছটা কুটে নিতুম।'

লতা বলল, 'কিন্তু ও বটিতে তো আপনি মাছ কুটতে পারবেন না মাসীমা।'

কাত্যায়নী অবাক হয়ে বললেন, 'কেন, তোমার তো বেশ নতুন বঁটি, দিব্যি ধার আছে।'

লতা বলল, 'তা আছে, কিন্তু বাঁটের ভিতরে ভাল করে বসেনা, ভারি ঢল ঢল করে।'

কাত্যায়নী সস্নেহে হাসলেন, 'তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ মা, এই তো খানিক আগেও দেখলুম তুমি বসে বসে দিব্যি মাছ কুট্‌ছ, বঁটি একটুও ঢল ঢল ক'রছে না।'

লতার মুখ বেশ কঠিন দেখাল, মুখের কথাগুলি শোনাল আরো শক্ত। লতা বলল, 'আমার হাতের জিনিস আমার হাতে ঢল ঢল ক'রবে কেন মাসীমা কিন্তু অন্যের হাতে একবার গেলে ওতে আর কোন পদার্থ থাকবে না। আমার অনেক দেখা আছে। আর ব্যবহারের জিনিস উনি কাউকে দেওয়া পছন্দ করেন না।'

কাত্যায়নী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'সে কথা আগে বললেই পারতে বাছা, তার জন্য অমন ছল-চাতুরী করবার তো কোন দরকার ছিলনা। বাবারে বাবা, সোনা নয় দানা নয়, সামান্য একখানা আঁশবঁটি। খেয়ে আমরা হজম করে ফেলতাম না বউ।'

ওপরে নীচে সঙ্গে সঙ্গে কথাটা রটনা হয়ে গেল। এমন কেউ কোনদিন শুনেছে না দেখেছে। বুড়ো মানুষের মুখের ওপর একেবারে স্পষ্ট ব'লে দিল, 'দোবনা', চক্ষু-লজ্জায় বাধল না একটুও।

কাছেই মল্লিক কোম্পানীর এ্যাম্পুল ফ্যাক্টরীতে কাজ করে মন্মথ। খাওয়া দাওয়া সেরে ন'টার মধ্যেই বেরোয়। সযত্নে পান সেজে স্বামীর হাতে তুলে দিতে দিতে লতা বলল, 'শুনেছ, সেই বঁটি নিয়ে সমস্ত বাড়ি ভ'রে আমার বিরুদ্ধে ফিস ফিস গুজ গুজ চলছে। নিজের বঁটি অন্যের হাতে নষ্ট করতে দিইনি, ভারি দোষ হয়ে গেছে আমার।'

স্ত্রীর অভিমানক্ষুব্ধ মুখখানার দিকে তাকিয়ে মন্মথ মৃদু হাসল, 'দোষ হয়ে গেছে নাকি? তাই তো, বড় ভাবনার কথা। দাঁড়াও, ফেরার পথে বাজার থেকে আধ ডজন বঁটি নিয়ে আসব। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে একখানা করে বিলিয়ে দিয়ো।'

হাসি চেপে কোপের ভঙ্গিতে লতা বলল, 'আর জ্বালিওনা। তোমার তো সব কথাতেই রহস্য। এদিকে বাড়িশুদ্ধ লোক যে পিছে লাগল সে খেয়াল আছে?'

চুনশুদ্ধ পানের বোঁটার মাথাটুকু দাঁতে কেটে নিল মন্মথ। বাকি অংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ চারটি আঙুল দিয়ে লতার ছোট সুন্দর চিবুকটি তুলে ধরে বলল, 'আছে গো আছে, কিন্তু তাতে ভয়টা কি। বাড়িশুদ্ধ লোক তো ভালো, দেশশুদ্ধ পিছে

লাগলেও কিছু এসে যাবে নাকি আমাদের? কারো তোয়াকা রাখি নাকি আমরা?' বলে মন্মথ মুখখানা স্ত্রীর মুখের কাছে আরও এগিয়ে নিল।

পাশের ঘর থেকে বিপিনবাবুর স্ত্রী কনকলতার কর্কশ ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গেল। বড় মেয়ে বীণাকে ধমকাচ্ছেন, 'হতভাগী, লক্ষীছাড়ী ফের যদি এই জানালায় এসে দাঁড়াবি কেটে কুচি কুচি করে ফেলব। ছি ছি ছি দিনে দুপুরে একি ব্যাভার, সভ্যতা ভব্যত বলে কি কিছু নেই গা? সব কি উঠে গেছে সংসার থেকে, এটা কি গেরস্ত বাড়ি না বেশ্যাবাড়ি, আজই জিজ্ঞেস করব বাড়িওয়ালাকে। তিনি থাকুন আর তাঁর পেয়ারের ভাড়াটে থাকুক। এমন হলে এ বাড়িতে স্বামীপুত্র ঝি বউ নিয়ে আর কারো বাস করা চলবেনা।'

মন্মথ আর লতা সকৌতুকে পরস্পরের দিকে তাকাল, লতা লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল, 'নাও হোল তো? এই নিয়ে দেখবে এখন কি হয়।'

মন্মথ পকেট থেকে একটা বিড়ি বার ক'রে দুই ঠোঁটের মধ্যে চেপে দিয়াশলাই জ্বালল; তারপর নিতান্ত অবজ্ঞার সুরে বলল, 'হোক গে।'

বিড়ি টানতে টানতে সগর্বে মন্মথ কাজে বেরিয়ে গেল।

লতা যা ভেবেছিল তাই, তাদের আচরণ নিয়ে সমস্ত বাড়িতে অন্তত বার দশেক বৈঠক বসল, কলতলায় গিয়ে শুনল বিভূতির বউ বাসন্তীর সঙ্গে কনকলতার এই আলোচনাই চলছে। ছাতে কাপড় মেলতে গিয়ে দেখল নিভাননী বীণাকে ডেকে সকৌতুকে কি জিজ্ঞাসাবাদ ক'রছেন, দু'একটা কথা কানে যেতে লতা সেখানে থেকে নেমে এল।

খেয়েদেয়ে বিছানা পেতে লতা দুপুরবেলায় একটু ঘুমাবার আয়োজন ক'রছে ছেলে কোলে নিয়ে বাসন্তী এল আলাপ জমাতে। একথা ও কথার পর বলল, 'তখন কি ব্যাপারটা হয়েছিল বল দেখি।'

লতা কঠিন স্বরে বলল, 'সে তো আজ দিন ভ'রেই শুনছেন।'

বাসন্তী ভাব জমাতেই এসেছিল কিন্তু লতার ভঙ্গি দেখে মনে মনে চটে উঠল, বলল, 'তবু তোমার মুখ থেকে একবার শুনতে চাই ভাই। বাহাদুরী আছে বটে তোমাদের। এতখানি বয়স হোল তিন তিনটি ছেলে মেয়ে হোল, কিন্তু সোয়ামীর কাছ থেকে এমন সোহাগ কোন দিন ভাই পাইনি। দিনে, দুপুরে, এক বাড়ি লোকের চোখের ওপর—। তোমাদের বাহাদুরী স্বীকার করতেই হবে, বিয়ে তো একদিন আমাদেরও হয়েছিল।'

লতা বলল, 'কিন্তু আমাদের তো বিয়ে হয়নি।'

বাসন্তী অবাক হয়ে বলল, 'বিয়ে হয়নি বলকি!'

লতা ফিস ফিস ক'রে বলল, 'হ্যাঁ দিদি, বলবেন না যেন কাউকে বিয়ে আমাদের হয়নি, আমরা অমনিই—'

বাসন্তী খানিকক্ষণ কাঠ হয়ে থেকে বলল, 'সত্যি বলছ?'

লতা বলল, 'হ্যাঁ দিদি সত্যিই, কিন্তু দোহাই আপনার কাউকে ব'লে দেবেন না যেন।'

লতা যেন আর হাসি চেপে রাখতে পারে না।

বাসন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে রূঢ় স্বরে বলল, 'ঠাট্টা করো আর যাই করো, তোমাদের ভাব দেখে কিন্তু তাই মনে হয়, গেরস্ত ব'লে ধারণা হয়না।'

আহত এবং অপমানিত বাসন্তী মুখ কালো ক'রে তৎক্ষণাৎ লতাদের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর দোর ভেজিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে ঘর ভরে লুটোপুটি খেতে লাগল লতা।

রাত্রে স্বামীর বাহুবন্ধনের মধ্যে থেকে দুপুরের কথা মনে পড়ায় হাসির তোড়ে লতা আবার অস্থির হয়ে উঠল।

মন্মথ বলল, 'ব্যাপার কি, হাসছ কেন অত।'

কাহিনীর সমস্তটুকু শুনে মন্মথও ভারি কৌতুক বোধ করল, বলল, 'এতও পারো তুমি। এরপর সমস্ত বাড়ি শুদ্ধ লোক কেবল চিড়বিড় ক'রবে।'

লতা বলল, 'কেবল চিড়বিড় ক'রবে না গো, বাড়ি থেকে তাড়াতেও চেষ্টা ক'রবে, গেরস্ত বাড়িতে এমন অনাচার কি সয়। দেখবে কালই বাড়িওয়ালা নোটিশ দিয়েছে।'

মন্মথ বলল, 'না গো না, অত সহজে পড়বেনা নোটিশ। বার টাকার ঘরের আঠার টাকার ভাড়া দিচ্ছি আমরা।'

গর্বে এবং আনন্দে স্বামীর বক্ষলগ্ন হয়ে থাকে লতা। সেই দিন আর নেই। সেই শাশুড়ী ননদের নির্যাতন, জা'দের টীপ্পনী টিটকারি, দেবর ভাসুরদের দুর-দুর সর-সর-এর দিন মন্মথ আর লতা পার হয়ে এসেছে। এখন বার টাকার ঘর আঠার টাকায় ভাড়া নিতেও তারা পিছোয় না, দু টাকার শাড়ি দশ টাকায় পরে, দু'বেলায় মাছ তরকারী দিয়ে পেট ভরে খায়। দু'হাতে কামায় মন্মথ। আর সব এনে দেয় লতার হাতে। স্বামীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা অনুভব করে লতা। মন্মথ শুধু তার, একান্ত করে লতারই। দেবর ভাসুরদের বৃহৎ পরিবার থেকে লতা তাকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছে। তাদের দুর্ব্যবহারের চরম প্রতিফল তারা পাক। বুঝুক মানুষের সব দিন সমান যায় না, সুখ দুঃখের ভাগ্য চাকার মত ঘোরে।

মন্মথও খুসি, এতকাল বিয়ে করেও বুঝতে পারেনি যে বিয়ে করেছে। যে রোজগার করতে পারে না, মা ভাই তার নয়, তাকে একটি জিনিস হাতে করে দেওয়ার তার ক্ষমতা নেই, তার সঙ্গে একটু হেসে কথা বলতে গেলে বাড়ি ভরে জোড়ায় জোড়ায় চোখ তার দিকে চেয়ে থাকত। কারো চোখে শাসন, কারো চোখে তিরস্কার, কারো চোখে বিদ্রূপ।

সেই চোখের খোঁচা সহ্য করতে না পেরে গাঁয়ের বাড়ি ছেড়ে চলে এল মন্মথ। এল

কলকাতায়। এখানেও ভাগ্য সহজে ফিরতে চায় নি। রাস্তায় ঘুরে ঘু:র অনেক দিন কেটেছে। না খেয়ে আধপেটা খেয়ে কেটেছে অনেক দুপুর। শীতের মধ্যে দূর সম্পর্কের কুটুম্ব-বাড়ির খোলা বারাণ্ডায় ছেঁড়া কম্বলের নীচে কাঁপতে হয়েছে অনেক রাত, তারপরে দিন ফিরেছে। এ্যাম্পুল ফ্যাক্টরীতে এখন সব চেয়ে ভালো কারিগর মন্মথ। পঁচিশ সি সি পঞ্চাশ সি সির ছোট এ্যাম্পুলে সে হাত দেয় না। দিন ভর খাটে রাত ভর খাটে আর সপ্তাহের শেষে পকেট ভরে আনে ছোট ছোট একটাকার নোট।

মা মাঝে মাঝে চিঠি দেয়, ভাইয়েদের চিঠি দুঃখ কষ্টের বর্ণনা আর সাহায্যের আবেদনে ভরে ভরে ওঠে। উঠুক। এই রক্ত-জল-করা টাকায় আর কারো অধিকার নেই। এ শুধু তার আর তার স্ত্রীর। এর থেকে আর কাউকে কিছু তুলে দিতে গেলে আবার উপবাসের পালা শুরু হবে, লতার গায়ে উঠবে সেই ছেঁড়া আর ময়লা শাড়ি, হাতে নোয়া আর শাঁখা ছাড়া কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তার চেয়ে দুজনে তারা বাঁচুক।

কিন্তু কাউকে সুখে থাকতে দেখলে কেবল আত্মীয়স্বজন নয়, পরন্তু যে পর আশেপাশের ভাড়াটেরা তাদেরও সহ্য হতে চায় না। ওদের হাব ভাব দেখে মন্মথ আর লতার এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না। কেবল নিন্দা, কেবল কুৎসা ; আড়ালে আবডালে মন্মথ আর লতার কেবল বিরুদ্ধ সমালোচনা। তাদের লজ্জা নেই, চক্ষু-লজ্জা নেই, সভ্যতা ভব্যতা জ্ঞান নেই, মনের উদারতা নেই।

মন্মথ বলে, 'নেই তো নেই।'

লতা বলে, 'বয়ে গেছে।'

তারপর দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসে। সমস্ত পৃথিবী এক দিকে আর তারা একদিকে। ভাইয়েরাই বিরুদ্ধে লেগে কিছু করে উঠতে পারল না আর এরা তো এরা।

সেদিন জলের কল নিয়ে সকলের সঙ্গে দারুণ এক চোট হয়ে গেল।

বাড়ি ভরে লোক গিজ-গিজ গিজ-গিজ করে। কল সহজে ছাড়া পাওয়া যায় না। যখন পাওয়া যায় তখন হয় তো জল চলে গেছে। এমনি করে গত দু'দিন ধরে লতা নাইতে পারেনি।

শুনে মন্মথ বলল, 'তুমি তো বোকা কম নও, খুব ভোরে উঠে চান করে নেবে, আমার সঙ্গে সঙ্গে।'

সেই পরামর্শই ঠিক হোল। পরদিন অন্য কেউ উঠতে না উঠতে মন্মথ আর লতা দু'জনে গিয়ে দুটি কল দখল করে বসল। সাবান আর তোয়ালে নিয়ে মেয়েদের বাথরুমে ঢুকল লতা আর চৌবাচ্চার লাগা খোলা জায়গায় কলটার নিচে মাথা পেতে বসল মন্মথ। পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায় লতাও বেরোয় না, গামছা দিয়ে মন্মথের গা রগড়ানো

শেষ হয় না। দুই কলের কাছেই মিনিট কয়েকের মধ্যে ভিড় জমে গেল। মেয়েরা বাথরুমের দোরে এসে ধাক্কার পর ধাক্কা দিতে লাগল। কিন্তু লতার সাবান মাখার শব্দ ছাড়া আর কোন সাড়া শব্দ নেই। একবার কাত্যায়নী আর একবার নিবারণবাবুর স্ত্রী নিভাননী মন্মথকে কলটা ছেড়ে দিতে বললেন, কিন্তু কথা যেন তার কানেই গেল না, চান করছে তো চানই করছে।

এবার এলেন বিপিনবাবু আর নিবারণবাবু।

বিপিনবাবু বললেন, 'বেশ তো মজা পেয়েছো তোমরা। সকাল থেকে দুটো কল দুজনে আটকে রেখেছ, কেন আর কি মানুষ নেই বাড়িতে, না আর কেউ এখানে ভাড়া দিয়ে থাকে না ?'

মন্মথ বলল, 'আমরা কি তাই বলেছি।'

নিবারণবাবু জবাব দিলেন, 'বলা কওয়া দিয়ে কি হবে, তোমাদের কার্যকলাপে তো তাই দেখছি। স্বামী-স্ত্রী বাপু এই বয়সে অনেক দেখলাম কিন্তু তোমাদের মত এমন গলায় গলায় সোহাগ আর কোথাও দেখিনি। শুধু খাওয়া শোওয়াই নয়, চানটাও বুঝি দুজনের এক সঙ্গে না হলে চলে না ?'

বিপিনবাবু বললেন, 'না-ই যদি চলে, আলাদা একটা কলে আর দরকার কি, একেবারে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেই হয়। স্নানলীলাটা দিব্যি পছন্দ মত—'

মন্মথ বলল, 'তাতে আপত্তি ছিল না। তা আমরা পারতুম। কিন্তু আপনারাই তখন আবার বাড়িশুদ্ধ লোক বাথরুমের আশে পাশে গিয়ে উঁকি মারতেন। স্নানলীলাটা স্বচক্ষে না দেখে ছাড়তেন না।'

সহসা কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। কেবল বাথরুমের ভিতর থেকে ফিক করে একটু হাসির শব্দ শোনা গেল।

বিভূতি এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এবার এগিয়ে এসে ধমকের সুরে বলল, 'বাপের বয়সী একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে অমন ইতরের মত কথা বলতে লজ্জা হয় না আপনার, ছি ছি ছি।'

মন্মথ তখন গামছা নিংড়ে মাথা মুছতে সুরু করেছে, বলল, 'সবাইকেই চিনি মশাই। বাপের বয়সী খুড়োর বয়সী সবাইকেই চেনা আছে।'

একটু পরেই লতা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। মন্মথও তার পিছনে পিছনে গিয়ে ঘরে ঢুকল। বাইরে তখনও তর্জন গর্জন চলছে—মন্মথ যেন মনে না করে সবাইকে অপমান করে, সকলের সঙ্গে বিবাদ বিসংবাদ করে এ বাড়িতে সে থাকবে। আইন আদালত থানা পুলিস কিছুই করা তাদের দরকার হবে না। কেবল ঘাড় ধরে যে কোন সময় সদর দরজা দিয়ে শুধু বাড়ি থেকে বের করে দেবে।

মন্মথ কাপড় ছেড়ে বারান্দায় ছোট আয়না চিরুণী নিয়ে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে

জবাব দিল, 'তাই নাকি? আসুন না কে এসে ধরবেন আমার ঘাড়? আসুন না ঘাড় পেতে দাঁড়িয়ে আছি আমি।'

মন্মথের সুদৃঢ় ঘাড় আর বলিষ্ঠ মাংসপেশীগুলির দিকে তাকিয়ে সহসা কেউ এগুলো না। মুখে অনেকেই বলল, এর শোধ তারা তুলবেই। ঘরে ঢুকে মন্মথ মোলায়েম গলায় স্ত্রীকে বলল, 'তুমি ভয় পাওনি তো?'

বাইরের লোকের সঙ্গে কলহ বিবাদের পর মন্মথের এই মিষ্টি গলা লতার কানে আরো মধুর শোনায়। অমন ঝগড়ার গলা যদি মন্মথের না থাকত তাহলে তার কণ্ঠস্বরের এমন মাধুর্য যেন কিছুতেই তেমন করে ফুটে উঠত না।

লতা স্বামীর সুদীর্ঘ সবল দেহের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি থাকতে আবার ভয় কিসের।'

কাজে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মন্মথ বলল, 'আর শোন। কাজটাজ সেরে সকাল সকালই তৈরী হয়ে থেক। সন্ধ্যার শোতে সিনেমায় যাওয়া যাবে দুজনে মিলে।'

লতা খুসী হয়ে বলল, 'টিকিট কেটেছ?'

'কেন বিনা টিকিটে ঢুকতে পারব না তোমাকে নিয়ে?'

ব'লে মন্মথ হেসে দুখানা সবুজ রঙের সিনেমার টিকিট স্ত্রীর হাতে তুলে দিল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'বেশ সেজে গুজে থাকা চাই কিন্তু, যাতে ওদের চোখ টাটায়।'

লতা মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'আচ্ছা গো আচ্ছা। অন্যের চোখ না টাটালে বুঝি নিজের ভালো লাগে না?'

মন্মথ বলল, 'তাতো লাগেই না, সাজবে তো এমন করে সাজবে যাতে পরের চোখ টাটাবে আর বরের চোখ মুগ্ধ হবে।'

লতা বলল, 'সকাল সকাল ফিরো কিন্তু, দেরি কোরো না।'

বেলা পড়তে না পড়তে লতার সাজসজ্জা সুরু হয়ে গেল। চুল বাঁধল, আলতা পরল, ঠোঁটে লাগাল একটু আলতার ছোঁয়াচ, বাকসের সবচেয়ে দামী গোলাপী রঙের শাড়িখানা পরল বের করে, বার বার ঘুরে ফিরে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে লাগল।

কিন্তু কখন এক সময় ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে এল। আয়নায় নিজের মুখ আর দেখা যায় না। ঘরে ইলেকট্রিক লাইট নেই। বিরক্ত হয়ে উঠে লতা হারিকেন জ্বালালো। কিন্তু সেই আলোয় গিয়ে নিজের মুখ দেখবার মত আর উৎসাহ রইল না।

এখনো কি ছ'টা বাজেনি? আর কখন ফিরবে মন্মথ? কখনই বা যাবে সিনেমায়? লতার কাছে কোনদিনই তো কথা খেলাপ করে না। কোনদিন চাল দেয় না, মিথ্যা কথা বলে না।

অভিমানে মন ভরে উঠল লতার। মন্মথের সঙ্গে আজ সে কথা বলবে না, কিছুতেই-

না। এই তামাসার শোধ সে নেবে। কিন্তু কোন্ কৌশলটা ঠিক হবে। কথাই বন্ধ করবে লতা না হাজার কথায় মন্মথকে বিদ্ধ করে ছাড়বে। চোখা চোখা কথাগুলি লতা নিজের মনে গুছিয়ে রাখতে লাগল।

বিপিনবাবু আর বিভূতিবাবু কি সব আলাপ ক'রছেন, সহরের কোথায় নাকি কি হাঙ্গামা হয়েছে। অনেক লোক মরেছে, আহত হয়েছে আরো বেশী।

লতার খানিকটা কানে গেল খানিক গেলনা। মনে মনে মন্মথের সঙ্গে সে ধারাল কথার বিনিময় করছে।

রাত বেড়ে চলল মন্মথ তবু ফিরল না। রাত্রের রান্না লতা আগেই সেরে রেখেছে। অন্য দিন দু'জনের খাওয়া এর মধ্যে শেষ হয়ে যায়। আরম্ভ হয় গল্পগুজব। আজ এত দেরি করছে কেন মন্মথ ?

রাত প্রায় দুপুরের সময় পাড়ার জন কয়েক ছাত্র আর মন্মথদের কারখানার কয়েকজন কারিগর মিলে নিয়ে এল মন্মথকে। পুলিসের গুলিতে তার মৃত্যু হয়েছে।

উঠানের ওপর সযত্নে ওরা শুইয়ে রাখল মন্মথকে, চেহারার কোনই পরিবর্তন হয় নি। কনুইয়ের কাছে শার্টের হাতা দুটো ওলটানো, ইস্ত্রী করা কলার দুটো এখনো বেশ শক্ত ও শুভ্র। কেবল কোমরের নিচে তাজা রক্তের ছোপে জামাটা লাল হয়ে গিয়েছে।

লতার ঘরের সামনে বাড়ির সমস্ত লোক ভেঙে পড়ল—পাড়ার সমস্ত লোক এসে জড়ো হোল।

ছাত্রনেতা সুব্রত সকলের কাছে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে চলল, 'অসহায় ভীরুর মত মরেনি মন্মথ। মরেছে পুরুষের মত, বীরের মত। মরবার আগে একটা সার্জেণ্টকে ঘায়েল করে গেছে। প্রথমে মন্মথ খানিকটা কৌতুহল নিয়েই ঢুকেছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল দেখছিল ব্যাপারটা কি হচ্ছে। তারপর চোখের সামনে পুলিসের গুলিতে একজন তের চৌদ্দ বছরের ছেলে যখন রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ল মন্মথের মনে কৌতুক বোধ আর রইল না। জনতার সঙ্গে মিশে সেও ইঁটের পর ইঁট ছুঁড়তে লাগল পুলিসের ওপর। অদ্ভুত তার হাতের তাক, কব্জির এমন জোর সাধারণত দেখা যায় না।'

নিবারণবাবু সগর্বে বললেন, 'কার মধ্যে যে কি আছে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তবে ছেলেটির মনের জোর যে অসাধারণ, তার রোখ আর জেদের কাছে যে কেউ দাঁড়াতে পারে না তা আমি আগেই টের পেয়েছিলাম।'

বিপিনবাবু কিন্তু নিজের অক্ষমতা স্বীকার করলেন, বললেন, 'এ ছিল ছদ্মবেশী মহাপ্রাণ। আমরা আগে চিনতে পারিনি।'

মন্মথের শবদেহের চারপাশে বাড়ির সমস্ত মেয়ে পুরুষেরা এসে ঘিরে দাঁড়াল। তার দর্শনে পুণ্য স্পর্শে গৌরব। সে আজ স্বার্থপর, স্ত্রৈণ সাধারণ একজন এ্যাম্পুল ফ্যাক্টরীর কারিগর মাত্র নয়, সে বীর সে পুণ্যাত্মা। দেশের জন্য অবলীলায় সে প্রাণ দিয়েছে।

লতার কিছুই যেন বোধগম্য হচ্ছে না। সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনুভূতির ক্ষমতা সে যেন হারিয়ে ফেলেছে।

সুব্রত এগিয়ে গেল লতার সামনে। পিছনে পিছনে এগিয়ে এল আরো কয়েকজন ছাত্র।

সুব্রত বলল, 'কই আমার দিদি কই। এই যে, তোমার তো অমন করে থাকলে চলবে না দিদি। শোক দুঃখ তোমার জন্য নয়। তোমার স্বামী তো কুকুর বিড়ালের মত মরেনি, সে প্রাণ দিয়েছে দেশের জন্য। তার মৃত্যুর জন্য আমরা শোক করব না, অহঙ্কার করব, প্রতিশোধ নেব তার মৃত্যুর।'

লতা অবাক বিস্ময়ে সুব্রতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কে এই ছেলেটি। কি বলতে চায় সে। এই দুর্বোধ্য শব্দগুলির মানে কি।

লতার কাছে মেয়েদের আসতে ইঙ্গিত করে সুব্রত অন্য কর্তব্যে মন দিল। বাড়ির ওপর উড়তে লাগল জাতীয় পতাকা। মন্মথকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এল খাট। ফুলের মালায় মন্মথের সমস্ত দেহ ঢাকা পড়বার জো হোল।

এবার শ্মশানের দিকে যাবে শোভাযাত্রা। উৎসাহী যুবকের দল এগিয়ে এল, খাট তুলবে কাঁধে। কাত্যায়নী নিভাননীরা আগলে ধরলেন লতাকে। শোকের আবেগে অস্থির হয়ে পাছে সাংঘাতিক কিছু করে বসে। এই সময়টাই ভারি মারাত্মক।

কিন্তু লতার ভাব দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। কোন উন্মত্ততা নেই, কোন চাঞ্চল্য নেই। শোকের কোন রকম উচ্ছ্বাস নেই চোখেমুখে। নিস্পন্দ কঠিন পাথরের মত তার মূর্তি।

খাট কাঁধে তোলার সঙ্গে সঙ্গে আবার জয়ধ্বনি উঠল। শহীদ মন্মথের জয়।

কিন্তু অসহ্য আর্তনাদে লতা এবার লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কান্নার আবেগে সমস্ত শরীর তার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। জয়রথ চলেছে মন্মথের কিন্তু তার পথ লতার হৃদয়ের ওপর দিয়ে।

পদক

খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে শান্তি নেই, এমন কি মনটা অস্বস্তিতে ভরা থাকলেও বাড়ীতে এতটুকু মেজাজ দেখাবার জো নেই কৈলাস কর্মকারের। চঞ্চলা দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। গালিগালাজের দরকার হয় না, গলাটা একটু রুক্ষ হলেই মুখ তার ভার হয়ে যায়। তারপর নতুন একদফা শাড়ি গয়না ছাড়া কিছুতেই আর হাসি ফোটে না সে মুখে।

অথচ মন-মেজাজ খারাপ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে কৈলাসের। ব্যবসা-বাণিজ্যে

কেবল মন্দাই নয়, কিছুকাল ধরে প্রায় বন্ধ হবার জো হয়েছে। বিক্রি-বন্ধকের রেওয়াজ যেন গাঁ থেকে উঠে গেছে হঠাৎ। মাসখানেক হতে চলল, এক রতি সোনা-রূপা আসেনি বাড়ীতে। ওপাড়ার যুধিষ্ঠির মণ্ডলের বউ সেদিন কাঁধ-বসা ছোট একটি পিতলের কলসী নিয়ে এসেছিল সন্ধ্যার সময়। এত পুরোণো যে, রঙ প্রায় কালো হয়ে গেছে। কিন্তু তার বদলেই তাকে দিতে হবে পাঁচ টাকা। কৈলাস তাকে গাল দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। 'তার চেয়ে পুকুর থেকে বরং এক কলসী জলই তুমি তুলে নিয়ে যাও, বউ! খেয়ে পেটও ভরবে, ঘরের জিনিসও থাকবে ঘরে।'

তবু মণ্ডলের বউ যা'হোক পুরোনো একটা কলসী নিয়ে এসেছিল, কিন্তু হরলাল ঢুলীর স্ত্রী নয়নের আক্কেলখানা দেখ। বেলা দুপুরের সময় একেবারে শুধু হাতে এসে হাজির।

'দশটা টাকা দাওনা নারাণের বাপ, ধানের নৌকা এসেছে ঘাটে।'

হাত দু'খানা শূন্য। জীর্ণ আঁচলেও কোন রহস্য আর প্রচ্ছন্ন নেই। তবু কৈলাস সেদিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টিক্ষেপ করল, 'একেবারে দশ টাকা! আচ্ছা কি এনেছ বার কর দেখি।'

নয়ন বলল, 'পোড়া কপাল আমার, বার করবার মত কিছু আর বাকি আছে নাকি নারাণের বাপ? একটা কুটোও আর নেই ঘরে। বন্ধক রাখতে চাওতো আমাকে রাখতে পারো।'

নয়ন রসিকতার ভঙ্গিতে মিষ্টি করে একটু হাসল।

আট দশ বছর আগে হলে মাত্র ওইটুকু হাসিতেই চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে পারত কৈলাসের। কিন্তু সে দিন নেই, সে বয়স নেই, সেই নয়নই কি আর নয়ন আছে! ছেলেমেয়ে মিলে গুটি সাতেক সন্তান হয়েছে নয়নের। আকালের বছরে তাদের চারটি মরেছে। নয়ন নিজেও মরতে বসেছিল। এই দু' তিন বছর পরেও নয়নের দেহ থেকে সেই মৃত্যুর চিহ্ন ভালো করে মিলায়নি। কিন্তু আর এক চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সে চিহ্ন সম্ভাবিত নতুন জীবনের। তবু মৃত্যুর চেয়েও যেন বীভৎস। বোধ হয় পুরো দশ মাসেরই পোয়াতী হবে নয়ন, ক্লান্ত দেহের দিকে তাকিয়ে কৈলাস ভাবল। তারপর নীরস রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল, 'না ভাই-ঢুলীবউ, তোমাকে বন্ধক রাখতে পারি অত ধন-দৌলত আমার ঘরে নেই। তার চেয়ে—'

চুড়ির ঝঙ্কার শোনা গেল দোরের দিকে। কৈলাস চকিত হয়ে পিছন ফিরে তাকাল। আধো খোলা দরজার পাশে চঞ্চলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৈলাসকে থেমে যেতে দেখে চঞ্চলা ঠোঁট টিপে তীক্ষ্ণ একটু হাসল, 'বল না, কি বলছিলে! এত ভয় কিসের! ঘরে তোমার ধন-দৌলত না থাকে গায়ে গহনা তো আমার আছে। তাই দিয়েই না হয় ঢুলী-বউকে বাধা রাখো।'

কৈলাস বিব্রত হয়ে বলল, 'কি যে বল—'

নয়ন চেয়ে দেখল, কথাটা মিথ্যা বলেনি। ঘরের সমস্ত ধনদৌলত উজাড় করেই বোধ হয় স্ত্রীর জন্য গয়না কিনেছে কৈলাস। সারা অঙ্গ সোনায় মুড়ে দিয়েছে। নাকে কানে হাতে গলায় কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। অতিকষ্টে দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখল নয়ন। কি একটা ব্যথায় বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। ক্ষুধার জ্বালার চেয়েও সে যন্ত্রণা যেন বেশী দুঃসহ। এক রতি সোনাদানা কোন দিন গায়ে উঠেনি নয়নের। কিন্তু বাপের দেওয়া রূপার গয়না নিতান্ত কম ছিল না। পায়ে মল ছিল, মোটা মোটা দু'গাছা বালা ছিল হাতে, কানে ঝুমকো ছিল দু'গাছা, কিন্তু আজ কিছুই আর নেই। আকালের বছরে ঘটি-বাটি, মাঠের কাঠা কয়েক জমি, ঘরের ওপরকার করোগেট টিনের চাল পর্যন্ত বিক্রি করে খেতে হয়েছে। সেই সঙ্গে গেছে নয়নের মল, বালা ঝুমকো। জেলেপাড়ার বাতাসা, তুলসী, মেনকা কারো গায়েই কিছু ছিল না। কিন্তু এক আধখানা করে গয়না আবার দেখা দিয়েছে তাদের গায়ে। মেনকার স্বামী মুকুন্দ তো সোনার নাকফুল গড়িয়ে দিয়েছে বউকে। কি কপাল নিয়ে এসেছিল নয়ন, ঘরের পুরুষ গা থেকে গয়না কেবল খসিয়েই নিল, কোন দিন একখানা পরিয়ে দেখতে জানল না।

নয়নের পলকহীন চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে চঞ্চলা মুখ মুচকে আবার একটু হাসল, 'কি বল ঢুলী-বউ, দেব নাকি খসিয়ে? খুসি হবে তো তা'হলে? বাঁধা পড়বে? পছন্দ করবে, প্রাণভরে ভালোবাসবে আমার টাকপড়া, দাঁতনড়া সোয়ামীকে?'

কথা শেষ না হ'তে হ'তে হেসে যেন একেবারে গড়িয়ে পড়ল চঞ্চলা।

বিরক্ত হয়ে এবার ধমক দিয়ে উঠল কৈলাস, 'আঃ থাম দেখি, রঙ্গ-রস সব সময় ভালো লাগে না।'

নয়নের দিকে ফিরে এবার কৈলাস কাজের কথায় মন দিল, 'রঙ্গ-রস রাখো ঢুলী-বউ, কারবারপত্র বন্ধ টাকা পয়সা আসবে কোত্থেকে! বাঁধা দেওয়ার মত কিছু যদি এনে থাকো দেখতে পারি চেষ্টা চরিত্র করে।'

নয়নের ক্লান্ত করুণ মুখখানা এবার কঠিন দেখাল: 'কিছু যদি থাকতই নারাণের বাপ, তোমাকে বার বার বলতে হত না। তোমার দোস্ত চাঁদেরকান্দী বিয়ে বাড়ীর বায়না রাখতে গেছে। এসেই তোমার টাকা ফেরৎ দিয়ে যাবে। টাকা মারা যাবে না, নারাণের বাপ। ধানের নৌকা ঘাট থেকে এখনই চলে যাচ্ছে, তাই এসেছিলাম।'

কৈলাস বলল, 'তাই বলে দেশ ছেড়ে তো আর চলে যাচ্ছে না। বায়না সেরে আসুক দোস্ত। সে-ই এসে ধান কিনবে গঞ্জ থেকে। মিছামিছি তুমিই বা অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ঢুলী-বউ?'

কৈলাশ যেন ভরসা আর আশ্বাস দিচ্ছে নয়নকে। ভঙ্গি দেখে গা জ্বলে গেল নয়নের। অন্য সময় হলে বুড়ো মিনষের এই ঢঙ সে মোটেই নিঃশব্দে সহ্য করত না। কথার তুবড়ী ছুটিয়ে দিত কৈলাসের মুখের ওপর। কিন্তু আজ আর অনর্থক বাদ প্রতিবাদ করতে প্রবৃত্তি হল না নয়নের। দেহ আর বয় না। সামর্থে কুলায় না ঝগড়া

করা। ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে নয়ন বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। কিন্তু পেছন থেকে ফের ডাকল কৈলাস, 'রাগ করলে নাকি ঢুলী-বউ ?'

ভারি মমতা কৈলাসের কণ্ঠে। নয়ন রাগ করলে সত্যিই যেন প্রাণে খুব ব্যথা পাবে কৈলাস। দুঃখের আর শেষ থাকবে না। কথার জবাব দিতে ঘেন্না করে নয়নের, আবার জবাব না দিয়েও থাকা যায় না। জিহ্বাটি অস্থির হয়ে মুখের মধ্যে যেন আপনিই নড়ে নড়ে ওঠে। নয়ন মুখ ফিরিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'রাগ করব কেন ? আমার কি আক্কেল নেই যে রাগ করব ? আমি কি জানিনে, রাগ করলে মনে দুঃখ পাও তুমি ?'

অনেক কাল আগে নয়নের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত কৈলাস। আড়ালে আবডালে, কখনো ভাষায়, কখনো আভাষে প্রণয় নিবেদনও করেছিল বার কয়েক। কিন্তু নয়ন রাজী হয়নি। কখনো হেসেছে, পরিহাস করে বলেছে, 'তোমার দোস্তের তাহলে উপায় হবে কি কর্মকার, নয়নহারা হয়ে সে বাঁচবে কি করে !'

কখনো দিয়েছে ধমক, কখনো ধক্ ধক্ করে কেবল আগুন জ্বলেছে তার চোখে, আজ সেই জ্বালা যেন দেহে মনে জড়িয়ে গেল কৈলাসের। নয়নের চোখে সেই আগুন আর নেই, কিন্তু সাপের জিহ্বার মত বিষ আছে পরতে পরতে। রসনার রসে আর বিষে কোন ভেদ নেই।

অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করল কৈলাস। বলল, 'ঠিকই ধরেছ বউ, তুমি রাগ করলে দুঃখ এখনো পাই। কেবল রাগ, দুঃখ মিটাবার উপায় পাই নে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।'

কর।'

কৈলাস বলল 'তোমার হাত পা তো দেখছি একেবারে শূন্য, ঝড়ো কাটা। কিন্তু দোস্ত তো দিব্যি গয়না গলায় দিয়ে আজকালও মনের আনন্দে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

নয়নের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, 'তার মেডেলগুলির কথা বলছ ?'

কৈলাস বলল, 'ওই হোল, মেডেলই বল আর গয়নাই বলো, একই কথা ! পুরুষ মানুষ তো আর হার, নেকলেস, নাকছাবি, কানপাশা পরে চলতে পারে না, গয়নার সখ তারা ওই মেডেলেই মেটায়। আক্কেলখানা দেখ ! তোমার গায়ে এক রতি সোনা-রূপা নেই আর নিজের—তুমিই বা কি রকম মানুষ ঢুলী-বউ টাকা পয়সা না দিয়ে যায়, ওগুলিও তো চেয়ে রাখতে পার দোস্তের কাছ থেকে। কচি কচি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর। পয়সার সব সময় দরকার। কিন্তু খালি হাতে কি আজকাল কেউ কাউকে কিছু দেয়—না দিতে পারে ঢুলী-বউ ! দেবে কোন্ ভরসায়, তবু ওই রূপার চাকতিগুলি যদি কাছে রাখো, সময়ে অসময়ে হাত পাতলে দু'চার টাকা অন্ততঃ মেলেই।'

নয়ন স্থিরদৃষ্টিতে একবার কৈলাসের দিকে তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আচ্ছা এবার তো কিছু আর হোল না, এর পর থেকে তোমার পরামর্শ মতই চলব

কর্মকার। চাকতিগুলি নিজের হাতেই রাখব, দরকার হলে সময়ে অসময়ে যাতে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি।'

কথা শেষ করে নয়ন এক ঝিলিক হাসল, আর সে হাসি বিষাক্ত তীরের মত গিয়ে বিধল কৈলাসের বুকে।

কেবল কৈলাস কেন, কথাটা নয়নেরও অনেকদিন অনেকবার মনে হয়েছে, শুধু মনে হওয়াই নয়, এ নিয়ে কোন্দলও করেছে নয়ন স্বামীর সঙ্গে।

একটি দুইটি নয়, তিন কুড়ি মেডেল জোগাড় হয়েছিল হরলালের। কাছাকাছি দু'চার দশ গ্রামের মধ্যে এমন ঢুলী আর নেই, এমন পরিষ্কার হাত কারোরই নেই ঢোলে। কত জায়গায়, কত দেশে বিদেশে, বিয়েতে অন্নপ্রাশনে বড় বড় নামজাদা সব লোকের বাড়ীতে নামকরা বাদ্যকরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢোল বাজিয়েছে হরলাল। সব জায়গায় সে প্রশংসা পেয়েছে, যশ পেয়েছে আর সেই তরল গালানো যশ শক্ত হয়ে রূপ ধরেছে মেডেলের। কি তার জেল্লা, কি তার কারুকার্যের বাহার! কোন কোনটির মধ্যে নাম লেখা থাকত হরলালের। নিজের নাম ধাম হরলাল কোন রকমে লিখতে পড়তে পারে। কিন্তু নয়ন তো আর পারে না, সে কেবল চেয়ে দেখত আর আঙুল বুলাত স্বামীর নামের অক্ষরগুলির উপর। যেন সস্নেহে সাদরে স্বামীর গায়ে হাত বুলোচ্ছে।

কিন্তু রূপার মেডেল যত এল, রূপার টাকা তত এল না। একেবারে যে এল না তা নয়, কিন্তু আসা না আসা সমান হয়ে গেল। হাতে পয়সা এলে একেবারে রাজার হালে থাকতে চাইত হরলাল। হাঁড়ি ভরে, খালুই ভরে দুধ মাছ আনত বাজার থেকে। নিজেরা খেত, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের খাইয়ে আমোদ ফুর্তি করত। তারপর বয়স যত বাড়তে লাগলো, জিহ্বা কেবল দুধ মাছের রসে তৃপ্ত রইল না হরলালের। গাঁয়ে থাকলে তাড়িই খেত, সহরে গঞ্জে গিয়ে খেত মদ। দেশ বিদেশ থেকে তখন কেবল মেডেল নয়, দু'এক বোতল মদও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে লাগল হরলাল।

নয়ন রাগ করে বলত, 'ওসব কি ছাইভস্ম আনছ হাতে ক'রে?'

টলতে টলতে আড়ষ্ট গলায় জবাব দিত হরলাল, 'ছাইভস্ম নয় রে পাগলী, ও সব হাতে না থাকলে ঢোলে ভাল করে হাত খোলে না। এ কেবল আমার কথা নয়, বড় বড় ওস্তাদ মহাজনের বাণী।'

মুখের কাছে মুখ নিয়ে রাত্রে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আনত নয়ন, 'ছি ছি, মুখে কি সব বিশ্রী গন্ধ তোমার!'

সোহাগ করে হরলাল সেই মুখ স্ত্রীর মুখের ওপর চেপে ধরত, 'কি যে বলিস, বিশ্রী কোথায়! এ হোল ওস্তাদের মুখের গন্ধ। যেতে দে কয়েক দিন, তারপর তোর নাকও ওস্তাদের নাক হবে।'

ক্রমে সে গন্ধ অবশ্য নয়নের নাকে একদিন সইল কিন্তু সংসার সইলনা। নয়নের খাড়ু বাজুর সঙ্গে মেডেলেও টান পড়ল হরলালের। তবু নয়নের গায়ে যখন একখানা

গয়নাও রইল না, হরলালের গলায়, জমিদার বাড়ীতে উপহার-পাওয়া হরলালের বহুকালের জীর্ণ কোটের বুক পকেটের ওপর দু'চারখানা মেডেল তখনো চিক চিক করতে লাগল।

নয়ন ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছিল, 'কেমনতর ধরণ তোমার, আমার বাজু বন্ধ সব গেল, তবু তোমার গয়না পরবার সখ গেল না!'

বুক পকেটের ওপর লটকানো চারদিকে সোনার কাজ করা সবচেয়ে দামী মেডেলটির দিকে সস্নেহে একবার তাকাল হরলাল, হেসে বলেছিল, 'তুই মিথ্যাই হিংসা করছিস নয়ানী! এ গয়না পুরুষ মানুষের কেবল সখের গয়না, সোহাগের গয়না নয়। সখ করে, সোহাগ করে গয়না পুরুষ মানুষ নিজেরা পরে না, মনের মানুষকে পরায়।'

নয়ন বলেছিল, 'আহাহা, কত গয়নাই পরেছে তোমার মনের মানুষ, সখের নয় তো কিসের গয়না তবে?'

হরলাল জবাব দিয়েছিল, 'সে কথা তুই ভালো করে বুঝবিনে নয়ন বউ, এ পুরুষ মানুষের মানের গয়না। এ গয়না গায়ে পরবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, যে মান একদিন পেয়েছিলাম, সে মান আমাকে আজও রাখতে হবে। হেলায় খেলায় চলবে না। এ গয়নার দিকে আর দশজনে লোভের চোখে, খারাপ চোখে তাকায় না, এ গয়না-পরা মানুষকে মানুষ ভয় ভক্তি করে, শ্রদ্ধা সমীহর চোখে দেখে।'

নয়ন সত্যিই বুঝতে পারেনি। কিন্তু তর্ক করতে ঝগড়া করতে সাহস হয়নি তার। বাবু ভুঁইয়াদের সঙ্গে মিশে মিশে হরলালও যেন তাঁদের মতই কথা বলতে শিখেছে। আর কিছু না বুঝলেও নয়ন এটুকু বুঝল, ওসব কথার জবাব তার মত লেখাপড়া না-জানা চাষিচামারের মেয়েমানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, স্বামীর কথার জবাব দিতে হলে তাকেও বাবু ভুঁইয়ার বউঝিদের মত লেখাপড়া শিখতে হবে। এসব কথার জবাব তো গেঁয়ো গালাগালির মধ্যে নেই, আছে বইয়ের ছাপার অক্ষরে। শুধু ঢোলেই ভালো হাত খোলে না হরলালের, ঢুলীপাড়ায় বইয়ের ছাপা অক্ষর পড়তে পারে, ছাপা অক্ষরের মত অক্ষর লিখতে পারে নিজের হাতে হরলালের মত এমন একজনও নেই। সারা গাঁয়েই বা কজন আছে! শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নয়ন। মুখ তো নয়, ছাপা অক্ষরের বই।

কিন্তু স্বামীর আজকের কাণ্ড দেখে নয়নের মনের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। চাঁদেরকান্দির বিয়ে বাড়ির বাজনা বাজিয়ে দল বল নিয়ে ঢোল কাঁধে সন্ধ্যাসন্ধি ফিরে এল হরলাল। ছেলেমেয়েগুলি চার পাশ থেকে ঘিরে ধরল, 'কি এনেছ বাবা!'

নয়ন হাসিমুখে ঢোল নামিয়ে রাখল স্বামীর কাঁধ থেকে, কালো সুতার কারে বাঁধা মেডেলের মালাটা গলা থেকে খসিয়ে নিল। বুকের মধ্যে খচ করে উঠল মালা হাতে নিয়ে। আগেকার মত সেই অগুণতি মেডেল আর নেই, তিন চারটি মেডেলই ফাঁক

ফাঁক করে ঝুলিয়ে মালা করা হয়েছে। আজকাল বড়লোকদের তো আর সেই কাল নেই, সেই দান নেই, ঢোলের বাজনা শুনে ওস্তাদের গলায় মেডেল ঝুলিয়ে দিতে জানে না তারা। কিন্তু ভাগ্যে যদি থাকে আবার হবে, আবার সব হবে নয়নের। মেডেলে মেডেলে হরলালের বুক ঢেকে যাবে আগের মত। মুখে হাসি এনে স্বামীর বুক পকেটে আঁটা সেই সোনালী মেডেলখানাও আস্তে আস্তে খুলে সাদরে একবার হাতের মধ্যে মুঠ করে ধরল নয়ন। স্বামীর সমস্ত যশ, খ্যাতি, তার সমস্ত গুণপণা যেন নয়নের মুঠির ভিতরে স্পন্দিত হচ্ছে। বড় মেয়েকে ডেকে হুকুম দিল, 'হা করে কি দেখছিস? যা, শিগগির হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক ভরে আন বাপের জন্য। কত দূর থেকে হয়রাণ হয়ে এসেছে মানুষ!'

তারপর সহাস্যে নয়ন মুখ ফিরাল স্বামীর দিকে, 'বাঁচিয়েছ। এবার মজা বুঝিয়ে দেব মুখপোড়া কর্মকারকে। ধানের নৌকো এখনো বাঁধা রয়েছে ঘাটে। দাও, টাকা দাও, সেই নৌকো থেকে ধানের বস্তা নিজের কাঁধে করে নিয়ে আসি। কর্মকারের বাড়ীর উপর দিয়ে আসব, তার চোখের সামনে দিয়ে আসব। ও চেয়ে চেয়ে দেখবে, ওর সোঁৎলাপড়া ময়লাধরা টাকা ছাড়াও আরো টাকা আছে মানুষের, সে টাকায়ও ধান রাখা যায়।'

কিন্তু আশ্চর্য মুখে হাসি নেই হরলালের, বিন্দুমাত্র শব্দ নেই মুখে।

নয়ন থমকে গিয়ে বলল, 'কি হোল?'

হরলাল আস্তে আস্তে বলল, 'টাকা নেই নয়ন, সব খরচ হয়ে গেছে।'

'খরচ হয়ে গেছে! মদ খেয়ে সব উড়িয়ে এসেছ বুঝি! আর আমার সোনার চাঁদেরা উপোস করে আছে দুদিন ধরে।' চেঁচিয়ে উঠল নয়ন। মনের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত বেদনা তার মুখে ক্ষোভে আর আক্রোশে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

হরলাল বলল, 'তোর গায়ে হাত দিয়ে বলছি বউ, মদ নয়।'

দু'পা পিছিয়ে গেল নয়ন, 'খবরদার, ছুঁয়ো না আমাকে। মাতালের আবার গায়ে হাত দিয়ে দিব্য! মদ নয় তবে কি মেয়েমানুষ? গাঁটের কাড়ি উজার করে দিয়ে এসেছ বুঝি তার পায়ে? চুলে পাক ধরতে চলল, তবু বদখেয়াল গেল না মনের?'

না, সে সব বদখেয়ালও নয়। স্ত্রীকে সবই খুলে বলল হরলাল। পথের মধ্যে বাবুইহাটির বাজারের ওপর দলের বংশীবাদক কানাইর কলেরা হয়েছিল। ডাক্তারের ভিজিট আর ওষুধের টাকা কানাই পাবে কোথা? বিয়েতে বাঁশী বাজিয়ে ভাগের ভাগ তার জুটেছে আড়াই টাকা। কিন্তু তাই বলে দলপতি হয়ে নিজের দলের মানুষকে তো আর সেই বাজারের দোচালা ঘরের মধ্যে হরলাল ফেলে আসতে পারে না! দেশ বিদেশের মানুষ বলবে কি?

বলবে কি! খানিকক্ষণ নয়নও একটি কথা বলতে পারল না। তারপর দুঃসহ ক্রোধে নয়ন যেন ক্ষেপে উঠল একেবারে। তার হাবভাব দেখে সভয়ে হরলাল একটু

পিছিয়ে গেল। রাগ হলে নয়ন সব পারে! আঁচড়াতেও পারে, কামড়াতেও পারে।

'আর ঘরের মধ্যে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আমি যদি উপোস করে মরি তাহলেই বুঝি লোকে তোমাকে কাঁধে করে চৌদোলায় চড়িয়ে দেবে, না? তা' পোড়া দেশের মানুষ চড়াতেও পারে। যা তাদের আক্কেল বুদ্ধি, তাতে তাও পারে তারা। ঘরে একটাও দানা নেই আর তুমি এলে দানদাতব্য করে! এমন বুদ্ধি না হলে আর শুকিয়ে মরব কেন গুষ্টীশুদ্ধ, এমন কপাল না হলে—'

হরলাল বলতে গেল, 'কিন্তু তুই অমন করছিস কেন নয়ন! এ টাকা তো কোনও খারাপ কাজে—'

নয়ন বলল, 'যে গুণধর পুরুষ তুমি। তোমার ভালো কাজও যা খারাপ কাজও তা।'

তাছাড়া কি। বুকের ভিতরে হাহাকার করে উঠল নয়নের। মতি-গতি যখন খারাপ হয় তখন মদ, মেয়েমানুষে টাকা উড়ায় হরলাল আর বুদ্ধিটি ভালো থাকলে নাম-যশের জন্য দানদাতব্য করে। তার মদের নেশা যেমন, নামের নেশাও তেমনি। নয়নের কাছে কোন প্রভেদ নাই। হয় মদে, না হয় বারভূতে খায় হরলালের টাকা। আর হাড় কালি হয়ে যায় নয়নের ধামা-কুলো বুনতে বুনতে। বেশীর ভাগ সময় সেই ধামা-কুলো বিক্রির পয়সাতেই দুটো দানা জোটে নয়নের ছেলেমেয়েদের! হরলালের হাতে টাকা কবেই বা থাকে! মুখে মদ, গলায় মেডেল নিয়ে সে তো দিব্যি দেশ ভরে নেচেকুঁদে বেড়ায়, তার দুঃখ কি!

চমকে উঠল যেন নয়ন। এই মুহূর্তে সেই মেডেলের রাশ হরলালের গলায় নেই, নয়নের হাতের মধ্যে জ্বলছে আর সেই জ্বালায় হাত পুড়ে যাচ্ছে নয়নের, বুক জ্বলে যাচ্ছে, মন পুড়ে যাচ্ছে খাক হয়ে। এই মেডেলের জন্য অনেক জ্বলেছে নয়ন। আর নয়, আর নয়।

দুই হাতের মুঠোয় মেডেলগুলিকে শক্ত করে চেপে ধরল নয়ন, যেন কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, কেড়ে নিয়ে যাবে কেউ। তারপর কাঁটাল গাছটার তলা দিয়ে অন্ধকারে নয়ন পা বাড়াল।

হরলাল অবাক হয়ে বললে, 'চললি কোথায় বউ?'

পিছন ফিরে তাকাল নয়ন, তারপর নিতান্ত শান্তভাবে জবাব দিল, 'কর্মকারবাড়ী।'

কি যেন একটু আপত্তি করতে গিয়ে হরলাল চুপ করে গেল, পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আচ্ছা যা!'

কাঁটালতলা পেরিয়ে বিপিন ঢুলীর পোড়ো ভিটে। তার পরেই কৈলাসের বাড়ী। নতুন মুলি বাঁশের বেড়া ঘেরা দাওয়ায় বসে সন্ধ্যার পর কৈলাস মহাজনী কারবারের খেরোবাঁধা খাতা খুলে বসেছে। পাশে জ্বলছে চিমনি ফাটা হ্যারিকেনে লাল কেরোসিনের

আলো। এক হাতে হুঁকো আর এক হাতে কলম নিয়ে স্থির হয়ে বসে রয়েছে কৈলাস। হুঁকোও চলছে না, কলমও নয়। হরলাল আর নয়নের দাম্পত্য কলহের প্রতিটি কথা শুনবার জন্য কলম আর হুঁকো তো দূরের কথা, হৃদপিণ্ডকেও যেন সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে রাখতে পারে কৈলাস। বয়সের সময় কতদিন ওদের ঘরের পিছনে গিয়ে আড়ি পেতেছে, বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে চেষ্টা করেছে ভিতরের কাণ্ড, কোন কোন দিন ধরা পড়েছে কিন্তু হার মানেনি কৈলাস। দোস্তের ঘরের পিছনে আড়ি পাতবে না, পাতবে কোথায় ?

'সে কথা ঠিক। কিন্তু আর বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে এসো। তামাক সাজ নয়ন', ব'লে হরলাল তাকে ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সে দিন নেই, সে কাল নেই। আজকাল আর আড়ি পাতবাড় দরকার হয় না। ওদের স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা আপনিই কানে আসে। কেবল পারতপক্ষে হরলাল আর আসে না। দেখা হ'ল এখনো সেই ছেলেবেলার মত 'দোস্ত' বলে ডাকে, কৈলাসও 'দোস্ত' বলে সাড়া দেয়। কিন্তু মন সাড়া দেয় না, হৃদয় পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে থাকে। স্ত্রীর দিকে চোখ দেওয়া সত্বেও সে চোখে হরলাল কোন দিন সড়কি বসিয়ে দেয়নি, কৈলাসও লাঠি মারেনি তার মাথায়। কেবল চোখেই দেখেছে, বন্ধুনীকে কোন দিন জোর ক'রে চেখে দেখতে চেষ্টা করে নি কৈলাস। তবুও চল্লিশ পেরিয়ে 'দোস্ত' কথাটি কেবল দু'জনের শুকনো মুখের ডাক হয়ে রয়েছে, অন্তরের রসসিন্ধু সে ডাকে আর উত্তাল হয়ে ওঠেনা। আবাল্যের বন্ধুত্বে নয়ন এসে যে বাধার সৃষ্টি করেছিল, সে বাধা, সে পরীক্ষা দুজনেই পার হয়ে গেছে, তবু বন্ধুত্ব টেকেনি। কৈলাসের মনে হয়েছে—হরলাল বোকা। হরলাল বলেছে, কৈলাস আগে ছিল কামার, এখন চামার হয়ে গেছে। তা হবে। চিরটা কাল একইভাবে হরলাল ঢোল বাজিয়ে আর তাড়ি টেনে কাটিয়ে দিল বলে কৈলাসও যে ঠুক ঠুক করে চিরদিন পরের বউঝির গয়না গড়বে, আর হাঁপর ফুয়োবে তার কি কথা আছে ? বোকারা বুদ্ধিমানদের চামারই বলে থাকে। সে কথার মার আর যারই হোক, কৈলাসের কোন দিন গায়ে লাগে না। চামার না হলে পারত কৈলাস এমন বিত্তবিভব করতে ? পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে অমন পনের বছরের সোনার প্রতিমাকে ঘরে এনে সোনায় মুড়ে রাখতে পারত ? কামারগিরি না ছাড়লে দেশ বিদেশের বউঝিদের গয়না গড়িয়েই চুল-দাড়ি পেকে যেত কৈলাসের। হরলাল ঢুলীর স্ত্রী নয়নের মত তার বউয়ের গায়েও কোনদিন গয়না উঠত না, বাড়ীতে উঠত না এমন আটচালা টিনের ঘর। ধানের সময় পাটের সময় মাঠের শস্যে উঠান তা হ'লে ভরে উঠত না কৈলাসের।

'কে ?'

পা টিপে টিপে নয়ন একেবারে কৈলাসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে অদ্ভুত তার উল্লাস। জোরে আর জেদে যেন ফের আবার যৌবনের জোয়ার এসেছে দেহে।

সেই উল্লাসের জোয়ার কৈলাসের মনে এসে লাগল। নয়ন আবার এসেছে। আসতেই হবে। সেই দুপুরের নয়ন আর সন্ধ্যার নয়নে অনেক তফাৎ, অনেক পার্থক্য।

নয়ন ফিস ফিস করে বলল, 'শুনেছ তো সব ?'

সব যে শুনেছে, সে কথা কৈলাস গোপন করল না, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির আনন্দকে মুখের ছদ্ম বিষণ্ণতায় ঢাকবার চেষ্টা করে বলল, 'সবই কানে গেছে। তোমরা তো জাত-মান ঢেকে ছোট করে কেউ কথা বলো না। এত চেঁচামেচি পাড়ার কার কানেই বা না গেছে শুনি ?'

নয়ন বলল, 'তা যাক, কারো পরোয়া করি নাকি আমি ?' তারপর একটু চুপ করে থেকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে একবার হাসল নয়ন, 'কেবল একজন ছাড়া। সে জন তুমি গো তুমি। তোমার কাছেই ফের এলাম কর্মকার। ধান আজ আমি কিনবই।'

কৈলাস তেমনি বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু তোমাকে তো আগেই বলেছি ঢুলীবউ, টাকা নেই আমার কাছে।'

'আছে আছে, এখন আছে।' বলতে বলতে আঁচল খুলতে লাগল নয়ন। 'চঞ্চুলি কোথায়, আমার সতীন ?'

কৈলাস অবাক হয়ে বলল, 'রাঁধছে রান্না ঘরে '

মেডেলের মালাটি আঁচল থেকে খুলে ঝপ করে হঠাৎ কৈলাসের গলায় পরিয়ে দিল নয়ন, 'এবার, এবারও কি টাকা নেই তোমার কাছে ?'

উৎসাহে আনন্দে চোখ দুটো চক চক করে উঠল কৈলাসের। গলার মেডেলের মালাটা খুলতে খুলতে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ছি ছি, একি করলে ?'

কিন্তু মুখের কথা যে তার মনের কথা নয়, তা বলবার ভঙ্গিতে গোপন রইল না। নয়ন তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আর একটি করে মেডেল হাতের তেলোতেই ওজন করে দেখতে লাগল কৈলাস না জিনিস খুব বেশী নেই। কেবল এই সোনার কাজ করা বড় গোল মেডেলটি ছাড়া। কিন্তু সেটিকে দু'একবার ঘুরিয়ে দেখেই কৈলাস চমকে উঠল। যেন বিদ্যুৎ ছুঁয়েছে হাত দিয়ে।

কৈলাস বলল, 'বাঃ রে, এ জিনিস এখনো আছে, এতো সেই আমার মেডেল !'

নয়ন অবাক হয়ে বলল, 'তোমার মানে ?'

কৈলাসের চোখ যেন পলক ফেলতে চায় না, 'মানে আমারই হাতের। তেঁতুলকান্দির চৌধুরীদের মেজবাবুর বিয়েয় বড়বাবু এ জিনিস ফরমায়েস দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর দোস্তকে পরিয়ে দিয়েছিলেন এক উঠান লোকের মধ্যে।'

নয়ন কৈলাসের হাত থেকে আস্তে আস্তে তুলে নিল মেডেলটি। ফের নতুন করে দেখল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, 'সত্যিই ভারি চমৎকার, ভারি মিহি তোমার হাত ছিল কর্মকার !' তারপর একটু মৃদু হেসে চোখ তুলে বলল, 'ঠিক তোমার দোস্তের হাতের মত।'

লজ্জিত অপ্রতিভ ভঙ্গিতে নয়নের দিকে তাকিয়ে কৈলাস একটু হাসল। হরলালের

প্রসঙ্গ ওঠায়, তার সঙ্গে তুলনা দেওয়ায় জ্বালা ধরল না মনে। বরং উপমার যাথার্থ, স্বাদ গ্রহণ করতে করতে যেন সুদূর এক স্বপ্নাচ্ছন্নতার ভিতর থেকে কৈলাস জবাব দিল, 'বড়বাবুও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন নয়নবউ।'

নাম

স্ত্রী আর দুই বোনের জ্বালায় শেষ পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম। উঠতে বসতে তাগিদ, 'কই, ঝির কি করলে? বলে বলে যে আমরা হয়রান হয়ে গেলাম—'

খুঁজে খুঁজে আমিও কি কম হয়রান হয়েছি। কিন্তু কলকাতায় চার টাকার জায়গায় আট দশ টাকা মাসিক মাইনেয় যদি বা ঠিকে ঝি বারকয়েক ঠিক করা গেছে, গাঁয়ে এসে দেখতে পেলাম টাকা বিলিয়ে আর যাই মিলুক না কেন ঝি মিলবেনা।

আশে পাশে যে কয়েক ঘর কামার আর নমঃশূদ্র প্রতিবেশী আছে আগে তাদের বিধবা বোন আর মেয়েদের ভিতর থেকেই এ সব প্রয়োজন মিটত। কিন্তু আজকাল দিনকাল বদলেছে। পুরুষদের মজুরীর রেট হয়েছে এখন দু'তিন টাকা। ফলে মেয়েদের মান সম্মানের দিকে চোখ পড়েছে। কি মেয়ে কি পুরুষ ঝি চাকর খাটতে আর কেউ রাজী নয়।

ঘুরে ঘুরে দু'তিন বাড়িতে গিয়ে ইসারা ইঙ্গিতে কথাটা পেড়েও ফেললাম। কিন্তু কেউ বলল, 'দেহ ভালো নয়, নিজের সংসারেই নানান ঝামেলা,' আবার কেউ বা পরিষ্কার মাথা নেড়ে জানাল, 'না কর্তা, সমাজে তা হলে কথা উঠবে।'

তা তো উঠবে, কিন্তু এদিকে বাইরের কাজকর্ম করার জন্য একজন মেয়েছেলে না হলে নিতান্তই যে আমাদের নয়।

সবচেয়ে অসুবিধা জলের। আধ মাইল খানেক দূরে নদী। ফাল্গুনেই জল হাঁটুর নীচে নামতে চায়। তাও রাত থাকতে থাকতে, খুব ভোর ভোর সময়ে গিয়ে পৌঁছলে সেটুকু দেখা যায়। একটু বেলা হয়ে গেলেই ঘোলা হ'তে হ'তে তরল কাদায় সেই জল রূপান্তরিত হয়। তিন ননদ বৌদিতে প্রথম দিন দুয়েক কলসী কাঁখে বেশ সোৎসাহে স্নান-যাত্রা সুরু করেছিল কিন্তু তৃতীয় দিনেই দেখা গেল তাদের মধ্যে দুজনের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। বলবার কিছু নেই। দীর্ঘকালের নাগরিক অভ্যাস বদলানো শক্ত। মনের জোর জিহ্বায় যত সহজে সঞ্চারিত হয় অন্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তত সহজে হয়ে ওঠে না।

জলের পর আগুন। রান্না করতে গিয়ে সুলতার প্রায় চোখ ছল ছল করে ওঠে আর কি। সহরের মত কয়লা এখানে মেলে না। শক্ত কোন রকম জ্বালানি কাঠেরও ব্যবস্থা করা যায় নি। উমা আর রমা দুজনে মিলে বাগান থেকে কিছু শুকনো

পাতা আর ছিটকে ডাল সংগ্রহ করে এনেছে। আহার্য তৈরীর তাই একমাত্র ভরসা। আমি অবশ্য আশ্বাস দিয়েছি যে শীগগিরই এর একটা সুব্যবস্থা হবে। নিপত্র শুকনো-শুকনো ডাল নিয়ে যে সব গাছ এখনো সোজা হযে দাঁড়িয়ে আছে তারাই জ্বালানি রূপে সুলতার উনানের পাশে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে। কেবল জন দুয়েক কামলা মিললেই হয়।

পৈত্রিক বাড়িতে মাসখানেকের জন্য সপরিবারে বিশ্রাম এবং চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে এসেছি। কিন্তু ঝি চাকরের আর কামলা কৃষাণের অভাব প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বকে দুঃসহ ক'রে তুলল।

পাশের গাঁ থেকে পিসেমশাই অবশেষে এনে হাজির করলেন ঝি। তাঁর প্রজা বুড়ো ভুবনমণ্ডলের বিধবা মেয়ে। আকালের বার ভুবন মারা যাওয়ায় তাঁর বাড়িতেই এতদিন ছিল। এবার তিনি তাকে নতুন চাকরিতে ভরতি ক'রে দিতে চান।

বললুম, 'আপনার চলবে কি ক'রে?'

পিসেমশাই বললেন, 'সেজন্য ভেবনা। তোমার পিসীমা একাই একশ'। কাজকর্ম দেখে যদি পছন্দ হয় তুমি ওকে কলকাতায়ও নিয়ে যেতে পারো। শুনেছি সেখানেও ঝিরা নাকি সব রাজার ঝি হয়েছে।'

তামাক খেয়ে পিসেমশাই বিদায় নিলেন। আমি অন্দরে গেলাম ঝি সম্বন্ধে ওদের মতামত শুনতে। কিন্তু চাঁদ হাতে পাওয়ার মত মুখের ভাব কারোরই দেখলাম না। সুলতা আর উমা দুজনে গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছে। রমা হাসছে মুচকে মুচকে।

তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি, ঝি পছন্দ হয়েছে তো?'

সুলতা বলল, 'আচ্ছা পিসেমশাই না হয় বুড়ো মানুষ, তাঁর রুচির কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু তোমার কি সঙ্গে চোখ ছিল না?'

উমা বলল, 'রাগ কোরোনা দাদা, চোখ মানে এখানে চশমা।'

বললুম, 'দুই-ই ছিল বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের এ ধরণের সন্দেহের কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা।'

উমা বলল, 'দেখা যাক, আর একবার দেখে যদি পারো।' বলে উমা একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকল, 'ওগো, একবার এদিকে এসো ত, বাড়ির কর্তা তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন।'

ঘরের পিছনে বসে জ্বালানির জন্য দা' দিয়ে শুকনো কঞ্চিগুলিকে ঝি ছোট ছোট করে কেটে রাখছিল। উমার ডাক শুনে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আট হাতি ধুতির আঁচলটুকু মাথায় টেনে দিতে বার দুয়েক চেষ্টা করল কিন্তু কোনবারই মাথায় আর তা রইল না।

সুলতা ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'চেহারাখানা দেখ একবার।'

এতক্ষণ চেহারার কথা আমার মনেই হয় নি। ঝির আবার কেউ চেহারা দেখে

নাকি। বিশেষত সারা গ্রাম খুঁজলে যা একটি মেলেনা, তার চেহারা কি রকম কে দেখতে যায়।

সুলতার অনুরোধে ওর দিকে এবার তাকিয়ে দেখলাম। বোঝা গেল এতক্ষণ কেন সুলতা আর উমার মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছিল, কেনই বা রমা হাসি চাপতে পারছিল না।

বছর তিরিশেক হবে বয়স। লম্বা ছিপছিপে একটি গাবের চারার মত চেহারা, কোন অঙ্গে যে বিশেষ রকমের খুঁৎ কিছু আছে তা নয় কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন রকম সামঞ্জস্যই যেন নেই। অত বড় মুখে নাক এবং চোখ দুটিকে ভারী ছোট মনে হয়। দেহের তুলনায় হাত দুখানিও খুব খাটো এবং নীচের অংশ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত রকমের লম্বা। চেহারায় পুরুষালি ধরণটাই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। আসলে ও যেন মেয়ে নয়, মেয়ে সেজে এসেছে এবং সাজটা সম্পূর্ণ করার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই। ঝির আঙ্গিক গঠনের এই বৈসাদৃশ্যই রমাকে হাসিয়েছে এবং সুলতাকে বিরক্ত ও গম্ভীর করে তুলেছে বুঝতে পারলাম! সুলতার ইচ্ছা বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাব যেন সুন্দর হয় এবং গৃহ-কর্ত্রীর সুরুচি এবং সৌন্দর্য-নিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়।

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কি?'

কর্কশ পুরুষের কণ্ঠে জবাব এল, 'রসো।'

ওর পৌরুষের আধিক্যে স্ত্রীসুলভ লজ্জা অনুভব ক'রে একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললাম, 'কাজ কর্ম সব দেখে নিয়েছ? সব পারবে তো করতে?'

রসো বলল, 'কেন পারব না? এদেশের মানুষ না আমি, না বিলেত থেকে এসেছি?'

সুজাতা বলল, 'তাতো আসোনি। কিন্তু মাথাটাকে অমন ন্যাড়া কদমছাঁটা করেছ কেন। চুলগুলি কি দোষ করল।'

রসো এবার লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল। বলল, 'আর বলবেন না বউঠাকরুণ। দিনরাত উকুনের জ্বালায় অস্থির হয়ে বেড়াতাম। মাথা ভরে কেবল চুলবুল চুলবুল করত। যত সব অশান্তির বাসা। শেষে রাগ করে দিলাম একদিন ছেঁটে।'

সুলতা রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'বেশ করেছ।'

ব্যক্তিগত ভাবে চুলের ভারি যত্ন করে সুলতা। তেল মাখিয়ে শুকানোয়, বেণী কি কবরী রচনায় অনেক সময় তার ব্যয় হয়। কিন্তু তার প্রতিটি মুহূর্ত সে যেন আলাদা আলাদা করে উপভোগ করে। সুলতার জন্য সত্যিই কষ্ট বোধ করলাম।

সুজাতা পিছিয়ে এল তো উমা গেল এগিয়ে। দ্বিতীয় দিনে, আমার বিনা অনুমতিতেই সুটকেশ থেকে পুরোনো সরু নকসী-পেড়ে ধুতিখানা বের করে আনল। আলনা থেকে নামিয়ে নিল নিজের আধ-পুরোনো সাদা সেমিজটা। তারপর রসোর কাছে গিয়ে বলল, 'ওখানা ছেড়ে এগুলি পরো দেখি, ওভাবে তুমি ত দিব্যি স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা করো, এদিকে আমরা যে চোখ তুলে তাকাতে পারিনা। ছিঃ ছিঃ!'

রসো অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল। তারপর উমার দেওয়া সেই ধুতি আর সেমিজটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আড়ালে চলে গেল।

কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই দেখি সেই আট হাতি জীর্ণ ময়লা চীর পরে সে বেশ আরামে স্বচ্ছন্দে কাজ-কর্ম করছে।

উমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওমা, সেই ধুতি আর সেমিজ কি করলি?'

রসো অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, 'ছেড়ে রেখেছি। ভারি বাধো বাধো ঠেকে। আর পরতে না পরতেই যা ঘামাচি উঠেচে, দেখবেন?'

উমা বিকৃত মুখে বলল 'থাক, তোমার ঘামাচি দেখে আমার আর দরকার নেই।'

আরো দিন কয়েক কাটল। দেখা গেল অবস্থার মোটামোটি উন্নতি হয়েছে। রসোর কদমছাঁটা মাথা, আঙ্গিক শ্রীহীন বৈসাদৃশ্য এবং পরিধেয়ের হ্রস্বতা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। কাজ কর্মে সবাইকেই সে তুষ্ট করেছে। রান্না এবং খাওয়া ছাড়া প্রায় কোন কাজেই সুলতাদের হাত দিতে হয় না। কলসীতে কলসীতে নদী থেকে জল নিয়ে আসে রসো। এত জল যে তাতে সুলতাদের স্নান পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়।

জ্বালানি কাঠের কোন অভাব নেই আজকাল। শুকনো পাতা আর কঞ্চির খণ্ড নয়, অবসর মত বিকেলে বিকেলে ছোট কুড়ুলখানা নিয়ে আম আর গাবগাছের শুকনো গুঁড়িগুলি রসো চেলা করে দেয়। তার সে রূপ নাকি চোখ পেতে দেখা যায় না। মাথায় কোন কালেই রসোর কাপড় থাকে না। বুকের আঁচল মাজায় জড়িয়ে নেয়। তারপর লোহার মত শক্ত আমের গুঁড়ির ওপর মুহুর্মুহু তার কুড়ুল পড়তে থাকে; দর দর ক'রে ঘাম ঝরে পড়ে পিঠ বেয়ে।

সুলতা মাঝে মাঝে মিনতি করে বলে, 'থাকনা রসো, এসব পুরুষের কাজ তোমাকে করতে হবে না।'

কুড়ুল থামিয়ে রসো তার বিপুল মুখখানাকে বিকৃত করে জবাব দেয়, 'আহাহা কি সোহাগের কথাখানা গো। আমাকে করতে হবে না তো করবে কে শুনি? চাকর বাকর, কামলা কৃষাণ আছে দু'চার গণ্ডা, না দাদাবাবু নিজে এসে করতে পারবে। কোপ দেওয়া দূরে থাকুক কুড়ুলখানা যদি ভালো করে ধরতে জানতো তবু না হয় বুঝতাম। গুণের ওই তো একখানা সোয়ামী। এরপর আবার পুরুষের কাজ আর মেয়েমানুষের কাজ বলে বকাবকি করছ বউঠাকরুণ।'

নায়ক নায়িকার সংলাপ রচনা করতে করতে হঠাৎ কথাগুলি আমার কানে যায়। কিছুক্ষণের জন্য কলমটি স্তব্ধ হয়ে থাকে কিন্তু রসোর কুড়ুলের খট্ খট্ শব্দ চলতে থাকে অবিরাম। খানিক বাদে রসো আবার আপোষ করে সুলতার সঙ্গে।

'সোয়ামীর নিন্দা করলাম বলে রাগ করেছ নাকি বউঠাকরুণ?'

স্থলতা হাসি গোপন করে বলে, 'করেছিই তো। নিন্দা শুনলে রাগ হয় না? তোর হোত না?'

জানলা দিয়ে চোখে পড়ল রসো তার বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে ধরেছে, 'হুঁ, এইটে হোত।'

উমা হঠাৎ ধমকের স্থরে বলে, 'ছিঃ ওসব কি?'

রসো পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যায়, 'কাজের কথা বলছিলে বউঠাকরুণ। কাজের কি আবার মেয়ে পুরুষ আছে। যে যা জানে তার সেই কাজ। তাই তাকে মানায়।'

রমা হেসে ওঠে, 'বাব্বাঃ, আমাদের রসরাজ যে আবার বক্তৃত দিতেও জানে দেখছি বউদি।'

রসোর পৌরুষকে স্বীকার করে নিয়ে ওরা তার নাম রেখেছে রসরাজ। চাল চলনে রুচিতে প্রসাধনে নিজেদের সঙ্গে রসোর মিল নেই। এ নিয়ে মনে আর কোন ক্ষোভ নেই স্থলতার, চোখ আর পীড়িত হয়ে ওঠে না। ওরে বেশ-বাসে, আচারে ব্যবহারে লজ্জা পাওয়ার কি আছে। ওযে কেবল আমাদের নিজেদের শ্রেণীর মেয়ে নয় তাই নয়, ওর মধ্যে কোন শ্রেণীর কোন নারীত্বই নেই।

আরো একটি ঘটনায় এ কথার ভালো রকম প্রমাণ হয়ে গেল। আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকেন কুঞ্জ কবিরাজ। ছেলেপুলে নেই, বছর কয়েক আগে স্ত্রী মারা গেছে। আর একবার বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মাথার চুল সব পেকে যাওয়ায় কোন মেয়ের বাপ রাজী হয়নি, পাড়ার ছেলেরাও শাসিয়েছে। অগত্যা বড়ি আর দাবার ব'ড়ে নিয়েই কবিরাজের দিন কাটে।

আমি বাড়ি এসেছি শুনে দাবার পুঁটলি হাতে রোজ আমাদের বাড়িতে তিনি আসা স্থরু করলেন। বললাম, 'কিন্তু দাবা খেলা তো আমি জানিনে কবিরাজ মশাই।'

কবিরাজ মশাই নাছোড়বান্দা। বললেন, 'জানোনা, জানতে কতক্ষণ?'

প্রথম দিন কয়েক খুব বিরক্ত বোধ করতাম। কিন্তু ক্রমশ একটু একটু ক'রে রস পেতে লাগলাম। নেশা জমে উঠল।

তবু কবিরাজের মত জিততে পারি না, চালও দিতে পারি না তাড়াতাড়ি। ভাবতে হয়। অনেক সময় লাগে।

কবিরাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন তারপর অধীর ভাবে বলেন, 'নাহে তুমি যে রাত ভোর করে দিতে চললে দেখছি। বসে বসে আমি কি করি বলোতো। অন্তত একটু ধোঁয়া টোয়ার ব্যবস্থা করলেও না হয় বুঝতুম।'

লজ্জিত হয়ে পরদিন থেকে কবিরাজ মশাইর জন্য তামাকের ব্যবস্থা করে দিলাম।

হুকো কলকে এলো, মাটির ভাড়ে রইল মাখা তামাকের গুলি, আগুন-মালসায় দগদগ করতে লাগল চেলা কাঠের আগুন। নাবাবী শিষ্টাচারে আরও একধাপ অগ্রসর হলাম। রসোকে ডেকে বললাম, 'রাত্রে তো কোন কাজ নেই। এখানে কাছাকাছি থাকবি, কবিরাজ যখন তামাক চাইবেন, ভরে দিবি তামাক।'

রসো হাত মুখ নেড়ে বলল, 'আহাহা কি সোহাগের কথা গো, ওঁরা রাত ভরে দাবা খেলবেন আর আমি বসে বসে কেবল তামাক ভরে দেব। আমার বুঝি আর মানুষের গতর নয়।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই রসো অত্যন্ত অপ্রতিভ এবং সংকুচিত হয়ে বলল, 'বকোনা দাদাবাবু, মুখে বললুম বলে, তোমার কথার কি সত্যই অমান্য করতে পারি। তুমি হচ্ছ মনিব।'

সুবন্দোবস্তের ফলে কবিরাজ মশাইর তামাকের তৃষ্ণা ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। এক ছিলিম শেষ হ'তে না হ'তেই আর এক ছিলিম রসোকে ভরতে বলেন। দুটো দিন যেতে না যেতে বড় বড় এক একটা গুলি কাবার হয়ে যায়। কিন্তু এ নিয়ে বলি বলি করেও কবিরাজ মশাইকে কিছু বলতে ভারি সংকোচ হয়। ভাবি, আর কটা দিনই বা।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এবং আকস্মিকভাবে যে দাবা আর তামাকের ওপর যবনিকা পড়বে ভাবতেই পারিনি। সুলতারা এ নিয়ে অনেক রকম মন্তব্য করেছে, কানে তুলিনি। কিন্তু সে রাত্রে ব্যাপার ঘটল একেবারে ভিন্ন রকম।

একটু বেশী রাত হয়ে যাওয়ায় এবং ওরা বারবার আপত্তি করতে থাকায় খেলা অসমাপ্ত রেখেই কবিরাজ মশাইকে বিদায় দিলাম। কবিরাজ মশাই নিতান্ত অনিচ্ছায় পুঁটুলি বেঁধে উঠে পড়লেন। বললেন, 'বড় বেরসিক লোক হে, একেবারে স্ত্রীর আঁচলধরা হয়ে পড়েছ।'

হেসে বললাম, 'সেটা তো রসিকেরই লক্ষণ। সে আঁচল যে রসে একেবারে ভিজে জবজবে হয়ে থাকে, তা কি এর মধ্যেই ভুলে গেলেন?'

রসো যে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল লক্ষ্য করিনি। তার হাসির শব্দে চমকে উঠলাম। চমকালেন কবিরাজও। এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'রসো আলোটা একটু ধরোতে, ভারি অন্ধকার রাস্তা।'

বললাম, 'আমি দিচ্ছি এগিয়ে।'

রসো তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে বলল, 'না দাদাবাবু, আপনি থাকুন। পথ ঘাট ভালো নয়, আমিই যাচ্ছি।'

ঘরে গিয়ে সুলতার অভিযোগের জবাব দিতে চেষ্টা করছি হঠাৎ বাগানের ভিতর থেকে কবিরাজ মশাইর তীব্র আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলাম। ব্যাপার কি! সাপটাপ

-নাকি রাস্তায়! তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। পিছনে থেকে রমা আর উমা ভীত কণ্ঠে বলল, 'একটা আলো নিয়ে যাও দাদা। অমন অন্ধকারে যেয়োনা।'

খানিকটা যেতে না যেতেই বিস্মিত হয়ে দেখলাম. কবিরাজ মশাইর একখানা হাতের কবজী শক্ত করে ধরে রসো তাকে হিড়হিড় করে আমাদের বাড়ির দিকে টেনে আনছে।

বললাম, 'ব্যাপার কি রসো?'

রসো একটা অশ্রাব্য গালি দিয়ে উঠল: 'হতচ্ছাড়া মুখপোড়া বুড়ো আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল বাগানের মধ্যে।'

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, 'ছেড়ে দাও ওঁকে। এসব কি কাণ্ড কবিরাজ মশাই?'

কবিরাজ মশাইর চেহারাটা অত্যন্ত করুণ দেখাল। গরম চিমনির ছাপ লেগে গালের খানিকটা পুড়ে গেছে। হাত ছেড়ে দিতে মনে হলো কাব্জীটা তার মচকে গেছে। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম রসো সম্বন্ধে এমন ভুল, এমন মোহ, তাঁর হোল কি করে? রসোর অন্তরে বাহিরে সত্যিই কী নারীত্ব বলে কিছু আছে?

মহকুমা সহর থেকে টীকাদার এসেছে বসন্তের টীকা দেওয়ার জন্য। রোগটা প্রত্যেকবারই এই সময়টায় এ অঞ্চলে বেশ একটু ছড়িয়ে পড়ে। আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।

অন্য সব বাড়ি সেরে. প্রায় দুপুরের সময় টীকাদার আমাদের বাড়িতে এল। মেয়েরা প্রথমটায় কিছুতেই টীকা নেবে না। টীকাদার বার বার অনুরোধ ক'রে বলতে লাগল, 'সবতো আমার মা লক্ষ্মী। আমার কাছে আবার লজ্জা কি আপনাদের।'

সুলতাদের বললাম, 'দোষ কি। নাওনা টীকা।'

বারাণ্ডায় চেয়ার পেতে টীকাদারকে বসতে দেওয়া হোল। পাড়ার কৌতূহলী ছেলেমেয়েরা টীকাদারের পিছনে পিছনে এসেছিল। ধমক খেয়ে আর তারা এগুলোনা।

শত হলেও বাইরের একজন লোকের সামনে বেরুতে হবে। আবাল্যের অভ্যাস মত তিনজনেই শাড়িটা বদলে নিল, আয়নার সামনে গিয়ে দেখে নিল মুখখানা। তারপর টীকা নেওয়ার জন্য বরাণ্ডায় এসে দাঁড়াল।

রসোও এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে দেখছে সব চেয়ে চেয়ে।

টীকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টীকাদারের সঙ্গের লোকটি একটি খাতায় নাম লিখে নিচ্ছে।

রমার টীকা দেওয়া হয়ে গেলে লোকটি বলল, 'ওর নামটা?'

বললাম, 'ডাকি তো রমা রমা ক'রে। ভালো নামটাই লিখুন, কাবেরী রায়।'

উমার পোষাকী নাম উজ্জয়িনী! স্থলতার শুচিস্মিতা।

এবার রসোর পালা। টীকাদারের কাছে ঠিক মধুরেন সমাপয়েৎ হোলনা। রসোর শক্ত শাবলের মত হাতখানায় নিতান্ত নিস্পৃহভাবে সরু ছুরি দিয়ে গোটা তিনেক আঁচড় কেটে টীকাদার পরম অবহেলায় জিজ্ঞসা করল, 'নাম?'

বললাম, 'রসো।' রসো একবার আমার দিকে তাকাল, চোখ বুলিয়ে নিল স্থলতাদের দিকে, তারপর টীকাদারের দিকে চেয়ে মোলায়েম গলায় বলল, 'না টীকাদার মশাই, আমার নাম রসমঞ্জরী।'

অবাক হয়ে রসোর দিকে তাকালাম। তার বেশবাসের সংস্কারের দিকে আর কেউ লক্ষ্য করেনি। এতদিনে লক্ষ্য না করাটাই সকলের অভ্যাস হয়ে গেছে। রসোর পরনে সেই আটহাতি ময়লা ধুতি কয়েক জায়গায় ছেঁড়া।

টীকাদাররা চলে গেলে বললাম, 'আমরা তো জানতাম না, এ নাম তুই কোথায় পেলিরে?'

রসো ভারী লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করল, তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'পাবো আবার কোথায়? পোড়ারমুখো কবরেজ সে দিন ওই নামেই ডেকেছিল।'

কুলপী বরফ

ষ্টেশন থেকে মিনিট দশেক হাঁটতে হয়। রাস্তার দু' দিকে নারকেল আর স্থপারির সার। ফাঁকে ফাঁকে একতলা কোঠা বাড়ী। মেটে বাড়ীর সংখ্যাই বেশী। এক জায়গায় ছোট্ট একটি বাঁশের ঝাড়।

যেতে যেতে নীরদ বলল, 'সহর ব'লে কিন্তু মনেই হয় না, মনোহরদা।'

মনোহর বলল, 'সহর নাকি যে সহর বলে মনে হবে? কয়েকটা চটকল আর কাপড়ের কল আছে এই পর্যন্ত। অবশ্য স্কুল, পোষ্ট অফিস, বাজার সবই আছে। সেগুলি সব ওই দিকে'—বলে মনোহর হাত দিয়ে বাঁ দিকের রাস্তাটা দেখিয়ে দিল।

নীরদ একটু হাসল, 'এটা বুঝি তাহলে তোমাদের সহরতলী?'

মনোহর তখনও সহরেরই বর্ণনা দিচ্ছে, 'গতবার দুটো ব্যাঙ্ক এসেছে, এবার শুনেছি সিনেমাও হবে।' উজ্জ্বল, উৎফুল্ল দুটি চোখে মনোহর নীরদের দিকে তাকাল।

শিয়ালদা' থেকে ট্রেণে মাত্র মিনিট পনেরর পথ। কিন্তু ভীড়ে আর গোলমালে গাড়ীতে যে দুর্ভোগ নীরদকে ভোগ করতে হয়েছে পনের ঘণ্টাতেও যেন তার দাগ মুছবে না। একখানা গাড়ী ফেল করায় স্টেশনে এসে বসে থাকতে হয়েছে পুরো দেড়

ঘণ্টা। দুপুর গড়িয়ে গেছে। বার কয়েক চা টোষ্ট খেয়েও ক্ষিদেয় জ্বলছে পেট। সহরের ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা নীরদের কানে খুব মধুর লাগল না, বলল, 'আর কতদূর তোমার বাসা ?'

মনোহর তাড়াতাড়ি বলল, 'এই তো, এই তো এসে গেছি। খুব কষ্ট হলো তোর, বেলা গেছে কোথায়, আমারা কিন্তু সেই সকাল থেকে আশায় আশায় আছি, এই আসে, এই আসে। একেকটা গাড়ীর শব্দ শুনি, আর দৌড়ে দৌড়ে আসি স্টেশনে, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। মানুষের দেখা নেই। শেষে তোর বউদি বললে—। এই যে নীরু, এই আমার কুঁড়ে।'

সদরের দরজায় খিল দেওয়া ছিল না। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ভিতর অত্যন্ত ছোট মেটে একখানা ঘর, ওপরে গোলপাতার ছাউনি। পাশেই আর একটু দোচালার মধ্যে পাকের জায়গা। কুঁড়েই বটে। কিন্তু মনোহরের কথার ভঙ্গিতে মনে হোল বড় একটা প্রাসাদকে নিতান্ত বিনয় আর সৌজন্যেই সে কুঁড়ে আখ্যা দিয়েছে। কুঁড়ে যেন এটা আসলে নয়।

ভিতরে ঢুকেই মহা ব্যস্ত হয়ে উঠল মনোহর। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কথাবার্তা আলাপ সালাপ পরে হবে, আগে খেতে দাও ওকে। দেখ, মুখ একবারে শুকিয়ে গেছে, বেলা আর আছে নাকি!'

নীরদরা আসবার সঙ্গে সঙ্গে নির্মলা আধ হাত ঘোমটা টেনে দিয়েছে। আলাপ করবার কোন গরজই তার মধ্যে দেখা গেল না। উনানের উপর কি একটা তরকারি হচ্ছিল। সেটা নামিয়ে নিয়ে সে এল শোয়ার ঘরে। দ্রুতহাতে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে নিল জায়গা, দুখানা আসন পাশাপাশি পেতে ঠাঁই করে দিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে ফিস ফিস ক'রে বলল, 'বসতে বল ঠাকুরপোকে।'

মনোহর একটু রসিকতা করল, 'বাঃ, কেবল আমি বললেই হবে নাকি? তোমার মুখের কথা না শুনলে—'

ঘোমটার ভিতর থেকে অনুচ্চ ধমক শোনা গেল, 'আঃ, রঙ্গ রাখো। আমার কথা ওঁর পরে শুনলেও চলবে। খেয়ে দেয়ে আগে সুস্থ হয়ে নিন।'

নীরদ আসনে বসতে বসতে বলল, 'থাক মনোহরদা, খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছ খেয়েই যাই, মুখ দেখা আর কথা শোনার নিমন্ত্রণ আর একদিন কোরো, সেদিন এসে দেখে শুনে যাব।'

এবার ঘোমটার ভিতর থেকে চাপা হাসির শব্দ উঠল।

আয়োজন অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। দু রকমের ডাল, তিন রকমের নিরামিষ তরকারি, মাছ তিনচারটা, টক, দই, মিষ্টান্ন, বাদ নেই কিছুই।

মনোহর খেতে খেতে বলল, 'কেমন হয়েছে রান্না। তুই যে কিছুই প্রায় খাচ্ছিসনে।'

নীরদ জবাব দিল, 'আমাকে কি মহাপেটুক ঠিক করেছ। চেহারা দেখে তাই মনে হয় নাকি? আর এত সব আয়োজনই বা কেন। আমি কি অতিথি না কুটম্ব?'

মনোহর মৃদু হেসে বলল, 'আয়োজন আর করতে পারলাম কই। কিন্তু অতিথি-কুটুম্বের চেয়েও তুই বাড়া হয়ে গেছিস। সেদিন দেখে তো চিনতেই পারলিনে।'

নীরদ লজ্জিত হয়ে বলল, 'সাত আট বছর পরে দেখা। তারপর অত বড় বড় গোঁফ গজিয়েছে ঠোঁটের ওপর। কি করে হঠাৎ চিনে ফেলি বল। গল্পটা আপনার কাছে বলছি বউদি। আপনি নিশ্চয়ই এর আগে শুনেছেন। কিন্তু এবার শুনতে একটু অন্য রকম লাগবে। এক বন্ধুকে তুলে দিতে এসেছি স্টেশনে। আসন্ন বিচ্ছেদে মন অন্যমনস্ক। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই কে একটি লোক এসে আচমকা আমার কব্জী চেপে ধরল। নাড়া লেগে সদ্য-ধরানো সিগারেটটা গেল পড়ে। চোখ গরম করে বললাম, কে আপনি। লোকটি মুচকি হেসে বলল, দেখুন মনে করে। মনে ক'রে দেখবার আগে আমি চেহারাটা আর একবার চেয়ে দেখলাম। বেঁটে ছোটখাটো মজুবুত শরীর। বর্ণ ঘনশ্যাম। গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, বাঁ হাতে মস্ত বড় এক ঝুলি। তার ভারে ভদ্রলোক ঈষৎ কাৎ হয়ে পড়েছেন। —ভালো কথা মনোহরদা, সেদিন জিজ্ঞেস করা হয় নি। অত বড় ঝুলির মধ্যে কি বাজার করে নিয়ে ফিরছিলে? কি ছিল তার মধ্যে?'

এতক্ষণ নির্মলা হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়ছিল, মনোহর নিজেও উপভোগ করছিল নীরদের সেদিনকার বর্ণনা। কিন্তু ঝুলির কথা তুলতেই নির্মলার হাসি বন্ধ হোল, ম্লান হয়ে গেল মনোহরের মুখ।

মনোহর একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'ও কিছু নয়।'

নীরদ প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'কিছু নয় বললেই আমি বিশ্বাস করলাম আর কি। আচ্ছা বউদি আপনিই বলুন না দাদাকে সেদিন এত কি আনতে পাঠিয়েছিলেন বাজারে।'

কিন্তু নির্মলা মুখ নিচু করেই রইল। নীরদের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

মনোহর খানিকক্ষণ গম্ভীরমুখে নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'কি দরকার এত ঢাকঢাক গুড়গুড়ের। থলের মধ্যে আর কি থাকবে। ছিল বরফ।'

নীরদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'বরফ! অত বরফ দিয়ে করলে কি। অসুখ বিসুখ ছিল নাকি বাড়িতে?'

নির্মলা আর বসল না। খালি ভাতের থালা হাতে রান্নাঘরের দিকে চলল।

মনোহর সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'ঈস লজ্জার বহর দেখ। যাতে ভাত জুটছে, কাপড় জুটছে, তার নাম করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে পড়ে, অপমান বোধ হয়!'

নীরদ বলল, 'ব্যাপার কি মনোহরদা।'

মনোহর বলল, 'না, ব্যাপার এমন কিছু নয়। আচ্ছা ভায়া, এম এ, বি এ, পাশ করেছ, চাকরি বাকরিও করছ কিন্তু গাড়ী বাড়ী কোথায় কি করতে পেরেছ শুনি।'

নীরদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'হঠাৎ এ কথা কেন মনোহরদা?'

মনোহর বলল, 'শুনিই না, করেছ নাকি কোথাও কিছু।'

নীরদ বলল, 'ক্ষেপেছ, যা দিনকাল তাতে নিজের খরচটা কোনরকমে চালিয়ে থাকতে পারলেই ঢের।'

মনোহর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, 'ঐ শোন।' তারপর নীরদের দিকে আবার ফিরে তাকাল মনোহর, 'কিন্তু ভায়া বরফই বেচি, আর যাই করি, এই যা দেখছ, তোমার মা-বাপের আশীর্বাদে সব নিজের। মাসে মাসে ভাড়া গুণতে হয় না, কথার তলায় থাকতে হয় না কারো!' আত্মপ্রসাদে মনোহরের চোখ দুটি উজ্জ্বল দেখাল।

নির্মলা নিঃশব্দে পরিবেশন করে যেতে লাগল।

নিজেদের সামান্য বাড়ীঘর নিয়ে স্বামীর এই আকস্মিক দম্ভে নির্মলার লজ্জার যেন আর সীমা রইল না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি ভাবলেন ঠাকুরপো। এই দু তিন দিন ধ'রে স্বামীস্ত্রীতে মিলে ঠিক করেছিল নিজেদের ব্যবসার কথা উচ্চশিক্ষিত, চাকুরে, দূর-সম্পর্কের আত্মীয়টির কাছ থেকে তারা গোপন রাখবে। কতক্ষণই বা থাকবে নীরদ। যে গাড়ীতে আসবে তার পরের গাড়ীতেই চলে যাবে। কি দরকার তাকে নিজেদের জীবিকার কথা জানানো। প্রসঙ্গেক্রমে কথাটা যদি ওঠেই মনোহর না হয় বলবে এখানেই কোন অফিস-টপিসে কাজ করে। মনোহরকে আজ তাই বরফ ফিরি করতে বের হতে দেয়নি নির্মলা। নিজেও বরফ রাখবার হাঁড়ি, দুধ জাল দেওয়ার বড় কড়াই, ছোট ছোট কুড়ি কয়েক টিনের চোঙা এবং অন্য সব ছোট বড় সরঞ্জাম লুকিয়ে রেখেছে এখানে ওখানে, রান্নাঘরের কোণে তক্তপোশের তলায়। কিন্তু মনোহর মেজাজ খারাপ করে হঠাৎ যে সমস্ত কথা এমন ভাবে ফাঁস করে দেবে তা নির্মলা আশঙ্কা করেনি। তবু একটা কথা ভেবে সে মনে মনে একটু স্বস্তি বোধ করল। ভদ্রলোকের অযোগ্য এই জীবিকার জন্য যে তাকেও সাহায্য করতে হয়, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কেবল এই নিয়েই যে তার কাটে, মনোহরের হাস্যকর দম্ভের মধ্যে একথাটা প্রকাশ হয়নি। এখন পর্যন্ত বাপের বাড়ীর তরফের দূর সম্পর্কের আত্মীয়েরা এ সব কথা জানে না। তাদের কাছ থেকে এ তথ্যটা নির্মলা অনেক কষ্টে অনেক কৌশলে গোপন রেখেছে। বাবা বেঁচে থাকলে এমন সম্বন্ধ তার হোত না। দেনায় ডুবু ডুবু দাদা তাকে যে পাত্রস্থ করতে পেরেছে এই তো যথেষ্ট। তার বর কি করে না করে এটা আর কে যাচাই করে দেখতে আসে। নির্মলা ভেবেছিল ঠিক ঐ রকম কৌশলে নীরদকেও কিছু জানতে দেবে না। নীরদ জেনে যাক মনোহরও ভদ্র-রকমের চাকরি বাকরি করে, ভালো খায়, ভালো পরে, কারো চেয়ে সে হীন নয়। কিন্তু

নিজের ধৈর্যহীন অসহিষ্ণু স্বভাবের জন্য এমন কাণ্ড করে বসল যে নির্মলার আর মুখ দেখাবার জো রইল না।

ব্যাপারটা এবার নীরদও কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারল। মনে পড়ল অনেককাল আগে মনোহরের বরফের কারবারের কথা কার কাছে সে যেন শুনেছিল। কিন্তু কথাটা মোটেই তার মনে ছিল না। তার নিরর্থক মেয়েলি কৌতূহলের জন্যই যে এমন একটি অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হোল সে কথা ভেবে নীরদ অপ্রতিভ এমন কি খানিকটা অনুতপ্তই হয়েই পড়ল।

দাওয়ায় পাটি বিছিয়ে বালিশ পেতে এরই মধ্যে পরিপাটি বিশ্রামের আয়োজন ক'রে রাখা হয়েছে। পিতলের ছোট রেকাবিতে এসেছে পান, মশলা। নীরদ একটু সুপারি তুলে নিয়ে বলল, 'যে রকম ব্যবস্থা দেখছি তাতে যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু এমন একটা জরুরী কাজ আছে আড়াইটের সময়—'

মনোহর বলল, 'রবিবার আবার জরুরী কাজ কিসের। তা ছাড়া গাড়িও তো নেই এখন।'

দোরের আড়াল থেকে নির্মলা বলল, 'খেয়ে উঠেই যদি ছোটেন লোকে ভাববে দাদার বাড়ীতে কেবল নিমন্ত্রণ খেতে এসেছিলেন।'

নীরদ বলল, 'কিন্তু নিমন্ত্রণ খাওয়া ছাড়া আর কি কোন রকম আশা আছে? এতক্ষণ তবু ঘোমটার আড়ালে ছিলেন, এবার গেলেন দোরের আড়ালে। সামনে যে আসবেন এমন কোন লক্ষণই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

মনোহর বলল, 'হবে হে ভায়া, সময়ে সব হবে। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে আসতে দাও।'

নীরদ বলল, 'সত্যি, আজ ভারি দেরী হয়ে গেল ওঁর খেতে।'

মনোহর বলল, 'এ আর নতুন কি। এমন দেরী ওর রোজই হয়।

নীরদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'রোজ! কেন?'

মনোহর বলল, 'কেন আবার, বেলা একটা দেড়টা তো বরফের ক্ষীর জ্বাল দিতেই কাটে। কুলির মাথায় হাঁড়ি চাপিয়ে আমি বেরোই তবে তোমার বউদি গিয়ে খেতে বসে।'

নীরদ কৌতূহল-কণ্ঠে বলল, 'ও, উনিই বুঝি নিজ হাতে সব করেন?'

'আর কে করবে তবে? এর জন্য কি লোক ভাড়া ক'রে আনব নাকি বাইরে থেকে?'

নির্মলা আর দাঁড়াল না। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু খেতে বসতে তার ইচ্ছা করছে না। মনোহর খুঁটিনাটি নীরদকে সব না জানিয়ে ছাড়বে না। কিন্তু এসব কথা কি এমনই গৌরবের যে সবাইকে তা বলে বেড়ান যায়।

সিগারেট আনতে মনোহর গেল বাইরে। দোকান কাছাকাছি নেই। খানিকটা দূরেই যেতে হবে। নীরদ বলল, 'থাক না', কিন্তু মনোহর সে কথা কানে তুলল না।

একটু পরেই রান্নাঘরের কাজ সেরে নির্মলা এসে উপস্থিত হোল। বরফের ব্যবসার কথা তার কাছে সব প্রকাশ ক'রে দেওয়া যে নির্মলার ইচ্ছা ছিল না তা নীরদের বুঝতে বাকি নেই, তবু একটু ইতস্তত করে নীরদ বলল, 'ভিতরে ভিতরে যে এত গুণ আছে আপনার সে সব আমার কাছে গোপন করে যাবেন ভেবেছিলেন, না?'

নির্মলা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'গুণ! গুণ আবার কোথায় দেখলেন আমার!'

নীরদ বলল, 'গুণ নয় তো কি! এমন কুলপী বরফ না কি এ অঞ্চলে আর কেউ তৈরী করতে পারে না। আর এত বড় কথাই আপনি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছিলেন। কিন্তু আজ আপনার হাতের কুলপী বরফ না খেয়ে আমি এক পাও নড়ছি না। হাজার জরুরী কাজ থাকলেও না। বাইরে এত আজে বাজে লোককে খাওয়াতে পারেন আর যত দোষ করলাম বুঝি আমি!'

নির্মলা মৃদুস্বরে বলল, 'কিন্তু আজ তো হবে না।'

'বেশ, কবে হবে বলুন। সেদিনই আমি আসব।'

নির্মলা বলল, 'যেদিন আপনার সুবিধা। তৈরী তো রোজই আমাকে করতে হয়।'

নীরদ বলল, 'কিন্তু রোজ তো অফিস আমাকে ছুটি দেবে না। মনোহরদাও নিমন্ত্রণ করবেন না। আমি আসব সামনের রবিবার। যেচে নিজেই নিমন্ত্রণ নিয়ে গেলাম, মনে থাকে যেন। সেদিন যেন বঞ্চিত না হই।'

কুলপী বরফ রোজ তৈরী করলেও রবিবার একটু বিশেষ আয়োজন করল নির্মলা। অন্য দিনের আটপৌরে বেশটি বদলালো। কড়াই আর ছোট ছোট চোঙাগুলি ঝকঝকে করল মেজে। যেখানে বসে তৈরী করে জিনিস, নিকিয়ে পুছে পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখল সে জায়গাটা।

নীরদ আজ অনেক সকাল সকাল এসে পৌছল। বাজার ক'রে নিয়ে এসেছে বৈঠকখানা থেকে। মাছ, তরকারি, এক ঝুড়ি আম, কুলির হাত থেকে নিজেই সব নামিয়ে রাখতে লাগল দাওয়ায়।

মনোহর বলল, 'এসব কি।'

নীরদ বলল, 'জিজ্ঞেস কর বউদিকে। আজকের নিমন্ত্রণ তিনি করেন নি, করেছি আমি। তিনি শুধু খাওয়াবেন কুলপী বরফ।'

সিগারেট টানতে টানতে নীরদ ছোট্ট উঠানটুকুতে পায়চারি করে আর রান্না-ঘরের সামনে এককেবার থামে আর চেয়ে চেয়ে দেখে নির্মলার কুলপী বরফ তৈরীর আয়োজন।

নীরদের এই কৌতূহল মনোহরের কাছেও উপভোগ্য হয়ে উঠল। নিজের ঔৎসুক্যে,

আগ্রহে, নীরদ যেন তাদের ব্যবসাকে নতুন মূল্য দিয়েছে, গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছে তার আর নির্মলার।

মনোহর বলল, 'নীরদকে একটি বসবার আসন টাসন দাও না এখানে। রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে তোমার কাছ থেকে বিদ্যাটিও শিখে নিতে চায়। সে তো আর অমন ঘুরে ঘুরে হবে না, মন স্থির ক'রে এক জায়গায় বসে শিখতে হবে।'

নির্মলা তাড়াতাড়ি উঠে গেল। ঘর থেকে বার ক'রে আনল ছোট একখানা জলচৌকি। তার ওপর পেতে দিল চারিদিকে লতা-ঘেরা নিজ হাতে বোনা কার্পেটের আসন। . আসনটি তার কুমারী বয়সের তৈরী। স্বামীর ঘরে আসবার সময় নিয়ে এসেছে সঙ্গে।

মনোহর ঠাট্টা ক'রে বলল, ঈস, নীরদ যে একেবারে দেখতে দেখতে গুরুদেব হয়ে উঠলি দেখছি।'

নীরদ সেই আসন-ঢাকা জলচৌকির ওপর বসতে বসতে বলল, 'উল্টো কথা বললে যে মনোহরদা। এখন থেকে গুরু তো হলেন ইনিই। বিদ্যেটা এঁর কাছ থেকেই তো শিখে নিতে হবে।'

নির্মলার সেই ঘোমটার দৈর্ঘ আর নেই। খাটো ঘোমটার ফাঁকে চাপা হাসিতে উজ্জ্বল মুখখানি ভারি সুন্দর লাগল নীরদের। এমন ঘরে এমন মুখ সত্যিই অপ্রত্যাশিত।

কথা বলল কিন্তু নির্মলা স্বামীকে উদ্দেশ করেই। বলল, 'তুমিও যেমন, ঠাকুরপো ভেবেছেন আমরা এমনি বোকা যে ওঁর ঠাট্টাটাও বুঝতে পারিনে। এ বিদ্যে শিখবেন উনি কোন দুঃখে।'

জিনিস প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে। মনোহর বেরুবার জন্য প্রস্তুত হ'তে গেল। একটা কুলি ঠিক করাই আছে। হাঁড়িগুলি মাথায় ক'রে সেই বয়ে নিয়ে যাবে। তারপর দিয়ে আসবে স্টেশনের কাছে নির্দিষ্ট সেই আমগাছটির তলায়। জলচৌকির ওপর বসে বসে সেখানেই বরফ বিক্রি করবে মনোহর! বছর কয়েক হোল এইটুকু আভিজাত্য তার হয়েছে। নিজের মাথায় বয়ে নেয়না হাঁড়ি, ফিরি করেনা সহর ভরে। তার বরফের খাবারের ঔৎকর্ষ সহর ভরে লোক জানে। তারা আজকাল নিজেরাই আসে তার কাছে।

মনোহর একটু অন্তরালে গেলে নীরদ বলল, 'বিদ্যাটি শিখতে যত দুঃখ কষ্টই হোক তাতে আমি রাজী আছি। কিন্তু আপনার বোধ হয় শেখাবার দিকে মন নেই!'

নির্মলা ঠোঁট টিপে একটু হাসল, 'আপনাকে শিখিয়ে হবে কি। তার চেয়ে বউ নিয়ে আসুন বিয়ে ক'রে, তাকে দেব শিখিয়ে। বাড়িতে আপনাকে মাঝে মাঝে তৈরী ক'রে দেবে।'

নীরদ বলল, 'কেন, বিয়ে না করলেও মাঝে মাঝে এ জিনিস তৈরী করে খাওয়াবার লোক মিলবে না নাকি?'

নির্মলা বলল, 'তা মিলবেনা কেন। কিন্তু বাইরের লোকের হাতের জিনিস খেয়ে আর কতদিন মন ভরবে?'

নীরদ বলল, 'মনের কথা আপাতত মনেই থাক। তা বাইরে বলে লাভ নেই! কেউ হয়তো বিশ্বাসই করবেনা সে কথা। যাক, আমি কিন্তু এবার একটা কথা বুঝতে পারছি।'

নির্মলা দুটি আরও কৌতূহলী কালো চোখে নীরদের দিকে তাকাল, 'ওকি কথা।'

নীরদ বলল, 'বরফের হাঁড়ি বয়ে নিতে মনোহরদার কেন কোন কষ্ট হয়না তা আজ বুঝতে পারলাম।'

নির্মলা বলল, 'কিন্তু আজকাল তো উনি নিজে আর বয়ে নেন না।'

নীরদ বলল, 'নিতান্ত বেরসিক তাই। আমি হ'লে চিরকাল বয়ে বেড়াতাম।'

'কেন, বলুন তো।'

'জিনিসগুলি আপনার হাতের তৈরী বলে।'

নির্মলা মুখ টিপে হাসল। 'হুঁ, তাই না আরো কিছু। হাঁড়ি বয়ে বয়ে মাথায় যখন টাক পড়ে যেত তখন?'

নীরদ বলল, 'তা পড়তই না। সেই টাকে বুলাবার জন্য কাঁকন-পরা একখানা হাত তো সেই সঙ্গে পেতাম।'

নির্মলা বলল, 'রক্ষা করুন, টাক আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।'

মনোহরের মাথায় যে টাকের আভাস দেখা দিয়েছে এ কথাটা বলতে বলতে নীরদ চেপে গেল, তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু জানেন তো টাকে টাকা আসে।'

নির্মলা বলল, 'কাজ নেই আমার টাকায়।'

খেয়ে দেয়ে বিকালের দিকে নীরদ বিদায় নিল। যাওয়ার সময় আরো একবার প্রশংসা করে গেল নির্মলার কুলপী বরফের। প্রশংসা নির্মলা আরো অনেক শুনেছে। বাজার ভরে সমস্ত লোকই তার হাতের তৈরী জিনিসের তারিফ করে। কিন্তু নীরদের প্রশংসার ভাষা আলাদা। সে কেবল তৈরী জিনিসের প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হয়নি, হাতের গুণগানও করেছে। গুণ অবশ্য মনোহরও তার গায়। কিন্তু তার গলায় কেবল তার ক্রেতাদেরই প্রতিধ্বনি। একমাত্র নীরদেরই মুখেই নির্মলা শুনল নতুন সুর, নতুন ভাষা। যা ছিল নিতান্তই গুরুভার প্রয়োজনের বস্তু, দৈনন্দিন জীবিকার পক্ষে অপরিহার্য, তাকে নীরদ যেন নতুন রূপ দিয়ে গেছে। সে কেবল নির্মলার গুণপনার রূপ। নীরদের হাসি পরিহাসে মিশে নির্মলার কুলপী বরফ যেন নতুন স্বাদ পেয়েছে, হয়ে উঠেছে নতুন রকমের সামগ্রী।

তার তৈরী জিনিসে নিত্য নতুন স্বাদ যাতে আসে, জিনিসের ঔৎকর্ষ যাতে বাড়ে সেদিকে আরও ঝুঁকে পড়ল নির্মলা। মাথা খাটিয়ে রোজ নতুন নতুন ধরণ সে আবিষ্কার

করে। নতুন নতুন মশলার ফরমায়েস দেয় মনোহরকে। মনোহর মহাখুশি। বাজারে গিয়ে বসতে না বসতে হাঁড়ি ফুরিয়ে যায়। মাল জুগিয়ে ওঠা যায় না।

মনোহর বলে, 'ঈস্, দু'হাতের বদলে হাত যদি তোর চারখানা হোত নির্মলা, চার মাসের মধ্যে পাকা বাড়ি তুলে ফেলতুম।'

নির্মলার মনে পড়ে যায় তার কেবল একখানা হাতের প্রশংসায় আর একজন কেমন পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

একটু চুপ করে থেকে নির্মলা বলে, 'কিন্তু তা যখন হবার জো নেই আর একটি দু'হাতওয়ালা বউই বরং নিয়ে এসো ঘরে।'

মনোহর বলে, 'উহুঁ, তাতে সুবিধা হবে না। সে রকম চার হাতে কেবল হাতাহাতি হবে, কুলপী বরফ তৈরী হবে না।'

যেন হাতাহাতি হবার ভয় না থাকলে মনোহরের তাতে কোন আপত্তি থাকত না।

তারপর থেকে নীরদ প্রায় রবিবারই আসতে লাগল। ছুটি উপভোগের জায়গা হিসাবে স্থানটুকু তার চমৎকার লেগেছে। কর্মব্যস্ত কোলাহলমুখর রাজধানীর এত কাছে এই আধা-সহর আর গ্রামের এক মেটেঘরে যে এমন মাধুর্য তার জন্য প্রচ্ছন্ন ছিল তা কে জানত?

রবিবারও আটটার মধ্যে শিয়ালদা' থেকে বরফ নিয়ে আসে মনোহর। আনে দুধ, চিনি, আরো অন্য সব মশলা। তারপর সুরু হয় নির্মলার কাজ। বরফ কুচোয়, দুধ জাল দিয়ে ক্ষীর তৈরী করে, তারপর দ্রুতহাতে সেই বরফের ক্ষীর ছোট ছোট টিনের চোঙাগুলির মধ্যে ভরে শেষে ময়দা দিয়ে আটকে দেয় চোঙার মুখ। যেন অসংখ্য রহস্যের টুকরোকে রাখে আড়াল করে। পিছনের দিকে না তাকিয়েও নির্মলা টের পায়, নীরদ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে হাতের কাজ। বরফের খাবার তৈরী করতে অদ্ভুত এক আনন্দ মনের মধ্যে অনুভব করে নির্মলা, যেন সত্যই এক দুরূহ কলাকৌশলময় শিল্প-সৃষ্টিতে সে হাত দিয়েছে।

কুলির মাথায় কুলপী বরফের হাঁড়ি চাপিয়ে খেয়ে দেয়ে মনোহর বেরিয়ে পড়ে। আর দাওয়ায় শীতল-পাটি বিছিয়ে নির্মলা নীরদের জন্য করে বিশ্রামের আয়োজন। বাইরে খর রোদ ঝলসাতে থাকে। কিন্তু আমগাছের ছায়ায় ঢাকা এই ছোট্ট উঠান আর ছোট্ট দাওয়াটুকু ভারি স্নিগ্ধ, ভারি ঠাণ্ডা লাগে নীরদের কাছে। ঝির ঝির করে বাতাস বয়। নির্জন নিস্তব্ধ সহরতলী পড়ে পড়ে ঘুমায়। কিন্তু ঘুম আসেনা নীরদের চোখে। আগাছার জঙ্গলের ফাঁকে দেখা যায় রেল লাইনের উঁচু রাস্তা। হুইসল দিয়ে গাড়ি যায়, গাড়ি আসে। তারপর একসময় পানের রসে ঠোঁট লাল করে পা টিপে টিপে আসে নির্মলা।

'ওমা, এখনো ঘুমোন নি।'

নীরদ বলে, 'না, ঘুমোলেই তো চোখ বুজতে হবে।'

নির্মলা বলে, 'কথা শোন। যেন চোখ মেলে থাকবার জন্য মাথার দিব্যি কেউ দিয়েছে আপনাকে।'

নীরদ বলে, 'মুখের কথায় দেয়নি। কিন্তু মনে মনে হয় তো দিয়ে থাকবে।'

নির্মলা একটু যেন আরক্ত হয়ে ওঠে, বলে, 'বয়ে গেছে মানুষের আপনাকে দিব্যি দেওয়ার। চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে কেবল তো দেখছেন লোহার রেল লাইন।'

নীরদ এবার হেসে চোখ ফিরায় নির্মলার দিকে। বলে, 'কি আর করি বলুন। রেল লাইন ছাড়া আর যা দ্রষ্টব্য এখানে আছে তা ভারি নিষিদ্ধ বস্তু। তাকে চুরি করে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে হয়, সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে থাকা চলে না।'

কথা বলবার ভঙ্গিটা নীরদের জটিল, কিন্তু ইঙ্গিতটা নির্মলার বুঝতে বাকি থাকে না। শব্দের অর্থ সর্বদা বোধগম্য না হলেই বা কি, তার ধ্বনির ব্যঞ্জনাই কি কম অনর্থ ঘটায়।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে নির্মলা বলে, 'যত সব বাজে বানানো কথা আপনার। আসলে আপনি যে কি জন্য ছটফট করছেন তা জানি। কখন গাড়িতে উঠবেন আর কখন গিয়ে পৌঁছবেন কলকাতা তাইতো ভাবছেন মনে মনে?'

নীরদ এক মুহূর্ত নির্মলার দিকে তাকিয়ে কি দেখল। তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে এটা যেন আপনার নিজের মনের কথা।'

নির্মলা একটু যেন চমকে উঠল, বলল, 'ধরুন না হয় তাই-ই। মানুষের বুঝি আর কলকাতা যেতে ইচ্ছা করে না? এত কাছে থাকি অথচ কলকাতা যাওয়া ভাগ্যে আমার মোটে হয়েই ওঠে না।'

'কেন, গেলেই তো পারেন মনোহরদার সঙ্গে।'

'হুঁ, ভালোমানুষ ঠিক করেছেন আপনি। কলকাতা বলতে তিনি তো চেনেন কেবল বৈঠকখানার বাজার। তার ওদিকে নিজেই যেতে সাহস পান না, তারপর আবার আমাকে নেবেন সঙ্গে।'

নীরদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সাহস পান না কেন?'

নির্মলা মুখ মুচকে একটু হাসল, 'বোধ হয় ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে।'

নীরদ বলল, 'তার চেয়ে বেশি ভয় বোধ হয় কাউকে হারিয়ে ফেলবার। আর ভয়টা বোধ হয় নিতান্ত অমূলকও নয়'—বলে নীরদও একটু হাসল, 'আচ্ছা ভাববেন না, আমি জোগাড় করে দেব আপনার পাসপোর্ট। চলুন সামনের রবিবার সিনেমা দেখে আসি মিড-ডে ট্রিপে।'

নির্মলার কালো চোখ দুটি যেন একবার চক্ চক্ করে উঠল। কিন্তু মুখে বলল, 'দরকার কি ভাই, কাজ নেই গরীবের অমন ঘোড়া রোগে। উনি বলেন কলকাতায় গেলেই নাকি আমার মাথা ঘুরে যাবে, আর এই ছোট সহরে আসতে চাইব না।'

নীরদের বুকের ভিতরটা কেমন যেন একটু দুলে উঠল, মৃদু কম্পিত গলায় বলল, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে। না ফিরতে চান নাই চাইবেন।'

মনোহর বাড়ী এলে প্রস্তাবটা তার কাছেও পাড়ল নীরদ। বলল, 'ভেবেছি সামনের রবিবার বউদিকে একটু সিনেমা দেখিয়ে আনব কলকাতা থেকে, তুমিও চল মনোহরদা।'

মনোহর স্থিরদৃষ্টিতে নীরদের দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'ক্ষেপেছিস ?'

নীরদ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কেন, দোষটা কি ?'

মনোহর হেসে উঠল, 'ওই দেখ, চোরের মন বোঁচকার দিকে। দোষের কথা কে বলল। আমি গেলে লোকসান হবে তাই বলছি। বেশ তো, যেতে চাস তোরা যাবি।'

নীরদ বলল, 'না, তুমি না গেলে হবে না।'

মনোহর বলল, 'খুব হবে। কথাটি আমিই তোর কাছে বলব বলব ভাবছিলাম, 'কলকাতা যাব কলকাতা যাব' বলে মাথা আমার খুঁড়ে খাচ্ছিল একেবারে। যেন ভারি মধু আছে কলকাতায়। তুই যদি ভারটা নিস ভালই হয়।'

নীরদ যে নির্মলার রূপগুণের প্রশংসা করেছে, ক্রমশ বাধ্য হয়ে উঠছে তার. এতে মনোহর এক ধরণের গর্বই অনুভব করছিল মনে মনে। এমন কি সমব্যবসায়ী দু' একজনের কাছে একথা সে বলেছেও। নির্মলা যে সত্যিই খুব দামী মেয়ে এ কথা নীরদের মত উচ্চশিক্ষিত, মার্জিতরুচি, ভদ্রসমাজের ছেলের মুখ শুনলে স্ত্রীর সম্বন্ধে অহঙ্কারের ভিত্তিটা আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। এখানকার লোকে তো নির্মলার প্রশংসা করবেই। তারা ক'টি মেয়েই বা দেখেছে, ঘরের বউ ছাড়া ক'টি মেয়ের সঙ্গেই বা মিশেছে। কিন্তু নীরদ তো আর তেমন নয়। কত মেয়ের সঙ্গে সে কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে ; কত পার্টিতে, জলসায়, কত রূপবতী গুণবতীর সান্নিধ্যে এসেছে সে, সুতরাং তার সার্টিফিকেটের দাম আছে।

পরের রবিবার একটু সকালে সকালেই কাজকর্ম সেরে নিল নির্মলা। তারপর মাতলো সাজসজ্জা নিয়ে। চুল বাঁধল, আলতা পরল, সব চেয়ে ভালো শাড়িখানা নামাল বাক্স থেকে, গয়না যে কয়েকখানা ছিল বার করল, তবু মনের সাজ যেন আর হয় না।

নীরদ বলল, 'কিছু কমিয়ে টমিয়ে আসুন বউদি। আপনার পাশে লোকে যে আমাকে গমস্তা বলে ভাববে।'

নির্মলা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তার চেয়ে বড় কিছু ভাবুক তাই আপনি চান বুঝি।'

নীর্মলা বলল, 'না না না, অত স্পর্দ্ধা রাখি না।'

বহু সাধাসাধি উপরোধ অনুরোধ সত্ত্বেও মনোহর গেল না তাদের সঙ্গে। কেবল বলতে লাগল, 'তাতে ক্ষতি হবে, লোকসান হবে ব্যবসার।'

গাড়িতে তুলে দেওয়ার সময় বলল, 'সাবধান হে ভায়া, দেখো যেন হারিয়ে টারিয়ে এসনা।'

নীরদ মৃদু হেসে বলল, 'অত যদি ভয় নিজেও চলনা সঙ্গে।'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মনোহর বলল, 'তা ভয় তো মনে একটু রইলই। এ তো আর যে সে স্ত্রী নয়, একেবারে আমার কারবারের মূলধন নিয়ে চলেছ সঙ্গে।'

কথাটা নীরদ আর নির্মলা দু'জনের কানেই হঠাৎ বড স্থূল শোনাল। কিন্তু গাড়ী ছেড়ে দেওয়ার পর বেশিক্ষণ তা আর কারোরই মনে রইল না।

ছোট খাঁচার ভিতর থেকে হঠাৎ যেন এক বৃহত্তর পৃথিবীতে ছাড়া পেয়েছে নির্মলা। নীরদ মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল উল্লাসে-আনন্দে নির্মলার রূপ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আরও উচ্ছল, আরও প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে নির্মলাকে।

ইন্টারক্লাস কামরায় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে নির্মালাকে বসবার জায়গা করে দিলেন। পাশে একটি যুবক বসে ছিল। সাঙ্কোচের সঙ্গে একটু স'রে এসে সেও নীরদকে বসবার অনুরোধ জানাল। বলল, 'যেন তেন প্রকারে আপনিও এখানে এসে বসে যান মশাই। না হলে যে ভদ্রলোক উঠে গেলেন তাঁর আত্মত্যাগ সার্থক হবে না। মিসেস বসবার জায়গা পেয়েও শান্তি পাবেন না মনে।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিও মৃদু হাসলেন, বললেন, 'তা যাই বলুন মশাই, ভারি চমৎকার মানিয়েছে এঁদের। যেন একেবারে লক্ষ্মীনারায়ণ।'

নীরদ আর নির্মলা দুজনেই দু'জনার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। কেউ কথা বলল না।

শিয়ালদ' থেকে দুবার করে ট্রামে উঠতে নামতে হোল। তারপর তারা পৌছল এসে সুসজ্জিত সিনেমা হাউসটির সামনে।

ছবিটি বোধ হয় একদিন কি দুদিন আগে মাত্র সুরু হয়েছে। শুভারম্ভের কলার চারা আর মঙ্গল-কলস এখনো রয়েছে দু পাশে।

নির্মলা বলল, 'এ যে একেবারে বিয়ে-বাড়ীর মত সাজিয়েছে দেখছি।'

নীরদ পরিহাসের ভঙ্গিতে বলল, 'তাই তো মনে হচ্ছে। আসুন দেখা যাক, ভিতরে বাসরঘরেরও কোন ব্যবস্থা করেছে কি না।'

সেকেণ্ড ক্লাসের একেবারে পিছনের সারিতে পাশাপাশি দুটি সিটে নির্মলাকে নিয়ে বসল নীরদ। আসল বই আরম্ভ হওয়ার আগে সুরু হবে দেশের সংবাদের চিত্ররূপ ও তারপর একটি কুকুর গিয়ে কি ক'রে চিড়িয়াখানার একপাল ভয়ঙ্কর জন্তু জানোয়ারের মধ্যে পড়ল রঙে বেরঙে তার বিচিত্র কাহিনী।

দেখতে দেখতে নির্মলা একেবারে মগ্ন হয়ে গেল। আর পাতলা অন্ধকারে নির্মলার অস্পষ্ট তনু-দেহটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল নীরদ।

একটু বাদেই আলো জ্বলল। কাঠের ট্রেতে ক'রে একটি সুদর্শন হিন্দুস্থানী ছোকরা কতকগুলি আইসক্রীম নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে, 'লিজিয়ে বাবুজী।'

নীরদ স্মিতহাস্যে দুটি আইসক্রীমের দাম দিয়ে দিল। তারপর একটি নিজের হাতে তুলে দিল নির্মলাকে। আঙুলে আঙুলে লাগল ছোঁয়া। একটা অদ্ভুত অনাস্বাদিত আনন্দে নির্মলার সর্বরীর শিহরিত হয়ে উঠল। তারপর কাঁচের ছোট্ট সুগোল সুন্দর বাটিটিতে মুখ ছুঁইয়ে যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই নির্মলা হঠাৎ অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'বাঃ! বেশ চমৎকার হয়েছে তো। অবশ্য আমিও যে এমন না পারি তা নয়। দামী মালমসলা যদি পাই, স্বাদে গন্ধে আমার কুলপী বরফ কেবল বেলঘরিয়া কেন কলকাতার বাজারকেও টেক্কা দিতে পারে।'

পরম আত্মপ্রসাদে আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা নীরদের দিকে ফিরাল নির্মলা।

কিন্তু ততক্ষণে আশেপাশে আরো কয়েকটি সুশ্রী সুবেশা তরুণী সকৌতুকে তাদের দিকে তাকিয়েছে।

মুহূর্তের জন্য লজ্জায় আর অপমানে আরক্ত হয়ে উঠে ছাইয়ের মত বিবর্ণ গেল নীরদের মুখ। চাপা ধমকের স্বরে বলল, 'ছিঃ, রক্ষা করো, কুলপী বরফ এখন থাক।'

ভারী একখণ্ড পাথর যেন নির্মলার হৃদয়ের ওপর সশব্দে গিয়ে পড়েছে। বিস্মিত বেদনার্ত চোখ দুটি নীরদের দিকে তুলে ধরল নির্মলা। পুরু চশমার ভিতর দিয়ে নীরদের আরক্ত ঘোলাটে দুটি চোখ দেখা যাচ্ছে। সে চোখে মোহ নেই, মাধুর্য নেই, অদ্ভুত ঘৃণায় আর বিদ্বেষে চোখ দুটি পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

খানিক বাদে নির্মালার ঠোঁটেও তীক্ষ্ণ একটুকরো হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল। আস্তে আস্তে নির্মলা বলল, 'আমার ভুল হয়েছিল ঠাকুরপো।'

নীরদ কোন জবাব দিল না, তার চোখের দৃষ্টিও তখন অন্যদিকে। নির্মলাও ধীরে ধীরে চোখ ফিরিয়ে নিল।

চিত্রগৃহের সব কটি আলোই এতক্ষণে নিভে গিয়েছে। অন্ধকার কালো পর্দায় এবার আসল ছবি আরম্ভ হবে।

ঘুষ

দেখিনি দেখিনি করে শীতাংশু পাশ কাটিয়ে চলে যাবে ভেবেছিল কিন্তু সদানন্দবাবু প্রায় ছুটে গিয়ে সাইকেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'আরে শীতাংশু যে, শোন শোন।'

অগত্যা ব্রেক কসে সাইকেলের ওপর থেকেই শীতাংশু বলল, 'আর একদিন

শুনব তাঐমশাই, বেলা একেবারে গেছে। একটু জোরে চালিয়ে না গেলে রাত আটটার আগে পৌঁছতে পারব না।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'আমিও তো তাই বলছি, যতই জোরে চালাও না কেন, পৌঁছতে পৌঁছতে তোমার অনেক রাত হয়ে যাবে। চন্দনীর চর কি এখানে নাকি, আর উত্তরে কি রকম মেঘ করেছে দেখেছ? মাঝকান্দীর চক ছাড়াতে না ছাড়াতে নির্ঘাত বৃষ্টি নামবে। এস আমাদের বাড়িতে, রাতটা থেকে কাল ভোরে রওনা হয়ো।'

শীতাংশুর মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। সেও ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিল। অবেলায় মেঘ বাদলের দিনে যাকে আরও দশ বার মাইল জল কাদার খারাপ রাস্তা সাইকেল চালিয়ে যেতে হবে কেউ বাড়িতে রাত্রিবাসের জন্য আমন্ত্রণ করলে তার খুসী হওয়ারই কথা, কিন্তু শীতাংশু তবু খুসী হতে পারছিল না। কারণ সে ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছে সদানন্দবাবু তিনচার বিঘা জমিতে বেশি পাট বুনিয়েছেন। আর শীতাংশুই এই সার্কেলেরই জুট-রেজিষ্ট্রেশন অফিসে কাজ করে। তদন্তের ভার তার ওপরই পড়েছে। অবশ্য খরচ পাতি' নিয়ে বরাদ্দের চেয়েও ছ'চার বিঘা এদিক ওদিক শীতাংশু অহরহই করে দিচ্ছে। সবাই তাই করে। তাতে গৃহস্থদেরও লাভ, শীতাংশুদেরও লোকসান নেই। কিন্তু দূরসম্পর্কের হলেও সামান্য একটু কুটুম্বিতা সদানন্দবাবুর সঙ্গে তার রয়ে গেছে। শীতাংশুর জেঠতুতো ভাই-এর পিসতুতো শ্বশুর হচ্ছেন মদনপুরের এই সদানন্দ গাঙ্গুলী। তাই শীতাংশু ভেবেছিল এ কেসটা ধরিয়ে দেবে সহকর্মী বিনোদ বোসকে। সে যদি অন্য কেস দিতে পারে ভালোই, না হলে তার কাছ থেকে বখরা নিলেই হবে। এ ক্ষেত্রে বিনোদ যত চাপ দিতে পারবে, শীতাংশু ততখানি দিতে পারবে না।

কিন্তু বিষয়টি অন্য রকম ঘুরে গেল। সদানন্দবাবু একেবারে পথ আগলে এসে দাঁড়ালেন। শীতাংশু মনে মনে ভাবল, আচ্ছা দেখা যাক, সেও ঘুঘু কম নয়। কোন রকম বিবেচনার কথা তুললেই শীতাংশুও খরচপত্রের কথা তুলতে সঙ্কোচ করবে না। 'পাঁচজনকে নিয়ে কাজ তাঐমশাই, নিচের ওপরের সকলের দিকেই তাকাতে হয়। একার ব্যাপার তো নয়, তবে কুটুম্ব মানুষ, যেখানে পঞ্চাশ লাগবে, সেখানে আপনি চল্লিশ দিন।'

অত চক্ষুলজ্জা নেই শীতাংশু চক্রবর্তীর। এ কথা সে সদানন্দবাবুকে খুবই বলতে পারবে, হলেনই বা জেঠতুতো ভাইয়ের পিসতুতো শ্বশুর।

তবু একবার এড়াবার শেষ চেষ্টা করল শীতাংশু, 'মিছামিছি আপনাদের কেন কষ্ট: দেব তাঐমাশাই, এরকম চলাফেরা আমাদের খুব অভ্যাস হয়ে গেছে, বেশ যেতে পারব।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'শোন কথ', কুটুম্বের বাড়ি কুটম্ব আসবে তার আবার কষ্ট

কি! অবশ্য আমি তো আর বড়লোক কুটুম্ব নই শীতাংশু, পোলাও মাংস করেও খাওয়াতে পারবনা, উপস্থিত মত নিতান্তই দুটি ডাল-ভাত হয়তো সামনে দিতে পারব। তবু এই সন্ধ্যাবেলা বুড়ো মানুষের কথা অমান্য কোরোনা শীতাংশু, এসো, চল আমার সঙ্গে।'

অগত্যা সাইকেল থেকে নেমে পড়তেই হোল। এরপর আর না করা চলেনা। তাছাড়া আজ সত্যিই দেহ যেন বড় বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দুপুরের মেঘভাঙা রোদে বার তের মাইল একটানা সাইক্লিং করতে হয়েছে শীতাংশুকে। আর সে কি রাস্তা। কোথাও জল কোথাও কাদা। এই যদি বা সাইকেলে চাপে, পরক্ষণেই সাইকেল চাপে এসে ঘাড়ে। তারপর ছোট বড় সবাই আজকাল চালাক হয়ে গেছে। সহজে গাঁট থেকে পয়সা বের করতে চায়না। অজস্র বক্তৃতা, ধমক আর চোখ রাঙানির ফলে যখন তারা নরম হয়ে আসে তখন ক্লান্তিতে নিজেরও চোখ প্রায় বুজে আসতে চায়। বেছে শীতাংশু আচ্ছা ঝকমারীর কাজ নিয়েছে যা হোক। সীজনের সময়টা রোদ নেই বৃষ্টি নেই সারাদিন প্রায় মাঠে মাঠেই কাটে। বিনিময়ে মাস অন্তে পচাত্তর টাকা। ঘুষ! ঘুষ না নিলে কি বাঁচবার জো আছে না কি। আর তো সম্বল দাদার পঁচিশ টাকার মাইনের এম, ই, স্কুলের মাষ্টারী। ভাইপো ভাইঝিদের সংখ্যা বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। অফিসের একটি ঘর কর্তৃপক্ষ থাকবার জন্য ছেড়ে দিলেও চন্দনীর চরের মত অমন একটা গেঁয়ো বাজারেও খোরাক পোষাক চা সিগারেটে পঞ্চাশ টাকায় কুলোয় না। বাঁচতে হলে এদিকে ওদিক সবাইকে আজকাল করতে হয়। কর্তৃপক্ষের এক আধটু ভয় ছাড়া অন্য কোনরকম শুচিবায়ু শীতাংশুর নেই। আর চারদিকে আট-ঘাঁট বেঁধে কি করে চলতে হয় এই আড়াই বছরে তা সে ভালোই রপ্ত করে নিয়েছে।

দু'পাশে পাটের জমি। মাঝখানের আধ হাত খানেক চওড়া আলের রাস্তা। কচি কচি দূর্বা গজিয়েছে আলের ওপর। সাইকেলটি হাত দিয়ে ঠেলে নিয়ে শীতাংশু সদানন্দবাবুর পিছনে পিছনে চলতে লাগল। সবুজ পাটের চারা গজিয়েছে দুদিকের জমিতে। এখনো হাঁটু অবধি ওঠেনি গাছ। দমকা বাতাসে মাঝেমাঝে নু'য়ে নু'য়ে পড়ছে। অবশ্য এখানে ওখানে বহু জমিই খালি পড়ে আছে। বরাদ্দ না থাকায় গৃহস্থেরা ওসব জমিতে পাট দিতে পারেনি। দেখতে দেখতে শীতাংশু এগিয়ে চলতে লাগল। বে-আইনী চাষের জন্য সোনাকান্দী গাঁয়ের দু'তিনখানা বড় বড় জমি শীতাংশু আজ ভেঙে ফেলবার হুকুম দিয়ে এসেছে। সে জমিগুলোর পাট এর চেয়েও বড় আর ঘন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারা ঠিক শীতাংশুর চাহিদা মেটাতে পারেনি। কেউ কেউ আবার ঔদ্ধত্যও দেখিয়েছিল। না এসব কাজে দয়া-মায়া চলেনা। দোষ ঘাট হলে শীতাংশুকেই বা দয়া দেখায় কে। তাছাড়া মানুষের কাছ থেকে ভয় শ্রদ্ধা আর উপুরি পাওনা পেতে হলে কিছু বেশি পরিমাণে নিষ্ঠুর নৃশংস হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পথে

বহু চাষী গৃহস্থদের সঙ্গেই দেখা হতে লাগল। সসম্ভ্রমে সবাই শীতাংশুকে নমস্কার জানাল। জনকয়েক বর্গাদার মুসলমান চাষী জমি থেকে তখনো ঘাস নিড়াচ্ছে। তারা হাত তুলে সেলাম জানাল। শীতাংশু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে জবাব দিতে দিতে এগুতে লাগল সদানন্দের পিছনে পিছনে।

বাড়ির সামনে একটি পানাভরা মজা পুকুর। চার পাশ থেকে নানা আগাছার জঙ্গল ঝুঁকে পড়েছে। ভালোর মধ্যে দু'একটা আম আর খেজুর গাছ আছে মাঝে মাঝে। পুকুর পারের সেই আগাছার ভিতর দিয়েই সরু সাদা একটু পথ কুমারীর সিঁথির মত সোজা একেবারে বাড়ির উঠানে গিয়ে পৌঁচেছে।

বছর পাঁচ ছয় আগে সদানন্দবাবুর মেজো মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে শীতাংশু যখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিল তখন বাড়ির আশপাশ এমন জংলা ছিলনা। পুকুরটিও বেশ পরিষ্কার ছিল বলে মনে পড়ছে।

কিন্তু উঠানের ভিতর গিয়ে শীতাংশুর চোখে পড়ল আগের চেয়ে বাড়িই কেবল জংলা হয়নি, ঘরদোরও জীর্ণ হয়ে পড়েছে। দুদিকে বারাণ্ডা ঘেরা উত্তরে ভিটির বড় ঘরখানা নড়বড়ে অবস্থায় কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। পূবের ভিটির অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরখানার অবস্থাও তথৈবচ। দুই মেয়ের বিয়েতে কিছু খামার জমি ছুটেছে, আর সালিশী বোর্ডের বিচারে কয়েক বিঘা মর্গেজী জমিও যে হারাতে হয়েছে সদানন্দবাবু তা শীতাংশুকে আগেই শুনিয়েছিল। তবু ওঁর অবস্থা যে সত্যিই এতখানি খারাপ হয়েছে তা তার ধারণা ছিল না।

সদানন্দবাবু উঠান থেকেই ডাকতে ডাকতে চললেন, 'ওরে ও কুন্তলা, ও চুণী টুনি, দেখ এসে কে এসেছে। এসো বাবা ঘরে এসো।'

পিছনে পিছনে শীতাংশু ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। বছর সতের বয়সের একটি তন্বী শ্যামবর্ণা মেয়ে এদিকে একবার মুখ বাড়িয়েই আড়ালে চলে গেল। পাঁচ ছয় বছরের ছোট ছোট আর দুটি মেয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সামনে।

শীতাংশু একটু ইতস্তত করে বলল, 'মাঐমা কোথায়?'

সদানন্দবাবু একটু যেন বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'কোথায় আবার, আঁতুড়ে। কাল গেলে মাংটামি সার বাবা। এক জন্ম ধরে দেখলুম তো কেবল মেয়ে আর মেয়ে। গুটি তিনেক তবু মরে গিয়ে রেহাই দিয়েছে। এখন নিজের মরবার আগে ভাগ্য হোল পুত্র দেখবার। তাতো হোল, কিন্তু বলোতো বাবা লাভটা হোল কি, শিখিয়ে পরিয়ে এ ছেলেকে কি মানুষ করবার সময় মিলবে, না এর রোজগার খেয়ে যাওয়ার বেড় পাব আয়ুতে। ভগবানের উপহাস ছাড়া আর একে কি বলব বলো তো শীতাংশু।'

কি বলবে শীতাংশুও হঠাৎ ভেবে পেলনা। তবে এটুকু লক্ষ্য করল সবটুকুই হয়তো ভগবানের উপহাস নয়। কিছু অতিরিক্ত বিলম্ব ঘটে গেলেও শেষ পর্যন্ত পুত্রসন্তান যে লাভ হয়েছে তার প্রসন্ন পরিতৃপ্তি প্রৌঢ় পিতার বাচনিক নৈরাশ্যে ঢাকা পড়েনি।

সদানন্দবাবু আবার হাঁক দিলেন, 'কোথায় গেলি কুন্তলা, চেয়ারটা এগিয়ে দে শীতাংশুকে। ওর কাছে আবার লজ্জা কিসের তোর। আচ্ছা থাক, থাক, আমিই না হয় আনছি।'

কিন্তু আনত মুখে কুন্তলা ততক্ষণে একটা হাতল ভাঙা কাঠের চেয়ার টেনে নিয়ে এসেছে। শীতাংশু একবার তার দিকে তাকাল। বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে এসে এই কুন্তলাকেই সে কি পাঁচ ছয় বছর আগে এঘরে ওঘরে ছুটাছুটি করতে দেখেছিল? দূর থেকে হাসতে হাসতে তার গায়ে হলুদ জল ছিটিয়ে দিয়েছিল কি এই শান্ত নিরীহ মেয়েটিই! বিশ্বাস করা শক্ত।

পাশের ছোট তক্তপোশখানায় নিজে বসে সদানন্দবাবু চেয়ারটা শীতাংশুকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো বাবা বোসো।'

এই ঘরের পশ্চিম কানাচে ছোট একটু ঢাকা বারাণ্ডায় আঁতুড়। স্বরলক্ষ্মী সেখান থেকে বলে উঠলেন, 'চটের আসনখানা চেয়ারের ওপর পেতে দে কুন্তী। নইলে ছারপোকার জ্বালায় একদণ্ডও বসতে পারবেনা।'

সবুজ সুতোয় লতা আর ফুল তোলা একখানা আসন চেয়ারের ওপর পেতে দিল কুন্তলা। শীতাংশু সেই আসন ঢাকা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'আবার চেয়ারের হাঙ্গামা কেন এত। কুন্তলা তো আজকাল ভারি শান্ত হয়ে গেছে। কথাই বলেনা।'

স্বরলক্ষ্মী আঁতুড় থেকেই বললেন, 'শান্ত না ছাই। দু'দণ্ড বস তাহলেই দেখতে পারবে।'

শীতাংশু বলল, 'তাই নাকি কুন্তলা?'

কুন্তলা মুখ মুচকে একটু হাসল, 'কি জানি। কথা বলিনি, তাতেই তো একদফা নালিশ হয়ে গেল শুনলেন তো। আর গোড়াতেই কথা বলতে সুরু করলে মা যে আরো কত কি বলতেন তার ঠিক নেই।'

স্বরলক্ষ্মী আঁতুড় ঘরের দোরের একটি পাট ততক্ষণে খুলে দিয়েছেন। শীতাংশুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হতচ্ছাড়া মেয়ের ভঙ্গি দেখ কথার। কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বললেই হবে, না হাতমুখ ধোবার জল টল এনে দিবি শীতাংশুকে।'

কুন্তলা অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি করে বলল, 'দিচ্ছি মা দিচ্ছি, তুমি শুধু চুপ করে দেখে যাও। তুমি আটকা আছ বলে সাধ্যমত আমরা কুটুম্বের অযত্ন করব না।'

স্বরলক্ষ্মী বললেন, 'আহাহা, সাধ্যের তো আর সীমা নেই। যত্ন করবার কত যেন সামগ্রী আছে ঘরে।'

এরপর আঁতুড় ঘরের সামনে এগিয়ে গিয়ে কুন্তলা ফিস ফিস করে মার কাছে কি বলল, তারপর আরও কি কি বলবার জন্য বাবাকে ডেকে নিয়ে গেল আড়ালে।

বেড়ার আড়াল থেকে সদানন্দবাবুর অনুচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল, 'বাঁড়ুয্যেরা চাইলেও

বহুকাল ভাগ্যে জোটেনি শীতাংশুর। বাড়ির বাইরের জঙ্গল আর ভিতরের ঘরদোরের জীর্ণতা দেখে শীতাংশু আশাই করতে পারেনি যে এর মধ্যেও এমন একটি আনন্দের নীড় আত্মগোপন ক'রে রয়েছে।

সুরলক্ষ্মী খুঁটে খুঁটে বাড়িঘরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শীতাংশুর দাদা বউদি মা, ভাইপো ভাইঝিদের কে কেমন আছে শুনতে চাইলেন। খুকুর সঙ্গে (শীতাংশুর সেই জেঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী) অনেককাল দেখাসাক্ষাৎ হয় না উল্লেখ করলেন সে কথা।

তারপর উঠল শীতাংশুর অফিসের প্রসঙ্গ। শীতাংশু বলল অল্প মাইনে আর অতিকষ্টের চাকরি। তাওতো ডিপার্টমেণ্টে এখনো স্থায়ী হোলনা। চাকরি কবে আছে কবে নেই তারই বা ঠিক কি। পাটের সময় তো প্রায় সর্বদা মাঠেমাঠেই বেড়াতে হয়। ফিরে গিয়ে দুদিন যে একটু শান্তিতে নিশ্বাস নেবে তারও জো নেই। অড়িয়ালখাঁ নদীর পারের চর। তারই গা ঘেঁষে অফিস। টুল টেবিল সরিয়ে রাত্রে তার মধ্যেই শোয়ার জায়গা করে নিতে হয়। শুয়ে শুয়ে কানে আসে নদীর অন্য পার ঝুপ ঝুপ করে অনুক্ষণ ভেঙে পড়ছে তো পড়ছেই। এদিকে জাগছে চরের পর চর। আর কিচ কিচ করছে বালি। হাওয়া একটু জোরে বইলেই সে বালি উড়ে আসে চোখে মুখে, বিছানাপত্রের মধ্যে। ঝাড়াপোছার পর বিছানা বালিস থেকে যদি বা সে বালি যায়, মনের ভিতর থেকে কিছুতেই তা দূর হতে চায়না। সেখানে দিনভর রাতভর বালি কেবল কিচ কিচ করতেই থাকে।

সদানন্দ আর সুরলক্ষ্মী দুজনেই সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। সবই ভাগ্য। নইলে বিদ্যাবুদ্ধি তো নেহাৎ কম নয় শীতাংশুর। দেখতে শুনতে বলতে কইতেও এমন ছেলে গণ্ডায় গণ্ডায় মেলে না। কিন্তু কপাল। সুরলক্ষ্মী আঙুল দিয়ে নিজের কপাল দেখিয়ে বললেন, 'সব এই চার আঙুল জায়গাটুকুর মধ্যে লেখা আছে বাবা। তার বাইরে কারোরই যাওয়ার জো নেই।'

অন্য কোন কুটুম্ব স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে নিজের সামর্থ সম্বন্ধে দৈন্য কখনো প্রকাশ করে না শীতাংশু। খুঁৎ খুঁৎ করে না ভাগ্য নিয়ে। বরং যতটুকু শক্তি তার চেয়ে বড়াই করে বেশি, বড় বড় চাল দেয়। কিন্তু সুরলক্ষ্মীর কথার ভঙ্গিতে এত গভীর স্নেহ আর মমতা প্রকাশ পেল যে তার মাধুর্যে দুঃখ আর দারিদ্র্যও যেন নতুন রকমের উপভোগ্য বস্তু হয়ে উঠল শীতাংশুর কাছে। এমন স্নেহার্দ্র সান্ত্বনা যখন আছে তখন দুঃখে আর ভয় কি।

সদানন্দবাবু বললেন, 'কিন্তু দৈব যেমন আছে তেমনি আছে পুরুষকার। মহাভারতের কর্ণের কথা মনে আছে তো। আর তোমাদের তো এই উঠতি বয়স। বাধা বিঘ্ন ঠেলে পথ করবার এইতো সময়। তোমাদের তো হতাশ হলে চলবে না বাবা শীতাংশু। কত-জনকে আশা দেবে তোমরা, বলভরসা দেবে, কতজন তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকবে, নির্ভর করবে তোমাদের ওপর।'

অতি প্রচলিত গতানুগতিক কথা। কিন্তু শীতাংশুর মনে হত লাগল এ সব যেন সে আজ নতুন শুনছে। কেবল হিত কথাই নয়, সঙ্গীতের মত সদানন্দবাবুর এসব কথারও যেন সুর আছে, ক্ষমতা আছে মনোহরণের।

কুন্তলা রান্নার আয়োজনে লেগে আছে। মাঝে মাঝে ফিসফিস করে কি জিজ্ঞাসা করছে এসে মায়ের কাছে, পরামর্শ নিয়ে যাচ্ছে তাঁর।

সদানন্দবাবু বললেন, 'জোর করে তোমাকে পথ থেকে ধরে তো নিয়ে এলাম শীতাংশু, আদর আপ্যায়ণ যা হবে তা ভগবানই জানেন।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'থাক্ থাক্, ভগবানের আর দোষ দিয়ো না, বাদলা বৃষ্টির জন্য গত হাটে গেলে না। আচ্ছা বেশ, কিন্তু সকালে তো বৃষ্টি ছিলনা—এত করে বললাম বাজারটা করে এস যাও, তা দাবা নিয়ে বসা হোল চাটুয্যে বাড়ি। পুরুষমানুষের এত গাফিলতি থাকলে কপালে কি কোন দিন সুখ হয়। এখন শুধু শুধু ডাল ভাত আমি কুটুম্বের ছেলের সামনে কি করে দিই।'

শীতাংশু বলল, 'আদর আপ্যায়ন কি কেবল খাওয়া পরার মধ্যেই মাঐমা? কুটুম্বের ছেলে বলে কি তাকে অতই পর ভাবতে হয়?'

রান্নাঘর থেকে কুন্তলা এসে উপস্থিত হোল, 'আচ্ছা আপনি যে কেবল মা আর বাবার সঙ্গেই বসে বসে কথা বলছেন, ওঁরা ছাড়াও যে এখানে আরো দুটি প্রাণী আছে তাদের কথা কি আপনি একেবারেই ভুলে গেলেন?'

শীতাংশু একটু বিস্মিত হয়ে কুন্তলার দিকে তাকাল। কুন্তলা মুখ টিপে হেসে বলল, 'চুনু আর টুনুর কথা বলছি। ওরা যে কতক্ষণ ধরে সেজেগুজে বসে আছে আপনাকে নাচ দেখাবে বলে?'

শীতাংশু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'ও তাই নাকি? তা এতক্ষণ বলনি কেন?'

কুন্তলার নির্দেশে চুনু আর টুনুর নাচগান আরম্ভ হয়ে গেল:

'আমার কৃষ্ণ কানাই এল, রুণু রুণু রুণু ঝুণু রে।'

একেবারে অপূর্ব মৌলিক পরিকল্পনা। শীতাংশু হেসে বলল, 'বেশ, বেশ। তা' এসব তোমরা শিখলে কোথায়?'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'কোথায় আবার শিখবে! সব কুন্তলার কাণ্ড। চাটুয্যে বাড়ির সেজমেয়ে থাকে কলকাতায়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিন পনেরের জন্য এসেছিল বাপের বাড়িতে। ওদের নাচতে গাইতে বুঝি দিন দুয়েক দেখে এসেছিল কুন্তলা বোনদের নিয়ে। তারপর বাড়িতে এসে বললে তোদেরও নাচতে হবে। আমার সব মনে আছে, ভুল হলে আমি ঠিক করে দেব। আচ্ছা একখানা মেয়ে হয়েছে বাবা। তারপর থেকে দিন নেই রাত নেই চুনু টুনুদের টেনে হেঁচড়ে মারধোর করে—'

তারপর হাসতে লাগল শীতাংশু। তারপর উঠে বারাণ্ডায় গেল সিগারেট ধরাতে।

দেবে না। তবে দত্তদের বাড়িতেই বোধ হয় পাওয়া যাবে। কলকাতা থেকে সেদিনও তাদের চা আসতে দেখেছি।'

কুন্তলার ফিস ফিস গলাও একটু একটু যেন কানে গেল শীতাংশুর, 'আস্তে বাবা আস্তে।'

ঘরে এসে ছাতাটা নিয়ে সদানন্দবাবু আবার বেরিয়ে গেলেন।

শীতাংশু বাধা দিয়ে বলল, 'এই জলবৃষ্টির মধ্যে মিছিমিছি আবার কোথায় চললেন তাঐমশাই।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'এক্ষুনি আসছি বাবা, তুমি ততক্ষণ হাতমুখ ধুয়ে নাও।'

শীতাংশু আর কোন কথা বলল না। সদানন্দবাবুর ছাতাটির দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। ছোটবড় গোটা তিনেক তালি পড়েছে ছাতায়। নতুন নতুন আরো গোটা কয়েক যে ছিদ্র বেড়েছে তাতে বোধ হয় এখনো তালি দেওয়ার অবকাশ পাননি কিংবা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু বৃষ্টি যে রকম বড় হয়ে এসেছে তাতে মালিকের মাথা ও-ছাতা কতক্ষণ শুকনো রাখতে পারবে শীতাংশু মনে মনে একবার না ভেবে পারল না।

এতক্ষণ ঘরে লক্ষ্মীর আসনের কাছে মাটির দীপে সরষের তেলের আলো জ্বলছিল কুন্তলা এবার একটি হারিকেন জেলে আনল। চিমনির একটি জায়গায় সামান্য একটু কাদা কিন্তু বাকিটা কুন্তলা চুন দিয়ে পরিষ্কার করে মেজে এনেছে। ছোট আকারের হারিকেন। কিন্তু তারই আলোয় সমস্ত ঘরখানা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কুন্তলা বলল, 'আসুন, ওদিকে জল দিয়েছি বালতিতে। হাতমুখটা ভালো করে ধুয়ে ফেলবেন। চিনু গামছাখানা নিয়ে আয় তো এখানে।'

চিনু এতক্ষণে একটি কাজের ভার পেয়ে খুসি হয়ে বলল, 'এক্ষুনি আনছি দিদি।'

তার ছোট টুনু অসহায় ভঙ্গিতে বলল, 'আমি কি আনব দিদি।'

কুন্তলা জবাব দিল, 'তুমি শীতাংশুদার কড়ে আঙুল ধরে নিয়ে এসো।'

বারাণ্ডা থেকে কুন্তলার খিল খিল হাসির শব্দ শোনা গেল। সুরলক্ষ্মীও হাসি চাপতে চাপতে বললেন, 'হতচ্ছাড়ী কোথাকার।'

শীতাংশু বাড়ণ্ডায় উঠে গিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'কেউ এসে কড়ে আঙল ধরুক, খুব বুঝি সখ?'

কুন্তলা ইঙ্গিতে মার আঁতুড়ঘরের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে একটু হতাশ ভঙ্গি করল। অর্থাৎ এ প্রশ্নের যথাযথ জবাব সে এখনি দিত যদি না মা থাকতেন ওখানে।

কুন্তলা বলল, 'এবার ভালো ছেলের মত হাতমুখটা ধুয়ে নিন। আর সাহেবী বেশটা কি পরাণ ধ'রে ছাড়তে পারবেন? তাহলে কাপড় এনেদি।'

শীতাংশু বলল, 'আনো। যে বেশ তোমার এতখানি চক্ষুশূল তা বেশিক্ষণ পরে থাকতে ভরসা হয় না।'

হাত মুখ ধুয়ে প্যান্ট ছেড়ে ফেলে চুলপেড়ে একখানা ধুতি পরল শীতাংশু। কুন্তলা সেখানেই আয়না চিরুণী নিয়ে এল। আয়নাখানা শীতাংশুর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'দেখুন এবার মানিয়েছে কিনা।'

শীতাংশু মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মানিয়েছে যে তা তোমার মুখচোখেই দেখতে পাচ্ছি, কষ্ট করে এর জন্য আর আয়না আনবার দরকার ছিলনা।'

মুখ মুচকে শীতাংশু একটু হাসল।

কথায় কথায় কখন একেবারে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল কুন্তলা, শীতাংশুর কথার ইঙ্গিত বুঝে তাড়াতাড়ি লজ্জিত হয়ে সরে দাঁড়াল। শীতাংশু তার সেই লজ্জারুণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন! এবার? আচ্ছা জব্দ হয়েছ তো? খুব তো বক্ বক্ করছিলে।'

কুন্তলা কোন জবাব দিল না। শীতাংশু প্রসঙ্গটা পালটে নিয়ে বলল, 'কিন্তু তাঐমশাইকে এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় পাঠালে বলোতো। চায়ের কি দরকার ছিল। চা যে আমি খাই সে কথা কে বলল তোমাকে।'

কুন্তলা যেন আর একবার আরক্ত হয়ে উঠল, বলল, 'কে আবার বলবে। কে কি খায় না খায় আমরা মুখ দেখলেই বুঝতে পারি।'

একটু বাদেই সদানন্দবাবু ফিরে এলেন। থালায় করে মুড়ি গুড়, আর নারকেলকোরা দিয়ে জলখাবার নিয়ে এল কুন্তলা, বলল, 'একেবারে গ্রামদেশী খাবার। সেইজন্যই আপনার বিদেশী সাহেবী বেশটা তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিলাম, বুঝেছেন?'

সুরলক্ষ্মী আবার বললেন, 'হতচ্ছাড়ীর কথার ভঙ্গি দেখ।'

চিনু আর টুনুর হাতে কিছু মুড়িগুড় তুলে দিল শীতাংশু। তারপর কুন্তলা নিয়ে এল চা। বলল, 'চা খাওয়ার তো আপনার অভ্যাস নেই, ধীরে ধীরে দেখেশুনে খাবেন, দেখবেন মুখ যেন পুড়িয়ে ফেলবেন না।'

সুরলক্ষ্মী ধমকের সুরে বললেন, 'পোড়ারমুখী এবার একটু থাম দেখি। মানুষ দেখলে ওর এত আনন্দ হয় শীতাংশু যে ও কি করবে, কি বলবে ভেবে পায় না। ফুর্তিতেই অস্থির।'

শীতাংশুও চেয়ে চেয়ে তাই দেখছিল। এই বয়সে এমন সপ্রতিভ বাকপটু মেয়ে সে যেন এর আগে আর দেখেনি। খানিকক্ষণ আগে দেহমনে যে ক্লান্তি ছিল শীতাংশুর তা যেন সম্পূর্ণ ঝরে পড়ে গেছে। এমন আনন্দ, এমন প্রসন্নতার স্বাদ দীর্ঘকাল ধরে পায়নি শীতাংশু। অফিসের কাজের চাপে অনেকদিন বাড়ি যেতে পারেনি। আর বাড়ি গেলেই বা কি। গেলেই মা আর বউদির একের বিরুদ্ধে আর একজনের নতুন নতুন নালিশ। অভাব অনটনের সংসারে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। একপাল ছেলেমেয়ের হাতাহাতি মারামারি চলছে সবসময়। বাড়ি গেলেও দুঘণ্টার মধ্যে শীতাংশুকে অস্থির হয়ে উঠতে হয়। এখানকার মত শান্ত নিরবচ্ছিন্ন পরিতৃপ্তির মুহূর্ত

খানিকবাদে সত্যিই জলের ঘটি হাতে কুন্তলা এল ঘরে। তার সেই কা... লাপেড়ে আধময়লা শাড়িটা ছেড়ে পরেছে পুরোণ ফিকে হয়ে যাওয়া ধানী রঙের আর এ... কখানা শাড়ি। বোধ হয় রাঁধতে গিয়ে আগের শাড়িখানা এঁটো হয়ে গিয়ে থাকবে। ... কিন্তু শীতাংশুর মনে হোল শুধু সেইজন্তেই নয়।

তক্তপোশের তলায় কিনার ঘেঁষে জলের ঘটিটা রাখল কুন্তলা, একটি পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে কাঁচের গ্লাসে ঢেকে দিল তার মুখ। তারপর মুহূর্তকাল চুপ করে একটু দাঁড়াল। শীতাংশু তার দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখল। মনে পড়ল সাইকেল নিয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একদিন ক্লান্ত হয়ে একটা আমগাছে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম করতে বসেছিল, হঠাৎ তার চোখ পড়ল শস্যভরা সামনের ছোট একখানি ক্ষেতের দিকে। এমন সবুজ শস্যের ক্ষেত তো শীতাংশু যেতে আসতে অহরহই দেখছে কিন্তু সেদিন যেন নতুন ক'রে দেখল, নতুন চোখে। কোথায় গেল ক্লান্তি কোথায় গেল বিরক্তি আর অপ্রসন্নতা। সমস্ত হৃদয় মন যেন জুড়িয়ে স্নিগ্ধ হয়ে গেল। শীতাংশু অনেকক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইল সেই শস্যের ক্ষেতের দিকে।

কুন্তলার চোখে আর একবার চোখাচোখি হোল শীতাংশুর। সেই মুখরা মেয়ের চঞ্চল চোখ দুটি যেন এ নয়। শস্যের ক্ষেতের ওপর এ যেন এক টুকরো মেঘ করা আকাশ—স্নিগ্ধ, শ্যাম, সুগম্ভীর। শীতাংশু ভাবল কুন্তলা হয়তো কিছু বলবে, কুন্তলা ভাবল হয়তো কোন কথা বলবে শীতাংশু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ কিছু বলল না। ক্ষণিকের জন্য দুজনের এই দুগ্ম উপস্থিতিই যেন শুধু বাঙ্ময় হয়ে রইল। তারপর দোর ভেজিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল কুন্তলা। শীতাংশু কান পেতে রইল। লঘু পায়ের শব্দ বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দের মধ্যে মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধ'রে জেগে জেগে সেই বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগল শীতাংশু। তারপর কখন দুচোখ ভেঙে এল ঘুমে।

খুব ভোরেই যাত্রার আয়োজন সুরু করতে হোল। মুখ হাত ধুয়ে শীতাংশু আবার পরল সেই খাকির হাফপ্যাণ্ট। কিন্তু প্যাণ্টটির রুক্ষতা যেন আর টের পাওয়া যাচ্ছেনা। শীতাংশুর সর্বাঙ্গে মনে কালকের সন্ধ্যার আর রাত্রের সেই আদর যত্নটুকু যেন স্নিগ্ধ চন্দনের প্রলেপের মত লেগে রয়েছে। দুটি নারকেল নাড়ুর সঙ্গে এক কাপ চা এনে দিল কুন্তলা। তাড়াতাড়িতে কোনো খাবার খেয়ে যাওয়ার সুবিধা হবে না বলে সুরলক্ষ্মীর নির্দেশে একটি পুঁটলিতে করে কিছু চিড়া আর গুড় সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে কুন্তলা বেঁধে দিয়ে এল। চুনু টুনু পায়ের উপর কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল শীতাংশুকে। কুন্তলা নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিল। শীতাংশু স্নেহে চুনু টুনুর গাল টিপে দিয়ে স্মিতমুখে কুন্তলার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল তার চোখ দুটি ছল ছল করছে। শীতাংশুর বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু এ যেন কেবল বেদনা নয়, তার সঙ্গে এক অনাস্বাদিত আনন্দও যেন মিশে

রয়েছে। শীতাংশু কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ আঁতুড়ের ভিতর থেকে সুরলক্ষ্মী অনুচ্চ, মিষ্টি কণ্ঠে ডাকলেন, 'শীতাংশু, চলে গেলে নাকি বাবা।'

শীতাংশু লজ্জিতকণ্ঠে বলল, 'না মাঐমা, আসছি।'

মনে পড়ল সুরলক্ষ্মীকে প্রণাম না জানিয়ে, তাঁর কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে তাড়াতাড়ি ভুল করে সত্যিই সে চলে যাচ্ছিল। ছি ছি ছি, নিজেকে শীতাংশু একটু তিরস্কার না করে পারল না। তারপর তাড়াতাড়ি আঁতুড় ঘরের দোরে এসে দাঁড়াল।

ছেলেকে বোধহয় স্তন্য দিচ্ছিলেন সুরলক্ষ্মী, তাড়তাড়ি একটু সংযত হয়ে বসলেন। কোলের ওপর শিশু আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শীতাংশু চেয়ে চেয়ে দেখল ভারি সুন্দর চেহারা হয়েছে সুরলক্ষ্মীর এই ছেলের। চমৎকার চোখমুখের গড়ন, আর মোমের মত ফুটফুটে রঙ। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে ভোরের সোনালী রোদ এসে পড়েছে ওর গায়ে, খানিকটা রোদ লেগেছে সুরলক্ষ্মীর মুখে। শীতাংশু চৌকাঠে মাথা রেখে প্রণাম করল।

সুরলক্ষ্মী সস্নেহে বললেন, 'বেঁচে থাক বাবা বেঁচে থাক।'

সদানন্দও সঙ্গে সঙ্গে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে সুরলক্ষ্মী বললেন, 'শীতাংশুকে বলেছিলে কথাটা?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'না, তুমিই তো বলবে বললে।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'বেশ বলছি, শীতাংশুর কাছে আবার লজ্জা!'

শীতাংশু বলল, 'ব্যাপার কি মাঐমা।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'ওই সেই তিন বিঘা জমির কথা শীতাংশু। বরাদ্দের চেয়ে ওই ক'টুকরো জমিতে নাকি উনি বেশি বুনিয়েছেন। শুনেই আমি কিন্তু বলেছিলাম তা বুনিয়েছ বুনিয়েছ, আমাদের শীতাংশু থাকতে আর ভাবনা কি। ওকে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এসো, দেখি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন করে না বলতে পারে।'

সুরলক্ষ্মী একটু থামলেন কিন্তু শীতাংশু কোন জবাব দিলনা দেখে তেমনি স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'উনি অবশ্য বলেছিলেন অনেক টাকাপয়সার ব্যাপার। এর জন্য বহু খরচপত্র করতে হয়। কিন্তু শীতাংশু, কি দিয়ে খাই না খাই, কোথায় শুই, কি করে থাকি সবই তো নিজের চোখে দেখলে বাবা, তুমিই বল খরচপাতির জন্য টাকা দেওয়ার কি সাধ্য আছে আমাদের?'

শীতাংশুর বুকের ভিতরটা আর একবার মোচড় দিয়ে উঠল। এবার আর আনন্দের কোন অনুভূতি নেই। হিংস্র বিষাক্ত একটা বল্লম কেউ যেন তার বুকে ছুঁড়ে মেরেছে।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে ম্লান একটু হাসল শীতাংশু, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল,

কুন্তলা গেল পিছনে পিছনে ; 'নাচ কি রকম দেখলেন বললেন না তো।'

শীতাংশু সহাস্যে বলল, 'বারে বললাম যে। বেশ চমৎকার হয়েছে। কিন্তু চুমু টুনুর নাচ তো দেখলুম এবার তোমার নাচটা কখন দেখব।'

কুন্তলা বলল, 'অসভ্য কোথাকার। আমি নাচতে জানি নাকি যে নাচ দেখবেন আমার।'

শীতাংশু সকৌতুকে হাসল, 'ও নাচতে জানো না বুঝি। তা কি জানো তুমি ?'

কুন্তলা আরও একটু কাছে এগিয়ে এল শীতাংশুর, ভ্রূদুটিতে অপূর্ব ভঙ্গি এনে বলল, 'নাচাতে গো নাচাতে।'

তারপর খিল খিল করে হেসে উঠে ফের চলে গেল রান্নাঘরে।

ঘণ্টাদুয়েক বাদে ডাক পড়ল খাওয়ার। বড় ঘরের মেঝেয় সেই লতাফুলওয়ালা আসনখানা কুন্তলা পেতে দিল সযত্নে। কাঁসার বড় একখানা ছড়ানো থালায় এলো মোটা মোটা রাঙা চালের ভাত। দুটো ডাল, ভাজা, মাংসের মত করে রাঁধা সিঙ্গি মাছের ঝোল, একটু টক্, আর তারপর একটি বাটির তলায় সামান্য একটু দুধ। উপকরণে বাহুল্য নেই, কিন্তু যত্ন আর আন্তরিকতা যেন চোখে দেখা যায়। এমন তৃপ্তি আর পরিতুষ্টির সঙ্গে শীগ্র কোথাও যেন আর খায়নি শীতাংশু।

সুরলক্ষ্মী বলে চললেন, 'ভাগ্যে জিয়ানো মাছ দুটি দত্তদের বাড়িতে পাওয়া গিয়েছিল। কি-রকম কি রেঁধেছে কে জানে। নিজে তো কিছু দেখতেও পারলাম না, করতেও পারলাম না।'

শীতাংশু বলল, 'চমৎকার রান্না হয়েছে মাঐমা। দেখবার করবার এরপর আপনার কিছু আর ছিলনা।'

ঘটিতে করে আঁচাবার জল দিল কুন্তলা বারাণ্ডায়। টিপটিপ করে তখনো বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। কুন্তলা বলল, 'ওখানে দাঁড়িয়েই আঁচান। ধুয়ে যাবে।'

শীতাংশু খানিকটা বিষন্ন গাম্ভীর্যের ভঙ্গিতে বলল, 'ধুয়ে যে যাবে সেই তো হয়েছে চিন্তা। আঁচাব কিনা ভাবছি। জলের ঘটি তুমি বরং ফিরিয়ে নিয়ে যাও!'

কুন্তলা বলল, 'কেন ?'

শীতাংশু বলল, 'রান্নার স্বাদটুকু ঠোঁটে মুখে মেখে রাখতে ইচ্ছা করছে। জল দিলে তো ধুয়েই যাবে।'

কুন্তলা হেসে বলল, 'তা'হলে ধুয়ে কাজ নেই। শুকনো গামছা দিচ্ছি। মুখটা একটু মুছে ফেলুন, তবু খানিকটা স্বাদ থাকবে।'

শীতাংশু বলল, 'উঁহু, মুছিই যদি শুকনো গামছায় মুখ মুছে আর লাভ কি।'

কুন্তলা বলল, 'তবে কিসে মুছবেন।'

শীতাংশু একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'অাঁচলে গো অাঁচলে।'

পূবের সেই ছোট্ট টিনের ঘরখানির একদিকে ধানের গোলা, আর একদিকে একখানি তক্তপোশ পাতা। পাটের সময় পাট রাখা হয়, অন্য সময় খালিই পড়ে থাকে। কুটুম্বস্বজন অতিথি অভ্যাগত কদাচিৎ কেউ কখনো এলে শুতে দেওয়া হয় সেখানে। বাপ আর মেয়েতে মিলে বিছানাপত্র টানাটানি করে নিল সেই ঘরে। সুরলক্ষ্মী অাঁতুড় ঘর থেকেই ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, 'কাঠের বড় বাক্সটার মধ্যে দেখ ধোয়া চাদর আর মশারিটা রয়েছে। পাতলা কাঁথাখানাও বের করে দিস, যদি শীত শীত করে শেষ রাত্রে গায়ে দেবে, আলমারীর মাথার ওপর দড়ি আর পেরেক পাবি, বোধ হয় বোঁচকাটার তলায় পড়ে গেছে। একটু খুঁজে দেখ কুন্তী, সবই আছে ওখানে।'

কুন্তলা বলল, 'ব্যস্ত হয়োনা মা, কোথায় কি আছে আমি জানি। সব আমি ঠিক করে নিতে পারব।'

কিছুক্ষণ ধরে ও ঘর থেকে ঝাড়া পোছা আর পেরেক ঠুকবার শব্দ এল। তারপর সদানন্দ চলে এলেন। কুন্তলা লাগল বিছানা পাততে। খানিক পরে এ ঘরে এসে বলল, 'যান শোন গিয়ে, হয়ে গেছে আপনার বিছানা।'

শীতাংশু বলল, 'এত তাড়াতাড়ির দরকার ছিল কি। তোমাদের তো এখনো খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত হয়নি।'

কুন্তলা বলল, 'হ্যাঁ, তা বাকি রেখেছি। সেই ভাবনায় যদি কিছুক্ষণ ঘুম আপনার বন্ধ থাকে। না হলে তো শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাক ডাকতে সুরু করবেন।'

শীতাংশু বলল, 'আমার নাক ডাকে কিনা তুমি কি করে জানলে।'

কুন্তলা বলল, 'নাক দেখলেই আমরা বুঝতে পারি।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'যাও বাবা, তুমি শোও গিয়ে।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'হ্যাঁ, আর রাত কোরোনা। সারাদিন খাটুনি আর ঘোরাঘুরি গেছে রোদবৃষ্টির মধ্যে। এবার শুয়ে বিশ্রাম করো গিয়ে।'

কুন্তলা বলল, 'দোর দেবেন না যেন। আমি একটু পরেই গিয়ে জলটল দিয়ে আসব। কি শীত কি গ্রীষ্মে রোজ রাত্রে আমার জল পিপাসা পায়। ঢক ঢক করে জল এক গ্লাস খাই তারপরে ফের ঘুম আসে।'

সুরলক্ষ্মী বললেন, 'বিশ্বশুদ্ধ সবাই বুঝি তোর মত ভেবেছিস ?'

এরপর শীতাংশু পূবের ঘরে উঠে গেল শোয়ার জন্য। হারিকেনটি জ্বলছে এক পাশে। বিশেষ যত্ন করে পাতা হয়েছে বিছানা। দক্ষিণ শিয়রে দুটি বালিশ। সাদা সাদা ঢাকনির এককোণায় নীল দুটি পাতার আড়ালে লেখা কুন্তলা। বিছানার চাদরটি শুভ্র পরিচ্ছন্ন। শীতাংশুর মনে হোল এই অম্লান শুভ্রতা কেবল যেন এই শয্যাটিরই নয়। আর একটি কুমারী হৃদয়ের সানুরাগ শুচিশুভ্র পবিত্রতা এর সঙ্গে মিশে রয়েছে।

আর হৃদয়নীতি। কিন্তু শচীবিলাসের রাজনীতি তো কেবল মস্তিষ্কে নয়, জ্ঞান মাত্র নয়, তা তাঁরা হৃদয়ের অনুভূতির স্তরে স্তরে মিশে রয়েছে। শচীবিলাসের রাজনীতি মানে দেশ সেবা। বিজ্ঞান নয়, ধর্ম। সূক্ষ্ম চারুশিল্প। কল্পনার রঙে, অন্তরের রসে বার বার তা তাঁর চোখের সামনে মূর্তি ধরে ওঠে। তিনি জোর করে স্বীকার করেন; 'হ্যাঁ, আমি পৌত্তলিক।' ইন্দিরা হাসে, 'এক হিসাবে তা ঠিক, দেশ আপনাদের কাছে প্রতিমা, দেশের লোক আপনাদের কাছে পুতুল। ভাবেন, তাদের ইচ্ছামত ভাঙা যায় গড়া যায়। গায়ে তাদের রঙ লাগান আর অপছন্দ হলে মুছে ফেলেন। বলেন ভুল হয়েছে।'

ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন শচীবিলাস। তিন বছর বয়সের মা-মরা মেয়ে ইন্দিরা। কিছুতেই কোলছাড়া হতে চাইত না। বকে, ধমকে, কাঁদিয়ে ওর পিসীর কোলে দিয়ে তবে শচীবিলাস বেরুতে পারতেন। আজ তার শোধ নিচ্ছে ইন্দিরা। তার ভাষায় আজ আর আবদার নেই, অভিমান নেই, আছে কেবল শ্লেষ আর ব্যঙ্গ। তাই ওষুধ খাওয়াবার দিকে ইন্দিরার লক্ষ্য আছে, যত্ন আছে, কিন্তু ওষুধ ছাড়াও যে শচীবিলাস সত্যি সত্যি আজকের দিনে ভাল থাকতে পারেন—এতে ইন্দিরার বিশ্বাস নেই। এই উচ্ছ্বাস হয়তো তার কাছে উপহাসের বস্তু।

মহকুমা সহর থেকে শচীবিলাসের জন কয়েক কংগ্রেস কর্মী সহযোগী বন্ধু এই উপলক্ষে আজই সন্ধ্যায় এসে পৌছুবেন। এর আগের দু'তিন বছর শচীবিলাসকেই তাঁরা আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন সহরে। তিনি সেখানে সভাপতিত্ব করেছেন, তুলে ধরেছেন জাতীয় পতাকা। কিন্তু এবার ডাক্তাররা নিষেধ করেছেন। ইদানীং ব্লাড প্রেসারটা বড় বেশী বেড়ে উঠেছে শচীবিলাসের। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে হৃদযন্ত্র। এ সময়ে পঁচিশ মাইল রাস্তা মোটরে যাওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই সমীচীন হবে না। আর যে রকম পথ ঘাটের অবস্থা। চিকিৎসকদের শাসন হয়তো গ্রাহ্য করতেন না শচীবিলাস, কিন্তু গাঁয়ের লোকের অনুরোধ তিনি এড়াতে পারলেন না। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এবার তাদের মধ্যেই থাকতে হবে তাঁকে। এর আগে পর পর কয়েক বছর তিনি দেশে থাকতে পারেন নি। কখনো জেলে, কখনো বা অন্য কোন জেলায় এদিনটি তাঁকে কাটাতে হয়েছে। এত দিন বাদে নিজের গ্রামবাসীদের মধ্যে যখন এসেই পড়েছেন শচীবিলাস তখন তাদের নিয়েই এবারকার উৎসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হোক। সমগ্র দেশের গৌরব শচীবিলাস, কিন্তু এই গাঁয়ের একান্ত আপন জন। একথা যেন ভুলে যান না তিনি। শচীবিলাস ভোলেননি, সানন্দে সম্মত হয়েছেন।

'নীরদ বাবুরা বোধ হয় সন্ধ্যাসন্ধি এসে পৌছবেন। বৈঠকখানাটা ভালো করে ধোয়ামোছা হয়েছে তো ইন্দু? রান্নাঘরে একটু খোঁজখবর নিয়ো বউঠান কি করছেন না করছেন।'

দূর সম্পর্কিত এক জেঠতুতো ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী অনেক দিন ধরেই শচীবিলাসের সংসারে আশ্রয় নিয়েছেন। ইদানীং সকন্যা শচীবিলাসই তাঁর আশ্রয় নিয়েছেন বলা চলে। ঘর সংসারের সমস্ত ভারই তাঁর ওপর। রাজনৈতিক প্রোগ্রামে বাপ মেয়ে দুজনই যখন দীর্ঘ দিনের জন্য বাইরে চলে যান, চারুবালা একাই দু' একজন ঝি চাকরের সাহায্যে আগলে রাখেন বাড়ি ঘর। পিতাপুত্রীর কারোরই রাজনীতির ধার তিনি ধারেন না, নিজের ঘরকান্না নিয়েই মশগুল। অবসর সময় কাঁথা সেলাই করেন, আসন বোনেন কিংবা সুর করে পয়ার ছন্দে বসে বসে পড়েন রামায়ণ, মহাভারত আর চৈতন্যচরিতামৃত।

কি একটা কাজে এ ঘরে এসেছিলেন চারুবালা। দেবরের কথা কানে যেতে বললেন, 'স্বদেশী বন্ধুদের বুঝি স্বদেশী হাতের রান্না ছাড়া চলবে না ঠাকুরপো? তাই বউঠানে বিশ্বাস নেই, দেশোদ্ধারিণী মেয়েকে পাঠাচ্ছ রাঁধতে।'

শচীবিলাস বললেন, 'কি যে বলছ বউঠান, ইন্দু আবার রাঁধতে পারে নাকি, তোমাকে জোগন দেওয়ার জন্য পাঠাচ্ছিলাম।'

চারুবালা প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'কথা শোনো। রাঁধতে আবার কোন্ মেয়ে না পারে? আমাদের আমলে মেয়েরা কেবল রাঁধত আর চুল বাঁধত, আর একালের মেয়েরা তার বদলে না হয় রাঁধে আর দল বাঁধে। এমন কোন কাজ নেই যা ইন্দু না জানে। আজকের সব রান্না ওকে দিয়ে আমি রাঁধাব দেখে নিয়ো।'

ইন্দিরার রান্না শচীবিলাসের একেবারে অনাস্বাদিত নয়। কাছে থাকলে দু'একটা তরকারি প্রায়ই তাঁর জন্য সে রেঁধে দেয়। খেতে ভালোই লাগে শচীবিলাসের। কিন্তু মুখে তা তিনি স্বীকার করেন না। আজও করলেন না, 'তা রাঁধাতে চাও রাঁধাও। কিন্তু নুনের বৈয়ম আর লঙ্কার গুড়োর কৌটোটা একটু দূরে সরিয়ে রেখো বউঠান। মেয়ের কথার মধ্যে নুন ঝালের পরিমাণ এত বেশী যে ঝোলে তার কিছু কম পড়লেও এসে যাবে না।'

শচীবিলাসের বন্ধুদের সঙ্গেও ইন্দিরা অসংকোচে, কুণ্ঠাহীন ভাবে বিতর্ক চালায়, তাঁদের রাজনৈতিক মতামতের ওপর ইন্দিরা যে তেমন শ্রদ্ধা পোষণ করে না তা চারুবালাও লক্ষ্য করেছেন। ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগে না। শত হলেও তাঁরা ইন্দিরার বাপের বয়সী, অনেকে ইন্দিরার বাবার চেয়েও বেশী নাম করা লোক। কতবার জেল খেটেছেন দেশের জন্য। নিজের বাবার সঙ্গে যাই করুক বাইরের ওই সব প্রবীণ ভদ্রলোকদের সঙ্গে ইন্দিরার মত একুশ বাইশ বছরের একটি মেয়ের অমন অসহিষ্ণু উত্তেজিত আলোচনা করা চারুবালার চোখে বিসদৃশই লেগেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ইন্দিরার অপ্রতিভ আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মায়া হোল চারুবালার। শচীবিলাসের কথার জবাবে বললেন, 'কিন্তু সারা গায়ে তোমাদের নিশ্চয়ই কাটা ঘা আছে ঠাকুরপো। না হলে নুন ঝালের ছিটাকে অত ভয় কেন?

'সেজন্য ভাববেন না মাঐমা। সব ঠিক করে নেব। টাকার চেয়ে বেশিই আপনারা দিয়েছেন। এত আর কোথাও পাইনি।' মনে মনে বলল, 'এমন করে হারাবার দুর্ভাগ্যই কি আর কখনো হয়েছে।'

স্বরলক্ষ্মী বললেন, 'বাঁচালে বাবা, এমন ভাবনা হয়েছিল আমার।'

সাইকেলে উঠবার আগে কুন্তলার দিকে আর একবার তাকাল শীতাংশু। মনে হোল তার চোখে আর জল নেই, ঠোঁটের কোণে কৃতার্থতার হাসি ফুটে উঠেছে।

দ্রুত প্যাডেল করে গাঁ ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল শীতাংশু। সবুজ কচিকচি পাটের পাতা হাওয়ায় দুলছে। কুন্তলার সেই পুরোণ ফিকে হয়ে যাওয়া সবুজ রঙের শাড়িখানা যেন আর একবার শীতাংশুর চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু তারপরই শীতাংশু মনে মনে অদ্ভুত একটু হাসল। হয়তো এরই মধ্যে আছে সদানন্দ গাঙ্গুলীর বরাদ্দের বাড়তি সেই তিন বিঘা জমি!

রাতের সেই টিপটিপে বৃষ্টি আর নেই। নীল নির্মল আকাশে ভোরের সেই সোনালী স্নিগ্ধতা মেঘান্তরিত খররৌদ্রে দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

পতাকা

উদ্যোগ আয়োজন প্রায় শেষ হয় এসেছে। স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচির একটা ছক কেটে রেখেছেন শচীবিলাস। গাঁয়ের নানা বয়সী উৎসাহী ছেলেদের আনাগোনার বিরাম নেই। ঝাঁড় থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে লম্বা এবং সবচেয়ে সোজা একটি তল্লা বাঁশ কেটে আনা হয়েছে। নমঃশূদ্র পাড়ার গগন ঘরামি তার ধারাল দাঁ নিয়ে নিখুঁতভাবে ছোট ছোট গিঁটগুলি চেঁছে সমান করে দিয়েছে বাঁশটির। শচীবিলাস একবার তাঁর আঙুলের শীর্ণ ডগাগুলি বুলিয়ে নিলেন তার ওপর। মুখের একটা প্রসন্ন পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল।

কিন্তু কেবল মুখের ভাবে নয় প্রশংসাটা ওঁর মুখের ভাষায় শুনতে চায় গগন, 'ঠিক হয়নি ছোট কর্তা?'

শচীবিলাস মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন, 'বেশ হয়েছে। পাকা হাত তোমার গগন। ঠিক হবেনা কেন। তোমার হাতে বড় বাঁশের বড় বড় গিঁটগুলি পর্যন্ত তেলের মত পালিশ হয়ে যায়, আর এতো সামান্য একটা বাঁশ।'

গগন তাড়াতাড়ি জিভ কেটে মাথা নিচু ক'রে নিজের হাতে চাঁছা বাঁশটির ওপর কপাল ছোঁয়াল। তারপর শচীবিলাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ্ঞে একি বললেন ছোট কর্তা। একি ঘর গেরস্থালীর কোন কাজ লাগতে যাচ্ছে যে সামান্য বলছেন।

এতে যে স্বাধীনতার নিশান উড়বে। বাঁশ বলতে মধু বাবুরা তো আমাকে ধমকেই দিলেন। বললেন, বাঁশ নয় ঘরামি, বাঁশ নয়, পতাকা দণ্ড।'

শচীবিলাস স্নিগ্ধ একটু হাসলেন, 'বেশ তাই বল।'

সাদা ধবধবে একখণ্ড খদ্দরের কাপড়ে সযত্নে রঙীন তুলি বুলিয়ে দিল নীলকমল পাল। মাঝখানে সাদা জমির ওপর এঁকে দিল চরকা, দুই পাশে হরিত হলুদের ঢেউ। তারপর তুলি রেখে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন হয়েছে কর্তা?' শচবিলাস স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'বেশ হয়েছে নীলকমল, চমৎকার হয়েছে।'

ছোট্ট একটি কাঁচের গ্লাস শচীবিলাসের মুখের সামনে প্রায় এগিয়ে ধরল ইন্দিরা, 'ওষুধটা এবার খেয়ে নিন বাবা।'

শচীবিলাস একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আবার ওষুধ!' কিন্তু পরমুহূর্তেই বিরক্তি দমন করে মেয়ের হাত থেকে ওষুধের গ্লাসটা তুলে নিলেন শচীবিলাস। চুমুক দেওয়ার আগে সস্নেহে একবার তাকালেন মেয়ের দিকে, কোমল কণ্ঠে বললেন, 'এক দিন কিন্তু ওষুধ না খেয়েও আমি ভাল থাকতাম ইন্দু।'

ইন্দিরা বলল, 'না না ওষুধটা খান।'

ওষুধ খেয়ে খালি গ্লাসটা মেয়ের হাতে ফিরিয়ে দিলেন শচীবিলাস। তাঁর মুখখানা একটু যেন ক্লিষ্ট, একটু যেন কঠিন দেখাল। হয়তো তা কেবল কটু স্বাদ ওষুধের জন্যই নয়। ইন্দিরার কণ্ঠে তেমনি শাসনের ভঙ্গি, আবদারের মাধুর্য আজো তেমনি আছে। তবু কি যেন নেই। তার সম্বোধনে, তার আহ্বানে সমস্ত হৃদয় মন যেন আজকাল আর ঠিক আগের মত সাড়া দিয়ে ওঠেনা শচীবিলাসের। মাঝে মাঝে সশংয় হয়। প্রশ্ন করেন নিজেকে দৈন্যটা কার। কার্পণ্য কোথায়। তা কি ইন্দিরার কণ্ঠে, না শচীবিলাসের অন্তরে? রাজনৈতিক আদর্শে, কর্মপদ্ধতিতে প্রভেদটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠেছে মেয়ের সঙ্গে। মিলের চেয়ে অমিলই হয় বেশী। কথায় কথায় তর্ক বাঁধে। বার বার দুজনেরই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে থাকে। তারপর ইন্দিরা হঠাৎ এক সময় উঠে গিয়ে নিয়ে আসে ওষুধের গ্লাস, কি চায়ের কাপ, কি তেলের বাটি। শচীবিলাস সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে যান। একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'আজকাল আমি বুঝি খুব রূঢ়ভাষী হয়ে উঠেছি ইন্দু।'

ইন্দিরার মুখখানা একটু যেন আরক্ত হয়ে ওঠে, তারপর দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, 'না, বাবা, সত্যিই আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে।' কিংবা 'রোজই তো এই সময় আপনি চা খান বাবা।' 'বেলা যে একেবারে গড়িয়ে গেছে। এর পর চান করলে যে শরীর আপনার আরো খারাপ হবে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন শচীবিলাস। ইন্দিরা মিথ্যা বলেনি, সময় ভুল হয়নি তার। তবে কি শচীবিলাসেরই ভুল? না ইন্দিরার এই অভ্রান্ত সময়-জ্ঞানের মধ্যেই অশ্রদ্ধা, অসহিষ্ণুতা আন্তরিক সৌহার্দ্যের অভাব মিলে রয়েছে? রাজনীতি

এসে জড়ো হয়েছে ওখানে। পীরপুরের সেই বুড়ো মৌলবীকেও দেখলাম। বোধ হয় তারই কারসাজি এসব, কুবুদ্ধি দিয়ে রাতারাতি সকলের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।'

শচীবিলাস স্তব্ধ হয়ে রইলেন। একি বিভ্রাট, এমনভাবে বাধা আসবে এ যে তিনি কল্পনায়ও আনতে পারেন নি।

পিছনে পিছনে ইন্দিরাও এসে দাঁড়িয়েছিল। অতুলের কথায় হেসে বলল, 'তুমি ভুল করছ অতুলদা। একজনের কুবুদ্ধিতে রাতারাতি গা শুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরতে পারে না। মাথা আর মুখ ওদের ঘুরেই ছিল।'

অতুল রুক্ষকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল, 'ঘুরেই ছিল? তোমাকে ওরা আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছে বুঝি ইন্দিরা?'

ইন্দিরা বলল, 'না অতুল দা, তোমাদের মত ওরাও অতখানি বিশ্বাস আমাদের করতে :চায় না। আমাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখলে হয়তো ব্যাপারটা অন্য রকম হোত।'

শচীবিলাস ধমক দিকে উঠলেন, 'কি হোত না হোত সে কথা এখন থাক, কি হবে এই মুহূর্তে সেই কথাই ভাবো।'

শচীবিলাসের বন্ধুরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপারটা সব শুনে তাঁরাও হঠাৎ কিছু বলতে পারলেন না। কোন একটা মীমাংসায় আসতেই হবে। কিন্তু পথটা কি।

অতুল আর বিনয়ের দল ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল! গুণ্ডা প্রকৃতির মুসলমানদের বাধা তারা মানবে না। ওখানেই আজ উঠবে দেশের জাতীয় পতাকা। এ পতাকা কোন সম্প্রদায়ের নয়, সমগ্র দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। ওরা ভুল করছে বলে সে ভুলকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। সে ভুলকে জোর করে ভাঙতে হবে।

কিন্তু শচীবিলাস অত সহজে মন স্থির করতে পারলেন না। কলকাতা আর নোয়াখালীর দাঙ্গার সময় গ্রামের হিন্দু মুসলমানের চাঞ্চল্য তিনি লক্ষ্য করেছেন। মুসলমান যুবকেরা হিন্দুদের লক্ষ্য করে নানা রকম বক্রোক্তি করেছে। আস্ফালন করেছে আড়ালে আবডালে। হিন্দুর সংখ্যালঘু হওয়ায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছে, গোপনে গোপনে আত্মরক্ষার জন্য তৈরী হতে চেষ্টা করেছে। আর যাঁরা সম্পন্ন ধনী গৃহস্থ তাঁরা দালানে তালাচাবি দিয়ে গৃহলক্ষ্মী আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে নেপালী দারোয়ান পাহারায় রেখে সাময়িক ভাবে দেশ ত্যাগ করেছেন। এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে যখন শচীবিলাসের মনে হয়েছে দাঙ্গার সংক্রামক মহামারী থেকে এ গাঁ'কেও রক্ষা করা গেল না! হিন্দু মুসলমানের মারাত্মক হানাহানি এখানেও বেঁধে উঠল বলে। কিন্তু তিনি আর ইন্দিরা রাত দিন সতর্ক রয়েছেন। একবার গেছেন হিন্দুদের পাড়ায় আর একবার ঘুরেছেন মুসলমানদের বাড়িতে বাড়িতে। এক হাতে থামিয়েছেন ভীত পলায়নপর হিন্দুদের আর এক হাতে উত্তেজিত মুসলমান জনসাধারণের হাত ধরেছেন। যে জন্যই হোক দাঙ্গা শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলে লাগেনি। মারাত্মক সময়টা নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয়েছে। যারা গ্রাম ছেড়ে

পালিয়ে ছিল তারা ফের ফিরে আসতে সুরু করেছে। কৌতুকে কৌতুহলে ক্ষোভে আর আক্রোশে যে সব মুসলমান যুবক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তারা ফের শান্ত হয়ে গৃহস্থালিতে মন দিয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা দিবসকে উপলক্ষ্য করে আবার হঠাৎ একি বিভ্রাট এলো। সংঘাতের আবার এ কোন সূচনা দেখা দিল আজ। কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রইলেন শচীবিলাস। তারপর ছেলের দলকে বললেন, 'আচ্ছা চল, দেখি গিয়ে ওরা কি চায়।'

বিনয়ের দল জাতীয় পতাকাটা সঙ্গে নিয়ে আসতে যাচ্ছিল, শচীবিলাস বাধা দিয়ে বললেন, 'ওটা রেখেই এসো বিনয়। আগে দেখি ওদের উদ্দেশ্যটা কি।'

বিনয় আর অতুলরা অসন্তুষ্ট ভাবে শচীচিলাসের অনুসরণ করল। তাঁর বন্ধুদের মধ্যেও যে কেউ কেউ খুসি হলেন না সে কথা শচীবিলাস বুঝতে পারলেন।

শচীবিলাসের বাড়ির নিচেই বড় একটা চটান। ওপারে মুসলমান পাড়া। সেখদের বাড়ির বসির ছিল শচীবিলাসের দোস্ত। তাঁর কাছ থেকেই তিনি জায়গাটুকুর খানিকটা অংশ কিনে রেখেছিলেন। ইচ্ছা ছিল সমস্তটুকুই কিনবেন। কিন্তু বসির সেখ ছাড়েনি। বলেছে, 'অত লোভ কেন দোস্ত। ঘোর-দৌড় দেখতে গিয়ে ছেলেবেলায় কতবার মামা-বাড়িতে এক কাঁথার তলে দুজনে রাত কাটিয়েছি মনে পড়ে? আর একখানা জমি দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে ভোগ করতে পারব না? ভোরে উঠেই তোমাকে একেবারে মুসলমানের জমিতে পা দিতে হয়, ঠাকরুণরা কাঁথা কাপড় মেলাবার জায়গা পান না, এই জন্যই অর্ধেকটা বেচে দিলাম তোমাকে। নইলে জমি বেচবার তো আমার দরকার ছিলনা। ভয় নেই সীমানা নিয়ে মামলা মোকদ্দমা করতে যাবনা তোমার সঙ্গে।'

শচীবিলাস বলেছিলেন, 'আমরা না হয় কাজিয়া মকদ্দমা না বাধালাম কিন্তু আমাদের ছেলেরা? তারা যদি বাধায়?'

হেসে দাড়িতে হাত বুলিয়েছিল বসির সেখ, 'তারা যদি বাধায় তার মজাও তারাই ভোগ করবে। তুমি আমি সেজন্য ভেবে মার কেন দোস্ত।'

বসির সেখকে বেশিদিন ভাবতে হয়নি। অল্পবয়সেই সে চোখ বুজেছিল। কিন্তু এত দিনে ভাববার পালা এসেছে শচীবিলাসের।

বসিরের ছেলে মকবুল আর মনসুরও কোন দিন তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ বাধায় নি। কাকা বলে ডেকেছে, সমীহ করে চলেছে সব সময়। বর্গা চষেছে তাঁর ক্ষেতের। পাটের যখন দর ছিল এই চটানটুকুতেও তারা পাট বুনেছে। ধুয়ে শুকিয়ে ভাগের ভাগ বুঝিয়ে দিয়ে গেছে শচীবিলাসকে। ইদানীং ফসল না হওয়ায় জায়গাটা খালিই পড়ে থাকে। গরু ছাগলে চরে, পাড়ার ছেলেরা খেলা ধূলা করে। আর বছর বছর গাঁয়ের লোক স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের দিনে জাতীয় পতাকা তুলতে আসে এখানে। কয়েক বছর শচীবিলাসও নিজের হাতে তুলেছেন। মকবুল মনসুররা

আয় ইন্দু, তোর চুল বেঁধে দি। চুলগুলিকে কেমন বাবুই বাসা করে রেখেছে দেখ। আচ্ছা মেয়ে হয়েছিস যাহোক।'

ইন্দিরাকে নিয়ে বাড়ির ভিতরের দিকে চলে গেলেন চারুবালা। শচীবিলাসের মনে হোল এমন স্নেহের ভঙ্গিতে, এমন আদর করে আজকাল তিনিও তো আর মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন না। কেবল ইন্দিরার দোষ দিলেই বা চলবে কেন। তিনিই কি তেমন ভাবে বুঝে দেখতে চেষ্টা করেন ইন্দিরার যুক্তি, ইন্দিরার বক্তব্য? শুনতে না শুনতে তিনিও কি ইন্দিরার মতই উত্যক্ত আর অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন না? দলগত মতভেদ কি এতই দুরতিক্রম্য যে বাপ মেয়ের সম্পর্ককেও তা স্পর্শ করে? তরুণ তরুণীর পরস্পরের প্রতি দুটি অনুরক্ত হৃদয়কেও বিচ্ছিন্ন করে দেয়?

নিরুপমের কথা মনে পড়ল শচীবিলাসের। সামান্য মতানৈক্যের জন্য নিরুপমকে ইন্দিরা প্রত্যাখ্যান করেছে। নিরুপমও সমস্ত সংস্পর্শ ত্যাগ করেছে ইন্দিরার সঙ্গে, কিন্তু নিরুপমও তো বামপন্থী। সেও তো বিপ্লববাদী। ত্যাগ স্বীকার দেশের জন্য সেও তো করেছে। তবু তাকে সহ্য করতে পারেনি ইন্দিরা। অত্যন্ত অনায়াসে তার প্রেমকে সে অস্বীকার করেছে। একদিন শচীবিলাসও তো বামপন্থী ছিলেন, চরমপন্থী ছিলেন তাঁর আমলে। ফাঁসী যেতে যেতে ফিরে এসেছেন। কিন্তু রাজনীতিতে কাল যা বাম আজ তা দক্ষিণ। ডাইনে বাঁয়ে মুহূর্তে তা পাশ বদলায়। আর বদলায় মন। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প সঙ্গে সঙ্গে বদলে চলে। এ যুগের রাজনীতি সর্বগ্রাসী। হতেই হবে। কারণ তা জীবননীতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন।

সন্ধ্যার পর মোটরে করে শচীবিলাসের বন্ধুরা এসে পৌছলেন। প্রত্যোকেই এতদঞ্চলের প্রখ্যাত কংগ্রেস কর্মী। এদের অনেকের সঙ্গেই শচীবিলাস একত্র কাজ করেছেন, জেল খেটেছেন একসঙ্গে। মোটরের ধুলো উড়ে এসে লেগেছে ওদের জামা কাপড়ে। চশমার কাঁচে পুরু হয়ে ধুলোর পর্দা পড়েছে। শচীবিলাস নিজের হাতে ঝেড়ে দিলেন বন্ধুদের কাপড়ের ধুলো। ইন্দিরা ট্রেতে করে কাপ আর চায়ের কেটলি নিয়ে এল সাজিয়ে।

শরীরের প্রতি তেমন লক্ষ্য রাখছেন না বলে শচীবিলাসকে অনুযোগ করলেন বন্ধুরা। সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ জানালেন কালকের প্রোগ্রামটা একটু সকাল সকাল সেরে ফেলতে। আরো কয়েকটি জায়গায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ভার পড়েছে তাঁদের ওপর। এ যাত্রা এখানে বেশীক্ষণ দেরী করলে লোকে অতিরিক্ত বন্ধুবাৎসল্যের অপবাদ দেবে।

শচীবিলাস হেসে বললেন, 'মাভৈঃ, এখানকার অনুষ্ঠান সূর্যোদয়ের আগেই না হয় শেষ করা যাবে।'

বন্ধুদের জন্য প্রোগ্রামটা সামান্য একটু অদল বদল করলেন শচীবিলাস। পুবের আকাশে রক্তবর্ণ সূর্য যখন গোল হয়ে দেখা দেবে মাঠের মত বিস্তৃত সেখেদের চটান জায়গাটায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হবে এ গাঁয়ের। সংকল্প বাক্য পাঠ

এবং আনুষঙ্গিক বক্তৃতার পর অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করবে। ছেলেদের হাতে থাকবে পাকাটির ডগায় ছোট ছোট জাতীয় পতাকা। ঠিক যেমন এ গাঁয়ের বার্ষিক নগর সংকীর্তনের সময় থাকে। মেয়েদের হাতে থাকবে শঙ্খ। সকলের হাতে শঙ্খ দেওয়া সম্ভব হবে না, অত শঙ্খ গাঁয়ে নেই। কিন্তু মুখে মুখে হুলুধ্বনি তো প্রত্যেকেই দিতে পারবে। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গৃহস্থ বধূরা কিশোর কিশোরীদের এই শোভাযাত্রা আধো ঘোমটার আড়াল থেকে চেয়ে দেখবে। বারকোষ থেকে কেউবা ছিটাবে ফুল, কেউবা পিতলের থালা থেকে খেজুর পাটালির টুকরো ছিটিয়ে দেবে। ছেলে মেয়েরা কুড়িয়ে কুড়িয়ে মুখে পুরবে আর সুমিষ্টস্বরে বলে উঠবে 'বন্দেমাতরম্'। নিজের পরিকল্পনায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে যান শচীবিলাস। তারপর বিকালের দিকে সভা বসবে সমস্ত গাঁয়ের। আবৃত্তি হবে, সঙ্গীত হবে, গাঁয়ের ভাষায় বক্তৃতা করবে গগন ঘরামি আর নীলকমল পালের দল। সহযোগী বন্ধুদের তিনি ততক্ষণ ধরে রাখবেন না। রাত্রে জাতীয় দেশাত্মবোধমূলক অভিনয় করবে ছেলেরা। তাঁর উঠানে সেজন্য থিয়েটার মঞ্চ আগে থেকেই তারা তৈরী করে রেখেছে।

বন্ধুদের ডেকে সদ্য তৈরী জাতীয় পতাকাটা দেখিয়ে আনলেন শচীবিলাস। সবুজ কাঁচা বাঁশের সঙ্গে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত খদ্দরের কাপড় মজবুত সুতোয় গেঁথে দেওয়া হয়েছে। একেবারে গাঁয়ের প্রথায় তৈরী নিশান। বন্ধুরা সবাই প্রশংসা করলেন, চমৎকার হয়েছে। সত্যিই—রুচি আছে শচীবিলাসের।

অনেক রাত্রে শুয়েও রাত্রে শচীবিলাসের বহুবার ঘুম ভেঙে গেল। শেষের দিকে একটু তন্দ্রার মত এসেছে কি একটা গোলমালে শচীবিলাস চমকে উঠলেন। ব্যাপার কি, কান খাড়া করে শুনলেন কিন্তু কথাবার্তার মর্ম যেন সম্পূর্ণ বুঝতে পারলেন না। পাড়ার ছেলেদের গলা। সবাই তাঁর উঠানে এসে জড়ো হয়েছে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করছে। ফলে তাদের উত্তেজনাটাই বোঝা যাচ্ছে, কথা বোঝা যাচ্ছে না।

শচীবিলাস বিছানা ছেড়ে নেমে এলেন উঠানে, 'কি হয়েছে বিনয়, সবাই একসঙ্গে চেঁচিওনা, যে কেউ একজন এসে বোলো।'

বিনয়ই এগিয়ে এল, 'মকবুলরা বলছে তাদের চটানে আমাদের জাতীয় পতাকা তুলতে দেবেনা। আমরা যে সামিয়ানা টানিয়েছিলাম রাত্রে এসে তারা তা খুলে ফেলেছে। ছেলেরা ভোর হতে না হতেই এম. ই. স্কুল থেকে চেয়ার বেঞ্চগুলি মিটিং-এর জায়গায় টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখ আর সিকদার বাড়ির লোক এসে বাধা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। চেয়ার টেবিল তারা পাততে দেবে না ওখানে। কিছুতেই নাকি মিটিং হতে দেবে না। আপনি একবার হুকুম দিন জেঠামশাই, দেখি ওরা কেমন করে না দিতে পারে।'

অতুল বলল, 'কেবল সেখ আর সিকদাররাই হবে কেন, চরকান্দির সমস্ত মুসলমানই

জায়গা নিয়ে কোন আপত্তি করেনি, বরং তারা এসে সমান ভাবে কামলা খেটেছে, দুর্বাঘাসের ওপর বসে শচীবিলাসের বক্তৃতা শুনেছে, তাদের বউ-ঝিরা বেরিয়ে এসে গাছ গাছালির আড়াল থেকে ঘোমটা তুলে রঙ্গ দেখেছে ছোটকর্তার। এত দিনের মধ্যে কোনদিন কোন আপত্তি ওঠেনি, কোন নালিস অভিযোগ আসেনি কোন পক্ষ থেকে। আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সমস্ত কিছু কলুষিত হয়ে উঠেছে। সম্মান নেই, শ্রদ্ধা নেই, সৌহার্দ্য নেই। শচীবিলাসের সমস্ত অন্তর বেদনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

চটানের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে মুসলমান জনতা ভিড় করে রয়েছে। উত্তেজিত ভাবে তারা কি যেন বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে। শচীবিলাস এগিয়ে গেলেন সেখানে। ডাকলেন, 'মকবুল, মনসুর, এদিকে এসো।'

পিছন থেকে কয়েকটি মুসলমান ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, 'মকবুল মনসুর নয়, মকবুল মিঞা মনসুর মিঞা।' শচীবিলাস ম্লান একটু হাসলেন, 'আচ্ছা তাই হবে, মকবুল মিঞা এদিকে একবার আসুন।'

মকবুল এসে জোড়হাত করে দাঁড়াল, 'মাফ করবেন কাকাবাবু। ওই ফাজিল ছেকরাদের কথায় কান দেবেন না। মিঞা কেন, আমাকে শুধু মকবুল বলেই ডাকুন। আমি আপনার ছেলের মত।'

শচীবিলাস অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু ছেলের মত এ কোন কাজটা করলে তুমি। বছর বছর ধরে এখানে আমরা জাতীয় পতাকা তুলছি, আজ হঠাৎ তেমোদের আপত্তির কি কারণ ঘটল। আর আপত্তিই যদি ছিল আগে জানালে না কেন। কেন সামিয়ানা, আর চেয়ার টেবিলগুলি ছিঁড়ে ছুঁড়ে তছনছ করে দিলে।'

মকবুল বলল, 'আজ্ঞে সব ওই বদমাস ছোকরাদের কাণ্ড। ওরা ক্ষেপে গিয়েছে।'

শচীবিলাস চোখ গরম করে বললেন, 'আর ক্ষেপিয়ে তুলেছে তোমাদের ওই বদমাস মৌলবী।'

মুসলমানদের মধ্যে একটা হৈ চৈ শব্দ শোনা গেল। দু'হাত তুলে তাদের শান্ত হতে বলে মকবুল একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াল শচীবিলাসের সামনে, বলল 'মৌলবী নয় কাকাবাবু, মৌলবী সাহেব। তিনি এখানকার সালার সাহেব আমাদের, নেতা, আপনি যেমন হিন্দুদের।'

শচীবিলাস ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কেবল হিন্দুদের! আমি কি তোমাদেরও নই?'

মকবুল চুপ করে রইল।

শচীবিলাস আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ, কি বলেছেন তোমাদের মৌলবী সাহেব?'

মকবুল বলল, 'বলেছেন, ও নিশান আমাদের নয়। আমাদের নিশান চাঁদ-মার্কা লীগের নিশান। আপনাদের ওই তে-রঙা উড়তে দেখলে আমাদের গুণাহ্ হয়। ও নিশান এখানে আমরা উড়তে দিতে পারি না।'

শচীবিলাস প্রতিবাদ করে বললেন, 'মিথ্যা কথা। এ নিশান কেবল হিন্দুর নয়, হিন্দু মুসলমান সকলেরই। এ নিশান ভারতের একমাত্র জাতীয় পতাকা। একে অসম্মান কোরোনা মকবুল।'

কিন্তু সমস্ত মুসলমান জনতার কোলাহলে শচীবিলাসের কণ্ঠ ডুবে গেল। তাঁর শেষের দিকের কথাগুলি মোটেই শোনা গেল না।

হিন্দু যুবকের দল একদিকে রুখে দাঁড়াল আর একদিকে মুসলমানেরা। সংখ্যায় তারাই বেশী। মুহূর্তে মুহূর্তে তাদের দল স্ফীত হতে লাগল। পিছনের দিকে লাঠি আর খেজুর গাছ কাটা ছ্যানি দেখা দেখা গেল কারো কারো হাতে। এখানে কিছুতেই তে-রঙা নিশান তারা ওড়াতে দেবে না।

বিনয় শচীবিলাসের কানের কাছে এসে বলল, 'অনুমতি করেন তো বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ছাড়ি গোটা কয়েক। ভয়ে ওরা পালিয়ে যেতে পথ পাবে না।'

শচীবিলাস মাথা নাড়লেন, 'না বিনয়, ওসব নয়।'

বিনয় বলল, 'তবে কি জাতীয় পতাকা এ গাঁয়ে উঠবে না আজ? প্রাণের ভয়ে আমরা পিছিয়ে যাব? অপমান করব জাতীয় পতাকার?'

শচীবিলাস বললেন, 'নিশ্চয় নয়। জাতীয় পতাকা আজ আমরা তুলবই এখানে।'

বন্ধুরা বললেন, 'কাজটা সমীচীন হবেনা শচী। ফের দাঙ্গা হাঙ্গামার কোন রকম সুযোগ দেওয়া উচিত নয় এখন। চল বরং অন্য স্থান দেখি, গাঁয়ে তো আরো অনেক জায়গা আছে।'

ইন্দিরা বলল, 'তা আছে। কিন্তু গাঁয়ের অনেক মানুষই তা হলে এখানে পড়ে থাকবে। স্বাধীনতা দিবসের উদ্‌যাপনে গাঁয়ের বেশীর ভাগ লোকেরই কোন অংশ থাকবে না।'

শচীবিলাস কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'তুমি তা হলে করতে চাও কি? ওদের ওই ভ্রান্ত ধারণার, অবুঝ আবদারের প্রশ্রয় দিতে চাও?'

ইন্দিরা বলল, 'আপাতত এক আধটু তো দিতেই হবে বাবা। কেবল কি ধমকেই ফল হবে? আচ্ছা দেখি আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে।'

স্তব্ধ বিমূঢ় ভঙ্গিতে শচীবিলাস দাঁড়িয়ে রইলেন। পতাকা উত্তোলনে ঠিক এ ধরণের বাধা তিনি কোন দিন পাননি। কতবার পুলিশের হাতে মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন, পতাকার কাপড় তারা ছিঁড়ে ফেলেছে, দণ্ড ভেঙ্গেছে পিঠের ওপর। কতবার কারাদণ্ড নিতে হয়েছে এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে। কিন্তু

কোনবার নিরুদ্যম হয়ে পড়েননি শচীবিলাস, নিরুৎসাহ হননি। দু'চার দশজন পুলিস দেশের স্বাধীনতাকে আটকে রাখতে পারবে না, তাদের দু'চার দশ হাজার অভিভাবকরাও নয়। কিন্তু আজ আইনের বাধা নেই, পুলিসের দল এসে পথ রুখে দাঁড়ায়নি। কিন্তু দাঁড়িয়েছে আর এক শ্রেণী। তারা দু'চার দশজন নয়, দু'চার দশ হাজারও নয়, অনেক অনেক বেশী। তারা পর নয়, নিতান্ত আপনার জন, তাদের ফেলে দেওয়া যায় না, ছেঁটে দেওয়া যায় না, রাগে অভিমানে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না তাদের। দেশের তারা অংশ, অঙ্গের তারা প্রত্যঙ্গ। অথচ তারাই আজ পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারাই ছিনিয়ে নিচ্ছে স্বাধীনতা পতাকা শচীবিলাসের হাত থেকে। এর চেয়ে মর্মন্তুদ আর কি হতে পারে, এর চেয়ে বেশী যন্ত্রণাদায়ক ?

ইন্দিরাকে নিজেদের দলের মধ্যে দেখে মুসলমানরা কৌতূহলী হয়ে উঠল। এই স্বদেশী মেমসাহেবটি তাদের কাছে এক বিস্ময় আর কৌতূহলের বস্তু। কখনো কখনো কৌতুকও তারা বোধ করে। ইন্দিরা আর শচীবিলাস প্রায়ই দেশে থাকেন না। কিন্তু কলকাতা থেকে দেশে যখন ফেরেন সারা গাঁয়ে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। আর কোন হিন্দুর ঘরের মেয়ে এমন করে মাঠে ঘাটে বেরোয় না এ অঞ্চলে, বক্তৃতা করে না, দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে না সকলের সঙ্গে। কিন্তু ইন্দিরা সকলের মধ্যে ব্যতিক্রম। অত্যন্ত সাহস তার, সোমত্ত পুরুষদের প্রায় গা ঘেঁষে সে দাঁড়ায়। চোখে চোখ রেখে কথা কয়। সে কথার বেশীর ভাগই হয়তো বোঝা যায় না, কিন্তু শুনতে ভালো লাগে। ভারি মধুর ইন্দিরার বলবার ভঙ্গি। রক্তিম চমৎকার পাতলা দুটি ঠোঁট। তাকে দেখে লোভ হয় মকবুলের। কি যেন আছে এই মেয়ের মধ্যে। বহুদিনের পুরোন পীরগাঁয়ের সেই পোড়ো মসজিদটার মত। বাইরে এখনো তার গায়ে চমৎকার সব কারুকার্যের চিহ্ন দেখা যায় কিন্তু ভিতরে যেতে সাহস হয় না। সেই পোড়ো মসজিদের ভিতরকার রহস্য দূরে দাঁড় করিয়ে রাখে কিন্তু অভ্যন্তরে টেনে নেয় না। ছোট কর্তার মেয়ে এই অপূর্ব খুবসুরৎ ইন্দিরাও তেমনি।

খানিক বাদে ইন্দিরা ফিরে এল। মুখে তার বিজয়িনীর হাসি। সে জিতেছে। সন্ধি করতে পেরেছে, সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছে এই উন্মত্ত জনতার সঙ্গে। শচীবিলাসদের কাছে ফিরে এসে ইন্দিরা বলল, 'ওদের রাজী করিয়েছি। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ওরাও যোগ দেবে। আর এখানেই হবে সেই অনুষ্ঠান, অন্যত্র যেতে হবে না।'

শচীবিলাস সাগ্রহে বললেন, 'যোগ দেবে ?'

শচীবিলাসের বন্ধু সহযোগীরা বললেন, 'কি সর্তে ?'

ইন্দিরা বলল, 'ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা আপাতত ওড়ানো হবে না।'

পিতৃবন্ধুরা শ্লেষ করে উঠলেন, 'তবে কি ওড়াতে হবে ? চাঁদ মার্কা না কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা নিশান বুঝি ?'

ইন্দিরা মৃদু হেসে বলল, 'না তাও নয়। কোন নিশানের কথাই আজ উঠবে না। আজ প্রতীকের দরকার নেই আমাদের, তার বদলে মানুষকে পেয়েছি।'

অনেক আপত্তি উঠল। বিনয়ের দলের কেউ কেউ চলেও গেল জায়গা ছেড়ে। কিন্তু খানিকটা ইতস্তত করে শচীবিলাস শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালেন একটা টেবিলের ওপর, 'বন্ধুগণ।'

তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে শচীবিলাস আবার উচ্চতর কণ্ঠে বললেন, 'বন্ধুগণ!'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হোল আজকের দিনে শূন্য তাঁর হাত। দৃঢ় হস্তে জাতীয় পতাকা তিনি সকলের সামনে তুলে ধরতে পারেননি। লোকে কানাকানি করছে এটা তাঁর নিতান্তই সন্তান-বাৎসল্য। তিনি জানেন তা ঠিক নয়। এ তাঁরই স্বদেশ আর স্বজন-বাৎসল্যও বটে। বক্তব্যটুকু গুছিয়ে নেওয়ার জন্য অভ্যাস বশে পলকের জন্য চোখ বুজলেন শচীবিলাস। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে মুখে তাঁর গভীর প্রশান্ত পরিতৃপ্তি ফুটে উঠল। আর কোন ক্ষোভ নেই, কোন বেদনা নেই তাঁর অন্তরে।

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা দুলে দুলে উঠছে মৃদু হাওয়ায়। মাঝখানটায় খদ্দরের পবিত্র শুভ্রতা, দুইপাশে হরিত হলুদের ঢেউ।